সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা

দ্বিতীয় ভাগ

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., ডি. ফিল.

ও

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম. এ., পি. আর. এস্.,
কাব্যতীর্থ

এ.ম

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক ঃ

শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ

২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৬৭

মুদ্রাকর ঃ

শ্রীভোলানাথ হাজরা

রূপবাণী প্রেস

৩১, বাদুড়বাগান স্ট্রীট

কলিকাতা-৯

ভূমিকা

এই গ্রন্থের প্রথম ভাগের মুখবন্ধে যে প্রতিশ্রুতি ছিল, তদনুযায়ী বর্তমান দ্বিতীয় ভাগে ধর্মশাস্ত্র, দর্শন, তন্ত্র, অলঙ্কার ও ছন্দ—এই কয়টি বিষয় সন্নিবেশিত হইল। উক্ত মুখবন্ধেই বলা হইয়াছে যে, এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য গবেষণা বা পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা নহে। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহুমুখিতার যে পরিচয় সংস্কৃত সাহিত্যে নিহিত আছে, তাহা সাধারণ পাঠকের বোধগম্য করিয়া সংক্ষেপে প্রকাশ করাই এই গ্রন্থের লক্ষ্য। ইহাতে আলোচিত বিষয়গুলি সংস্কৃতসাহিত্যসমুদ্রের কতিপয় রত্নমাত্র। এই সমগ্র মহাসমুদ্র মন্থন করিতে হইলে এইরূপ আরও কয়েকখণ্ড গ্রন্থের প্রয়োজন।

যে সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে এই ভাগে লিখিত হইল, তাহাদের অংশবিশেষ বাংলাভাষায় ইতস্ততঃ আলোচিত হইয়াছে বটে; কিন্তু, বিষয়গুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত অথচ সামগ্রিক আলোচনা কোন একটি বাংলা গ্রন্থে সম্ভবতঃ এ পর্যন্ত হয় নাই। সুতরাং, যে সাধারণ পাঠক নানা কর্মব্যস্ততার মধ্যে প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন চিন্তাধারার সহিত অল্পসময়ে ও অল্পায়াসে পরিচিত হইতে চাহেন, তিনি উপযুক্ত গ্রন্থের অভাবে অসহায় বোধ করেন। তাঁহার এই অভাব আংশিকভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থিকা রচনার প্রয়াস।

Bashamএর ইংরাজী ভাষায় লিখিত *The Wonder that was India*, Rénouর *Ancient Indian Civilisation*, Oursel-Grabowska-Sternএর *Ancient India and Indian Civilisation* প্রভৃতি গ্রন্থ বর্তমান গ্রন্থরচনায় অনেক পরিমাণে প্রেরণা দান করিয়াছে। ইংরাজ পাঠকের ভারত-জিজ্ঞাসার ন্যায় স্বাধীন ভারতে বাঙ্গালী পাঠকেরও জিজ্ঞাসা কিয়ৎ-পরিমাণে তৃপ্ত হইলেও এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

ঈদৃশ গ্রন্থের প্রণয়নে পূর্বসূরি ও বিশেষজ্ঞগণের সাহায্য অপরিহার্য। প্রতি অধ্যায়ের অন্তে সন্নিবেশিত গ্রন্থপঞ্জীতে পূর্ববর্তী লেখকগণের ঋণ স্বীকার করা হইয়াছে। এই গ্রন্থরচনায় লেখকদ্বয় দার্জিলিং গভর্নমেণ্ট কলেজের ভূতপূর্ব

অধ্যাপক শ্রীদেবীপ্রসাদ সেন, শ্রীসুধীররঞ্জন রায়, শ্রীরমাপ্রসাদ দাস, শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ ও শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন মহাশয়গণ হইতে অকুণ্ঠ উৎসাহ লাভ করিয়াছেন। ইঁহারা ছাড়াও, শ্রীসুশীলকুমার দে, শ্রীগোপীনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীত্রিপথনাথ স্মৃতিতীর্থ, শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অধ্যাপকগণ লেখকদ্বয়কে সৎপরামর্শ দান করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই গ্রন্থকারদ্বয়ের কৃতজ্ঞতাভাজন।

লেখকদ্বয়ের অনিচ্ছাসত্ত্বেও বর্তমান গ্রন্থের কলেবর পরিকল্পিত আকার হইতে বৃহত্তর রূপ ধারণ করিল; কারণ, আলোচ্য বিষয়গুলি এত ব্যাপক যে, অধিকতর সংক্ষিপ্তীকরণ সম্ভবপর হইল না।

এই গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে অর্থশাস্ত্র, প্রাচীন ভারতে রসায়ন শাস্ত্র, গণিত প্রভৃতি বিজ্ঞানের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

বর্তমান গ্রন্থের ভ্রমপ্রমাদ ও ত্রুটিবিচ্যুতির প্রতি গ্রন্থকারদ্বয়ের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সুধীসমাজের নিকট অনুরোধ জ্ঞাপনান্তে কালিদাসের ভাষায় বলা যাইতেছে—

আ পরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।

ইতি

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য

দ্রষ্টব্য :—এই গ্রন্থের 'ধর্মশাস্ত্র' ও 'তন্ত্রশাস্ত্র' শীর্ষক অধ্যায় দুইটি সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত; অবশিষ্ট অংশ নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক রচিত।

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা

॥ ধর্মশাস্ত্র ॥

'ধর্মশাস্ত্র' শব্দের অর্থ

যে শাস্ত্র ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বিধিনিষেধ লিপিবদ্ধ করে তাহাই ধর্মশাস্ত্র। কিন্তু, ধর্ম কি? মীমাংসাসূত্রে[১] বলা হইয়াছে—চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ। অর্থাৎ কিনা, ধর্ম তাহাই যাহা মানুষকে বিহিত কর্মে প্রণোদিত করে। সুতরাং দেখা যায়, ধর্মকে religion বলিলে ঠিক অনুবাদ হয় না। Religion শব্দে সাধারণতঃ আমরা কোনরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাসই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু, ঈশ্বরে বিশ্বাস বা ঈশ্বরোদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকাণ্ডই যে কেবল ধর্ম শব্দে বুঝায় তাহা নহে; ধর্মের অর্থ আরো ব্যাপক। ইংরেজীতে যাহাকে আমরা inherent characteristic বলি, ধর্ম শব্দ কখনও কখনও সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়; যেমন জলের ধর্ম শৈত্য, অগ্নির ধর্ম দাহিকা শক্তি, ইত্যাদি। 'বর্ণাশ্রমধর্ম' শব্দটির প্রয়োগ করিলে আমরা বর্ণের এবং আশ্রমের ইতিকর্তব্যতাকেই বুঝি। অতএব duty শব্দটি অনেকাংশে 'ধর্ম' শব্দটির ভাব প্রকাশ করে। 'ধর্ম্য যুদ্ধ'কে গীতায়[২] শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয়ের 'স্বধর্ম' বলিয়াছেন; এই 'ধর্ম' শব্দ কর্তব্য অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে[৩]। 'ধৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'ধর্ম' পদটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'যাহা ধরিয়া রাখে'; মানুষের জীবন তো সহস্র কর্তব্যেরই বন্ধনে বাঁধা।

ধর্মশাস্ত্রের ধর্মকে ব্যাপক অর্থেই বুঝিতে হইবে। বিভিন্ন বর্ণের ও আশ্রমের ধর্ম সম্বন্ধে বিধিনিষেধই এই শাস্ত্রের আলোচ্য।

---

১. পূর্বমীমাংসাসূত্র, ১. ১. ২।

২. ২।৩১।

৩. গীতার অন্যান্য স্থলেও (২।৩৩, ৩।৩৫, ১৮।৪৭) এই অর্থে 'ধর্ম' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে

ধর্মশাস্ত্র—স্মৃতি

'স্মৃতি' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'যাহা স্মৃত হয় তাহা'। ব্যাপক অর্থে, যাহা শ্রুতি নহে তাহাই স্মৃতি। যাহা শ্রুত হয় তাহাই শ্রুতি; এই শব্দে লোকপরম্পরায় শ্রুত বেদকেই বুঝায়। পরবর্তী কালে স্মৃতি বলিতে কেবল ধর্মশাস্ত্রকেই বুঝাইত; 'ধর্মশাস্ত্রং তু বৈ স্মৃতিঃ'—এই উক্তিই ইহার প্রমাণ।

ধর্মশাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্তন

আর্যগণের আদি গ্রন্থ ঋগ্বেদসংহিতা। কালক্রমে অপর তিন সংহিতার আবির্ভাব হইল। এই সংহিতাচতুষ্টয়ে তাঁহাদের কর্তব্যাকর্তব্য লিপিবদ্ধ ছিল। বৈদিক যুগের প্রারম্ভ হইতে বহুকাল পর্যন্ত আর্যগণ জ্ঞানকাণ্ড নিয়াই ব্যস্ত ছিলেন। উষা, সূর্য, মরুৎ, প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্য ও বস্তু দর্শনে বিস্ময়-বিহ্বল ঋষি তাহাদের স্তুতিগান করিয়াই কালযাপন করিতেন। ক্রমশঃ তাঁহারা স্থান হইতে স্থানান্তরে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেন, দস্যুদের সহিত তাঁহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। ফলে, তাহাদের বৃহত্তর সমাজে ও জীবনে জটিলতার সৃষ্টি হইল। শুদ্ধ জ্ঞান হইতে জটিল কর্মের বন্ধনে তাঁহারা আবদ্ধ হইলেন। এইবার বৈদিক যুগের কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত হইল। নানাবিধ ঐহিক ও পারত্রিক ফলকামনায় তাঁহারা বহুবিধ যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে আত্ম-নিয়োগ করিলেন। এই কর্মকাণ্ড ক্রমে বিশাল হইতে বিশালতর রূপ ধারণ করিল। অবশেষে এমন হইল যে, যাগযজ্ঞের খুঁটিনাটি নিয়মপ্রণালী আর লোকের পক্ষে মনে করিয়া রাখা সম্ভবপর হইল না; এই বিষয়ে গ্রন্থরচনার প্রয়োজন অনুভূত হইল। এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই 'ব্রাহ্মণ' নামক সাহিত্যের সৃষ্টি হইল[১]। কালক্রমে ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি এত বৃহদাকার হইয়া পড়িল যে, তাহাদের সংক্ষিপ্তসার আবশ্যক হইল। এই সংক্ষিপ্তসার স্মৃতি-সহায়ক সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়া কল্পসূত্র নাম ধারণ করিল। শ্রৌতসূত্র গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র ও শুল্বসূত্র—এই চতুর্বিধ সূত্র লইয়া কল্পসূত্রের সৃষ্টি। বৈদিক

১. বর্তমান গ্রন্থের প্রথমভাগের ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

যাগযজ্ঞের নিয়মপ্রণালী লিপিবদ্ধ হইল শ্রৌতসূত্রে, উপনয়ন ও বিবাহাদি সংস্কারসমূহ হইল গৃহ্যসূত্রের আলোচ্য এবং চতুর্বর্ণের ও চতুরাশ্রমস্থ ব্যক্তি-গণের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের নিয়মকানুন আলোচিত হইল ধর্মসূত্রে। যজ্ঞবেদির পরিমাপ, আকার ও নির্মাণপ্রণালী লিপিবদ্ধ হইয়াছিল শুল্বসূত্রে।

ধর্মসূত্রগুলিকে ধর্মশাস্ত্রসূত্র, সাময়াচারিক সূত্র বা ধর্মশাস্ত্র আখ্যাতেও অভিহিত করা হইত। ধর্মসূত্রগ্রন্থগুলির মধ্যে কোন কোনটি শুধু সূত্রাকারে লিখিত, কোন কোনটিতে কিন্তু সূত্র ও শ্লোক উভয়ই সন্নিবেশিত হইয়াছে। পরবর্তী কালে, সম্ভবতঃ সমাজ-বিস্তারের ফলে এবং স্থানভেদে আচারব্যবহার ও রীতিনীতির ভেদবশতঃ ধর্মসূত্র-গ্রন্থগুলির প্রসারণ এবং সংখ্যাবৃদ্ধি আবশ্যক হইয়াছিল এবং মনু-সংহিতা ও যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রগুলি শ্লোকাকারে রচিত হইয়াছিল। ধর্মশাস্ত্রের সূত্রগ্রন্থ ও শ্লোকগ্রন্থগুলির রচনাকালের পৌর্বাপর্য সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতাতে কুড়িজন ধর্মশাস্ত্রকারের নাম আছে[১]। ইহা ছাড়াও নানা স্মৃতিগ্রন্থে অপর অনেক ধর্মশাস্ত্রকারের নাম পাওয়া যায়।

প্রাচীন-স্মৃতি ও নব্যস্মৃতি

সাধারণভাবে ধর্মসূত্রগুলিকে, বিশেষতঃ শ্লোকাকারে রচিত উক্ত ধর্ম-

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

১. মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরা-

৮ ৯ ১০ ১১ ১২

যমাপস্তম্বসংবর্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী।

১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮

পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ

১৯ ২০

শাতাতপোবশিষ্ঠশ্চ ধর্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ॥

আচারাধ্যায়, ১।৪-৫।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, এই শ্লোকবহির্ভূত ধর্মশাস্ত্রকারও অনেক ছিলেন ; যথা—বৌধায়ন, প্রচেতাঃ, সুমন্ত ইত্যাদি।

শাস্ত্রগুলিকে, প্রাচীন-স্মৃতির পর্যায়ে ধরা হয়। ইহাদের টীকাটিপ্পনী, ভাষ্য, সংক্ষিপ্তসার ও ইহাদের ভিত্তিতে রচিত নিবন্ধগুলিকে নব্যস্মৃতি নামে অভিহিত করা হয়।

প্রাচীন-স্মৃতির রচনাকাল

সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যান্য শাখার ন্যায় এই শাখারও রচনাকাল নিশ্চিত ভাবে নির্ধারণ করা অসাধ্য। আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কতক প্রমাণবলে পণ্ডিতপ্রবর কাণে সূত্রে ও শ্লোকে রচিত ধর্মশাস্ত্রগ্রন্থসমূহের রচনাকাল মোটামুটিভাবে নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।[১] বাহুল্য-ভয়ে তাহার সিদ্ধান্তসমূহের পুনরুক্তি বর্জন করা হইল। এখানে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে, মহামহোপাধ্যায় কাণের মতে প্রাচীনতম ধর্মসূত্রের প্রণয়ন হইয়াছিল খ্রীঃ পূঃ ৬০০-৪০০ অব্দের মধ্যে।

ধর্মসূত্র

নিবন্ধগ্রন্থসমূহের মধ্যে ধর্মশাস্ত্রবিষয়ক বহু সূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু, অদ্যাবধি সমস্ত ধর্মসূত্রকারগণের প্রণীত গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয় নাই। যে কয়খানি ধর্মসূত্রের গ্রন্থ আবিষ্কৃত ও মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রধান—

(১) গৌতম ধর্মসূত্র,
(২) বৌধায়ন ” ,
(৩) আপস্তম্ব ” ,
(৪) বিষ্ণু ” ,
(৫) বৈখানস ” ,
(৬) বাশিষ্ঠ ধর্মশাস্ত্র।

মনুস্মৃতি বা মনুসংহিতা

ধর্মশাস্ত্র বলিতে জনসাধারণ 'মনুসংহিতা'কেই বুঝিয়া থাকে। সুতরাং এই গ্রন্থের রচয়িতা ও রচনাকাল সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। পণ্ডিতগণের

---

১. দ্রষ্টব্য *History of Dharmasatra*, Vol. I.

মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে, এই গ্রন্থের বর্তমান রূপটি ইহার আদিম রূপ নহে। মূল গ্রন্থটি কে কখন রচনা করিয়াছিলেন তাহা অজ্ঞেয়। ঋগ্বেদে দেখা যায়, মনু হইতে মানবজাতির সৃষ্টি। সুতরাং, এই গ্রন্থকে তাঁহার রচনা মনে করা যাইতে পারে না। মনুস্মৃতিতে[১] দেখা যায় যে, ঋষিগণ বর্ণাশ্রম ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের আশায় মনুর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি সৃষ্টিক্রম প্রভৃতি কিছু বর্ণনা করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার শিষ্য ভৃগু তাঁহাদের নিকট এই শাস্ত্র ব্যাখ্যান করিবেন। এই সমস্ত কারণে, অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে, এই সংহিতার সংকলয়িতা স্বীয় সংকলিত গ্রন্থে প্রাচীনত্ব ও প্রামাণিকত্ব আরোপ করিবার জন্যই মনুর নামের সহিত ইহাকে যুক্ত করিয়াছেন।

নানা যুক্তি ও প্রমাণ বলে পাশ্চাত্ত্য মনীষী বুহ্লার (Buhler) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, বর্তমান মনুস্মৃতিটি খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক হইতে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যে সংকলিত হইয়াছিল। পণ্ডিতবর কাণেও এই মত সমর্থন করেন।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত বিংশতি ধর্মশাস্ত্রকারগণের মধ্যে সর্বপ্রথম লিখিত হইয়াছে মনুর নাম। ধর্মশাস্ত্রসমূহের মধ্যে মনুসংহিতা ভারতে শীর্ষস্থানীয় বলিয়া যুগে যুগে স্বীকৃত হইয়াছে। লোকপরম্পরায় প্রসিদ্ধ একটি উক্তি হইতেছে—মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্নপ্রশস্যতে, অর্থাৎ মনূক্ত বিধির বিপরীতার্থবোধক যে স্মৃতি তাহা প্রশস্ত নহে। অপর একটি উক্তি—বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্; বেদের অর্থ উপনিবদ্ধ হওয়ায়ই মনুর গ্রন্থের প্রাধান্য হইয়াছে। 'তৈত্তিরীয় সংহিতা'য় (২. ২. ১০. ২) বলা হইয়াছে—'যদ্বৈ কিং চ মনুরবদত্তদ্ভেষজম্' : মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহাই ঔষধস্বরূপ। 'তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে'ও (২৩.১৬.১৭) অনুরূপ উক্তি দেখা যায়।

১. ১।৫৯।

'মনুসংহিতা'র টীকাকারগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মেধাতিথি, গোবিন্দরাজ ও কুল্লূকভট্ট। কুল্লূক সম্ভবতঃ বাঙ্গালী ছিলেন।[১]

মনুস্মৃতির পরেই ধর্মশাস্ত্রে যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির স্থান। এই স্মৃতির বহু টীকার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান বিজ্ঞানেশ্বর-কৃত 'মিতাক্ষরা'। হিন্দুগণের দায়বিভাগ ও উত্তরাধিকার প্রভৃতি ব্যাপারে বঙ্গদেশ ভিন্ন সমগ্র ভারতে মিতাক্ষরাই সর্বাধিক প্রামাণ্য বলিয়া যুগে যুগে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির ভিত্তিতেই জীমূতবাহন 'দায়ভাগ' নামে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, বাংলাদেশে উহাই প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। উক্ত স্মৃতির উপরে শূলপাণি নামক একজন প্রসিদ্ধ প্রাক্-রঘুনন্দন বাঙালী নিবন্ধকার 'দীপকলিকা' নাম্নী একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। ইহা সংক্ষিপ্ত অথচ প্রাঞ্জল।

নব্যস্মৃতি—নিবন্ধ সাহিত্য

স্মৃতিনিবন্ধ নামে যে সকল অসংখ্য গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহাদিগকে নব্য-স্মৃতি আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। স্মৃতিশাস্ত্রের মূল গ্রন্থগুলিতে নানাপ্রকার বিধিনিষেধ একত্র লিপিবদ্ধ আছে। পরবর্তী স্মার্ত পণ্ডিতগণ স্মৃতিশাস্ত্রের বিষয়-বস্তুকে আচার, প্রায়শ্চিত্ত, ব্যবহার প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকরণে সাজাইয়া প্রত্যেক প্রকরণের অন্তর্গত বিষয়গুলি লইয়া নিবন্ধগ্রন্থসমূহ রচনা করিয়াছিলেন। এইরূপ করিতে যাইয়া তাঁহারা স্ব স্ব স্থানে আচার এবং রীতিনীতি-গত বৈষম্যও লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। স্মৃতিনিবন্ধগুলিকে আমরা প্রধান দুইটি ভাগে বিভক্ত করিতে পারি :—

(ক) টীকা, ভাষ্য প্রভৃতি—যথা, 'মনুসংহিতা'র 'মেধাতিথিভাষ্য' ও যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার 'মিতাক্ষরা'। ইহাদের মধ্যে শ্লোকসমূহের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বহু গ্রন্থ হইতে রচনাদি উদ্ধৃত করিয়া নানা যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে। এইজন্যই এই টীকা ও ভাষ্যগুলি নিবন্ধের আকার ধারণ করিয়াছে।

---

১. তাঁহার 'মন্বর্থমুক্তাবলী' নামক 'মনুসংহিতা'র টীকাতে আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন :—

গৌড়ে নন্দনবাসিনাম্নি সুজনৈর্বন্দ্যো বরেন্দ্র্যাং কুলে
শ্রীমদ্‌ভট্টদিবাকরস্য তনয়ঃ কুল্লূকভট্টোঽভবৎ।

(খ) মৌলিক রচনা—যেমন, রঘুনন্দনের 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব'।

শেষোক্ত গ্রন্থগুলি আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত :—

(১) **ব্যাখ্যাত্মক**—এই জাতীয় নিবন্ধে মূলস্মৃতির অনুশাসনগুলিকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন স্মৃতিকারের পরস্পর-বিরোধী বচনসমূহের সামঞ্জস্যবিধান করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মীমাংসা ও ন্যায়শাস্ত্রের অনেক যুক্তির অবতারণা করিয়া নিবন্ধকারগণ স্বীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। উল্লিখিত 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব' এই ধরণের রচনা।

(২) **সার সংকলন** (Digest)

এই জাতীয় গ্রন্থে কোন বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে শ্লোকসমূহ সংকলিত আছে; ইহাদের মধ্যে সংকলয়িতার নিজস্ব মতামত বা বিচার বিশেষ কিছু নাই। হেমাদ্রির 'চতুর্বর্গচিন্তামণি' এই শ্রেণীর গ্রন্থ।

নব্যস্মৃতির বিভিন্ন সম্প্রদায় (School)

আমরা দেখিয়াছি যে, প্রাচীন স্মৃতির বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা ও বিরুদ্ধবচন-সমূহের সামঞ্জস্য-সাধনই ছিল নব্যস্মৃতির মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু, দেশভেদে ও রুচিভেদে এবং সম্ভবতঃ, কোন কোন ক্ষেত্রে, স্থানীয় সামাজিক অবস্থার প্রয়োজনে, একই মূল স্মৃতিবাক্যের বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা হইতে থাকিল। আইন-কানুনের ভাষার নানারূপ ব্যাখ্যাই (interpretation) সম্ভবপর। বিশেষতঃ, সংস্কৃত ভাষার এমনই প্রকৃতি যে, অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন ধীমান্ ব্যক্তির নিকট উহা ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রতিভাত হইতে পারে। এই সমস্ত কারণে ভারতের নানা প্রদেশে নব্যস্মৃতির নানা সম্প্রদায় দেখা দিল। এই সম্প্রদায়-গুলির মধ্যে প্রধান ও সর্বাধিক প্রসিদ্ধ বঙ্গদেশীয় সম্প্রদায়, মৈথিল সম্প্রদায়, বারাণসী সম্প্রদায় ও দাক্ষিণাত্য সম্প্রদায়।

নিবন্ধকার ও নিবন্ধ

বর্তমান গ্রন্থের পরিসরে বিশাল নিবন্ধ-সাহিত্যের লেখক ও গ্রন্থের সম্পূর্ণ

বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর নহে। সুতরাং, এখানে শুধু প্রধান প্রধান গ্রন্থকার ও গ্রন্থের সামান্য পরিচয় দেওয়া হইল।[১]

বিশ্বরূপ

খ্রীষ্টীয় ৭৫০ হইতে ১০০০ অব্দের মধ্যে কোন সময় তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া মনে করা হয়। 'যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি'র উপর বিশ্বরূপ-রচিত টীকা 'বালক্রীড়া' নামে সুপ্রসিদ্ধ।

শ্রীকর

ইনি সম্ভবতঃ মৈথিল ছিলেন। বঙ্গদেশের শ্রীনাথাচার্যচূড়ামণির পিতা শ্রীকর ভিন্ন ব্যক্তি। মৈথিল শ্রীকর খ্রীঃ ১০৫০ অব্দের পুর্বেকার লেখক। তাঁহার কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই ; কিন্তু 'মিতাক্ষরা' ও 'স্মৃতিচন্দ্রিকা'র মত প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহে ইঁহার মতের উল্লেখ দেখা যায়।

মেধাতিথি

'মনুস্মৃতি'র বিখ্যাত মনুভাষ্য ইঁহারই রচনা। 'মনুস্মৃতি'র ভাষ্যসমূহের মধ্যে এই ভাষ্যই প্রাচীনতম। ইহা বিস্তৃত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। মেধাতিথির জীবনকাল সম্ভবতঃ ৮২৫ হইতে ৯০০ খ্রীষ্টাব্দ।

বিজ্ঞানেশ্বর

'মিতাক্ষরা' নামক যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতির সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য টীকা ইঁহার রচিত। বিভিন্ন যুক্তিবলে অনুমান হয় যে, 'মিতাক্ষরা' ১০৭০ হইতে ১১০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছিল।

'মিতাক্ষরা' রচনাকাল হইতে বঙ্গদেশ ছাড়া ভারতের অন্যান্য সমস্ত প্রদেশে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। ভারতের ব্রিটিশ সরকারও

---

১. বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা বিভিন্ন লেখকগণ কর্তৃক রচিত শুধু স্মৃতিনিবন্ধেরই আলোচনা করিব ; তাঁহাদের রচিত অন্য কোন বিষয়ের গ্রন্থের উল্লেখ করিব না।

ইহার প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়া ইহার অনুশাসন অনুযায়ী হিন্দুদের দায়বিভাগ ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। পুত্র জন্মমাত্রেই পিতামহের সম্পত্তিতে অধিকারী হয়[১]—ইহাই মিতাক্ষরাকারের প্রধান সিদ্ধান্ত।

গোবিন্দরাজ

মনুস্মৃতির উপরে ইঁহার টীকা সুবিদিত ইনি সম্ভবতঃ খ্রীষ্টয় দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগের লেখক।

লক্ষ্মীধর

এই লেখকের রচিত নিবন্ধ 'কৃত্য-কল্পতরু' বা 'কল্পতরু' নামে প্রখ্যাত। গ্রন্থটির আকার বিরাট এবং ইহা অনেকগুলি কাণ্ডে বিভক্ত। উত্তর ভারতের নিবন্ধসমূহে লক্ষ্মীধরের অপরিসীম প্রভাব লক্ষিত হয়। লক্ষ্মীধরের জীবনকাল খ্রীঃ দ্বাদশ শতকের পূর্বার্ধ।

অপরাদিত্য

ইঁহার 'অপরার্ক' 'যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি'র বিখ্যাত টীকা। ইনি সম্ভবতঃ খ্রীঃ দ্বাদশ শতকের প্রথম পাদে এই টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

'স্মৃতিচন্দ্রিকা' নামক বিখ্যাত নিবন্ধ এই লেখকের রচনা। এই গ্রন্থটি অতি বৃহৎ এবং সংস্কার, আহ্নিক প্রভৃতি কাণ্ডে বিভক্ত। দেবণ্ণভট্ট দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁহার গ্রন্থটি দাক্ষিণাত্যে অতিশয় প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। ব্রিটিশ সরকারের বিচার-বিভাগের কর্তৃপক্ষ ইদানীন্তন কালেও ইহার প্রামাণিকত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এই লেখকের জীবনকাল সম্ভবতঃ খ্রীঃ দ্বাদশ শতকের শেষভাগ।

১. এই সম্বন্ধে 'দায়ভাগে'র মত জীমূতবাহন প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

হেমাদ্রি

ইঁহার রচিত সুবিদিত নিবন্ধের নাম 'চতুর্বর্গচিন্তামণি'। ব্রত, দান প্রভৃতি পাঁচটি খণ্ডে গ্রন্থটি বিভক্ত। দাক্ষিণাত্যের নিবন্ধকারগণের মধ্যে হেমাদ্রি শীর্ষস্থানীয়। ইঁহার জীবনকাল খুব সম্ভবতঃ খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগ হইতে চতুর্দশ শতকের প্রথম পাদের মধ্যে।

চণ্ডেশ্বর

'স্মৃতিরত্নাকর' বা 'রত্নাকর' নামক বিস্তীর্ণ নিবন্ধ ইঁহার রচিত। কৃত্য, দান প্রভৃতি সাতটি ভাগে ইহা বিভক্ত। প্রধান মৈথিল নিবন্ধকারগণের মধ্যে চণ্ডেশ্বর অন্যতম। ইঁহার জীবনকাল খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শেষ ভাগ হইতে চতুর্দশ শতকের পূর্বভাগের মধ্যে। মৈথিল ও বঙ্গদেশীয় নিবন্ধকারগণের উপর ইঁহার যথেষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়।

মাধবাচার্য

দাক্ষিণাত্যের নিবন্ধকারগণের মধ্যে ইনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। বিজয়নগরের রাজা বুক্কের কুলগুরু ও মন্ত্রী মাধব ছিলেন একাধারে রাজনীতিবিদ্ ও পণ্ডিত। ঋগ্বেদভাষ্যের বিখ্যাত প্রণেতা সায়ণাচার্য ইঁহার ভ্রাতা। মাধবের রচিত বহু গ্রন্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 'পরাশর-মাধবীয়' এবং 'কালনির্ণয়' ; প্রথমটি 'পরাশর-স্মৃতি'র টীকা এবং অপরটি উপোদ্‌ঘাত, বৎসর প্রভৃতি পাঁচটি প্রকরণে রচিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ নিবন্ধ। মাধবাচার্য খুব সম্ভবতঃ খ্রীঃ চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগের লেখক।

রুদ্রধর

স্মৃতিশাস্ত্রের ইনি একজন বিখ্যাত মৈথিল নিবন্ধকার। রুদ্রধর বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকখানি নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 'শ্রাদ্ধবিবেক' ও 'শুদ্ধিবিবেক' সমধিক প্রসিদ্ধ। ইনি সম্ভবতঃ খ্রীঃ পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগের লেখক।

বাচস্পতিমিশ্র[1]

মিথিলার নিবন্ধকারগণের মধ্যে ইনি অন্যতম প্রধান লেখক। ইনি বহু নিবন্ধগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই লেখক-রচিত 'বিবাদচিন্তামণি' নামক নিবন্ধ ভারতের উচ্চ বিচারালয়ে (High Court) এবং বিলাতের Privy Council কর্তৃক মিথিলাতে সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। বাচস্পতির নামের সহিত যুক্ত যে নিবন্ধগুলি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের অধিকাংশই 'চিন্তামণি' নামে অভিহিত; যথা, 'বিবাদচিন্তামণি', 'আচারচিন্তামণি' ইত্যাদি। 'তিথিনির্ণয়', 'দ্বৈতনির্ণয়' প্রভৃতি কয়েকটি নিবন্ধও ইহার রচিত। স্মার্ত বাচস্পতি খ্রীঃ পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধের লেখক।

নন্দপণ্ডিত

ইনি বহু গ্রন্থের টীকা ও মৌলিক নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। ইহার রচিত টীকাসমূহের মধ্যে 'বিষ্ণুধর্মসূত্রে'র 'বৈজয়ন্তী' বা 'কেশব-বৈজয়ন্তী' নামক টীকা সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ইহার নিবন্ধসমূহের মধ্যে 'দত্তকমীমাংসা' শ্রেষ্ঠ। দত্তক-পুত্রের গ্রহণাদি সংক্রান্ত আইন-কানুনের ব্যাপারে এই নিবন্ধ অতিশয় প্রামাণিক বলিয়া বিবেচিত হয়। খ্রীঃ ষোড়শ শতকের শেষ ও সপ্তদশ শতকের প্রথম পাদের মধ্যবর্তীকালে সম্ভবতঃ তাঁহার গ্রন্থাবলী রচিত হইয়াছিল।

নীলকণ্ঠ ভট্ট

ইনি 'ভগবন্তভাস্কর' নামে এক অতি বিস্তীর্ণ নিবন্ধ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহা 'সংস্কারময়ূখ', 'আচারময়ূখ' প্রভৃতি দ্বাদশটি ময়ূখে রচিত। এই ময়ূখগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ 'ব্যবহারময়ূখ'। দাক্ষিণাত্যের অনেক

---

১. এই নামাঙ্কিত 'সম্বন্ধচিন্তামণি' নামক একটি নিবন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু, ইহার রচয়িতা বর্তমান বাচস্পতিমিশ্র হইতে অভিন্ন কি না তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। (দ্রঃ—ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ার্টারলি, ডিসেম্বর, ১৯৫৬, পৃঃ ৩৮৬)।

স্থানের বিচারালয়ে এই নিবন্ধকে সর্বাধিক প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। নীলকণ্ঠের গ্রন্থরাজি সম্ভবতঃ খ্রীঃ ১৬১০ হইতে ১৬৪৫ অব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছিল।

মিত্রমিশ্র

'বীরমিত্রোদয়' নামক প্রকাণ্ড নিবন্ধটি ইঁহার রচনা। ইহাতে স্মৃতি-শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়গুলি 'প্রকাশ' নামক খণ্ডে লিপিবদ্ধ হইয়াছে; যথা—'ব্যবহারপ্রকাশ', 'সংস্কারপ্রকাশ' ইত্যাদি। বারাণসী-সম্প্রদায়ে 'বীর-মিত্রোদয়' অতিশয় প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হয়। মিত্রমিশ্র নীলকণ্ঠের সমসাময়িক লেখক।

বঙ্গদেশীয় স্মৃতি [১]

জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ধারণা এই যে, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য বা স্মার্ত ভট্টাচার্যই এই দেশের স্মৃতিশাস্ত্রের প্রবর্তক ও একমাত্র লেখক। কিন্তু, বঙ্গদেশীয় স্মৃতিশাস্ত্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, রঘুনন্দনের বহুকাল পূর্ব হইতেই এদেশে স্মৃতির চর্চা হইয়া আসিতেছে; শুধু চর্চা নহে, প্রাক্‌-রঘুনন্দন যুগেই বাংলা দেশে একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। অবশ্য ইহা অনস্বীকার্য যে, স্মার্তকুলশিরোমণি রঘুনন্দনের প্রদীপ্ত প্রতিভার তেজে তাঁহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী নিবন্ধকারগণের যশ ম্লান হইয়া গিয়াছিল।

রঘুনন্দন বাংলার স্মার্তগণের মধ্যমণিস্বরূপ। সুতরাং, তাঁহাকে কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করিয়া আমরা এই দেশের স্মৃতিশাস্ত্রের নিম্নলিখিতরূপ যুগবিভাগ করিয়া লইতে পারি :—

(ক) প্রাক্‌-রঘুনন্দন যুগ,

(খ) রঘুনন্দন ও গোবিন্দানন্দ,

(গ) রঘুনন্দনোত্তর যুগ।

---

১. বর্তমান গ্রন্থটি বাঙালী পাঠকের জন্যই রচিত। সুতরাং, ইহাতে বঙ্গদেশীয় স্মৃতির বিবরণ অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত হওয়া প্রয়োজন।

উল্লিখিত প্রত্যেকটি যুগেরই কয়েকটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। প্রাক্-রঘুনন্দন যুগের লেখকগণ রঘুনন্দন অপেক্ষা অল্পসংখ্যক বিষয়ের উপর নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া, রঘুনন্দনের পূর্ববর্তী অধিকাংশ লেখক মূল স্মৃতিগ্রন্থ ও পুরাণাদি হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া সাধারণভাবে তাহাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু, রঘুনন্দন মীমাংসাশাস্ত্র ও ন্যায়শাস্ত্র হইতে যুক্তির অবতারণা করিয়া সূক্ষ্মতরভাবে মূল বচনাদির ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং বিরুদ্ধ বচনসমূহের সঙ্গতি করিয়াছেন। এইরূপ ব্যাখ্যা-পদ্ধতিতে শ্রীনাথাচার্য-চূড়ামণি অনেকাংশে রঘুনন্দনের পথপ্রদর্শক।

রঘুনন্দনোত্তর যুগের লেখকগণের মৌলিকতা প্রায় নাই বলিলেই চলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহারা পূর্ববর্তী লেখকগণের, বিশেষতঃ রঘুনন্দনের, আদর্শ অনুসরণ করিয়া তাহাদের গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্তসার রচনা করিয়াছেন। সেই যুগে স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত আচার-ব্যবহারে আস্থাবান্ জনসাধারণের সম্ভবতঃ বৃহদাকার নিবন্ধসমূহ পাঠ করা বা তাহাদের অর্থ উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল ফলে এইরূপ সংক্ষিপ্তসার রচনার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল।

নিম্নে প্রতি যুগের লেখক ও তাঁহাদের গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইতেছে।

(ক) প্রাক্-রঘুনন্দন যুগ

এই যুগের সূচনা বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া আছে। কোন্ সুদূর অতীতে এই দেশের প্রতিভাবান্ লেখকগণ স্মৃতিনিবন্ধ রচনায় মনোনিবেশ করিতে আরম্ভ করিলেন তাহা কে বলিবে? অদ্যাবধি আবিষ্কৃত উপকরণ-সমূহের দ্বারা ঐ তমসাচ্ছন্ন যুগে আলোকপাত সম্ভবপর নহে। বাংলাদেশের প্রাচীন নিবন্ধকারগণের উল্লেখ হইতে মনে হয় যে, বালক, জিকন, যোগ্লোক ও জিতেন্দ্রিয় নামে প্রতিভাবান্ স্মার্ত পণ্ডিতগণ এই দেশকে এককালে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহাদের সম্বন্ধে অন্য কোন তথ্য বা তাঁহাদের রচিত কোন গ্রন্থ আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।[১]

১. ইঁহাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য *Indian Historical Quarterly*, XXXII, No. 1 (পৃঃ ৩৬—৪৩)।

ভবদেব ভট্ট

এই যুগের যে নিবন্ধকারগণের কাল ও গ্রন্থ সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া গিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে ভবদেব প্রাচীনতম। উড়িষ্যা প্রদেশের ভুবনেশ্বরে অনন্ত-বাসুদেবের মন্দির-গাত্রে যে প্রশস্তি রহিয়াছে তাহাতে ভবদেবের জীবনী সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। ঐ প্রশস্তিতে এবং তাঁহার গ্রন্থসমূহে তিনি নিজের পরিচয় দিয়াছেন 'বালবলভিভুজঙ্গ' বলিয়া। রাঢ়ের অন্তর্গত 'সিদ্ধল' নামক স্থানের অধিবাসী ভবদেব রাজা হরিবর্মদেবের 'সান্ধিবিগ্রহিক' ছিলেন।

ভবদেবের জীবনকাল নিশ্চিতভাবে নিরূপিত হয় নাই। বিভিন্ন পণ্ডিতের মতগুলি পর্যালোচনা করিয়া বলা যায় যে, খ্রীঃ ৭৫০ হইতে ১১০০ অব্দের মধ্যে কোন সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন।

তাঁহার রচিত স্মৃতিনিবন্ধ চারিটি :—

(১) কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতি বা দশকর্মপদ্ধতি,

(২) প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ (বা -নিরূপণ),

(৩) সম্বন্ধবিবেক,

(৪) শবসূতিকাশৌচ-প্রকরণ।[১]

'কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতি'তে সামবেদীয় সংস্কার-সমূহের পদ্ধতি আলোচিত হইয়াছে। 'সম্বন্ধবিবেক' বিবাহ-বিষয়ক গ্রন্থ।

জীমূতবাহন

স্বীয় গ্রন্থসমূহে ইনি রাঢ়ীশ্রেণীর 'পারিভদ্রীয়' বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন। জীমূতবাহনের কাল খ্রীঃ একাদশ হইতে চতুর্দশ শতকের মধ্যে কোন সময়ে।

১. এই গ্রন্থটি নবাবিষ্কৃত। ইহার সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য *Indian Historical Quarterly*, XXXII, No. 1, পৃঃ ১-১৪।

তাঁহার রচিত নিবন্ধ (১) কালবিবেক, (২) ব্যবহারমাতৃকা ও (৩) দায়ভাগ। কালবিবেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপযোগী কালের বিচার আলোচিত হইয়াছে। 'ব্যবহারমাতৃকা'য় বিবাদের বিচারপদ্ধতির আলোচনা করা হইয়াছে। ইহার বিষয়বস্তুকে প্রধানতঃ চারিটি ভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা—(১) ভাষা (plaint), (২) উত্তর (reply), (৩) প্রমাণ (proof) এবং (৪) নির্ণয়। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় যে, এত প্রাচীনকালেও আইন সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে গিয়া এই দেশেরই লেখক জীমূতবাহন কতক বিষয়ে যে সূক্ষ্মবুদ্ধি ও বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, আধুনিক যুগে সেই বিষয়গুলি সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত আইনও তাহা অপেক্ষা বেশী অগ্রসর হইতে পারে নাই। ব্রিটিশ সরকারের Civil Procedure Codeএর Res Judicata (Section II) জীমূতবাহনের প্রাঙ্ন্যায়েরই নামান্তর। উক্ত Codeএর Judgment [Order XX, Sec. 33, Rule 6 (i)] জীমূতবাহনের 'জয়পত্রে'রই অন্য নাম।

'দায়ভাগ'ই জীমূতবাহনের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত গ্রন্থ এবং বাংলাদেশের গৌরব। 'যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি' অবলম্বনে ইহা রচিত হইলেও, ইহাতে গ্রন্থকার এমন অনেক যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন যাহা 'যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি'র অপর কোন টীকাতে নাই। ভারতের অপর প্রদেশসমূহে বিজ্ঞানেশ্বরের 'মিতাক্ষরা'র যে স্থান বাংলাদেশে 'দায়ভাগে'রও সেই স্থান। দায়ভাগ ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে (ব্রিটিশ সরকারের বিচারালয়ে) 'মিতাক্ষরা' বাংলাদেশ ভিন্ন ভারতের অপরাপর প্রদেশে এবং 'দায়ভাগ' বাংলাদেশে সর্বাধিক প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, জীবনের এই শ্রেষ্ঠ ব্যাপারে যখন সারা ভারত বিজ্ঞানেশ্বরের মতবাদকে অবনতমস্তকে স্বীকার করিয়াছে, তখন একমাত্র বাংলাদেশ মাথা তুলিয়া এই দেশের স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছে। উত্তরাধিকার ব্যাপারে জীমূতবাহনের মতবাদ বিজ্ঞানেশ্বরের মতবাদ অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শে প্রভাবিত—এ কথা স্বীকার করা স্বস্থানপ্রীতির (local patriotism বা parochialism) পরিচায়ক হইবে না, আশা করা যাইতে পারে। এই বিষয়ে বিজ্ঞানেশ্বর ও জীমূতবাহনের মতের

মূলগত অনৈক্য এই যে, জীমূতবাহনের মতে, পূর্বপুরুষের সম্পত্তিতে পিতার স্বত্ব লুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত পুত্রের কোন স্বত্ব জন্মে না ; কিন্তু, বিজ্ঞানেশ্বরের মতে, পুত্র জন্মিবামাত্রই ঐ সম্পত্তিতে পিতার সহিত অংশীদার হয়। প্রেতাত্মার উদ্দেশে পিণ্ডদানের অধিকারের দ্বারা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে অধিকার নিয়ন্ত্রিত হইবে, ইহা জীমূতবাহনের মত। বিজ্ঞানেশ্বরের মতে, সম্পত্তিতে স্বত্বাধিকার নির্ভর করে জন্মের উপরে। এক কথায় বলিতে গেলে, জীমূতবাহন মরণ-স্বত্ববাদী ও বিজ্ঞানেশ্বর জন্ম-স্বত্ববাদী।

অনিরুদ্ধ ভট্ট

অনিরুদ্ধ ছিলেন বাংলার রাজা বল্লালসেনের গুরু। ইনি ছিলেন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত এবং 'ধর্মাধিকরণিক'।

'হারলতা' ও 'পিতৃদয়িতা' ইঁহার রচিত দুইটি সুবিদিত নিবন্ধ। পূর্বোক্ত নিবন্ধে অশৌচ সম্বন্ধে এবং শেষোক্ত গ্রন্থে নানা অনুষ্ঠান, বিশেষতঃ নানাবিধ শ্রাদ্ধ, সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

বল্লালসেন

ইনি ছিলেন একাধারে বাংলাদেশের রাজা, পণ্ডিত ও সমাজ-সংস্কারক। কিম্বদন্তী এই যে, ইনিই বাংলাদেশে কৌলীন্যের প্রবর্তন করেন। শাসক হিসাবে বল্লালের নাম ছিল 'অরিরাজনিঃশঙ্কশঙ্কর'। খ্রীঃ দ্বাদশ শতকের আদি ভাগে ইনি রাজত্ব করিতেন বলিয়া ঐতিহাসিকগণ মনে করেন।

নিম্নলিখিত নিবন্ধ দুইটি ইঁহার নামের সহিত যুক্ত :—

(১) দানসাগর—নানা দ্রব্যের দান সম্বন্ধে আলোচনা,

(২) অদ্ভুতসাগর--শুভাশুভলক্ষণ বিষয়ক।

'দানসাগর' গ্রন্থে বল্লালের স্ব-রচিত 'প্রতিষ্ঠাসাগর', 'আচারসাগর' ও 'ব্রতসাগর' নামক নিবন্ধের উল্লেখ আছে।

হলায়ুধ

তাঁহার গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, তিনি বাৎস্যগোত্রীয় ধনঞ্জয় নামক

কোন 'ধর্মাধ্যক্ষে'র পুত্র ছিলেন। হলায়ুধ সম্ভবতঃ বাংলার রাজা লক্ষ্মণ সেনের সমসাময়িক (খ্রীঃ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের মধ্যবর্তী কাল) ছিলেন।

ইহার রচিত 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' বা 'কর্মোপদেশিনী' নামক নিবন্ধে ব্রাহ্মণের ইতিকর্তব্যতা সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

শূলপাণি[1]

বঙ্গদেশীয় নিবন্ধকারগণের মধ্যে ইনি অন্যতম প্রধান লেখক। স্বীয় নিবন্ধসমূহে ইনি 'সাহুড়িয়ান মহামহোপাধ্যায়' বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন। কাহারও কাহারও মতে, 'সাহুড়িয়ান' রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের এক শাখা।

শূলপাণির কাল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ দেখা যায়। খ্রীঃ একাদশ হইতে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে নানা সময়েই ইহাকে স্থাপন করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এই শূলপাণির রচিত বলিয়া মনে হয় :—

(১) দোলযাত্রাবিবেক, (২) ব্রতকালবিবেক,
(৩) সম্বন্ধবিবেক, (৪) দত্তকবিবেক,
(৫) একাদশীবিবেক, (৬) সংক্রান্তিবিবেক,
(৭) দুর্গোৎসববিবেক, (৮) প্রায়শ্চিত্তবিবেক,
(৯) শ্রাদ্ধবিবেক।

উক্ত গ্রন্থগুলির নামই উহাদের বিষয়বস্তুর পরিচায়ক। এইগুলি ছাড়াও, "দীপকলিকা' নামে 'যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি'র একটি টীকা ইহার রচিত।

বৃহস্পতি রায়মুকুট[2]

ইহার নাম সাধারণ্যে সুপরিচিত না হইলেও ইনি যে একজন প্রতিভাবান্

১. শূলপাণির জীবনী ও গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য :—সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত **'Sulapani, the Sahyuidan'** শীর্ষক প্রবন্ধ (নিউ ইণ্ডিয়ান এ্যাণ্টিকোয়ারি, পঞ্চম বর্ষ, সংখ্যা ৭-৮)।

২. ইঁহার জীবনী ও গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য—*Indian Historical Quarterly*, **XVII**, পৃঃ ৪৪২-৪৫৫, ৪৫৬-৪৭১।

স্মার্ত ছিলেন তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ রঘুনন্দনের বহু নিবন্ধে তাঁহার বা তাঁহার গ্রন্থের উল্লেখ। তাঁহার গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, তিনি রাঢ়ী শ্রেণীর মহিন্তা 'গাঁই'এর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পিতা ছিলেন গোবিন্দ ও মাতা নীলসুখায়ী দেবী। তিনি সম্ভবতঃ বাংলার রাজা গণেশের সভাপণ্ডিত ছিলেন। তৎপুত্র যদু বা জালাল-উদ্দীনের সময়ে যে তিনি পণ্ডিতগণের অগ্রণী ছিলেন সেই বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই, কারণ, তিনি জালাল-উদ্দীনের যথেষ্ট স্তুতিকীর্তন করিয়াছেন।

তিনি খুব সম্ভব খ্রীঃ পঞ্চদশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে তাঁহার গ্রন্থাবলী রচনা করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, মুসলমানগণ কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের সময় হইতে দুই শতাব্দীর সুষুপ্তির পর ইঁহার উদ্যমেই বাংলাদেশে সংস্কৃত শাস্ত্রাদির পুনরভ্যুত্থান হইয়াছিল।

ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'স্মৃতিরত্নহার' ও 'রায়মুকুটপদ্ধতি' অপেক্ষাকৃত অধিকতর পরিচিত।

শ্রীনাথ আচার্যচূড়ামণি

ইনি ছিলেন রঘুনন্দনের অধ্যাপক। রঘুনন্দন অনেক স্থলেই 'গুরুচরণাঃ', 'গুরুপাদাঃ' প্রভৃতি সম্মানসূচক পদের দ্বারা ইঁহার সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীনাথের পাণ্ডিত্য যথেষ্ট ছিল, গ্রন্থও তিনি রচনা করিয়াছিলেন বহু। কিন্তু, সম্ভবতঃ রঘুনন্দনের অপরিসীম প্রভাবহেতু, তাঁহার কথা পরবর্তী কালে বিস্মৃত হইয়াছে। খ্রীঃ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের মধ্যবর্তী কোন কালে তিনি জীবিত ছিলেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলিকে নিম্নলিখিত বর্গে (group) বিভক্ত করা যাইতে পারে—

১। টীকা

(১) সারমঞ্জরী—নারায়ণের 'ছন্দোগ-পরিশিষ্ট-প্রকাশ' নামক গ্রন্থের টীকা,

(২) তাৎপর্যদীপিকা—শূলপাণির 'তিথিবিবেকে'র টীকা,

(৩) শ্রাদ্ধবিবেকব্যাখ্যা—শূলপাণির 'শ্রাদ্ধবিবেকে'র টীকা,
(৪) দায়ভাগটিপ্পনী—জীমূতবাহনের 'দায়ভাগে'র উপর রচিত।

২। অর্ণববর্গ

(১) বিবেকার্ণব,
(২) কৃত্যতত্ত্বার্ণব—ইহাই সমধিক প্রসিদ্ধ,
(৩) শুদ্ধিতত্ত্বার্ণব,
(৪) বিবাহতত্ত্বার্ণব।

৩। দীপিকাবর্গ

(১) গূঢ়-দীপিকা,
(২) শ্রাদ্ধ-দীপিকা।

৪। চন্দ্রিকাবর্গ

(১) আচারচন্দ্রিকা,
(২) শ্রাদ্ধচন্দ্রিকা,
(৩) দানচন্দ্রিকা।

৫। বিবেকবর্গ

(১) দুর্গোৎসববিবেক,
(২) প্রায়শ্চিত্তবিবেক,
(৩) শুদ্ধিবিবেক।

॥ রঘুনন্দন ও গোবিন্দানন্দ ॥

রঘুনন্দন

বঙ্গদেশীয় স্মৃতিনিবন্ধকারগণের মধ্যে রঘুনন্দন শ্রেষ্ঠ। শুধু গ্রন্থের বিপুল সংখ্যায় নহে, বিচারের সূক্ষ্মতায়ও তিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লেখকগণ অপেক্ষা অধিকতর নৈপুণ্য ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। মীমাংসা ও ন্যায়শাস্ত্রের বহু যুক্তির অবতারণা করিয়া তিনি নানা জটিল বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, প্রাক্-রঘুনন্দন যুগের নিবন্ধকারগণ রঘুনন্দনের পথ অনেক পরিমাণে সুগম করিয়া দিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি পূর্ববর্তী লেখকগণের ঋণ স্বীকারও করিয়াছেন।[1] বাংলা দেশের গ্রন্থকার হইলেও তিনি অপরাপর সম্প্রদায়ের, বিশেষতঃ মিথিলার, নিবন্ধসমূহ যথাযথরূপে পর্যালোচনা করিয়াছিলেন ; নিজ গ্রন্থগুলির স্থানে স্থানে তিনি অন্য সম্প্রদায়ের লেখকগণের মতের বা ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন।

রঘুনন্দন শুধু যে স্মৃতিনিবন্ধই রচনা করিয়াছিলেন তাহা নহে। তিনি অনেক পরিমাণে সমাজ-সংস্কারকও ছিলেন। তিনি যেকালে নিবন্ধসমূহ রচনা করিয়াছিলেন সেকালে তন্ত্রের প্রভাব দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যদিও তন্ত্রোক্ত বিধিগুলি অনেক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধী ছিল এবং নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণসমাজ তন্ত্রগুলিকে ঘৃণার চক্ষেই দেখিতেন, তথাপি রঘুনন্দন তীক্ষ্ণবুদ্ধিবলে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তন্ত্রোক্ত ধর্ম এবং আচারাদি কিয়ৎপরিমাণে মানিয়া না লইলে ইহাদের সহিত সংঘর্ষে ব্রাহ্মণ্যধর্ম অনেকটা ব্যাহত হইবে। সেই-জন্যই 'দীক্ষাতত্ত্ব' নামক নিবন্ধে তান্ত্রিক দীক্ষা তিনি শাস্ত্রীয় বলিয়া অনুমোদন করিয়াছিলেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, রঘুনন্দনের পূর্ববর্তী লেখকগণের মধ্যে কেহ কেহ তন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র ; কিন্তু, কেহই তন্ত্রকে এমন

---

১. 'প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে'র প্রারম্ভে তিনি লিখিয়াছেন—প্রায়শ্চিত্তবিবেকাদাবজ্ঞজ্ঞেয়ং বিচক্ষণৈঃ শূলপাণির 'প্রায়শ্চিত্তবিবেক' বিখ্যাত গ্রন্থ।

ভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অঙ্গীভূত করেন নাই। ষোড়শ শতাব্দীতে রঘুনন্দন যখন নবদ্বীপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, তখন বাংলাদেশের সমাজ ও ধর্মজীবনে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। একদিকে মুসলমান-শাসনাধীনে ইসলাম ধর্মের প্রভাব, অপরদিকে চৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসার এবং তদুপরি বিখ্যাত তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ কর্তৃক তান্ত্রিক ধর্মের সমর্থন—এতগুলি প্রতিক্রিয়াশীল ঘটনার চাপে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অবস্থা সেই সময় শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং, রঘুনন্দনের মত তীক্ষ্ণধী সমাজসংস্কারকের আবির্ভাব না হইলে তখন 'সনাতন' ব্রাহ্মণ্যধর্মের দুর্গতি কেহই রোধ করিতে পারিত না।

তাঁহার জীবনকাল নিশ্চিতরূপে জানিতে না পারা গেলেও তাঁহার আবির্ভাব যে খ্রীঃ ষোড়শ হইতে সপ্তদশ শতকের মধ্যবর্তীকালে হইয়াছিল, সেই বিষয়ে প্রমাণ আছে।

নিম্নলিখিত অষ্টাবিংশতি বিষয় সম্বন্ধে তিনি যে নিবন্ধসমূহ রচনা করিয়াছিলেন তাহারাই 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব' নামে পরিচিত :—

(১) মলমাস, (২) দায়, (৩) শুদ্ধি, (৪) সংস্কার, (৫) প্রায়শ্চিত্ত, (৬) তিথি, (৭) বিবাহ, (৮) জন্মাষ্টমী, (৯) দুর্গোৎসব, (১০) ব্যবহার, (১১) একাদশী, (১২) তড়াগভবনোৎসর্গ, (১৩-১৫) ছন্দোগবৃষোৎসর্গ, যজুর্বৃষোৎসর্গ, ঋগ্‌-বৃষোৎসর্গ (সংক্ষেপে, বৃষোৎসর্গ), (১৬) ব্রত, (১৭-১৮) দেবপ্রতিষ্ঠা ও মঠ-প্রতিষ্ঠা (সংক্ষেপে, প্রতিষ্ঠা), (১৯) দিব্য, (২০) জ্যোতিষ, (২১) বাস্তুযজ্ঞ, (২২) দীক্ষা, (২৩) আহ্নিক, (২৪) কৃত্য, (২৫) পুরুষোত্তমক্ষেত্র, (২৬) সামশ্রাদ্ধ, (২৭) যজু-শ্রাদ্ধ, (২৮) শূদ্রকৃত্য। এই প্রসিদ্ধ নিবন্ধগুলি ছাড়াও, নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি রঘুনন্দনের নামের সহিত যুক্ত দেখা যায় :—

(১) দায়ভাগটীকা,
(২) তীর্থযাত্রাতত্ত্ব বা তীর্থতত্ত্ব,
(৩) গয়াশ্রাদ্ধপদ্ধতি,
(৪) রাসযাত্রাপদ্ধতি,

---

১. 'মলমাসতত্ত্বে' অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের নামগুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে লিখিত আছে। দ্রঃ—স্মৃতিতত্ত্ব (জীবানন্দ সং). প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭৩৬।

(৫) ত্রিপুষ্করশান্তিতত্ত্ব,

(৬) গ্রহযাগতত্ত্ব বা গ্রহযাগপ্রমাণতত্ত্ব,

(৭) দ্বাদশযাত্রাতত্ত্ব বা যাত্রাতত্ত্ব।

প্রথমটি জীমূতবাহনের 'দায়ভাগে'র টীকা। (২) হইতে (৫) সংখ্যক গ্রন্থগুলির নামই উহাদের বিষয়বস্তুর পরিচায়ক। 'গ্রহযাগতত্ত্বে' বিভিন্ন গ্রহশান্তিবিধায়ক অনুষ্ঠানাদির আলোচনা আছে। শেষোক্ত গ্রন্থে জগন্নাথ-দেবের বার মাসে বারটি উৎসবের আলোচনা আছে।

গোবিন্দানন্দ

ইঁহার নিবন্ধসমূহ হইতে জানা যায় যে, ইনি 'বাগ্‌ড়ি'[১] (<ব্যাঘ্রতটী)-নিবাসী গণপতিভট্টের পুত্র ছিলেন। গোবিন্দানন্দের উপাধি ছিল 'কবি-কঙ্কণাচার্য'।

ইঁহার জীবনকাল খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। ইনি রঘুনন্দনের পূর্ববর্তী, পরবর্তী কি সমসাময়িক তাহা নিঃসন্দেহে নির্ণীত হয় নাই।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি গোবিন্দানন্দ কর্তৃক রচিত :—

(১) দানক্রিয়াকৌমুদী,

(২) শুদ্ধিকৌমুদী,

(৩) শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদী,

(৪) বর্ষক্রিয়াকৌমুদী,

(৫) তত্ত্বার্থকৌমুদী,

(৬) অর্থকৌমুদী।

(১) হইতে (৪) সংখ্যক গ্রন্থগুলির বিষয়বস্তু উহাদের নাম হইতেই বুঝা যায়। 'তত্ত্বার্থকৌমুদী' শূলপাণির 'প্রায়শ্চিত্তবিবেকে'র টীকা। 'অর্থকৌমুদী' শ্রীনিবাসের 'শুদ্ধিদীপিকা'র[২] টীকা। এতদ্ব্যতীত, গোবিন্দানন্দ শূলপাণির 'শ্রাদ্ধবিবেকে'র একখানি টীকাও রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।[৩]

১. মেদিনীপুরের অন্তর্গত—দ্রঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত *History of Bengal*, Vol I, পৃঃ ২১৭।

২ দ্রষ্টব্য *History of Dharmasastra*, I, পৃঃ ৪১৫।

৩. দ্রঃ *Journal of Oriental Research*, (XVIII) পৃঃ ১০৩

রঘুনন্দনোত্তর যুগ ॥

পূর্বে বলা হইয়াছে, জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ধারণা এই যে, রঘুনন্দনই এই দেশের একমাত্র স্মৃতিনিবন্ধ-রচয়িতা। তাঁহার পূর্ববর্তী দুই একজন লেখকের কথা কেহ কেহ জানিলেও রঘুনন্দনের পরেও যে বাংলা দেশে বহু নিবন্ধ প্রণীত হইয়াছিল তাহা প্রায় অজ্ঞাত। রঘুনন্দন ও গোবিন্দানন্দের কালই বঙ্গীয় স্মৃতিশাস্ত্রের গৌরবময় যুগ। তাঁহাদের পরবর্তী কাল ক্ষয়িষ্ণু স্মৃতিশাস্ত্রের যুগ। এই যুগে রচিত নিবন্ধসমূহের বৈশিষ্ট্য পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই নিবন্ধগুলির সঙ্গে রঘুনন্দনের গ্রন্থগুলির তুলনা করিলেই দেখা যাইবে যে, পূর্বোক্ত গ্রন্থসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্মার্তভট্টাচার্যের গ্রন্থ-সমূহের আদর্শে লিখিত, এমন কি উঁহাদের সংক্ষিপ্তসার মাত্র। এই যুগের গোপাল ন্যায়পঞ্চানন নামক একজন নিবন্ধকার তাঁহার 'সম্বন্ধনির্ণয়া'খ্য গ্রন্থে স্পষ্টই বলিয়াছেন—সম্বন্ধোঽয়ং গোপালেন কৃতঃ **স্মার্তস্য বর্ত্মনা**।

বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে[১] রক্ষিত পুঁথিসমূহের মধ্যে এই যুগের অসংখ্য নিবন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলাদেশ ছাড়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশের পুঁথিশালাতেও এই জাতীয় কিছু কিছু গ্রন্থ আছে।

এখানে এই যুগের লেখকগণের বা তাঁহাদের রচিত নিবন্ধসমূহের নামকরণ নিষ্প্রয়োজন; বর্তমান গ্রন্থের স্বল্পপরিসরে ইহা দুষ্করও বটে। শুধু এইটুকু বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, অদ্যাবধি এই যুগের প্রায় চল্লিশজন লেখক ও শতাবধি নিবন্ধের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; এই নিবন্ধগুলি পুঁথি আকারেই রহিয়াছে।[২]

---

১. যথা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (অধুনা পূর্বপাকিস্তানে), এসিয়াটিক সোসাইটি (কলিকাতা), সংস্কৃত কলেজ (কলিকাতা), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (কলিকাতা) ইত্যাদি।

২. গোপাল ন্যায়পঞ্চানন কৃত শুধু 'সম্বন্ধনির্ণয়' মুদ্রিত হইয়াছে; সম্পাদক গ্রন্থকার (**Poona Oriental Series No. 85—Oriental Book Agency, Poona**)।

বিবাদভঙ্গার্ণব

ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত হইলে, ব্রিটিশ বিচারপতিগণ বিষয়সম্পত্তি, বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারে হিন্দু ও মুসলমানগণের নিজ নিজ আইন অনুযায়ী বিচারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই বিচারকার্যের সুবিধার জন্য হিন্দুশাস্ত্র হইতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল। হিন্দুশাস্ত্রের এইরূপ সংকলনের মধ্যে বিশিষ্ট একখানি গ্রন্থ 'বিবাদভঙ্গার্ণব'। মনীষী উইলিয়ম জোন্‌স-এর উদ্যোগে এই বিশাল গ্রন্থটি সংকলন করিয়াছিলেন পশ্চিম বঙ্গের 'ত্রিবেণী' নামক স্থানের রুদ্র তর্কবাগীশের সুযোগ্য পুত্র পণ্ডিতপ্রবর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। গ্রন্থটি তদানীন্তন ব্রিটিশ বিচারালয়সমূহে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই গ্রন্থের অংশ কোলব্রুক্ (Colebrooke) কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছিল ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে; ইহাই Colebrooke's Digest নামে প্রখ্যাত।

ধর্মশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা

উপরিলিখিত আলোচনা হইতে বুঝা গেল যে, এই শাস্ত্র বিপুল; প্রশ্ন হইতে পারে—এই বিশাল ধর্মশাস্ত্রের এবং ইহার টীকা-টিপ্পনীর মূল্য কি? কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে, ধর্মশাস্ত্রকারগণ বা স্মৃতিনিবন্ধকারগণ নিজেদের ধীশক্তি প্রদর্শনের জন্যই শাস্ত্র, নিবন্ধ ও টীকা প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন, বাস্তবজীবনে ইহাদের কোন প্রয়োজন ছিল না। ভাবিলে দেখা যায়, এই শাস্ত্রের প্রয়োজন ছিল। বর্তমান যুগে পাপের ভয় বা পুণ্যের লোভ আমাদের মধ্যে লুপ্তপ্রায়, কিন্তু অনাদি কাল হইতে হিন্দুদের পরজন্মে আস্থা ও কর্মানুযায়ী পারত্রিক গতিতে বিশ্বাস ছিল। এইজন্য তাঁহারা বাস্তবজীবনের কর্মপ্রবাহের মধ্যেও আচার-অনুষ্ঠানাদি পালন করিবার জন্য ব্যগ্র হইতেন। হিন্দুদের জীবনের সর্বাবস্থায়ই ধর্মের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল; তাঁহারা জীবনকে কখনও ধর্মনিরপেক্ষ বলিয়া মনে করিতে পারিতেন না। সুতরাং জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহাদের কার্যাবলী যাহাতে শাস্ত্রসম্মত হয়, তৎপ্রতি সমাজপতিগণের লক্ষ্য ছিল। ধর্মশাস্ত্র ও তাহার টীকাটিপ্পনী রচিত হওয়ার

ইহা অন্যতম কারণ। দ্বিতীয়তঃ, আর্যসভ্যতা ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম যুগে যুগে কঠোর সংঘর্ষের সম্মুখীন হইয়াছিল। "শক হূন দল পাঠান মোগলে"র আক্রমণ ও ফলে রাজনৈতিক অবস্থার বিপর্যয় ছাড়াও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বৌদ্ধ-ধর্ম ও ইস্‌লামধর্মের সংঘাতে হিন্দু ধর্ম অনেকবারই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ধর্মশাস্ত্রসমূহের কঠোর নিগড়ে আর্যসমাজ আবদ্ধ না থাকিলে এই বেদ-কেন্দ্রিক ধর্ম সম্ভবতঃ ভারতবর্ষ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, এককালে ধর্মশাস্ত্রের প্রয়োজন হয়ত ছিল। কিন্তু, বর্তমান যুগে ইহা নিতান্তই মূল্যহীন; বিশেষতঃ ধর্মনিরপেক্ষ (secular) ভারত রাষ্ট্রের নাগরিকগণের জীবনে। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, কোন দেশের ইতিহাসকে মুছিয়া ফেলা যায় না; কালের পটে ইতিহাস চির অঙ্কিত থাকে। ভারতীয় ইতিহাসের একটি দিক সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিব যদি ধর্মশাস্ত্রকে আমরা না জানি। যুগে যুগে এই দেশের আর্য সমাজ যে ধর্মজীবন ও কর্মজীবন যাপন করিয়াছে বা যাপন করিবার আদর্শ সম্মুখে স্থাপন করিয়াছে, সেই জীবনের পরিচয় ধর্মশাস্ত্র ছাড়া আর কোন্ শাস্ত্র দিতে পারে? ভারতবর্ষের সমাজতত্ত্বের (sociology) আকর ধর্মশাস্ত্র। যে বর্ণাশ্রমধর্মের উপর ভর করিয়া আর্যসমাজ আজ পর্যন্তও দণ্ডায়মান রহিয়াছে তাহার ভিত্তি ধর্মশাস্ত্রেই খুঁজিতে হইবে। যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবাসী বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রভৃতি অপরিহার্য ব্যাপারে যে আইনের দ্বারা শাসিত হইয়াছে তাহার উৎসই ধর্মশাস্ত্র। ইদানীন্তন কালে ব্রিটিশ শাসক ও ধর্মশাস্ত্রের সাহায্যে আইন প্রণয়ন করিয়াই হিন্দু সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়াছিলেন। কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন সমাজব্যবস্থার হয়ত আমূল পরিবর্তন হইবে এবং হিন্দুর চিরাগত আইন-কানুন জীর্ণবাসের ন্যায়ই পরিত্যক্ত হইবে; কিন্তু, প্রাচীন ভারতকে জানিতে হইলে, আর্যগণের সভ্যতা ও কৃষ্টির ধারাকে বুঝিতে হইলে ধর্মশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা চিরকালই অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

॥ ধর্মশাস্ত্র পারিভাষিক শব্দ ॥

[ধর্মশাস্ত্রে বিশিষ্ট অর্থে এমন কতকগুলি শব্দের প্রয়োগ আছে, যাহাদের অর্থ না জানিলে এই শাস্ত্রের অনেক বিধিনিষেধই বোধগম্য হয় না। অপেক্ষাকৃত অধিকতর প্রযুক্ত ঐরূপ শব্দগুলির মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটিকে অ-কারাদিক্রমে সাজাইয়া তাহাদের অর্থ সংক্ষেপে লিখিত হইল।]

অগ্রেদিধিষু—জ্যেষ্ঠাভগ্নীর বিবাহের পূর্বে যে কন্যার বিবাহ হয়।

অনুলোম—উচ্চবর্ণের পুরুষের সহিত নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোকের বিবাহ হইলে সেই বিবাহকে বলা হয় অনুলোম এবং ঐরূপ দম্পতির সন্তানকেও এই আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। সাধারণতঃ বিবাহ বুঝাইতেই এই শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

অনূচান— যিনি বেদ ও বেদাঙ্গের অর্থ জানেন।

অপপাত্র— এই শব্দটির নানারূপ অর্থই দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন 'চণ্ডালাদি', কেহ বা বলেন 'প্রতিলোমজ রজকাদি'। শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে এমন লোক যাহাকে নিজের পাত্রে ভোজন করিতে দেওয়া যায় না, বা যাহার ব্যবহৃত ভোজন-পাত্র

অভিশপ্ত— এই শব্দটি কোন কোন স্থানে ব্রহ্মহা এবং অপর স্থানে উপপাতকী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

অবকীর্ণী— যে ব্রহ্মচারী স্বীয় কর্তব্যভ্রষ্ট হয়, বিশেষতঃ স্ত্রীসম্ভোগ করে তাহাকে এই আখ্যা দেওয়া হয়।

অসৎপ্রতিগ্রহ—চণ্ডাল বা পতিত ব্যক্তির নিকট হইতে দান, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি নিষিদ্ধ স্থানে দান, গ্রহণাদি নিষিদ্ধ কালে দান, মদ্যাদি নিষিদ্ধ বস্তুর দান গ্রহণকে এই নাম দেওয়া হয়।

আচার্য— যিনি শিষ্যের উপনয়ন সংস্কার সম্পাদন পূর্বক তাহাকে বেদ-পাঠে প্রবৃত্ত করেন তিনি আচার্য। কোন কোন স্থানে বলা হইয়াছে—যস্মাদ্ধর্মানাচিনোতি স আচার্যঃ; অর্থাৎ, যাঁহার নিকট হইতে ধর্ম চয়ন বা লাভ করা যায় তিনি আচার্য।

আর্য— এক প্রকার বিবাহ; ইহাতে কন্যাকর্তা দুইটি বা চারিটি গাভী গ্রহণপূর্বক কন্যাকে সম্প্রদান করেন।

আসুর— অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে এক প্রকার বিবাহ। ইহাতে পিতার অনুমতিক্রমে কন্যাকে এমন পাত্রের নিকট সমর্পণ করা হয় যে কন্যা ও তাহার পরিবারবর্গকে যথাসাধ্য অর্থ দান করে।

ইষ্টাপূর্ত— 'ইষ্ট' ও 'পূর্ত' এই দুইটি পদের সমাস। 'ইষ্ট' শব্দের অর্থ শ্রৌত যাগযজ্ঞাদি, 'পূর্ত' শব্দে কূপতড়াগাদির দান, দেবমন্দিরাদির উৎসর্গ প্রভৃতিকে বুঝায়।

উপনয়ন- ইহা সেই সংস্কারকে বুঝায় যাহা দ্বারা শিষ্যকে আচার্যের সমীপে বেদপাঠের জন্য লইয়া যাওয়া হয়। এই সংস্কারই ব্রহ্মচর্যাশ্রমের

ঋত— এক প্রকার বৃত্তি বা উপজীবিকার উপায়। এই বৃত্তি-অবলম্বী ব্যক্তি ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত শস্যদ্বারা জীবন ধারণ করে (মনুসংহিতা, ৪।৪ দ্রষ্টব্য)।

কূটস্থ— পাত্র ও পাত্রী উভয়ের সাধারণ পূর্বপুরুষ (common ancestor)।

ক্ষেত্রজ— একপ্রকার পুত্র। নিয়োগের দ্বারা একজনের পত্নীর সহিত অপর পুরুষের মিলনসম্ভূত পুত্র। (নিয়োগ' দ্রষ্টব্য)

গান্ধর্ব— কন্যা ও পাত্রের ইচ্ছানুযায়ী পারস্পরিক প্রেম বশতঃ বিবাহকে এই আখ্যা দেওয়া হয়।

গোত্র— বিদ্যা, বিত্ত, শৌর্য ও ঔদার্যাদিগুণ বিশিষ্ট যে খ্যাতনামা ব্যক্তির নামে কুল পরিচিত হয়, তাঁহাকে গোত্র বলা হয়।

চাতুর্মাস্য—সাধারণতঃ বৈশ্বদেব, বরুণপ্রঘাস, সাকমেধ এই তিনটি অনুষ্ঠানকে চাতুর্মাস্য ও এই তিনটি প্রত্যেকটিকে এক একটি পর্ব বলা হয়।

প্রতিটি পর্ব চারি মাস পরে পরে অনুষ্ঠেয় বলিয়া এই নামকরণ হইয়াছে।

চূড়াকরণ বা চূড়াকর্ম—শিশুর প্রথম কেশচ্ছেদনরূপ সংস্কারকে এই নাম দেওয়া হইয়াছে। 'চূড়া' অর্থ শিখা; এই সংস্কারে শিখা রাখিয়া মস্তকের অবশিষ্ট কেশ ছেদন করা হয়। ইহাকে সংক্ষেপে চৌলও বলা হয়।

দিধিষূ— যে কন্যার বিবাহের পূর্বে তাহার কনিষ্ঠা ভগ্নীর বিবাহ হইয়াছে।

গৃহস্থের প্রত্যহ কর্তব্য পঞ্চযজ্ঞের একটি যজ্ঞের নাম; ইহাতে দেবতার উদ্দেশে অগ্নিতে দ্রব্যাদি দেওয়া হয়।

দৈব— একপ্রকার বিবাহের নাম। ইহাতে যজ্ঞকারী পুরোহিতের হস্তে পিতা আভরণাদিভূষিতা কন্যাকে সম্প্রদান করেন।

নিয়োগ— এই ক্রিয়াদ্বারা একজনের বিধবা বা সধবা পত্নীতে অপর নিযুক্ত ব্যক্তি সন্তান উৎপাদন করিতে পারিতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের দেবরই এই কার্যের জন্য নিযুক্ত হইতেন।

নৈষ্ঠিক— যিনি আজীবন ব্রহ্মচারী থাকেন, তাঁহাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলা হয়।

পঞ্চগব্য— গোময়, গোমূত্র, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত—এই পাঁচটি দ্রব্যের মিশ্রণ জাত বস্তুকে এই নামে অভিহিত করা হয়। ইহা অতি পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

পঞ্চামৃত— দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু, চিনি—এই পাঁচটিকে একত্রে পঞ্চামৃত বলা হয়। দেবদেবীর পূজায় ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে।

পরিবেদন—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহের পূর্বে কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহকে এবং জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর বিবাহের পূর্বে কনিষ্ঠা ভগ্নীর বিবাহকে বলা হয় পরিবেদন। ঐরূপ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বলা হয় পরিবেত্তা বা পরিবিবিদান বা পরিবিন্দক এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম হয় পরিবিত্ত বা পরিবিন্ন বা পরিবিত্তি।

পিতৃযজ্ঞ—পঞ্চযজ্ঞের একটি যজ্ঞ; ইহাতে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ করিতে হয়।

পুংসবন— একটি সংস্কারের নাম; পুত্রসন্তান লাভের জন্য ইহা অনুষ্ঠিত হয়।

পুত্রিকা বা পুত্রিকাপুত্র—অপুত্রক ব্যক্তি কন্যাকেই পুত্রস্বরূপ গণ্য করিলে সেই কন্যাকে পুত্রিকা বলা হইত। কোন কোন সময়ে, ঐরূপ কন্যার পুত্রকেই তাহার মাতামহ স্বীয় পুত্র বলিয়া গণ্য করিতেন; তখন সেই পুত্রের নাম হইত পুত্রিকাপুত্র।

পুনর্ভূ— সাধারণতঃ পুনর্বিবাহিতা বিধবাকে এই আখ্যা দেওয়া হয়।

পৈশাচ— সর্বাপেক্ষা নিন্দিত বিবাহ; ইহাতে নিদ্রিতা বা উন্মত্তা কন্যাকে সম্ভোগ করিয়া পরে তাহাকে বিবাহ করা হয়।

প্রতিলোম—উচ্চবর্ণের স্ত্রীর সহিত নিম্নতর বর্ণের পুরুষের বিবাহ হইলে সেই বিবাহকে এবং সেই দম্পতির সন্তানকে এই নাম দেওয়া হয়।

প্রবর— এক গোত্রপ্রবর্তক মুনিকে অন্য গোত্রকারী মুনি হইতে পৃথক্‌ভাবে বুঝাইবার জন্য যে মুনিগণের সাহচর্যের কথা বলা হয় তাঁহাদিগকে প্রবর বলে। যথা—শাণ্ডিল্য গোত্রের প্রবর শাণ্ডিল্য, অসিত ও দেবল।

প্রাজাপত্য—একপ্রকার বিবাহ; ইহাতে কন্যার পিতা 'তোমরা উভয়ে একত্র ধর্মপালন কর' এই বলিয়া পাত্রপাত্রীকে সম্বোধন করতঃ পাত্রকে মধুপর্কাদি দ্বারা অভ্যর্থনাপূর্বক তাহার হস্তে কন্যাকে সম্প্রদান করেন।

ব্রহ্মযজ্ঞ— গৃহস্থের প্রত্যহ অনুষ্ঠেয় পঞ্চযজ্ঞের এক যজ্ঞ। বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাকে এই নাম দেওয়া হয়।

ব্রহ্মাবর্ত— মনুসংহিতার মতে, সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থলকে এই নামে অভিহিত করা হইত। এই স্থানকে অতি পবিত্র গণ্য করা হইত।

ব্রাহ্ম— একপ্রকার বিবাহের নাম; ইহাতে নানাভরণবস্ত্রাদিবিভূষিতা কন্যাকে পিতা শ্রুতশীলবান্ পাত্রের হস্তে সম্প্রদান করেন।

ভূতযজ্ঞ— গৃহস্থের দৈনিক অনুষ্ঠেয় পঞ্চযজ্ঞের এক যজ্ঞ। ইহাতে নানা প্রাণীকে খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হয়।

মধুপর্ক— বিশেষ সম্মানার্হ অতিথিকে অভ্যর্থনা করিতে ইহার ব্যবহার হইত। ইহার উপাদান বিষয়ে বিস্তর মতভেদ দেখা যায়। সাধারণতঃ দধি, ঘৃত, মধু ও জল এইগুলির মিশ্রণকেই এই নাম দেওয়া হয়। কোন কোন প্রাচীন স্মৃতিতে মধুপর্কে গোমাংস ও ছাগ-বা মেষ-মাংস দিবার ব্যবস্থাও ছিল।

মনুষ্যযজ্ঞ (বা নৃযজ্ঞ)—অতিথি সৎকার; ইহা পঞ্চযজ্ঞের এক যজ্ঞ।

যোগক্ষেম—বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন অর্থে ইহার প্রয়োগ করিয়াছেন। 'মিতাক্ষরা'তে ইহার অর্থ ইষ্ট ও পূর্ত (ইষ্টাপূর্ত দ্রষ্টব্য)।

রাক্ষস— একপ্রকার নিন্দিত বিবাহ; ইহাতে পাত্র কন্যাকে বলপূর্বক হরণ করিয়া বিবাহ করে।

ব্রাত্য— বিভিন্ন অর্থে এই শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। কোন কোন গ্রন্থে, বর্ণসংকরজাত ব্যক্তিকে এই নাম দেওয়া হইয়াছে। অপর কোন কোন স্থলে যাহার এবং যাহার পূর্বপুরুষগণের উপনয়নসংস্কার হয় নাই তাহাকে ব্রাত্য বা পতিতসাবিত্রীক বা সাবিত্রীপতিত বলা হইয়াছে।

সন্ধিনী— ইহা বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে; যথা—

(১) যে গাভী দিনে একবার মাত্র দুধ দেয়,

(২) যে গাভীকে নিজের বৎস মৃত হওয়ায় অপর গাভীর বৎস-সংযোগে দোহন করিতে হয়।

সপিণ্ড— এই শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে স্মৃতিকারগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। সাধারণতঃ, কোন ব্যক্তির পিতা ও তাঁহার ঊর্ধ্বতন ষষ্ঠ পুরুষ পর্যন্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার সপিণ্ড। সেই ব্যক্তির অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ (নিজেকে নিয়া) পর্যন্ত তাঁহার সপিণ্ড; তাঁহার মাতামহকে

লইয়া ঊর্ধ্বতন চতুর্থ এবং নিজেকে লইয়া মাতামহপক্ষে অধস্তন চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত তাঁহার সপিণ্ড। আবার কোন ব্যক্তির পিতৃপক্ষের যে কোন সপিণ্ড হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত তাঁহার সপিণ্ড। তাঁহার মাতামহ পক্ষের সপিণ্ড হইতে অধস্তন পঞ্চম পুরুষ পর্যন্ত তাঁহার সপিণ্ড।

সমাবর্তন— গুরুগৃহে বেদপাঠ সমাপনান্তে ব্রহ্মচারীর স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন; ইহাতে স্নান বিধেয় বলিয়া ইহাকে স্নান বা আপ্লাবনও বলা হয়। যিনি সমাবর্তন করেন তাঁহাকে বলা হয় স্নাতক।

সীমন্তোন্নয়ন—ইহা গর্ভিণী নারীর গর্ভের চতুর্থ মাসে অনুষ্ঠেয় সংস্কার-বিশেষ; ইহাতে গর্ভস্থ সন্তানের মঙ্গল হয় বলিয়া বিশ্বাস।

ধর্মশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী

[শুধু প্রধান প্রধান গ্রন্থের
পরিচয় লিখিত হইল]

প্রাচীন-স্মৃতি

আপস্তম্ব ধর্মসূত্র—সং বুলার, বোম্বাই।

গৌতমধর্মসূত্র—মহীশূর সংস্করণ।

ধর্মশাস্ত্রসংগ্রহ—সং জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, কলিকাতা।

বৌধায়ন ধর্মশাস্ত্র--Mysore Govt. Oriental Series, 1907.

মনুস্মৃতি—নির্ণয়সাগর প্রেস সংস্করণ, বোম্বাই, ১৯৩৩।

যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি—ঐ, ১৯২৬।

বাশিষ্ঠধর্মশাস্ত্র—সং ফুরার, ১৯১৬।

বিষ্ণুধর্মসূত্র—সং জলি, কলিকাতা, ১৮৮১।

বৈখানসধর্মপ্রশ্ন—সং ক্যালাণ্ড, কলিকাতা, ১৯২৭।

স্মৃতীনাং সমুচ্চয়ঃ—আনন্দাশ্রম সং, পুণা, ১৯২৯।

নব্যস্মৃতি

বঙ্গীয় সম্প্রদায়

অদ্ভুতসাগর (বল্লাল)—সং মুরলীধর ঝা, বারাণসী, ১৯০৫।

কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতি (ভবদেব)—সং শ্যামাচরণ কবিরত্ন, কলিকাতা, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ।

কালবিবেক (জীমূতবাহন)—বিব্‌লিওথিকা ইণ্ডিকা সং, কলিকাতা, ১৯০৫।

দানক্রিয়াকৌমুদী (গোবিন্দানন্দ)—ঐ, ১৯০৩।

দানসাগর (বল্লাল)—ঐ, ১৯৫৩।

দায়ভাগ (জীমূতবাহন)—সং ভরত শিরোমণি, কলিকাতা, ১৮৬৩।

পিতৃদয়িতা (অনিরুদ্ধ)—সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ সিরিজ, কলিকাতা।

প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ (ভবদেব)—রাজসাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯২৭।

প্রায়শ্চিত্তবিবেক (শূলপাণি)—সং জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, কলিকাতা, ১৮৯৩।

ব্রাহ্মণসর্বস্ব (হলায়ুধ)—সং তেজশ্চন্দ্র বিদ্যানন্দ, কলিকাতা, ১৩০১ বঙ্গাব্দ।

বর্ষক্রিয়াকৌমুদী (গোবিন্দানন্দ)—বিব্‌লিওথিকা ইণ্ডিকা সিরিজ, কলিকাতা, ১৯০২।

শুদ্ধিকৌমুদী (ঐ)—ঐ, ১৯০৫।

শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদী (ঐ)—ঐ, ১৯০৪।

শ্রাদ্ধবিবেক (শূলপাণি)—সং চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, কলিকাতা, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ।

স্মৃতিতত্ত্ব, ১ম ও ২য় ভাগ (রঘুনন্দন)—সং জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, কলিকাতা।

হারলতা (অনিরুদ্ধ)—বিব্‌লিওথিকা ইণ্ডিকা সং, কলিকাতা, ১৯০৯।

অন্যান্য সম্প্রদায়

অপরার্ক—যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির টীকা (অপরাদিত্য)—আনন্দাশ্রম প্রেস সং, পুণা, ১৯০৩, ১৯০৪।

কৃত্যকল্পতরু (লক্ষ্মীধর)—ইহার কোন কোন অংশ গাইকোয়াড় ওরিয়েণ্ট্যাল সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে।

দত্তকমীমাংসা (নন্দপণ্ডিত)—সং ভরত শিরোমণি, কলিকাতা, ১৮৮৫।

বালক্রীড়া (বিশ্বরূপ) যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির টীকা—সং গণপতি শাস্ত্রী, ট্রিভ্যাণ্ড্রাম স্যাংস্ক্রীট সিরিজ।

মনুভাষ্য (মেধাতিথি)—সং জে. আর. ঘরপুরে, বোম্বাই।

মিতাক্ষরা (বিজ্ঞানেশ্বর) যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির টীকা—নির্ণয়সাগর প্রেস্ কর্তৃক মূল সহ প্রকাশিত।

বীরমিত্রোদয় (মিত্র মিশ্র)—অংশতঃ সং জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, কলিকাতা, ১৮৭৫, কোন কোন অংশ সং গোলাপ সরকার শাস্ত্রী, কলিকাতা, ১৮৭৯।

শুদ্ধিবিবেক (রুদ্রধর)—বারাণসী, ১৮৬৬।

শ্রাদ্ধবিবেক (রুদ্রধর)—কাশী সংস্করণ, ১৯২০।

বিবিধ

Jolly : Recht und Sitte.

Kane, P. V : History of Dharmasastra, I–V

॥ দর্শনশাস্ত্র ॥

ভূমিকা

ভারতীয় দর্শনের সাহিত্য বিপুল। "ভারতীয় দার্শনিকগণের দর্শন চিন্তার মূল উৎস বেদ। বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক প্রভৃতি অধ্যাত্ম-চিন্তার লীলাভূমি। কেবল অধ্যাত্মচিন্তার কেন, ভারতের যে কোনও চিন্তার উৎপত্তিস্থান বেদ। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল (যোগ), পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা (বেদান্ত) সাক্ষাদ্‌ভাবে বেদ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। যে সমস্ত মহর্ষিগণ বেদের প্রবক্তা, বেদের ব্যাখ্যাতা ও বেদার্থের অনুষ্ঠাতা,...তাহারাই পূর্বোক্ত ছয়খানি দর্শনের প্রণেতা।"

"বেদসমূহে যে অধ্যাত্মচিন্তার বীজ নিহিত রহিয়াছে, বৈদিক দার্শনিকগণ তাহারই বিবৃতি করিবার জন্য দর্শনশাস্ত্রসমূহ প্রণয়ন করিয়াছেন ; বৈদিক দার্শনিকগণের দর্শনচিন্তা কোনও ব্যক্তিবিশেষের তাৎকালিক কুতূহল নিবৃত্তির জন্য চিত্তের বিলাসমাত্র নহে ; এই চিন্তার মূল বেদ। বেদান্তের সার সঙ্কলনপূর্বক যুক্তির সাহায্যে সেই তত্ত্বের অধিকারী পুরুষের দৃঢ় শ্রদ্ধা উৎপাদন ও তাহার অপরোক্ষীকরণের জন্য ভারতীয় দর্শনসমূহ নানা স্রোতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।"[১]

পৃথিবীতে সভ্যতার ইতিহাস অতি বিচিত্র। সভ্যতার এই বিচিত্র ইতিহাস যাঁহারা আলোচনা করেন তাঁহারা কার্যকারণ সম্বন্ধ দ্বারা ইতিহাস এবং সমস্ত জাগতিক ব্যাপার ব্যাখ্যা করিতে চান। আর সেইজন্যই সভ্যতার ইতিহাসে যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হয়।

১। প্রাচ্যবাণী গবেষণা গ্রন্থমালা (পঞ্চম পুষ্প)—ম. ম. শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ, ডি. লিট.।

অনুকূল বাহ্য প্রকৃতি ও আভ্যন্তরীণ নিজস্ব যোগ্যতা না থাকিলে কোনো দেশেই দর্শনের আবির্ভাব ও বিকাশ সম্ভবপর নহে। জগতের অন্যান্য জাতিদের পক্ষে দর্শনে প্রতিষ্ঠালাভ ঘটিয়া উঠে নাই। যে কারণেই হউক চীন, জাপান, আমেরিকা ও সেমিটিক দেশগুলি সভ্যতার আর সকল দিকে যথেষ্ট প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছে, কিন্তু প্রাচীন গ্রীস কিংবা ভারতের মতো দর্শনে প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। সাধারণভাবে বলা যায়, দর্শন আর্যজাতির সন্তান। যেখানে খাদ্য সহজলভ্য ও প্রকৃতিতে আছে সৌন্দয ও বিরাটত্ব সে দেশেই দর্শনের সাক্ষাৎ মিলে। দর্শন অনলস মনের অবসরপুষ্ট অবদান। প্রাচীন গ্রীস ও ভারত দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনের তালিকা সংক্ষিপ্ত করিয়া দার্শনিক ধ্যানধারণায় মনোনিবেশ করিয়াছিল। সেইজন্যই এই দুই দেশে দর্শনের এমন উন্নতি ও বিকাশ সম্ভব হইয়াছিল।

ভারতবর্ষেও অনুকূল বাহ্যপ্রকৃতি ও আভ্যন্তরীণ নিজস্ব যোগ্যতা যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। ভারতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য চির-প্রসিদ্ধ। এ সম্বন্ধে ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত বলেন, "The inexhaustible wealth of natural phenomena in a country of tropical climate girdled by great mountain ranges, deep and extensive oceans interspersed with long and wide rivers; where the seasons appear in so marked a manner with glorious colours of the sky, the glowing sunshine, silvery moonbeams, the pouring sonorous rains…all these captivated the sensitive minds of the Indians…"[১] এই তো ছিল ভারতের বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য। অপরদিকে, ভারতীয় মন চিরদিনই "Subtle, deep, logical to the extreme, imaginative and

১। History of Sanskrit Literature, Classical Period, Vol. I, পৃঃ lxvi; Indian Philosophy, Vol I.—Radhakrishnan.

analytic." একদিকে যেমন ভারতীয় মন ভোগমুখী, অপরদিকে ত্যাগমুখিতাও ইহার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ঐহিক চিন্তাও যেমন সত্য, পারত্রিক চিন্তাও তেমনি সত্য। ভারতীয় মন প্রতি বস্তুকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত তথ্যের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত। তাই, "the Indian mind takes infinite delight in carrying on logical thoughts to their consistent conclusions in analysing, classifying, naming and arranging the data in any sphere of experience." ভারতীয় জীবন প্রকৃতির উপর ছিল অনেকাংশেই নির্ভরশীল! মহিমময়ী প্রকৃতির দান ছিল ভারতবাসীর প্রতি অকৃপণ। তাই ভারতীয় মন ভাগ্য ও দৈবকে তাহাদের জীবনের অপরিহার্য ও অজ্ঞাত শক্তিরূপে মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল। "Early in the history of human civilisation they discovered the existence of a supreme power which not only controlled the phenomena of the external world but also all the biological phenomena of life, the functions of our cognative and conative senses."

দর্শনের সূচনা ও ক্রমবিবর্তন

এই যে বিপুল দর্শনশাস্ত্র পৃথিবীর সকল দেশেই অল্পবিস্তর রহিয়াছে, কিরূপে ইহার সূচনা হইয়াছে তাহা জানিবার জন্য জিজ্ঞাসু মন স্বতঃই ব্যাকুল হয়। জনৈক পারস্যদেশীয় কবি বিশ্বকে একটি হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথির সহিত তুলিত করিয়াছেন।[২] এই পুঁথির প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠা কালের বিবর্তনে হারাইয়া গিয়াছে। এখন আর বলা সম্ভব নহে কিরূপে এই গ্রন্থ বা পুঁথিটির আরম্ভ হইয়াছিল; এবং কিরূপেই বা ইহার শেষ করা যায়, তাহা বলাও দুষ্কর। কবির এই উক্তির মধ্যেই বোধ হয় দর্শনশাস্ত্রের সূচনার ধারণা নিহিত

১ A History of Sanskrit Literature, Vol I., পৃঃ XVII

২ Introduction: History of Philosophy, Eastern and Western, Vol. I.

আছে। মানুষ যেদিন হইতে পৃথিবীতে জ্ঞানলাভ করিয়াছে সেইদিন হইতেই সে ঐ সকল লুপ্ত পৃষ্ঠাগুলির পুনরুদ্ধার করিতে অবিরাম চেষ্টা করিতেছে। এই অনুসন্ধিৎসা ও তাহার ফলাফলের নামই দর্শন। দার্শনিক দর্শনগ্রন্থ রচনা করেন বিশ্বের রহস্য সম্বন্ধে কতগুলি সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান দিয়া। এই যে অনুসন্ধান, ইহার উদ্দেশ্য কিন্তু জীবন ও সত্তার অর্থ ও সার্থকতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা। যেদিনই মানুষ চিন্তা করিতে ও জানিতে শিখিল, সেদিন দুইটি প্রশ্ন তাহার মনে জাগিয়াছিল—(ক) তাহার জীবনের অর্থ কি এবং (খ) যে নিখিল বিশ্ব সে তাহার চতুষ্পার্শ্বে দেখিতেছে সে বিশ্বের স্বরূপ কি? কতদিন ধরিয়া মানুষ যে অন্ধকারের মধ্যে আলোকের অনুসন্ধান করিয়াছে তাহা আমরা বলিতে পারি না, তবে একটা সময় অবশ্যই আসিয়াছিল যখন সে একটি নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং মননশক্তি ও যুক্তির উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িল। "Systematic speculation"এর ইহাই আনন্দ। যেদিন মানুষের ধীশক্তি ঐ অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে দর্শনের জন্ম সেইদিনই এবং সেইদিন হইতেই দর্শনের ইতিহাসের সূচনা।

আমরা জানি যে গ্রীসেরও বহুপূর্বে মিশর ও ইরাকে খুব উন্নত ধরণের সভ্যতা বর্তমান ছিল। আমরা ইহাও জানি যে প্রথমদিকের গ্রীক দর্শন প্রাচীন মিশরীয় জ্ঞানের দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হইয়াছিল। প্লেটো এবং অ্যারিস্টট্‌ল্‌ মিশরীয় দার্শনিক মতবাদকে অবিসংবাদিত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু মিশর ও গ্রীসের মধ্যে সংযোগসূত্র কিরূপ ছিল এখন বলা অসম্ভব। ব্যাবিলোন ও নিনেভের দার্শনিক চিন্তারাজি কিরূপ ছিল আমরা জানি না—গ্রীক দর্শনই বা কিরূপে অত উন্নত হইয়াছিল জানিবার আজ আর কোন উপায়ই নাই।

কিন্তু কতকগুলি দেশের প্রাচীন ইতিহাস আমরা জানি যাহার ফলে দর্শনের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হইয়াছে। ভারতীয় ইতিহাসের প্রাচীন যুগ সম্বন্ধে আমরা যতটুকু জানিয়াছি তাহাতে প্রাচীন যুগের দার্শনিক চিন্তা ও মতবাদ কিরূপ ছিল সে সম্বন্ধে নূতন আলোক-

পাত করা যায়। গ্রীক দর্শনের পূর্বেও ভারতীয় দর্শনের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হওয়ায় ঐ যুগে দর্শনের প্রকৃতি ও প্রসার কিরূপ হওয়া সম্ভব সে সম্বন্ধে ধারণা জন্মে।

য়ুরোপীয় দর্শন গ্রীসের দার্শনিক চিন্তাধারা হইতে উদ্ভূত। খ্রীষ্টীয় ধর্ম প্রচার ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইহার গতি হয় ব্যাহত এবং কিছুদিনের জন্য য়ুরোপ হইতে দার্শনিক ধ্যানধারণা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কয়েক শতাব্দী পরে অষ্টম শতাব্দীতে আরবগণ গ্রীক দর্শন অধ্যয়ন ও আলোচনা করিতে থাকেন। তাঁহাদের মাধ্যমেই পবে দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা য়ুরোপেও পুনরুজ্জীবিত হয়। এই শাস্ত্রালোচনার ফলেই য়ুরোপে মধ্যযুগে "Renaissance"এর সূচনা। এই যুগে য়ুরোপ সরাসরি গ্রীক দর্শনের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় ব্যাপৃত হয় এবং তাহাকে আর দর্শনশাস্ত্রের জন্য আরবগণের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না। Renaissanceএর পর য়ুরোপে যে চিন্তাধারার বিকাশ হয় ও মনোজগতে যে বিশাল আলোড়ন ঘটে, তাহার ফলেই আধুনিক দর্শনের জন্ম হয়।

দার্শনিক চিন্তাধারাকে মোটামুটি দুইভাবে ভাগ করা যায়—প্রাক্-খ্রীষ্টীয় এবং খ্রীষ্টোত্তর। খ্রীষ্টোত্তর যুগকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়—প্রাক্-Reformation যুগ ও Reformation-উত্তর যুগ। এই ভাবে ভাগ করার যে প্রথা প্রচলিত ইহাতে কিন্তু সাধারণভাবে দর্শনের জন্ম ও ক্রমবিকাশের কথা বলা হয় নাই; কেবলমাত্র পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ক্রমবিকাশের ধারাই এইভাবে সূচিত হয়। চীন ও ভারত অতি প্রাচীনকালে স্বাধীনভাবেই নিজেদের চিন্তাধারার স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছিল। প্রাচীন যুগের দার্শনিক চিন্তাধারা সম্বন্ধে যে কোন আলোচনাই করা যাউক না কেন, ভারত ও গ্রীস, এই উভয় দেশীয় দার্শনিক চিন্তাধারার আলোচনা না করিলে সে আলোচনা অসম্পূর্ণ হইয়া যাইবে।

গ্রীসে Thalesই প্রথম দার্শনিক। তিনি একজন বড় জ্যোতির্বিদ্‌ও ছিলেন। Thalesএর পর গ্রীক দর্শনে নূতন আলোক সম্পাত করেন Pythagoras ও Socrates। ভারতে কিন্তু গ্রীসেরও বহু পূর্বে দার্শনিক চিন্তাধারার

সূচনা হয়। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে দার্শনিক তত্ত্ব ভারতে কেবল যে জন্মলাভ করে, তাহাই নয়, তখন তাহার যথেষ্ট উন্নতিও পরিলক্ষিত হয়।[১]

'দর্শন' শব্দের অর্থ

ইংরাজী 'Philosophy' শব্দের ব্যাপক অর্থ জ্ঞানানুরাগ। মানুষের পক্ষে যাহার প্রয়োজন আছে এবং মানুষের সঙ্গে যাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্পর্কিত তাহাই Philosophy। মানুষের প্রকৃতি কি? জীবনের শেষ কোথায়? যে পৃথিবীতে মানুষ বাস করে সে পৃথিবীর স্বরূপ কি? মৃত্যুর পরেই কি জীবনের পরিসমাপ্তি? কে আমাদের লালন পালন করেন? জগতের আদি কারণ কি? অনেকগুলি এই প্রকার সমস্যা পৃথিবীর উৎপত্তির সময় হইতেই মানবমনে নিরন্তর সমাধান খুঁজিয়া আসিয়াছে। Philosophy এই প্রকার সমস্যা লইয়াই আলোচনা করে। Philosophy যেহেতু সত্যের সন্ধানে ব্যস্ত, সেজন্যই ভারতীয় সাহিত্যে ইহাকে 'দর্শন' বা 'সত্যদর্শন' বলা হইয়াছে।[২] ভারতীয় দর্শনগুলির প্রত্যেক শাখাই স্বীকার করে যে উপযুক্ত সাধনা করিলে 'তত্ত্ব-দর্শন' লাভ করা যায়।[৩]

ভারতীয় দর্শনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

উপনিষদ্‌গুলিই ভারতের দার্শনিক সাহিত্যের আদিম গ্রন্থ। এই উপনিষদ্‌গুলি আবার বেদ-অন্ত, অর্থাৎ বৈদিক অপৌরুষেয় সাহিত্যের ইহারাই শেষভাগ। দার্শনিক গ্রন্থহিসাবে উপনিষদ্‌গুলি যে আদিম, সে বিষয়ে সন্দেহ

১ It was not a case of the dawn of Philosophy as in Greece but what may be described as the full glow of philsophical day. It was not the first faltering steps of the human intellect it marked a stage which could have been reached only after a considerable journey.—Maulana Abul Kalam Azad.

২ দৃশ্‌—See নিরুক্ত 'দর্শনাদৃষিত্বম্'।

৩ The word 'darsana' in the sense of true philosophical knowledge has its earliest use in the Vaisesika Sutras of Kanada Haribhadhra uses the word Darsana in the sense of systems of philosophy. —A *History of Indian Philosophy*, Vol, I. p 68n.

নাই। কিন্তু দার্শনিক চিন্তা উপনিষদেই প্রথম দেখা দিয়াছিল ইহাও সত্য নয়। শ্রবণ ও মনন যে এই যুগে ঘটিয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তাহার পর সেই চিন্তা যখন পূর্ণতা ও পরিণতি লাভ করে তখনই তাহা গ্রন্থের আকার ধারণ করে।

উপনিষদেরও পূর্বে ঋগ্‌বেদে পুরুষসূক্ত, দেবীসূক্ত, হিরণ্যগর্ভসূক্ত, লবসূক্ত ও নাসদীয়সূক্ত প্রভৃতিতে কমবেশী দার্শনিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। "সেই সময় হইতে উপনিষদ্‌গুলির রচনাকাল পর্যন্ত দীর্ঘ শতাব্দীগুলিতে ভারতের জিজ্ঞাসু মন দার্শনিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হইতেছিল, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়।"

বিদেহরাজ জনকের সভায় যজ্ঞের পর সমবেত বহু পণ্ডিতের সঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্যের যে বিচার হইয়াছিল, তাহা সুপ্রসিদ্ধ। এই কাহিনী বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণিত আছে। ছান্দোগ্যে আরুণি ও তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতুর মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা দেখিতে পাই। পরে এই শ্বেতকেতুই পঞ্চালরাজ প্রবাহণ জৈবনির নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। প্রশ্নোপনিষদে পিপ্পলাদ ঋষির নিকট কয়েকজন পণ্ডিত গিয়া নানা প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছিলেন। কঠোপনিষদে যম ও নচিকেতার মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা আছে। এই সব আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়া দর্শনের বীজ উপ্ত হইতে থাকে, আর সে সমস্ত অঙ্কুরিত হয় উপনিষদ্‌গুলিতে।

॥ ভারতীয় দর্শনের শ্রেণীবিভাগ ॥

আস্তিক ও নাস্তিক দর্শন

বেদের কর্মবহুল, অনুষ্ঠান-পশুহিংসা-বহুল জটিল ধর্মের প্রতি ধীরে ধীরে একটা অসন্তোষ দেখা দিতেছিল। ইহার প্রমাণ উপনিষদে প্রচুর আছে। উপনিষদ্ ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা করিয়াছে—যাগযজ্ঞের নহে। সেইজন্যই পরবর্তী সমালোচনায় বেদকে কর্মকাণ্ড ও উপনিষদকে জ্ঞানকাণ্ড বলা হইয়াছে। উভয়েই শ্রুতিপদবাচ্য হইলেও উপনিষদের ভিতরেই কিন্তু কর্মের নিন্দা রহিয়াছে। মুণ্ডক বলিয়াছে—'দুইটি বিদ্যা জানিবার আছে'। উক্ত বিদ্যাদ্বয় পরা ও অপরা নামে প্রসিদ্ধ।[১] তন্মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ—এই সকলই অপরা বিদ্যা। আর পরা বিদ্যাই হইল, যে বিদ্যাদ্বারা সেই অক্ষরকে (অর্থাৎ ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হওয়া যায়।[২] বৈদিক যজ্ঞের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ইহার অপেক্ষা আর হইতে পারে না—পশুবধসম্বলিত যজ্ঞাদির প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণাই জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠার কারণ।

বেদ যাহারা মানে না তাহাদিগকে প্রচলিত পরিভাষা অনুসারে 'নাস্তিক' বলা হয়। ইহার বিপরীত শব্দ 'আস্তিক'। ঈশ্বর, পরলোক এবং বেদ যাহারা মানে না তাহারাই প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক। কিন্তু ভারতের পরিভাষায় নাস্তিক শব্দের অর্থ বেদনিন্দক[৩] এবং বেদে বিশ্বাসী মাত্রেই আস্তিক। জৈন ও বৌদ্ধদর্শন বেদকে অপৌরুষেয় ও অনাদি বলিয়া স্বীকার করে না এবং বেদের প্রামাণ্যতাও স্বীকার করে না। এইজন্যই ইহারা নাস্তিক। আর পূর্বে যে ষড়্দর্শনের কথা বলিয়াছি উহারা বেদ মানে বলিয়া আস্তিক। আস্তিক

১। মুণ্ডক উপনিষদ্ ১।১।৪

২। ঐ ১।১।৫

৩। "নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ।"

দর্শনের পাশাপাশি নাস্তিক দর্শন দীর্ঘকাল চলিয়া আসিয়াছে, তাহার পর কালক্রমে তাহাদের খ্যাতি কমিয়া গিয়াছে।

ভারতে যাহা নাস্তিক দর্শন নামে প্রসিদ্ধ তাহা সাধারণতঃ জৈন এবং বৌদ্ধ দর্শন; কিন্তু আরও একটি চিন্তাধারার সহিত আমরা পরিচিত যাহা নাস্তিক তো বটেই, দর্শন নামেও অধিকন্তু তাহাকে অভিহিত করা হইয়া থাকে। ইহাই প্রসিদ্ধ চার্বাক দর্শন। ইহাকে পাশ্চাত্য ভাষায় Materialistic Philosophy বা জড়বাদ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।

চার্বাক-রচিত বিশেষ কোনো প্রসিদ্ধ গ্রন্থ কিছুদিন পূর্বেও দুর্লভ ছিল। অধ্যাপক দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী মহাশয় বহু গবেষণা করিয়া চার্বাকের লুপ্তপ্রায় গ্রন্থ[১] উদ্ধার করেন ও চার্বাক-দর্শন সম্বন্ধে ভারতীয় মনকে নূতনভাবে সচেতন করিয়া তোলেন। মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' নামক গ্রন্থেও চার্বাক-দর্শনের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। চার্বাক বেদের উপর তীব্র-কঠোর আক্রমণ করিয়াছেন এবং ত্যাগ অপেক্ষা ভোগের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন।

এ পর্যন্ত আমরা যাহা দেখিলাম তাহাতে ছয়টি আস্তিক দর্শন ও তিনটি নাস্তিক দর্শনের সন্ধান পাইয়াছি। সংক্ষেপে ইহাই ভারতীয় দর্শন। ইহাদের প্রত্যেকের কলেবরই পরিপুষ্ট; শাখাপ্রশাখাও অনেক আছে। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতৃগণ কিন্তু দার্শনিক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন নাই; ইহাদের ধর্মসম্বন্ধীয় নীতিগুলির মধ্যে দর্শনের আবির্ভাব পরে ঘটিয়াছে।

আস্তিক দর্শনগুলির আরম্ভ সংস্কৃত ভাষায়—বেদে-উপনিষদে। ইহাদের পরিণতিও সংস্কৃতে ঘটিয়াছে। নাস্তিক দর্শনের মধ্যে চার্বাকের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাও প্রধানতঃ সংস্কৃতে। তাঁহার দর্শনের অপর নাম 'লোকায়ত'।[২] ইহার অর্থ লোকপ্রিয়, লোকে বিস্তৃত বা লোক (কথ্য)-

১। Charvaka Sashti (Book Company); A Short History of Indian Materialism.

২। লোকায়ত দর্শন—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দ্রঃ।

ভাষায় লিখিতও হইতে পারে। তবে এই দর্শনের যে বিবরণ রক্ষিত (preserved) হইয়াছে তাহা সংস্কৃতেই। জৈন ধর্মের প্রবর্তক প্রাকৃতেই তাঁহার ধর্ম প্রচার করিতেন। জৈন দর্শনের প্রথম সূচনাও প্রাকৃত ভাষাতেই। পরে কিন্তু ক্রমশঃ সংস্কৃতের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। বুদ্ধের ধর্ম পালি ভাষাতেই প্রচারিত হইত; বৌদ্ধ দর্শনের প্রথম স্তরও নিশ্চয়ই পালি ভাষাতেই রচিত হইয়াছিল। কিন্তু পরে জৈন দার্শনিকের মতো বৌদ্ধ দার্শনিককেও সংস্কৃতের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল।

এই যে নাস্তিক দর্শনগুলিরও মাধ্যম হইয়াছিল সংস্কৃত ভাষা, ইহার একটি গূঢ় কারণ আছে। প্রাচীন য়ুরোপে প্রথম দিকে গ্রন্থাদি রচিত হইত তখনকার দিনের রাষ্ট্রভাষা গ্রীকে। পরে রোমক সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান ও অগ্রগতির সংগে সংগে সেগুলি ল্যাটিনে অনূদিত হয়। বেকন ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ হইলেও ল্যাটিনেই দর্শনের গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কিন্তু এখন দর্শন ইংরেজী, জার্মান, ফরাসী প্রভৃতি বিভিন্নদেশীয় ভাষায় রচিত হইতেছে। ভারতেও ঠিক এইভাবেই সংস্কৃত প্রথম হইতেই পণ্ডিতগণের ভাষা ও জ্ঞান প্রকাশের উপায় ছিল। হিন্দু পণ্ডিতগণের সঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈন দার্শনিকগণের বিচার যখন হইতে লাগিল, তখন সংস্কৃতের ব্যবহার তাঁহাদের পক্ষে অনিবার্য হইয়া গেল।

সুতরাং সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ কোনো একজনের পক্ষে সমগ্র ভারতীয় দর্শনের পরিচয় লাভ করা অসম্ভব নয়। ইহার সহিত গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষা ও আধুনিক কয়েকটি ইউরোপীয় পণ্ডিতদের গবেষণার সহিত পরিচয় থাকিলে তো আর কথাই নাই। সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি থাকিলেও ভারতীয় দর্শনের আধুনিক পাঠকের পক্ষে এক সংস্কৃতের উপর নির্ভর না করিয়া কতকটা আধুনিক ইউরোপীয় সমালোচকদের সাহায্য লওয়া উচিত।

ভারতীয় দর্শনের প্রকাশভঙ্গীর একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। সূত্রদ্বারা দার্শনিক তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করা ভারতীয় দর্শনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সূত্র যথাসম্ভব সংক্ষেপে বিষয়ের অবতারণা করে।[১] সূত্র সকল সময় পূর্ণ বাক্যাকারে

[১] "অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্বিশ্বতোমুখম্।
অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ॥"

পাওয়া যায় না। সূত্রার্থ অনেক সময়ই অপবে বলিয়া না দিলে বোধগম্য হয় না। সূত্রগুলির অর্থ নিগূঢ় বলিয়াই তাহাদের ব্যাখ্যার প্রয়োজন। ব্যাখ্যাগুলির প্রকারভেদে ভাষ্য, টীকা, টিপ্পনী প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয়। সূত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যাই ভাষ্য।[১] ভাষ্যের ব্যাখ্যার আবার বিভিন্ন নাম আছে। শারীরক-ভাষ্য, শ্রীভাষ্য, অনুভাষ্য ইত্যাদি বেদান্তসূত্রের বিভিন্ন ভাষ্যের নাম। আবার লেখকের নামানুসারেও অনেক সময় ভাষ্যের নাম হইয়াছে, যেমন শাঙ্কর ভাষ্য, জাগদীশী টীকা।

"আস্তিক দর্শন ছয়টিরই সূত্রগ্রন্থ রহিয়াছে। সকলের আকার সমান নহে। পতঞ্জলির যোগসূত্র সকলের ছোটো। আর সকলেরই সূত্রসংখ্যা তিন শতের উপর।"[২] নাস্তিক দর্শনগুলির কিন্তু ঠিক এই ধরণের সূত্র নাই, যদিও তাহাদের মধ্যে স্থানে স্থানে সূত্রজাতীয় রচনা আছে। এই সকল সূত্রভাষ্য বিশিষ্ট দর্শনের সংক্ষিপ্তসার ও কারিকা, সংগ্রহ ইত্যাদি গ্রন্থে বিধৃত রহিয়াছে।

এইরূপে ভারতে আস্তিক ও নাস্তিক মতের একটা বিপুল দার্শনিক সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীর সকল দেশেরই দার্শনিক মতবাদের কিছু না কিছু আভাস ভারতীয় দর্শনগুলিতে পাওয়া যায়।

দর্শনের রূপ—সাধারণ ও ভারতীয়

দর্শন গতিশীল শাস্ত্র। ইহার পরিবর্তন ঘটে আলোচ্য প্রশ্ন ও উত্তরের বিবর্তনে। কিন্তু মূল কাঠামোর আমূল পরিবর্তন সম্ভব নয়। প্রশ্নে ও উত্তরে নানাত্ব আছে, কিন্তু জিজ্ঞাস্য বিষয় প্রায়ই চিরপুরাতন। দর্শনের মূল জিজ্ঞাস্য—জগৎ ও আত্মা এবং এই উভয়ের অতিরিক্ত একটি পরমতত্ত্ব,[৩] যাহাকে সাধারণভাবে আমরা 'পরমাত্মা' বলিয়া থাকি। শ্বেতাশ্বতরে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে—ব্রহ্ম কি জগৎকারণ (ultimate cause)?

১ "সূত্রস্থং পদমাদায় বাক্যৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ।
স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ॥"

২ ভারতদর্শনসার, পৃঃ ৫৬

৩ ভারতদর্শনসার পৃঃ ৫৯

আমরা কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, কাঁহার দ্বারা জীবিত আছি এবং অবশেষে কোথায় অবস্থান করি ?[১]

সাধারণভাবে বলা যায় যে জীব, জগৎ ও পরমার্থ বা পরমাত্মাই দর্শনের আলোচ্য। ইহারা 'প্রমেয়'। যে বিচারের সাহায্যে ইহাদের জানা যায় তাহা 'প্রমাণ'। এই প্রমাণ ও প্রমেয়ই দর্শনের বিচারবস্তু। ইহারাই দর্শনের কেন্দ্রস্থ প্রশ্ন ও সনাতন রূপ।

ভারতীয় দর্শনেরও মুখ্য আলোচ্য বিষয় প্রমাণ ও প্রমেয়। সুতরাং দর্শনের সাধারণ স্বরূপ ও প্রকৃতি হইতে ভারতীয় দর্শনের স্বরূপ ও প্রকৃতিগত কোনো ভেদ নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, বেদের গ্রহণ ও বর্জন লইয়াই ভারতে আস্তিক ও নাস্তিক দর্শনের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। বিশ্বাসীদের মতে বেদ একটি প্রমাণ, অবিশ্বাসীদের মতে কিন্তু ইহার কোনো প্রামাণিকতা নাই।

নাস্তিক দার্শনিকদের কেহ কেহ অনুমান বা প্রত্যক্ষ, কেহ বা উভয়কেই স্বীকার করিয়াছে; কিন্তু আস্তিক দার্শনিকমাত্রই প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটি প্রমাণ মানিয়াছেন। উপমানকেও অনেকে প্রমাণের চতুর্থ রূপ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি—প্রমাণের এই দুইটি রূপও অনেকে স্বীকার করিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে কিন্তু প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ—এই তিনটিই পৃথক্ প্রমাণ। বাকি সকলই ইহাদের অন্তর্ভুক্ত। শব্দকে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অতিরিক্ত পৃথক্ প্রমাণ না মানিলেও চলে। তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ ও অনুমান—এই দুইটিই মাত্র প্রমাণ দাঁড়ায়।

প্রমাণের ন্যায় প্রমেয়ের সম্বন্ধেও মতভেদ রহিয়াছে। এইখানেই দর্শন-শাস্ত্রের বৈচিত্র্য।

আস্তিক দর্শনসমূহের বিভাগ

বেদবিশ্বাসী বলিয়াই আস্তিক দর্শনগুলি ঐ আখ্যা লাভ করে। কিন্তু সকলের বিশ্বাসের গভীরতার মাপকাঠি সমান নয়। মীমাংসা ও বেদান্তের

---

১ শ্বে: উ ১।১

ভিত্তি শ্রাত ও শ্রুতিবাক্য। সাংখ্য, যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিক কিন্তু শব্দ বা শ্রুতিকে একটি পৃথক্ প্রমাণ ধরিয়া লইয়া স্বাধীনভাবে চিন্তা ও আলোচনা করিয়াছে। এই দর্শনগুলির মধ্যে কোন্‌টি বেশী প্রাচীন বলা শক্ত। তবে বেদান্ত ও সাংখ্যের প্রভাব যে ভারতীয় মনের উপর অসীম তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। তাহাদের পর ন্যায় ও মীমাংসার প্রাধান্য।

বেদান্ত মীমাংসা ছাড়া অপর চারিটি আস্তিক ও নাস্তিক দর্শনকে মনে করিয়াছে ভ্রান্ত। বেদান্তের সমালোচনা সাংখ্যের সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বেশী।[১] অচেতন প্রকৃতিবাদী সাংখ্যকে বেদান্ত ক্ষমা করিতে পারে নাই।

১ কারণ সাংখ্যই বেদান্তবাদের অত্যন্ত প্রত্যাসন্ন বা একান্ত নিকটবর্তী। ('প্রত্যাসন্নত্বাৎ' –ব্র, সূ, ভা (শঙ্কর)'।

॥ ক ॥ সাংখ্য দর্শন

সাংখ্য দর্শন ভারতের দর্শনগুলির মধ্যে প্রাচীনতম বলিয়া পরিগণিত। উপনিষদ্, মহাভারত[১], মনুসংহিতা[২] এবং চরকসংহিতা প্রভৃতিতে সাংখ্যের মত প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। কঠ, শ্বেতাশ্বতর ও মৈত্রায়ণীয় উপনিষদে সাংখ্যের আলোচনা যাহা দেখা যায়, তাহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে সাংখ্যের তত্ত্বগুলি মোটামুটি তাহাদের নিজস্ব স্বরূপ লইয়া তখনই প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। এই দর্শনের প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠাতা কপিলের নাম শ্বেতাশ্বতরে উল্লিখিত আছে।[৩]

সকল প্রকার দার্শনিক চিন্তাধারার মধ্যে সাংখ্যই সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে ('সাংখ্যশাস্ত্রং জ্ঞানসুধাকরং কালার্কভক্ষিতং'—বিজ্ঞানভিক্ষু)। কপিল এবং পঞ্চশিখের গ্রন্থগুলি কালগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। অধ্যাপক গার্বের (Garbe) মতে পঞ্চশিখ সুপ্রসিদ্ধ মীমাংসক শবরস্বামীর সমসাময়িক (অর্থাৎ খ্রীঃ অব্দ ১০০—৩০০র মধ্যে ইনি বর্তমান ছিলেন)।[৪] চৈনিক মতে পঞ্চশিখ 'ষষ্টিতন্ত্র' রচনা করিয়াছিলেন, যদিও সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে।

সাংখ্যের মৌলিক গ্রন্থ মাত্র তিনটি পাওয়া যায়। 'তত্ত্বসমাস', ঈশ্বরকৃষ্ণের 'সাংখ্যকারিকা' এবং 'সাংখ্যপ্রবচনসূত্র'। 'সাংখ্যপ্রবচনসূত্র' অর্বাচীনকালের রচনা। 'ষষ্টিতন্ত্রে'র কথা ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁহার 'সাংখ্যকারিকা'য় বলিয়াছেন। ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকাও খুব প্রাচীন নহে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বেই যে ইহা রচিত হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।[৫] এই কারিকার

---

১ সাংখ্যজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি পরিসংখ্যানদর্শনম্ (মহাভা. ১২।১১৩।৯৩)

২ আসীদিদং তমোভূতম্ ইত্যাদি (মনু ১।৫)

৩ শ্বেতাশ্বতর ৫।২

৪ An Introduction to Classical Sanskrit—G. Sastri, pp. 203.

৫ The only work which has escaped extinction is the Samkhya-Karika of Isvarakrisna who cannot be earlier than the Christian era; দ্রঃ Indian Philosophy, Vol. II.

উপর যে সমস্ত প্রাচীনতর টীকা রচিত হইয়াছিল, সেগুলিও আজ আর পাওয়া যায় না। ঈশ্বরকৃষ্ণ যে সকল মত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা যে প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত ছিল তাহা স্পষ্টই প্রতীত হয়। অতএব আমাদের পক্ষে সাংখ্য দর্শনের আলোচনা আরম্ভ করা উচিত গৌড়পাদের টীকা ও ৯ম শতাব্দীর লেখক বাচস্পতি মিশ্রের 'সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী' লইয়া। গৌড়পাদের কাল লইয়া মতভেদ আছে। 'যুক্তিদীপিকা' নামক একটি গ্রন্থ কিছুদিন পূর্বে আবিষ্কৃত হওয়ায় এ বিষয়ে অনেক বিতর্কের অবসান হইয়াছে। ১৬শ শতাব্দীর নিকটবর্তী কালে বাঙালী বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্য-সূত্রের ভাষ্য লিখেন। অনিরুদ্ধ নামে আর একজন সাংখ্যের বৃত্তিকারের কথাও শোনা যায়।[১]

ঈশ্বরকৃষ্ণ

গৌড়পাদ

বিজ্ঞানভিক্ষু, অনিরুদ্ধ

জ্ঞানের নিধান আদি-বিদ্বান্ কপিল সাংখ্যকার।

এই বাংলার মাটিতে গাঁথিল সূত্রে হীরকহার॥—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সাংখ্যের প্রবর্তক কপিল ঋষি।[২] ইনি গীতায় সিদ্ধদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছেন।[৩] শ্বেতাশ্বতরে তাঁহার উল্লেখ আছে, পূর্বেই বলিয়াছি। কপিল শব্দের অর্থ 'তাম্রবর্ণ' বলিয়া গ্রন্থকার কপিলের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই অনেকে সন্দিহান; কিন্তু কপিল এতই প্রসিদ্ধ ছিলেন যে, যুক্তির কুশলতায় তাঁহাকে উড়াইয়া দেওয়া অসম্ভব।[৪] "প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে কপিলকেই সাংখ্যদর্শনের প্রবর্তক মনে করা ভালো। তবে, তাঁহার পূর্বে ও পরে অনেক মনীষীর সমবেত চেষ্টায়ই ইহার পরিপুষ্টি হইয়াছে, ইহাও মনে রাখিতে হইবে।"

কপিল

---

১ Indian Philosophy, Vol II, pp. 253-256.

২। কপিল কাহারও কাহারও মতে কর্দমমুনির পুত্র আবার অনেকের মতে ইনি ধর্ম ও হিংসার পুত্র। শংকরাচার্যের মতে ইনি সগরবংশধ্বংসকারী কপিল হইতে পৃথক্ (ব্র. সূ. ভাষ্য ২।১।১); ভাগবতের মতে কিন্তু ইনিই সগরবংশ ধ্বংস করিয়াছেন।

৩ গীতা অ ১০।২৬ শ্লো.

৪ "While these accounts are mythical, it may be accepted that a historical individual of the name Kapila was responsible for the Samkhya tendency of thought".—Radhakrishnan.

সাংখ্যের সম্বন্ধে মহাভারত[১] ও গীতাতে আলোচনা থাকায় এবং 'ন্যায়-সূত্র' ও 'ব্রহ্মসূত্রে' সাংখ্যমতের সমালোচনা হওয়ায় আমরা এই দর্শন যে অতি প্রাচীন সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত করিতে পারি।

সাংখ্য ও অন্যান্য শাস্ত্র

সাংখ্যের মতামত চরকসংহিতা এবং অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ও অহির্বুধ্ন্যসংহিতাতেও পাওয়া যায় বলিয়া অনেকে মনে করেন, সাংখ্য নিশ্চয়ই প্রাক্-বৌদ্ধযুগীয় দর্শন।[২]

'সাংখ্য' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কি প্রথমে দেখা যাউক। 'সংখ্যা' শব্দ হইতে 'সাংখ্য' আসিয়াছে।[৩] সংখ্যা শব্দের অর্থ বিবেচন বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞান

সাংখ্যের অর্থ

এবং জ্ঞানের মাধ্যমে দর্শনের পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করার নামই সাংখ্য।[৪] গীতায় সাংখ্য বলিতে মধুসূদন সরস্বতী বুঝিয়াছেন—"সম্যক্ খ্যায়তে সর্ব-উপাধিশূন্যতয়া প্রতিপাদ্যতে পরমাত্মতত্ত্বমনয়েতি সংখ্যা উপনিষৎ, তয়ৈব তাৎপর্যপরিসমাপ্ত্যা প্রতিপাদ্যতে যঃ স সাংখ্যঃ। ঔপনিষদঃ পুরুষ ইত্যর্থ।"[৫]

"বৌদ্ধ দর্শনেও যেমন, সাংখ্যদর্শনেও তেমনই দুঃখ একটি প্রধান স্বীকৃত সত্য।" দুঃখ নিবৃত্তির জন্য প্রয়োজন তত্ত্বজ্ঞান—দর্শন এই তত্ত্বজ্ঞানেরই সন্ধান দেয়। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ভেদে দুঃখ তিন

সাংখ্যের সাধারণ প্রকৃতি

প্রকার। সাময়িকভাবে এই সকল দুঃখের অবসান বা উপশম কখন কখন সম্ভব হইলেও দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি তত্ত্বজ্ঞান ছাড়া অসম্ভব। এইজন্যই সাংখ্য তত্ত্বের কথা চিন্তা করিয়াছে, ইহার মতে তত্ত্বের সংখ্যা পঞ্চবিংশতি।

১। মহাভারতে তিন প্রকার সাংখ্য মত দেখা যায়। কোনো মতে ২৪ তত্ত্ব, কোনো মতে ২৫ তত্ত্ব এবং কোনো মতে ২৬ তত্ত্ব।

২। History of Philosophy : Eastern & Western, Vol. I, pp. 243.

৩। "The very name of the doctrine, derived from Samkhya—which means buddhi, indicates that it is based on reflection rather than on authority." The Cultural Heritage of India, Vol. III, p. 41 ; (মহাভারত, ১২।১১৩।৯৩)

৪। "The word Samkhya has two meanings : (i) philosophic knowledge or wisdom, (ii) pertaining to numerals or numbers." Legacy of India, p. 104; An Intro. to Indian Philosophy—Chatterjee & Dutta p. 292.

৫। গীতা ২।৩৯ মধুসূদনী টীকা।

সাংখ্য প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটি প্রমাণকে স্বীকার করিয়াছে। সাংখ্য শব্দকে অনিত্য বলিয়া থাকে; সেজন্যই মীমাংসার সহিত ইহার মতবিরোধ। সাংখ্য অনুমানকেই প্রধান প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে; কিন্তু অনুমানের আলোচনায় ন্যায়, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের মতো সাংখ্য গভীর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে নাই।

সাংখ্য দর্শনে আমরা পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উপদেশ লাভ করি। এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব[১] যথাক্রমে প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, এগারোটি ইন্দ্রিয়, পাঁচটি তন্মাত্র ও পাঁচটি মহাভূত আর পুরুষ। ইহাদিগকে 'গণ'ও বলা হয়। এইগুলির আলোচনায় আমরা একাধারে জীব ও জগতের কথা জানিতে পারি।

পঞ্চবিংশতি-তত্ত্ব

সাংখ্য সৃষ্টির মূলে পুরুষ ও প্রকৃতি[২] এই দ্বৈততত্ত্বে বিশ্বাসী। ইহারাই 'fundamental category' এবং এই নিখিল বস্তুবিশ্ব—তাহা আধ্যাত্মিকই হউক আর আধিভৌতিকই হউক—এই পুরুষ ও প্রকৃতির লীলামাত্র। সাংখ্যের মতে পুরুষ, বা জীব অসংখ্য। অদ্বৈত বেদান্ত বহু পুরুষের অস্তিত্ব অস্বীকার করায় সাংখ্য বহু পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছে।

দ্বৈতবাদ

পুরুষ বহু, কারণ এক পুরুষ মরিলেই সকলে মরে না, বা এক পুরুষের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সকল পুরুষ জন্মগ্রহণ করে না। পুরুষ এক হইলে ইহা অসম্ভব হইত। এই যে পুরুষ ইহা আত্মা হইতে ভিন্ন নহে, কিন্তু দেহ হইতে ভিন্ন। এই বহু পুরুষের অস্তিত্ব আমরা অনুমানের সাহায্যেই জানিতে পারি।[৩]

সাংখ্যের পুরুষ

সাংখ্যের পুরুষ ভোক্তা, কিন্তু কর্তা নহেন। সাংখ্যের পুরুষই শাস্ত্রান্তরে আত্মা এবং গীতায় ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত হইয়াছেন। তিনি নিষ্ক্রিয়; সাক্ষীমাত্র।

১। "It is called by name both for these reasons and in consideration of the fact that it is regarded as the earliest formulation of rationalization of experience"—Legacy of India—p. 104

২। "Purusa stands for ultimate Selves or spirits which are steadfast, unchanging, eternal entities whose nature consists of pure consciousness alone."

৩। গীতা ২।২৬, যোগ পরিচয়—পৃঃ ৫।

জ্ঞানোদয় না হওয়া পর্যন্ত তিনি জাগতিক সকল দুঃখই ভোগ করেন; কিন্তু জ্ঞানোদয় হইবামাত্র তাঁহার ভোক্তৃত্বও লোপ পায়; তখনই তিনি মুক্ত।

পুরুষ ব্যতীত বাকি যে ২৪টি তত্ত্ব তাহাই জগৎ।[১] ইহাদের মধ্যে স্থূল ভূত (পৃথিবী প্রভৃতি) প্রত্যক্ষ দ্বারাই জানা যায়। কিন্তু এই পঞ্চভূত সূক্ষ্মতর বস্তু দ্বারা গঠিত; আর এই সূক্ষ্মতর পঞ্চভূত হইতেই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধকে অনুমান করা যায়। বাহ্য ও আভ্যন্তর ইন্দ্রিয়—জ্ঞানেন্দ্রিয় ৫টি, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি ও কর্মেন্দ্রিয় ৫টি, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এবং জ্ঞান ও কর্মাত্মক ইন্দ্রিয় মন—এই ১১টি ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র হইতে অহঙ্কারের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। আর অহঙ্কার হইতেই মহতের, বুদ্ধির এবং তাহা হইতে মূল প্রকৃতির অনুমান করা যায়। এইভাবে অনুমানের মাধ্যমে পর পর পঁচিশটি তত্ত্বকেই জানা যায়।

অন্যান্য ২৪ তত্ত্ব

এই ২৪টি তত্ত্বের মধ্যে প্রকৃতিই[২] সকলের মূল। সমস্ত জগতের উপাদানও ইহা। প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা এবং ইহা এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা মাত্র। কিন্তু ইহাদের হ্রাসবৃদ্ধি আরম্ভ হইলে প্রকৃতির মধ্যে দেখা দেয় বিক্ষোভ আর তখনই মহৎ, অহঙ্কার ইত্যাদি পরপর আবির্ভূত হয়। তখনই হয় জগৎ-সৃষ্টি।

প্রকৃতি

অধ্যাপক কীথের মতে ভারতীয় চিন্তাধারায় সাংখ্যের শ্রেষ্ঠ অবদান ত্রৈগুণ্যবাদ।[৩]

ত্রৈগুণ্যবাদ

১। Essentials of Indian Philosophy—M. Hiriyanna p. III (diagram)
প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস—ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ।
'মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারোন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥' পৃঃ ১২৫ [সাংখ্যকারিকা :৩]

২। "Prakriti has been described to be of the nature of equilibrium of the triple Gunas"—G. Sastri, p.205. "From the principle of causality......is deduced that the ultimate basis of empirical universe is the unmanifested (avyaktam) prakriti"—Radhakrishnan, Vol II, p. 259.

৩। A History of Sanskrit Literature—A. B. Keith, p. 487.

সাংখ্যের প্রকৃতিকে অনেকে মূল প্রকৃতি বলিয়া থাকেন। এই প্রকৃতি অচেতন ও জড় এবং সদৃশ ও বিসদৃশ দ্বিবিধ পরিণামশীল।[১] প্রকৃতির বিষম পরিণামেই বিরাট জগৎ-প্রপঞ্চ হয় আবির্ভূত। গুণ বলিতে সাধারণ-ভাবে quality বুঝায়, কিন্তু সাংখ্যদর্শনে 'গুণ'-শব্দ বলিতে তাহা বুঝান হয় নাই। গুণ বলিতে প্রকৃতির অপরিহার্য

গুণশব্দের অর্থ

সাংখ্যের ২৫ তত্ত্ব

পুরুষ (প্রকৃতিও নয়, বিকৃতিও নয়)

(মূলা) প্রকৃতি (বিকৃতিহীন)
| মহৎ
অহংকার

প্রকৃতিবিকৃতি

মহৎ ৫তন্মাত্র মন ৫ কর্মেন্দ্রিয় ৫জ্ঞানেন্দ্রিয়

একাদশেন্দ্রিয়

৫ মহাভূত (বিকৃতিমান্)

অংশ বুঝান হইয়াছে। গুণত্রয় পরস্পরাপেক্ষী, আবার পরস্পর অভিভবশীল (overpowers one another)—'অন্যোন্যাভিভবজননমিথুনবৃত্তয়শ্চ গুণাঃ' (সাংখ্যকারিকা)।

শুধু প্রকৃতিই যে ত্রিগুণাত্মিকা, তাহাই নয়; যাহা কিছু সৃষ্ট হয় বা হইয়াছে সকলেই এই তিনটি গুণের অবস্থা বিশেষে আবির্ভূত।[২] কারণ, সাংখ্য বিশ্বাস করে effects বা কার্য উপাদান কারণ হইতে স্বরূপত অভিন্ন।

১। প্রকৃতির অপর নাম প্রধান, অব্যক্ত, আবার মনুর মতে ইনিই আগার তমঃ [মনু.সং ১।৫] প্রকৃতির বিকৃতি আবার অন্যবিকারের প্রসূতি হইলে প্রকৃতিবিকৃতি নামে অভিহিত হয়।

২। "They form themselves into groups or wholes, and not only are the inner constituents of each of the groups working in union with one another for the manifestation of the groups as wholes, but the wholes themselves are also working in union with one another for the self-expression of the individual whole and of the community of wholes for the manifestation of more and more developed forms. Causation is thus viewed as the actualization of the potentials—"The Legacy of India, p. 105—"In fact, it is by an analysis of the things of experience and a proper synthesis of their common and enduring feature that the conception of Prakriti has been reached"—M. Hiriyanna, p 109 (Essentials etc)

প্রকৃতি এবং পুরুষের সংযোগ উভয়ের মধ্যেই উভয়ের ধর্মকে সঞ্চারিত করিয়া থাকে। ইহার ফলে যে পুরুষ নিষ্ক্রিয়, অচঞ্চল ছিলেন তিনি যেন সক্রিয় বা গতিমান্‌রূপে (পরিণামীরূপে) প্রতিভাত হন। আবার অপরদিকে যে প্রকৃতি অচেতনা ছিলেন তিনি সচেতনা হইয়া উঠেন। কিন্তু পুরুষ প্রকৃতির লীলা বা মায়া যখন বুঝিতে পারে, তখনই তাহার জ্ঞানোদয় হয় এবং তৎক্ষণাৎ সে মুক্তিলাভ করে। প্রকৃতি লজ্জাবতী নায়িকার ন্যায় অদৃশ্যভাবে পুরুষকে মুগ্ধ করিতে চায়, কিন্তু তাহার স্বরূপ পুরুষের কাছে প্রকাশিত হইয়া প'ড়িলেই সে নিজেকে সঙ্কুচিত করিয়া লয় কূর্মের অঙ্গসমূহের মত। পুরুষের বন্ধন ও মুক্তির ইহাই ভিতরকার কথা।[১]"

সাংখ্যে ঈশ্বর

সাংখ্যের জীব ও জগতের কথা বলা হইল। এখন ঈশ্বরের সম্বন্ধে সাংখ্য কি বলিয়াছে দেখা যাউক। ঈশ্বরের কথা উঠিয়াছে গৌণভাবে। বাহ্যবস্তুর সহিত ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ। "বস্তুর পরিণাম বা অবস্থান্তর প্রাপ্তি যে জানে সে অতীত ও অনাগতকে বর্তমানের মতো প্রত্যক্ষ করিতে পারে। কার্যে লীন কারণ—এবং কারণে অব্যক্ত কার্য উভয়ই প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। এই অতিরিক্ত প্রত্যক্ষ সকলের সম্ভব না হইলেও উহা প্রত্যক্ষই।"[২]

ঈশ্বর নাই

যোগিগণের ঈশ্বরপ্রত্যক্ষের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ বা আপ্তবাক্য না থাকায় ঈশ্বর অসিদ্ধ; আর সেজন্যই ঈশ্বরপ্রত্যক্ষের আলোচনা নিষ্ফল। জগৎস্রষ্টা (ঈশ্বর) যদি মুক্ত হন তো সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাই তাঁহার থাকার কথা নয়; আর তিনি যদি বদ্ধ জীব হন তো ঈশ্বর হইতে পারেন না। অতএব ঈশ্বর নাই।[৩] শাস্ত্রোক্ত ঈশ্বরবাচক শব্দে সিদ্ধপুরুষ অথবা মুক্ত আত্মার প্রশংসাই করা হইয়াছে, অতএব সাংখ্য ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। পুরুষ ও প্রকৃতিই একমাত্র তত্ত্ব যাহার দ্বারা এই জগৎ প্রপঞ্চের ব্যাখ্যা করা চলে।

১। ভারতদর্শনসার—পৃঃ ১৪৫।

২। ঐ পৃঃ ১৪৫।

৩। ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ—প্রবচনসূত্র।

বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে ঈশ্বর অসিদ্ধ মাত্র

বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে কিন্তু সাংখ্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে নাই, কেবল অসিদ্ধ বলিয়াছে মাত্র। প্রমাণ দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ করা যায় না, সাংখ্য শুধু ইহাই বলিতে চাহিয়াছে।

বন্ধনের কারণ

বন্ধনের কারণ প্রকৃতিসংযোগ, তাহার কারণ অনাদি অবিদ্যা। অনাদি কর্মফলের বাসনাবাসিত প্রকৃতির সহিত সংযোগ ঘটিলেই বন্ধন হয়। বেদান্ত যেমন অবিদ্যাকে বন্ধনের কারণ বলিয়াছে, সাংখ্য তেমনি প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগকেই বন্ধনের নিদান বলিয়াছেন।

সাংখ্যের পুরুষ নির্গুণ এবং নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব ; প্রকৃতির সংস্পর্শেই তাঁহাতে ভোক্তৃত্বের যতটুকু আরোপ হয় বন্ধন মোচিত হইলে তাহার অবসান হয়। সাময়িক ভাবে তাহার স্বরূপ আচ্ছন্ন হয় বটে, কিন্তু বন্ধনহীন অবস্থায় পুরুষ তাঁহার স্বাভাবিক অস্তিত্ব ফিরিয়া পাইবেন ; কর্তৃত্ব না থাকায় মুক্ত হইলে তাঁহার ভোক্তৃত্বেরও অবসান হয়।

সাংখ্য ও অন্যান্য দর্শন

সাংখ্য বৌদ্ধদর্শনের ক্ষণিকত্ববাদ ও ন্যায়ের ঈশ্বরকর্তৃত্ব অস্বীকার করিয়াছে। বৈশেষিকের ষট্-পদার্থবাদ এবং ন্যায়ের পরমাণুবাদও এই দর্শন স্বীকার করে নাই।[১] ব্রহ্মই সৎ এবং জগৎ ব্রহ্মাত্মক—বেদান্তের এই মত সাংখ্য গ্রহণ করে নাই। অবিদ্যা আর অজ্ঞান ঠিক এক পদার্থ নহে বলিয়া সাংখ্য অবিদ্যাকেও অস্বীকার করিয়াছে। মীমাংসাদর্শনের শব্দনিত্যত্বে সাংখ্য বিশ্বাস করে নাই। বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করিলেই বেদের নিত্যত্ব স্বীকার করা হইল—সাংখ্য এই মতে সন্দিহান।[২]

বেদ ও সাংখ্য

সাংখ্য বেদকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে—আত্মার বন্ধন ও মুক্তি সত্য ঘটনা বলিয়া সাংখ্য-দর্শনে স্বীকৃত।

সাংখ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য তিনটি। (ক) গুণত্রয় :—সত্ত্ব, রজঃ ও

১। সাংখ্য-সূত্র ৫।৮৫

২। ঐ ৪।৪৩,৪৫,৪৮।

গুণত্রয়

তমঃ এই গুণ তিনটির কথা ভারতীয় মনকে এতই পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে যে উহা সাংখ্যের অবদান কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। গুণত্রয়ের কল্পনা কোথা হইতে আসিল বলা দুরূহ। সাংখ্যের মতে[১] গুণগুলি প্রকৃতির ধর্ম নহে—ইহারা প্রকৃতির স্বরূপ। সত্ত্বাদি তিনটি গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। গুণত্রয় আবার পরস্পরাপেক্ষী, পরিমাণে হয়ত কোনটি কম, কোনটি বেশী।

এই গুণত্রয় জাগতিক সমস্ত বস্তুতেই কমবেশী পরিমাণে বর্তমান। শ্রদ্ধা, আহার, দান, তপস্যা প্রভৃতিও সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ানুসারে শ্রেণীত্রয়ে বিভক্ত হইয়াছে।[২] মানবচরিত্র এই গুণত্রয়ের তারতম্যানুসারে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে।

(খ) **সৎকার্যবাদ**:—সাংখ্যের মতে কার্য উৎপত্তির পূর্বে কারণে অব্যক্ত অবস্থায় থাকে—ইহাই সৎকার্যবাদ। "যাহা নাই তাহা কখনও হয় না,"[৩] আর যাহা ঘটে তাহা কারণেই সম্ভাবনারূপে নিহিত থাকে। প্রকৃতিতে জগৎ থাকে অব্যক্ত—জগৎ আর প্রকৃতি বস্তুত অভিন্ন বলিয়া প্রকৃতিকে "অব্যক্ত"ও বলা হইয়া থাকে। কার্যকারণেতে বর্তমান (সৎ) বলিয়া এই মতের নাম 'সৎকার্যবাদ'। ইহার বিপরীত মতই 'অসৎকার্যবাদ' বা 'আরম্ভবাদ'।ক নৈয়ায়িকগণ এই মতানুসারী। আর অদ্বৈত বেদান্ত জগৎকে মায়া বলেন বলিয়া ঐ মতের নাম 'মায়াবাদ'।

সৎকার্যবাদ

(গ) **প্রকৃতি ও পুরুষ**:—পুরুষ ও প্রকৃতির কল্পনা এবং উহাদের সম্বন্ধের ধারণাই সাংখ্যের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অচেতন ও অজ্ঞান প্রকৃতি পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া সক্রিয় হয়।

প্রকৃতি-পুরুষ

১। সাংখ্য-সূত্র ৬।৩৯।

২। গীতা ১৭ অধ্যায়।

৩। "নাসতো বিদ্যতে ভাবো
নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" গীতা

(ক) অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাৎ সর্বসম্ভবাভাবাৎ।
শক্তস্যশক্যকারণাৎ কারণাভাবাৎ সৎকার্যম্॥

সাংখ্যের প্রভাব ও সাংখ্যাচার্যগণের বিবরণ :—ভারতীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উপর সাংখ্যের প্রভাব অপরিসীম। পুরাণাদিতে, চরকসংহিতায়, মহাভারত মনুসংহিতা প্রভৃতিতে সাংখ্য-মত নানাভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রাচীনকালে যে একখানি সাংখ্যসূত্র ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। দশম শতাব্দীর ভোজরাজ ষড়ধ্যায়বিশিষ্ট সাংখ্যসূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন এবং ভোজরাজ স্বয়ং রাজবার্তিক নামে একখানি সাংখ্যবার্তিক রচনা করেন। সম্ভবত প্রাচীন সাংখ্যসূত্রের কতকগুলি সূত্র ও সাংখ্যশাস্ত্রের যুগযুগান্তরের সঞ্চিত জ্ঞান পরবর্তীযুগে কোন গ্রন্থকার নবীন সূত্রাকারে নিশ্চয়ই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উহাই সাংখ্যপ্রবচনসূত্র নামে অভিহিত হইয়াছে—প্রাচীন সাংখ্যসূত্র কিন্তু কালগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

সাংখ্যের ইতিহাস

পূর্বেই বলিয়াছি ঈশ্বরকৃষ্ণের মতে ষষ্টিতন্ত্র পঞ্চশিখাচার্যকৃত। জৈন দর্শন-গ্রন্থেও ষষ্টিতন্ত্রের উল্লেখ আছে। বাচস্পতি মিশ্রের মতে ষষ্টিতন্ত্র বার্ষগণ্যের রচনা। কিন্তু তাঁহার (অর্থাৎ বাচস্পতির) সময়ে ঐ ষষ্টিতন্ত্র অবলুপ্ত হইয়াছিল। অহির্বুধ্ন্য সংহিতাতেও যে ষষ্টিতন্ত্রের উল্লেখ আছে তাহাও পূর্বে বলা হইয়াছে। এই ষষ্টিতন্ত্রে অধ্যায় ছিল মোট ৬০টি, তাহার মধ্যে ৩২টি অধ্যায়ে ছিল তন্ত্র আর বাকি ২৮টি অধ্যায়ে ছিল কাণ্ড।

ষষ্টিতন্ত্র পঞ্চশিখকৃত

গুণরত্নের তর্করহস্যদীপিকাতে প্রাচীন ও নবীন—এই দুই প্রকার সাংখ্য মতের উল্লেখ দেখা যায়। আসুরি ছিলেন কপিলের শিষ্য—কপিল করুণা করিয়া আসুরিকে এই ষষ্টিতন্ত্র বলিয়াছিলেন।[১] পঞ্চশিখ ছিলেন আসুরির শিষ্য; তিনি কপিলের নিকটও শিক্ষা পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। পঞ্চশিখ জনকরাজাকে সাংখ্যশাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছিলেন।[২] সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তাঁহার গ্রন্থ ছিল।

তর্করহস্যদীপিকায় দুই প্রকার সাংখ্যমত

১। 'আদিবিদ্বান্ নির্মাণচিত্তমধিষ্ঠায় কারুণ্যাদ্ ভগবান্ পরমর্ষিরাসুরয়ে জিজ্ঞাসমানায় তন্ত্রং প্রোবাচ' (যোগসূত্র ১।২৫—ব্যাসভাষ্য)

২। মহাভারত, শান্তিপর্ব ২১৮

সাংখ্যকারিকা ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত

পঞ্চশিখের শিষ্য ঈশ্বরকৃষ্ণই সাংখ্যকারিকার প্রণেতা। ইঁহার গ্রন্থের নামান্তর 'সাংখ্যসপ্ততি' বা 'কনকসপ্ততি' বা 'সুবর্ণসপ্ততি'। উহাতে মূল ৭০টি আর্যা ছিল—সেজন্যই উহার নাম 'সপ্ততি'। প্রচলিত কারিকার পরে আরও দুইটি শ্লোক সংযোজিত হইয়াছে। এই কারিকার ৬২তম শ্লোকটি কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু লোকমান্য তিলক গৌড়পাদ ভাষ্য হইতে ঐ কারিকাটি উদ্ধার করেন।[১]

খৃঃ ৫ম শতকে নহে

খৃঃ ১ম শতকের পূর্ববর্তী

অধ্যাপক টাকাকুসুর মতে ঈশ্বরকৃষ্ণ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন; কিন্তু এই মত বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না। চীন দেশীয় অনুবাদ সাংখ্যকারিকার মাঠরভাষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। মাঠর সম্রাট কণিষ্কের সমসাময়িক; সেজন্য ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা নিশ্চয়ই খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্ববর্তী। কীথ, দাশগুপ্ত এবং গার্বে ঈশ্বরকৃষ্ণকে যথাক্রমে তৃতীয়, দ্বিতীয় এবং প্রথম শতাব্দীতে স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু উহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না।

গৌড়পাদভাষ্য ৭ম-৮ম শতাব্দী

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষে অথবা অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে গৌড়পাদাচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকার ভাষ্য প্রণয়ন করেন। গৌড়পাদই আবার মাণ্ডুক্যকারিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। নবম শতাব্দীতে বাচস্পতি মিশ্র সাংখ্যকারিকার সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী নামে ভাষ্য রচনা করেন।

বাচস্পতি : নারায়ণতীর্থ

সপ্তদশ শতাব্দীর নারায়ণ তীর্থ গৌড়পাদভাষ্যের সাংখ্য-চন্দ্রিকা নামে টীকা রচনা করেন। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের সাংখ্যকৌমুদী অষ্টাদশ শতাব্দীর গ্রন্থ।

তত্ত্বসমাস

তত্ত্বসমাস সাংখ্যদর্শনের অতি প্রাচীন গ্রন্থ। উহার গ্রন্থকার যে কে তাহা আজও নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। উহাতে অতি সংক্ষেপে সাংখ্যের তত্ত্বগুলির বর্ণনা আছে। ম্যাক্সমূলারের মতে তত্ত্বসমাস সাংখ্যকারিকার পূর্ববর্তী। বিজ্ঞানভিক্ষুর তত্ত্বসমাসকে সাংখ্যসূত্রকারের

১। 'কারণমীশ্বরমেকে ব্রুবতি কালংপরে স্বভাবংবা। প্রজাঃ কথং নিগু'ণতো ব্যক্তঃ কালঃ স্বভাবশ্চ॥' এইটিই লুপ্তকারিকা

রচিত বলিয়া মনে করিয়াছেন। কীথ ও দাশগুপ্ত তত্ত্বসমাসকে চতুর্দশ শতাব্দীতে স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহাদের মতে মাধবাচার্য তাঁহার সর্বদর্শন-সংগ্রহে তত্ত্বসমাসের উল্লেখ করিয়া যান নাই। কিন্তু কতগুলি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যাহাতে ঐ মতগুলি যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না।

সাংখ্যপ্রবচনসূত্র

সাংখ্য প্রবচনসূত্রের রচয়িতা কিন্তু কপিল নহেন। গৌড়পাদ, শংকর, বাচস্পতি, গুণরত্ন এবং মাধব কেহই সাংখ্যপ্রবচন-সূত্রের উল্লেখ করেন নাই। গুণরত্ন এবং মাধব সকল দর্শনেরই প্রামাণিক গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন। এ অবস্থায় সেকালে সাংখ্যপ্রবচনসূত্র প্রামাণিক গ্রন্থ ছিল বলিয়া মনে হয় না। ইহার অনিরুদ্ধের রচিত একটি বৃত্তি আছে। তাহা চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীতে বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য রচনা করেন। ঐ ভাষ্য অতি সুন্দর, বিস্তৃত এবং তথ্যমূলক। উহা আধুনিক হইলেও উহাতে ভাষ্যলক্ষণগুলি বিদ্যমান আছে।

অন্যান্য গ্রন্থ

বিজ্ঞানভিক্ষু 'সাংখ্যসার' বলিয়া এবং কবিরাজ যতি সাংখ্যতত্ত্ব প্রদীপ নামে আর একটি সাংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সীমানন্দের সাংখ্যতত্ত্ববিবেচনা এবং মাধবের সর্বদর্শনসংগ্রহও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

খ ॥ যোগদর্শন

"ভারতীয় ষড়্‌দর্শনের ভিতর পতঞ্জলির যোগদর্শন অন্যতম। এ বিশেষ ভাবে আদৃত; এ দর্শনের তত্ত্বনিষ্পন্ন শুধু বিচারে হয়নি, তত্ত্ব অধিগম হয়েছে ধ্যানে। ধ্যানের গভীরতায় তত্ত্বগুলির সম্যক্ স্ফুরণ ও সাক্ষাৎ পরিচয়। দর্শন সত্যিকার এখানে দর্শন। ...... এতে আছে তত্ত্বনির্দেশ, তত্ত্ব উপলব্ধি ও তত্ত্ব অধিগমের উপায়।"[১]

যোগ ও সাংখ্যের মধ্যে দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই।

সাংখ্য ও যোগ

জীব ও জগৎ সম্বন্ধে উভয়ের মত অভিন্ন—পার্থক্য কেবল ঈশ্বরালোচনায়। যোগ ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন, সাংখ্য ঈশ্বর অসিদ্ধ বলিয়াছেন—উভয়ের মধ্যে মূলত ইহাই প্রধান পার্থক্য।

যোগদর্শনের আলোচনায় পাই তত্ত্ব কি, যোগ কি ও যোগের লক্ষ্য

যোগদর্শনের আলোচ্য

কি। যোগদর্শন একটি বিজ্ঞান—ইহা ঠিক দর্শন নহে, যোগ। এই শাস্ত্র একাধারে পদার্থবিজ্ঞান, অধ্যাত্মবিজ্ঞান, সংযম ধ্যানবিজ্ঞান।

তত্ত্ব কি? যাহার কখনও ধ্বংস হয় না, তাহাই তত্ত্ব। যে বস্তু শাশ্বত, চিরন্তন, তাহাই সত্য, তাহাই তত্ত্ব। ইহার প্রকৃতিই হইতেছে নিত্যত্ব। এই নিত্য তত্ত্ব কি, দার্শনিকেরা তাহারই অনুসন্ধানে ব্যাপৃত।

তত্ত্ব কি?

তত্ত্ব দুই প্রকার—পরিণামী ও অপরিণামী। একরূপতা অপরিণামী তত্ত্বের স্বরূপ। আর, অস্ফুটের রূপান্তরই স্ফুট অবস্থা। রূপের রূপান্তরকেই বলা হয় পরিণাম বা পরিণতি। পুরুষ অপরিণামী। পুরুষকে কোন ক্রিয়া স্পর্শ করিতে পারে না। ক্রিয়া প্রকৃতির, পুরুষ প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই অপরিণামী তত্ত্বই সাংখ্য ও যোগের প্রকৃত তত্ত্ব। প্রকৃতিও নিত্য এবং তত্ত্ব। বাহিরের বস্তুসংযোগে এই অপরিণামী তত্ত্বের কোন পরিবর্তন হয় না। তবে যে মনে হয় পরিবর্তন ঘটিল, তাহা ভ্রান্তিমাত্র। যোগজ জ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য এই ভ্রান্তির নিরসন।

১। যোগপরিচয়—মহেন্দ্র নাথ সরকার, পৃঃ ১

যোগদর্শনেও পুরুষের বহুত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রতি ব্যক্তিতে পুরুষ বোধ স্ফুট। বাচস্পতির মতে, "পুরুষের জন্ম-মরণ, সুখদুঃখভোগ, মুক্তি, সংসার—এই ব্যবস্থাতেই পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধি।" জ্ঞানের কেন্দ্রে পুরুষ প্রতি ব্যক্তিতে যে ভিন্ন তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

পুরুষের বহুত্ব

পুরুষ স্বভাবতঃ মুক্তস্বভাব ও গুণাতীত। ইহা অয়স্কান্ত মণি সদৃশ। ইহা গুণবর্গ হইতে ভিন্ন, কিন্তু তাহাদের ভিতর নিজ শক্তি অনুপ্রবিষ্ট করাইতে সমর্থ। এই অনুপ্রবিষ্ট চিতিই প্রতিবিম্বিত পুরুষ। এই প্রতিবিম্বিত পুরুষ স্বরূপত নির্গুণ হইয়াও গুণসঙ্গে গুণীর ন্যায় প্রতিভাত হয়। প্রতিবিম্বিত পুরুষই কর্তা, বোদ্ধা, অনুভবিতা। শুদ্ধ পুরুষ অকর্তা, অবোদ্ধা, অননুভবিতা।

পুরুষের স্বরূপ

আমরা দেখিলাম বহুপুরুষবাদ যোগেরও সিদ্ধান্ত। এই বহুপুরুষ অনাদি ও অনন্ত। কেননা পুরুষ নিত্য পদার্থ। পুরুষকে কাল স্পর্শ করিতে পারে না, কারণ পুরুষ ত্রিকালাতীত। এই বহুপুরুষের মধ্যে কতকগুলি মুক্ত, কতকগুলি বদ্ধ। প্রকৃতির প্রভাবশূন্যতায় জ্ঞানের পুর্ণ উদয় হয়; আর এই জ্ঞানস্বরূপতার প্রতিষ্ঠাই মুক্তি। মুক্তি প্রকৃতি-বিচ্যুতিরই নামান্তর।

মুক্তি কি?

যোগের অর্থ চিত্তবৃত্তির নিরোধ,—যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ (সূত্র ২)।[১] নিরোধ অর্থে বৃত্তির নিরোধ, চিত্তেন্দ্রিয়ের বিলয়। নিরোধ অভ্যাসে চিত্ত ক্রমশ, সকল বাহ্য ও আন্তর বিষয় হইতে উপরত হয়। নিরোধের শ্রেষ্ঠ অবস্থায় চিত্তের পুর্ণলয় হয়। উহাই সমাধি। জাগরণ ও সমাধি চিত্তের, পুরুষের নহে। চিত্তের কোন অবস্থাই বস্তুত পুরুষকে স্পর্শ করিতে পারে না। তবু যে পুরুষের সুখ ও দুঃখ ইত্যাদি ভাবনা তাহা মিথ্যা সংযোগজন্য।

যোগের অর্থ

১। "Yoga is defined as a partial or complete arrest or cessation of the mental states",—The Legacy of India, p. III

পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ আছে, পুরুষ ভোগ করে, পুরুষ মুক্ত হয়। কিন্তু বস্তুত পুরুষ ভোগও করে না, মুক্তও হয় না আমিবুদ্ধি আশ্রয় করিয়াই পুরুষের এইরূপ ব্যবহার—প্রকৃতপক্ষে কিন্তু বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত পুরুষই ভোক্তা। যে পুরুষ প্রকৃতির অবদান ভোগ করে, সে প্রতিবিম্বিত পুরুষ, সে বদ্ধ। আর যে পুরুষ নিজের প্রতিবিম্ব হইতে পার্থক্য অনুভব করে সেই মুক্ত।

পুরুষের স্বরূপ

ঈশ্বর কিন্তু মুক্ত পুরুষ হইতে ভিন্ন। তিনি নিত্য ক্লেশমুক্ত তাঁহার ঐশ্বরিক উপাধি নিত্য, সাধনালব্ধ নহে। তিনি পুরুষ বিশেষ। অনাদিকাল হইতে তিনি নিরতিশয় জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন। তিনি প্রকৃতিস্পর্শমুক্ত নহেন; তাঁহার সত্ত্বোৎকর্ষ স্বাভাবিক। প্রকৃতিস্পর্শ সত্ত্বেও স্বাভাবিক রূপেই ক্লেশশূন্য বলিয়া ঈশ্বরের জ্ঞান ও মহিমার নিত্যপ্রকাশ কখনও ক্ষুণ্ণ হয় না। তাঁহার অতীত ও অনাগত কোনো বন্ধন নাই। তিনি কখনও প্রকৃতিতে লীন হন না। কারণ তিনি প্রকৃতির অতীত; তাঁহার প্রকৃতিস্পর্শ থাকিলেও প্রকৃতিতে লয় হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি প্রকৃতির স্রষ্টা, বোদ্ধা, সকল জ্ঞানের আশ্রয়।

ঈশ্বর

ঈশ্বরারাধনা বা ঈশ্বর প্রণিধান সাকার উপাসনা। ঈশ্বর মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ হন না; সাক্ষাৎকারণ অবশ্য প্রকৃতিপুরুষ-বিবেক; কিন্তু ঈশ্বরোপাসনা তাহার সহায়ক। ঈশ্বরের মুক্তিদানের ক্ষমতা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে—পরম্পরাসম্বন্ধে। যোগদর্শনে ঈশ্বর শান্ত সমাহিত পুরুষ।

পুরুষ ভিন্ন আর একটি তত্ত্ব প্রকৃতি। প্রকৃতি পরিণামী, পরিবর্তনশীল, কিন্তু নিত্য। পরিণামী নিত্য ও অপরিণামী নিত্য পদার্থ লইয়াই এই জগতের সৃষ্টি। সৃষ্টি প্রকৃতিরই পরিণাম। প্রকৃতি পরিণত হয় পুরুষকে ভোগসম্ভার অর্ঘ্য দিতে। তাহার স্বভাব পুরুষকে আকর্ষণ করা, তাহার ভোগ ও অপবর্গ সাধন করা।[১] প্রকৃতির যাহা কিছু ক্রিয়া—সৃষ্টি ও সৃষ্টির উপসংহার—সকলই পুরুষকে লইয়া। কারণ প্রকৃতি

প্রকৃতি

১। চিত্তনদীনামুভয়তোবাহিনী বহতিকল্যাণায়, বহতি পাপায় চ—যোগভাষ্য [সংসার-প্রাগ্‌ভারাকৈবল্যপ্রাগ্‌ভারা]

নিজে জড়—তাহার ক্রিয়ার কোন অর্থ তাহার কাছে নাই। ক্রিয়ার অর্থ নিষ্পন্ন হয় পুরুষকে লইয়া।

প্রকৃতির স্বরূপ

প্রকৃতির পরিণাম থাকিলেও তাহার কখনও ধ্বংস নাই, কারণ সে যে নিত্য।ক পরিণামের অর্থ অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্তি, পূর্ণ অভাব বা বিনাশ নহে। এই পরিণামেই বিচিত্র বিশ্বের সৃষ্টি। ইহা অবিরাম, অবিশ্রান্ত।[১] সৃষ্টির প্রবাহ তাই প্রকৃতপক্ষে অনাদি ও অনন্ত। প্রকৃতির সাম্যাবস্থার তিরোভাবেই সৃষ্টির বিকাশ। সাম্যাবস্থায় প্রকৃতির গুণত্রয়ের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, কারণ অব্যক্ত ভূমিতে তাহাদের স্বভাবের বিকাশ সম্ভব নহে। অদৃষ্টবশে সাম্য বা অব্যক্ত অবস্থা দূরীভূত হয়; তখন প্রকৃতি হয় পরিস্পন্দিত ও ব্যক্ত।

ত্রৈগুণ্যবাদ

একই প্রকৃতির পরিণামে বিশ্ব, কিন্তু পরিণত পদার্থের স্বভাব এক নহে। তাহার স্বভাব অন্তর্নিহিত গুণধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই জন্যই প্রতিবস্তু হইতে প্রতিবস্তু ভিন্ন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের তারতম্যানুসারে সৃষ্ট বস্তুর এবং প্রাণিবর্গের স্বরূপ ও পর্যায় নির্দিষ্ট করা হয়। সত্ত্বগুণ প্রকাশশীল—এই প্রকাশশীলতা কিন্তু চিতের প্রকাশশীলতা নহে, ইহা একরূপ স্বচ্ছতা মাত্র। সত্ত্বের ধর্ম স্বচ্ছতা, লঘুতা ও নমনীয়তা। রজোগুণ ক্রিয়াশীল—তাহার ধর্ম সঞ্চার, ক্রিয়াশীলতা ও প্রবৃত্তিপরতা। তমোগুণ স্থিতিশীল—তাহার ধর্ম স্থিতিস্থাপকতা (conservation)। প্রকাশ ও প্রবৃত্তি যে অবস্থায় রুদ্ধ হইয়া যায়, তাহাই স্থিতি।

পরিণাম

সাংখ্য এবং যোগ উভয়ের মতেই প্রকৃতির অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্তিই পরিণাম। বীজের পরিণতি বৃক্ষে—যে ক্রিয়ার দ্বারা তাহার উপস্থিতি সম্ভব হয় তাহাই পরিণাম। পরিণামে একই কারণ কার্যে রূপান্তরিত হয়। কার্য কারণেরই পরিণতি অর্থাৎ কারণের শক্তির কার্যরূপে পরিণতি মাত্র। শক্তির স্পন্দনেই পূর্বাবস্থার

(ক) প্রকৃতির মধ্যে যে পরিণাম (movement) তাহার জন্ত পুরুষ দায়ী, প্রকৃতি নহে। পুরুষ director, প্রকৃতি actness।

১। নাপরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে—সাম্যাবস্থায়ও সদৃশ পরিণাম চলিতে থাকে; সৃষ্টি অবস্থায় বিসদৃশ পরিণাম—তাহার ফলে বৈষম্যমূলক সৃষ্টি।

রূপান্তরে এইরূপ অবস্থান্তর হয়। বস্তুত, পরিণামবাদে কোন বস্তু উৎপন্ন হয় না, অভিব্যক্ত হয় মাত্র। কার্য কারণেই সুপ্ত থাকে, তাহার উৎপত্তি সহসা হয় না। কার্যই কারণ—ব্যক্ত অবস্থা কার্য, অব্যক্ত অবস্থা কারণ। যে সময় সকল কার্য অব্যক্ত কারণে বা প্রকৃতিতে লীন হয়, তখনই আমরা সেই অবস্থাকে বলি প্রলয়। এই অব্যক্তপ্রকৃতি পুনরায় সৃষ্টি-অভিমুখী হইয়া রূপান্তরিত হইলেই হয় সৃষ্টির আরম্ভ।

পরিণামবাদে কার্য নিত্য স্থায়ী না হইলেও কারণের ধ্বংস হয় না, কেননা কারণ ধ্বংস হইলে কোন কিছুর উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব। সমগ্র সৃষ্টিই প্রলয়কালে অব্যক্তে প্রবেশ করে, আবার নব সৃষ্টির প্রারম্ভে পুনরায় আবির্ভূত হয়। ইহাই শাশ্বত বিধান, ইহাই পরিণতির ধর্ম।

যোগদর্শনের কয়েকটি শব্দের অর্থ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। শব্দগুলি চিত্ত, বৃত্তি, ক্লেশ ও প্রমা। বুদ্ধি অহংকার ও মন—এই তিনের একীভূত অবস্থার নাম চিত্ত। কোন কিছু বস্তু সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে চিত্তে প্রতিবিম্বিত হয়, আর চিত্ত সেই প্রকারের বৃত্তি জন্মায়। এই বৃত্তি সেই পদার্থের জ্ঞানের কাবণ হয়। এই বৃত্তি পুনরায় পঞ্চ প্রকারের—প্রমাণ, বিপর্যয়, নিদ্রা, স্মৃতি, বিকল্প। ইহা ছাড়া পঞ্চবিধ ক্লেশেরও উল্লেখ আছে; সেগুলি অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। যোগশাস্ত্রে ক্লেশ গুণের ক্রিয়া দৃঢ় করে, কর্মবিপাক রচনা করে।

কয়েকটি শব্দের অর্থ

এইবার জ্ঞানের কথার অবতারণা করা যাউক। যাহা চোখে দেখা যায়, কানে শোনা যায় এইরূপ জ্ঞানই প্রত্যক্ষ। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয় যুক্ত হইলে সেই বিষয় ইন্দ্রিয়প্রণালীর দ্বারা বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হয়। বুদ্ধির দ্রষ্টারূপে পুরুষে তাহা উপগত হইলে তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। অনুমান কিন্তু পরোক্ষ জ্ঞানের কারণ। ব্যাপ্তি জ্ঞানের দ্বারা অনুমান সম্পন্ন হইয়া থাকে। শব্দজন্য জ্ঞান আর একপ্রকার জ্ঞান। এই শাব্দিক জ্ঞান লৌকিক ও অলৌকিক। লৌকিক শাব্দিক জ্ঞানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ ইতিহাস। আগম অলৌকিক

জ্ঞান :—
প্রত্যক্ষজ,
পরোক্ষজ এবং যোগজ প্রজ্ঞা

শাব্দিক জ্ঞানের ভিত্তি। এই অলৌকিক শাব্দিক জ্ঞান একরূপ যোগজ প্রজ্ঞা। আগমে ঈশ্বরবাক্য বিধৃত রহিয়াছে। সৃষ্টির প্রারম্ভে কল্পে কল্পে মানবের হিতকামনায় ঈশ্বর ধর্ম ও জ্ঞান বিষয়ে যে উপদেশ দান করেন তাহার সমষ্টিই আগম প্রমাণ। ঋষিদের ঈশ্বর-কৃপায় ঐশীশক্তির প্রভাবে বুদ্ধিপ্রজ্ঞা দীপ্ত হয় গভীর ধ্যানে। সেই অবস্থায় তাঁহারা আগম বা শাশ্বত অলৌকিক শাব্দিক জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। ইহাই যোগ দর্শনের তত্ত্ব।

সাধারণত বলা হইয়া থাকে যে সাংখ্যে ঈশ্বর স্বীকৃত নহে, যোগে অনাদি মুক্ত ঈশ্বর সিদ্ধ। সুনিপুণ বিচারে কিন্তু প্রতিপন্ন হয় যে কি সাংখ্য কি যোগ—একজন ঈশ্বর যে নিত্যকাল হইতে সৃষ্টি করিয়া আসিতেছেন তাহা স্বীকার করেন না। জগতের কারণ পুরুষ ও প্রকৃতি এবং জগৎ উৎপাদনের জন্য ঈশ্বরকল্পনার আবশ্যক হয় । এক নিত্য ঈশ্বর এই জগৎ রচনা করিতেছেন এবং তাহা বিনাশ করিতেছেন—এই মত সাংখ্য ও যোগের অভিমতবিরুদ্ধ। বেদান্তে ঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ—তাঁহার শক্তির কোন সীমা নেই। যোগদর্শনকার পতঞ্জলি ঈশ্বর স্বীকার করিলেও এইরূপ ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই, কারণ তাঁহার ঈশ্বর শুধু পুরুষবিশেষ মাত্র।

পতঞ্জলির ঈশ্বর শুধু পুরুষবিশেষ মাত্র

স্বরূপ-অববোধের জন্য যেরূপ তত্ত্ব বিচার দ্বারা বুদ্ধির শুদ্ধি আবশ্যক, তেমনি শরীর ও মনের শুদ্ধি আবশ্যক। মানবের চিত্তে পূর্ব-সংস্কারজনিত বাধাকে দূর করিবার জন্যই সাধনার প্রয়োজন। যোগদর্শন যে সাধনার কথা বলিয়াছে, আত্মার বিশুদ্ধতা সাধনার জন্য তাহা নিখুঁত। যোগে অষ্টাঙ্গযোগসাধনা উক্ত হইয়াছে। যাহাতে পারিপার্শ্বিক অবস্থা চিত্তকে ক্লিষ্ট ও ব্যথিত করিতে না পারে এবং যাহাতে চিত্ত দ্রবীভূত না হয়, এই সাধনার উদ্দেশ্যই তাহাই। অষ্টাঙ্গযোগ চিত্তনিরোধের কারণ। চিত্তনিরোধই যোগ। নিরুদ্ধবৃত্তিসম্পন্ন হওয়া পতঞ্জলির মতে প্রধান যোগ-লক্ষণ।

সাধনা

যোগের নানারূপ অর্থ আছে। ধ্যানে পরমাত্মাতে চিত্তসংযোগকে যোগ বলা হয়। পতঞ্জলির যোগের অর্থ চিত্তের সকল অধিকারের লয়, সকল বৃত্তির বিলয়। প্রকৃতিপুরুষের

পাতঞ্জল যোগ

ভিন্নতাজ্ঞাপকত্বই যোগের চরম অর্থ। অশুদ্ধিক্ষয়ের জন্য যোগাঙ্গ অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট হইয়াছে[১]। যোগাঙ্গ অনুষ্ঠান সত্ত্বোৎকর্ষের কারণ।

৮ যোগাঙ্গ

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি লইয়া যোগাঙ্গ আটটি। ইহাদের পরিচয় পরে দেওয়া হইবে[২]। সমাধি পুনরায় দুই প্রকার বলা হইয়াছে—সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। ভাষ্যে বলা হইয়াছে, যে যোগ সদ্ভূত অর্থ প্রকাশ করে, ক্লেশ ক্ষীণ করে, কর্মবন্ধন শ্লথ করে, চিত্তকে নিরোধ-অভিমুখী করে তাহাই সম্প্রজ্ঞাত যোগ বা সমাধি[৩]। যে যোগে বুদ্ধি হইতে ভূত পর্যন্ত সকল তত্ত্বের জ্ঞান উদ্ভাসিত হয়, বিষয় কিছু অপ্রকাশ থাকে না, তাহাই সম্প্রজ্ঞাত জ্ঞান। এই জ্ঞানে কোন আবরণ বা সংশয় থাকে না। চিত্তের বৃত্তিসমূহের পরিপূর্ণ নিরোধের নাম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।[৪]

সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি

ধ্যান

বস্তুবিষয়ক ধ্যানের গভীরতায় হয় বস্তুর সূক্ষ্ম অবস্থার উপস্থিতি বা উপলব্ধি। বিষয়ের সূক্ষ্ম অবস্থা আরও সূক্ষ্মতর ধ্যানে যোগীর চিত্তে হয় প্রতিভাত। রূপতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র, শব্দতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও স্পর্শতন্মাত্রের সহিত এইরূপ ধ্যানে সাক্ষাৎকার হয়। তখন অসংখ্য রূপ-রস-গন্ধের স্থলে একপ্রকার রূপ-রস-গন্ধ অনুভূত হয়।

ঈশ্বর প্রণিধান

ঈশ্বরপ্রণিধানপূর্বক শ্রদ্ধা-বীর্যসহকারে তত্ত্ব-উদ্বোধনের দিকে উন্মুখ হওয়াকে যোগমার্গ বলা হয়। এই ঈশ্বর-প্রণিধান কি? ইহার অর্থ শরণাপন্ন চিত্তে ঈশ্বরের অভিধ্যান। সাধনার জীবনে পতঞ্জলি ভক্তি স্বীকার করেন। ভক্তিই জ্ঞানের কারণ। এই ভক্তির অর্থ সত্যকার শ্রদ্ধা যাহার দ্বারা চিত্তের শান্ত বৃত্তি ও জ্ঞান উন্মেষিত হইতে পারে।

১। "The Yoga thinks that had it not been for the will of God, the potentialities of the gunas might not have manifested themselves in the present order." —The Legacy of India, p. 112.

২। সূত্র ২।২৮

৩। Yoga Sutras of Patanjali—Ballantyne and Shastri, 17 (b), p. 20. ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ; [ঈশ্বরস্তু তৎসম্বন্ধো ন ভূতো ন ভাবী]

৪। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস, পৃঃ ১২৮

ঈশ্বর-ধ্যান ধ্যানবিশেষ মাত্র।[১]

সাংখ্য ও যোগ প্রকৃতির সৃষ্টির স্বাভাবিকত্ব স্বীকার করে। এই স্বাভাবিকত্বের অর্থ এই যে ইহাতে কাহারও কর্তৃত্ব নাই, এমন কি ঈশ্বরও ইচ্ছাপূর্বক ইচ্ছানুযায়ী সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে অক্ষম।

সৃষ্টির স্বাভাবিকত্ব

সৃষ্টির বীজ ও রূপ প্রকৃতিতে নিহিত—ইচ্ছাদ্বারা ঈশ্বর ইহাদের স্বরূপ পরিবর্তিত করিতে পারেন না। প্রকৃতির পরিণতির একটা সুনির্দিষ্ট রীতি আছে যাহা অপরিবর্তনীয় ও অলঙ্ঘনীয়। উহাই অদৃষ্ট—বিশ্বসৃষ্টির শৃঙ্খলার মূলে নিত্য বিরাজমান। এইরূপ সমষ্টিগত অদৃষ্ট ভিন্নও জীবের কর্মানুযায়ী অদৃষ্ট আছে। যোগ (ও সাংখ্য) পূর্ণরূপে পুরুষকারবাদী ; প্রাণীর ভোগ তাহার কর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এই নীতিতে পূর্ণ বিশ্বাসী।

যোগ (ও সাংখ্য) দুঃখের আত্যন্তিক ধ্বংসসাধন করিতে প্রয়াসী। তাহাদের মতে চরম লক্ষ্যে দুঃখ নাই, আছে প্রজ্ঞা, শান্তি ও চিত্তের পরম উপশম। ইহাতে হ্লাদিনীবৃত্তি নাই বটে, কিন্তু আছে প্রজ্ঞাবৃত্তি। চাঞ্চল্যহীন এই প্রজ্ঞাবৃত্তি মন ও বুদ্ধির ভাবনার অতীত।

সত্যের শান্ত স্পর্শে সমাহিত হইলে জীবন সত্যের নিকট আনন্দে আত্মনিবেদন করে। জীবন সত্যে বিধৃত। ইহার সম্যক্ জ্ঞান লাভের বিশেষ প্রয়োজন। এই জন্যই যোগদর্শনে জীবননিয়ন্ত্রণের জন্য এমন সুন্দর অনুশীলনের অবতারণা করা হইয়াছে। অনিয়ন্ত্রিত জীবনে সত্যের সম্যক্ পরিচয় লাভ সম্ভবপর নহে। অনুশীলনই মানুষকে দৈববৃত্তি সম্পন্ন করে, উর্ধ্বতর শক্তির আধার করে। অবশেষে "প্রজ্ঞাসম্পন্ন সাধক চিত্তবৃত্তির পূর্ণ নিরোধে আত্মোপলব্ধি লাভ করেন। এই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির অবস্থায়

১। যোগদর্শনে প্রণব ঈশ্বরবাচক। সেই প্রণব বা ওঙ্কারের জপ ও তাহার অর্থ ভাবনাকে এক-প্রকার ঈশ্বরপ্রণিধানই বলা হইয়াছে। কিন্তু ঈশ্বরের ধ্যান যে পতঞ্জলির মতে একমাত্র বা শ্রেষ্ঠ পন্থা নহে, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা সমাধিঃ সিধ্যতি দ্রুতম্, অন্তরায়নিবৃত্তিশ্চ ভবতি।"

আত্মা আপনার স্বরূপে অবস্থান করে এবং যোগী কৈবল্য প্রাপ্ত হয়। যোগী যখন কৈবল্য লাভ করে তখন সেও অবিদ্যাদি পাঁচ ক্লেশ ও কর্মের সঙ্গে সম্বন্ধশূন্য হয়ে যায়"।[১]

কৈবল্য বা মুক্তি অর্থাৎ যোগসিদ্ধি

যোগের সমস্ত সাধন সুপ্রযুক্ত হইলে প্রথমে লাভ হয় বিভূতি, পরে হয় কৈবল্য বা মুক্তি, যাহার অন্য নাম যোগসিদ্ধি।[২] যোগারূঢ় হইতে হইলে বিবেকজ্ঞানপূর্বক পুরুষজ্ঞানের আবশ্যক। সমস্ত যোগসাধনার লক্ষ্যই এই। পতঞ্জলি নানা বিভূতি ও সিদ্ধির কথা বলিয়াছেন। বিভূতি শক্তি ও জ্ঞানের পরিচায়ক। চিত্তসংযম ও সূক্ষ্মতায় উহাদের উৎপত্তি। সত্ত্বশুদ্ধিতে উহাদের সম্ভাবনা আর প্রকৃতিবশিত্বে হয় উহাদের পূর্ণতা। যোগসূত্র (৩।৩৮) বলিয়াছে—ব্যুত্থানে ইহারা সিদ্ধি, সমাধিতে ইহারা উপসর্গ। সিদ্ধি শক্তিসাধ্য আর সমাধি জ্ঞানসাধ্য।

গীতায় সাংখ্য ও যোগের অর্থ অন্য ভাবে করা হইয়াছে। যোগ বলিতে দ্বিতীয় অধ্যায়ে গীতা বুঝিয়াছে নিষ্কাম কর্মযোগ[৩], যাহার মাধ্যমে ধীরে ধীরে পরমার্থের উপলব্ধি জন্মে। অন্যান্য অধ্যায়ে গীতা যোগের নানারূপ অর্থ করিয়াছে।[৪] গীতা একস্থলে বলিয়াছে সাংখ্য এবং যোগ বস্তুত ভিন্ন নহে, পণ্ডিতগণের মত অন্তত এইরূপ[৫]।—যে যোগে 'the physical body, the active will and the understanding mind are to be harmonically brought under control'[৬] তাহাকে বলা হয় রাজযোগ। যোগ আর একপ্রকারের আছে যাহাকে বলা হয় হঠযোগ।

গীতায় যোগের অর্থ

ভারতীয় সাধনার ইতিহাসে পতঞ্জলির অমূল্য অবদান যোগদর্শন।

১। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস, পৃঃ ১৩০।

২। Yoga Sutra of Patanjali—Ballantyne & Shastri, IV/25, pp. 145-146. কৈবল্যের অর্থ কেবলভাব (aloneness), কেবলপুরুষ অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে বিযুক্ত অবস্থায় পুরুষের যখন একাকিত্ব, তখন তাহাই তাঁহার কৈবল্য বা মুক্তি।

৩। গীতা—২/৪৭-৪৮

৪। ঐ — অভ্যাসযোগ, বিভূতিযোগ, মোক্ষযোগ ইত্যাদি

৫। 'সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃসম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥' গীতা

৬। The Wonder that was India—Basham, A. L.—p 326.

তিনি যোগশাস্ত্রের প্রণেতা এবং তাঁহার নামানুসারেই অনেক সময় এইদর্শনকে পাতঞ্জলদর্শনও বলা হইয়া থাকে। যোগশাস্ত্রের প্রথম উপদেষ্টা কিন্তু পতঞ্জলি নহেন—হিরণ্যগর্ভই প্রথমে লোকসমাজে যোগবিদ্যা প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া বিখ্যাত।[১]

যোগদর্শনের অবদান

পতঞ্জলির যোগসূত্রের রচনাকাল লইয়া মতভেদ আছে।[২] ইহা উপনিষদ্ এবং জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম হইতে অর্বাচীন, কিন্তু সাংখ্যদর্শনের সূত্র অপেক্ষা প্রাচীন। যোগসূত্রকার পতঞ্জলি ও মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি একই লোক কিনা, এবিষয়ে আজিও নিশ্চিতভাবে সন্দেহের নিরসন হয় নাই।

যোগসূত্রই যোগের একমাত্র গ্রন্থ নহে। যোগের প্রচারক কতকগুলি উপনিষদ্ আছে। শাণ্ডিল্য, ধ্যানবিন্দু, নাদবিন্দু, হংস, যোগতত্ত্ব, যোগচূড়ামণি, যোগশিখা ইত্যাদি। এইগুলি সকলেই অত্যন্ত অর্বাচীন যুগের উপনিষদ্। যোগ-উপনিষদ্‌গুলিতে যোগাঙ্গ অনুষ্ঠানের বিবরণ পাওয়া যায়। শ্বেতাশ্বতর (২য় অধ্যায়) উপনিষদে ধ্যান করার কথা পাওয়া যায়। শ্বেতাশ্বতর একেবারে আধুনিক উপনিষদ্ নহে। সেজন্য যোগাসন, প্রাণায়াম প্রভৃতির প্রাচীনত্ব অস্বীকার করা যায় না।

যোগদর্শনের অন্যান্য গ্রন্থ

উপনিষদ্‌গুলি ব্যতীত যোগসংহিতা নামে আরও এক শ্রেণীর গ্রন্থ পাওয়া যায়—শিবসংহিতা, অষ্টাবক্র-সংহিতা, যোগিযাজ্ঞবল্ক্য, ষট্-চক্র-নিরূপণ ইত্যাদি।

যোগসংহিতা

পতঞ্জলির যোগসূত্রের উপর ভগবান্ বেদব্যাস সংক্ষিপ্ত অথচ উপাদেয় ভাষ্য রচনা করেন। পাতঞ্জলভাষ্য বেদব্যাসকৃত। ইহা ভাষ্যে লিখিত হয় নাই বটে, কিন্তু মাধবাচার্য প্রভৃতি প্রাচীন ও প্রামাণিক আচার্যগণ যোগভাষ্য বেদব্যাসকৃত, ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন।[৩] "বাচস্পতি মিশ্রের মতে

পাতঞ্জলভাষ্য

১। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস, পৃঃ ১২৭; হিন্দুদর্শন—চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, পৃঃ ২১৭

২। An Introduction to Classical Sanskrit— G. Sastri, p. 206 (4th century A. D.)

৩। হিন্দুদর্শন, পৃঃ ২১২।

পাতঞ্জলভাষ্য বেদব্যাসকৃত। বাচস্পতি ব্যাসভাষ্য বা যোগভাষ্যের উপর ভাষ্য রচনা করেন—তাহার নাম তত্ত্ব-বৈশারদী।[১] ভোজ-রাজের বৃত্তি "রাজমার্তণ্ড" (১১ শতক) এবং 'যোগমণিপ্রভা' যোগদর্শন-বিষয়ক জনপ্রিয় গ্রন্থ। বিজ্ঞানভিক্ষুর (ষোড়শ শতাব্দী) যোগবার্তিকও যথেষ্ট লোকপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। যোগসার-সংগ্রহ যোগদর্শনের প্রয়োজনীয় সংগ্রহ (manual)।

বাচস্পতি

ভোজরাজ

বিজ্ঞানভিক্ষু

যোগসূত্র চারি ভাগ বা চারি পাদে বিভক্ত। প্রথম পাদের নাম সমাধিপাদ, দ্বিতীয়—সাধনপাদ, তৃতীয়—বিভূতিপাদ এবং শেষ—কৈবল্যপাদ। দার্শনিক তত্ত্ব বাদ দিলেও দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় যোগের উপকারিতা যথেষ্ট। যোগাঙ্গ-আসন ইত্যাদির অভ্যাস এবং তদ্দ্বারা অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি ও ঐশ্বর্যলাভের কথাও যোগ বলিয়াছে। শরীরতত্ত্বের কথা হঠযোগাদিতে বর্ণনা করা হইয়াছে—ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না ইত্যাদি নাড়ী, ষট্‌চক্র ও দেহাভ্যন্তরের অনেক তত্ত্ব ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। আধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা, সহস্রার এই সাতটি পদ্মের উল্লেখ করা হইয়াছে। এইগুলি দেহের নিম্নদিক হইতে ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে। ইহাতে কুলকুণ্ডলিনী এবং ডাকিনী প্রভৃতিরও উল্লেখ দেখা যায়। এইগুলির সহিত তান্ত্রিক আচার প্রভৃতির যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে।

যোগসূত্রের বিভাগ

যোগে শরীরতত্ত্ব

এই সকল আলোচনা হইতে দেখা যায় যে একটা ক্ষেত্রে তন্ত্র ও যোগ মিলিত হইয়াছিল; শুধু তাহাই নহে, বৌদ্ধ প্রভাবও অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায়। যোগের উপকারিতা যথেষ্ট ছিল বলিয়াই অতি প্রাচীনকাল হইতে এখন পর্যন্ত অন্যূন আড়াই হাজার বৎসর যাবৎ ভারতে, বিশেষত সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে যোগের অনুষ্ঠান ও অভ্যাস অব্যাহতভাবে চলিয়া আসিতেছে। সবগুলি না হউক, আসনগুলির অনেকেই যে অত্যন্ত উপকারী তাহা বর্তমানে সর্বস্বীকৃত যোগব্যায়ামের আসনগুলি হইতেই বুঝা যায়।

যোগ ও তন্ত্র

যোগাসন ও যোগ-ব্যায়াম

১। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে নাগেশভট্ট ব্যাসভাষ্যের উপর টীকা লেখেন। উহার নাম 'ছায়া'।

প্রাচীনকালে যোগদর্শনকেও 'সাংখ্যপ্রবচন' বলা হইত, কিন্তু পরবর্তী যুগে সাংখ্যশব্দ যোগরূঢ় অর্থে প্রযুক্ত হইয়া কপিলদর্শনকেই বুঝাইতে থাকে।

যোগ-সেশ্বরসাংখ্য

যোগকে যে 'সেশ্বরসাংখ্য' বলা হয় তাহা পুর্বেই বলিয়াছি। যোগ অতি প্রাচীন দর্শন। ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং বহুদিন যোগশাস্ত্রের মত অবলম্বন করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন।

হিরণ্যগর্ভই যোগদর্শনের আদি বক্তা (বাচস্পতি)

যোগদর্শনের ২৬ তত্ত্ব

বাচস্পতির মতে 'হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বক্তা নান্যঃ পুরাতনঃ'। তাঁহার মতে পতঞ্জলি প্রাচীন যোগের শৃঙ্খলামাত্রই দেখাইয়াছেন। সেজন্যই তিনি প্রথমসূত্রে যোগশাসন না বলিয়া যোগানুশাসনের কথা বলিয়াছেন। পতঞ্জলি র কাল আনুমানিক খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দী। 'প্রতিমা' নাটকের পঞ্চম অঙ্কে পঠিত বিদ্যার মধ্যে রাবণ মাহেশ্বরযোগশাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। সাংখ্য পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছে, কিন্তু যোগ ষড়্‌বিংশতিতত্ত্ববাদী।

॥ গ ॥ ন্যায়দর্শন

'ন্যায়দর্শন'[১] মহর্ষি গৌতম প্রণীত। কেহ কেহ তাঁহাকে গোতম নামেই অভিহিত করিয়া থাকেন। গোতমের অপর নাম 'অক্ষপাদ'। অক্ষপাদ ব্যক্তিগত নাম, আর গৌতম গোত্রগত নাম। 'মেধাতিথি'ও তাঁহার আর এক নাম বলিয়া অনেকের মত। অক্ষপাদ নামটির পশ্চাতে আছে একটি কৌতূহলোদ্দীপক কিংবদন্তী। শব্দটির অর্থ পাদদ্বয়ে অক্ষিদ্বয় যাহার। গোতম শব্দটি লইয়াও উপহাস করা হইয়াছে—গো-তম অর্থাৎ একটি প্রথম নম্বরের গরু।[২]

অক্ষপাদ

গোতম বা গৌতম

ম.ম. সতীশ বিদ্যাভূষণের মতে[৩] অক্ষপাদ ও গৌতম ভিন্ন ব্যক্তি এবং উভয়ের জন্মস্থান ভিন্ন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ ও দুর্গাচরণ সাঙ্খ্যবেদান্ততীর্থ উভয়কে এক ব্যক্তি বলিয়াই মনে করেন। চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের মতও তাহাই।

শাস্ত্র হিসাবে ন্যায়ের নাম 'আন্বীক্ষিকী'।[৪] অর্থাৎ যে শাস্ত্র অন্বীক্ষা বা বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করে। ন্যায়ের সূত্রগুলি প্রণীত হইবার পূর্বে বিশেষ কোনো সাহিত্য ছিল বলিয়া জানা যায় না। কিন্তু বিষয়বস্তুটি আলোচনা দ্বারা পুষ্ট না হইয়া সূত্রে সহসা গ্রথিত হইতে পারে না। অতএব সূত্র রচনার পূর্বেও ন্যায়ের পঠনপাঠন চলিয়াছিল—ইহা

আন্বীক্ষিকী : ন্যায়

---

১ ন্যায় বা Analysis

২ হিন্দু দর্শন, পৃঃ ১৪১

৩ দ্রঃ History of Indian Logic—M. M. S. C. Vidyabhusana

৪ 'আন্বীক্ষিকীত্মবিদ্যাম্'—মনু

নিঃসন্দেহে ধরিয়া লওয়া যায়।[১] এই সূত্র রচনার আরম্ভ ও সমাপ্তি কবে হইয়াছিল, তাহা লইয়া মতভেদের সীমা নাই। তবে খৃঃপূঃ ২০০ হইতে খৃঃ ৪০০-এর মধ্যে এই সূত্রগুলি সমাপ্ত হইয়াছে বলিবার সঙ্গত কারণ আছে।

ন্যায়সূত্র আঃ খৃঃ পূঃ ২০০-৪০০ খৃঃ

তাহার পর সূত্রের ভাষ্য, ভাষ্যের টীকা বা ব্যাখ্যা, সংগ্রহ-গ্রন্থ ইত্যাদি নানা জাতীয় গদ্যপদ্য গ্রন্থ মিলিয়া ন্যায়ের এক বিশাল সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে। গোতম প্রণীত ন্যায় প্রাচীন ন্যায় বলিয়া প্রসিদ্ধ। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মিথিলানিবাসী গঙ্গেশ উপাধ্যায় নব্যন্যায়ের প্রবর্তন করেন। তাঁহার গ্রন্থের নাম তত্ত্বচিন্তামণি। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাসুদেব সার্বভৌম বঙ্গদেশে ন্যায়ের এই গ্রন্থের অধ্যয়ন প্রবর্তন করেন এবং তদীয় শিষ্য রঘুনাথ শিরোমণি ও অন্যান্য বহু পণ্ডিত নবদ্বীপের নব্যন্যায়-শিক্ষাকেন্দ্রকে উন্নততম করিয়া তোলেন।

প্রাচীন ন্যায়

নব্যন্যায়

ভারতীয় সকল আস্তিক দর্শনেরই উদ্দেশ্য এক। মানুষ কি উপায়ে দুঃখের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে, এই বিষয়ে পথনির্দেশ করা দর্শনগুলির প্রধান উদ্দেশ্য। ন্যায়ের মতে পদার্থের সংখ্যা ষোল এবং ন্যায় অনিয়তপদার্থবাদী। জগতে যাহা কিছু আছে তাহা ঐ ষোলটির অন্তর্গত। এই প্রকার শ্রেণীবিভাগের নাম 'পদার্থ সংকলন'। এক একটি শ্রেণী এক একটি পদার্থ। এইজন্যই ন্যায়ের অপর নাম ষোড়শপদার্থবাদী শাস্ত্র। পদার্থকে ইংরাজীতে বলা হয় **'Category'**।

১৬ পদার্থ ঃ Category

ন্যায়সূত্র রচনার কালে নাস্তিকতার প্রসার বেশী ছিল বলিয়া মনে হয়। এই কারণেই বোধ হয় যুক্তিপ্রমাণের সাধুতানিরূপণে ন্যায়দর্শনে অনেক কথাই বলিতে হইয়াছে। গোতমের ন্যায়দর্শন,

১ ছান্দোগ্য উপনিষদে 'বাকোবাক্য, বা তর্ক-শাস্ত্রের এবং মহাভারতে ন্যায়দর্শনের প্রতিপাদ্য পঞ্চাবয়ববিস্তার উল্লেখ পাওয়া যায়। ভাসের প্রতিমা নাটকে মেধাতিথির ন্যায়শাস্ত্রের প্রথম উল্লেখ।

বাৎস্যায়নের ভাষ্য, উদ্দ্যোতকারের বার্তিক প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া এবং বৈশেষিক দর্শনের সহিত অনেকাংশে যোগ রাখিয়াই নব্যন্যায়ের উদ্ভব হইয়াছে। নব্যন্যায় পরিভাষাবহুল বলিয়া এখানে শুধু প্রাচীন ন্যায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ই দেওয়া সম্ভব।

'ন্যায়' শব্দের অর্থ

সংশয় নিরাস পূর্বক[১] সিদ্ধান্ত স্থাপন করার উপায়কে বলা হয় 'ন্যায়'[২]। যুক্তিতর্কের সাহায্যে অপরকে কিছু বুঝাইতে গেলে যে রীতিতে বুঝাইতে হয় সেই রীতিকেও বলা হয় 'ন্যায়'। গৌতম-দর্শনে যুক্তিরই প্রাধান্য, ইহাও ন্যায়-সংজ্ঞার কারণ। বিভিন্ন প্রমাণের সাহায্যে বস্তুর তত্ত্ব নিরূপণ করাকেও ন্যায় বলে। প্রতিপক্ষের উদ্ভাবিত তর্কজাল নিপুণতার সহিত তর্কের সাহায্যে এই দর্শনে খণ্ডিত হইয়াছে এবং এই শাস্ত্র তর্কপ্রধান, তাই ইহার নাম তর্কশাস্ত্র। আচার্য উদয়ন কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে বলিয়াছেন—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের মধ্যে ন্যায়চর্চা ভগবানের মননস্বরূপ।

ন্যায়সূত্রের বিভাগ

মূল দর্শনে ৫৪৭টি সূত্র দেখিতে পাওয়া যায়। মহামতি বাচস্পতি মিশ্রের মতে সূত্র-সংখ্যা ৫২৮। ন্যায়দর্শনে ৫টি অধ্যায়। প্রত্যেক অধ্যায়ে ২টি অংশ, এই অংশগুলির নাম 'আহ্নিক'। প্রথম অধ্যায়ের দুই আহ্নিকে আছে পদার্থ নিরূপণ ছল পর্যন্ত, দ্বিতীয় অধ্যায়ের দুই আহ্নিকে আছে প্রমাণ আলোচনা, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে প্রমেয়ের আলোচনা, পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে জাতিনিরূপণ, দ্বিতীয় আহ্নিকে নিগ্রহস্থান নিরূপণ। প্রসঙ্গত সূত্রমধ্যে অন্যান্য বিষয়েরও আলোচনা করা হইয়াছে।

১। দ্রঃ সরলন্যায়—অমরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, পৃঃ ৪

২। 'প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণং ন্যায়ঃ', আন্বীক্ষিকী শব্দের ব্যুৎপত্তিগত আর অর্থ পূর্বজ্ঞাতের জ্ঞানলাভের দ্বারা অন্যপ্রকার জ্ঞান লাভ করা বা Inference। ন্যায়কে সংক্ষেপে প্রমাণশাস্ত্র বা Logic বলা হয়।

ন্যায়সম্মত ১৬টি পদার্থের নাম[১]—প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান। এই ১৬টি পদার্থের যথাযথ জ্ঞান হইলেই মুক্তিলাভ হয়। এইগুলির মধ্যে প্রমেয় পদার্থের তত্ত্ব-জ্ঞান সাক্ষাৎ রূপে মুক্তির কারণ। প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানে মুক্তির বেলায় অন্য বস্তুও অপেক্ষিত হয়। মহর্ষি বলিয়াছেন, ১৬টি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির কারণ। অতএব মুক্তি বা দুঃখনিবৃত্তির উপায় নির্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে ন্যায়দর্শন রচিত হইয়াছে[২]।

১৬ পদার্থের নাম

মুক্তি

ন্যায়ের প্রথম পদার্থ প্রমাণ[৩]। প্রমাণ ব্যতীত কোনো পদার্থেরই সিদ্ধি হয় না। যাহা দ্বারা বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান জন্মে, তাহাই প্রমাণ। প্রমাণ চারিভাগে[৪] বিভক্ত—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। প্রমাণ-চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষই প্রধান, অপর তিনটি প্রমাণ প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে। আমরা চোখ দিয়া দেখি, কানে শুনি, জিহ্বা দ্বারা খাদ্যবস্তুর রসাস্বাদন করি, নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণ করি, ত্বক্ দিয়া স্পর্শ অনুভব করি, মনের দ্বারা সুখদুঃখানুভব করিয়া থাকি।

প্রমাণ

৪প্রকার

প্রত্যক্ষ (Perception)

লৌকিক ও অলৌকিক

এই সকল অনুভব প্রত্যক্ষ প্রমাণ[৫] হইতে জন্মে। চক্ষু, ঘ্রাণ, রসনা, শ্রোত্র, ত্বক ও মন এই ছয়টির নাম ইন্দ্রিয়। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয় নহে, ইহারা ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় মাত্র। ইহাদেরই মধ্যে এমন কিছু আছে যাহাদের নাম ইন্দ্রিয়। মন ব্যতীত অপর পাঁচটি

১ প্রমাণপ্রমেয়সংশয়প্রয়োজনদৃষ্টান্তসিদ্ধান্তাবয়বতর্কনির্ণয়বাদজল্পবিতণ্ডাহেত্বাভাসছলজাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।

২ যে কোন বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান লাভের জন্য ন্যায়দর্শনের আশ্রয় লইতে হয়। [Science of sciences—বাৎস্যায়ন, ফণিভূষণ, ১ম খণ্ড]

৩। প্রমা শব্দের অর্থ—যথার্থ জ্ঞান; যদ্দ্বারা তাহা লাভ করা যায়, অর্থাৎ তাহার যাহা করণ তাহাকে বলে প্রমাণ।

৪ প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি (১।১।৩ সূ)

৫ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারিব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্, ১।১।৪

বহিরিন্দ্রিয়; মন একক অন্তরিন্দ্রিয়। কোনও দৃশ্যবস্তুর সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের যখন সম্বন্ধ ঘটে, তখন আমরা বলি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা বিভিন্ন বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। ইন্দ্রিয়ের দোষ থাকিলেই প্রত্যক্ষ ভুল হইবে, নতুবা নহে। যে বস্তু দেখিতেছি বা যে শব্দ শুনিতেছি, তাহার সহিত চক্ষুর বা কর্ণের নিশ্চয়ই একটি সম্বন্ধ ঘটিতেছে এবং এই দৃশ্য বা শ্রব্য বিষয়ের একটি জ্ঞানও জন্মিতেছে। এই সম্বন্ধ এবং জ্ঞান উভয়ই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। দার্শনিক ভাষায় ইন্দ্রিয় সম্বন্ধের ফল তিনটি—উপাদান, হান ও উপেক্ষা। এই তিনটির যে কোনও একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণের ফল।[১]

পথ চলিতে চলিতে একটি বালক দর্শন করিলাম। বালকের সহিত আমার চক্ষুর সংযোগ ঘটিল। বালক প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয়, চক্ষু দর্শন-ইন্দ্রিয়, বালকের সহিত চক্ষুর সংযোগসম্বন্ধ বা সন্নিকর্ষ ঘটিল। পরক্ষণেই বালক ও বালকের আকৃতি, গুণাবলী প্রভৃতির সাধারণ ভাবে একটা ধারণা জন্মে। দার্শনিক পরিভাষায় ঐ সাধারণ জ্ঞানের নাম 'নির্বিকল্পক জ্ঞান'। বিশেষ্যবিশেষণ ভাবই 'বিকল্প'। যে প্রত্যক্ষে পদার্থের বিশেষ্যবিশেষণ ভাব থাকে না, তাহাকে বলে 'নির্বিকল্প'। পরক্ষণেই বালক ও তাহার বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি ধর্মের একসংগে একটি সংমিশ্রিত জ্ঞানের উপস্থিতি ঘটে, এই প্রকারে ধর্মের সহিত ধর্মীর (বস্তুর) যে বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ হয় তাহাই 'সবিকল্পক প্রত্যক্ষ'।

জগতের প্রত্যেক বস্তুই স্ব স্ব অসাধারণ ধর্মের দ্বারা অপর বস্তু হইতে পৃথক্‌রূপে জ্ঞাত হয়। পূর্বের উদাহরণে যেখানে বালকটি প্রত্যক্ষগোচর হইল, সেখানে বালকটিও তাহার অসাধারণ ধর্মের (differentiaর) গুণে অন্যান্য যাবতীয় বস্তু হইতে পৃথক্‌রূপে পরিজ্ঞাত হইল। এইরূপে বালকটি প্রত্যক্ষগোচর হইলে, যে ব্যক্তির পূর্বে বালকবিষয়ে জ্ঞান আছে তাহার মনে স্নেহের উদ্রেক হয়। যথা :—

১ দ্রঃ সরল ন্যায়—অমরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩৯

সকল বালক স্নেহের আধার··· ··· (১)

এটিও একটি বালক ··· ··· (২)

∴ এই বালকটিও স্নেহের আধার (পাত্র)

এইরূপ অনুভূতিমূলক সংস্কার উপস্থিত হইবে। যে ব্যক্তি পূর্বে কখনও বালক দেখে নাই, অথবা অপর কোন বালকের সহিত পরিচিত হয় নাই, তাহার পক্ষে বালকটির উপযোগিতা কি তাহা জানা সম্ভবপর নহে। সুতরাং বালকটির সম্বন্ধে পূর্বেই সবিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অতঃপর পূর্বে যে সকল বালক দেখিয়াছি, এই বালকটিও সেই জাতীয়—এইরূপ জ্ঞান জন্মে। ইহাকে উপাদানবুদ্ধি বলে—প্রত্যক্ষ প্রমাণের ইহাই শেষ ফল।

[illegible] শুধু ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষ প্রমাণ, আর ইন্দ্রিয়ের সহিত [illegible] সম্বন্ধ [illegible] রস, রূপ, ইত্যাদির যে জ্ঞান হয়, তাহা প্রমিতি বা প্রত্যক্ষ প্রমাণের ফল। বস্তুত লৌকিক প্রত্যক্ষের কালে প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞানের আশ্রয় জীবাত্মা মনের সহিত সংযুক্ত হয়, এই সংযোগ সকল প্রত্যক্ষের কালেই সাধারণ কারণ। আত্মার সহিত সংযুক্ত মন যদি প্রত্যক্ষের জনক ইন্দ্রিয়বিশেষের সহিত যুক্ত হয় এবং সেই যুক্ত ইন্দ্রিয় যদি দৃশ্যাদি বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই জ্ঞান উৎপন্ন হইবে।

লৌকিক প্রত্যক্ষ ৬ প্রকার

প্রত্যক্ষের আরও অনেক কারণ আছে কিন্তু দৃশ্য প্রভৃতি বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধকেই বলা হয় প্রধান কারণ। প্রত্যক্ষের বেলায় ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হয় ছয় প্রকারের—সংযোগ, সংযুক্ত সমবায়, সংযুক্ত সমবেত সমবায়, সমবায়, সমবেত সমবায়, বিশেষণতা বা বিশেষ্যবিশেষণভাব। (এই যে সম্বন্ধ ইহাকে অনেক সময় স্বরূপ-সম্বন্ধও বলা হইয়া থাকে।) ন্যায়ের মতে চক্ষুরিন্দ্রিয় তেজঃপদার্থ। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা ঘটাদি দ্রব্য, ঘটত্ব, ঘটের রূপ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ জন্মায়।[১] ঘটের প্রত্যক্ষে সংযোগই সম্বন্ধ। কিন্তু ঘটস্থিত রূপাদির প্রত্যক্ষ হইলে সংযুক্তসমবায় এবং রূপাদিগত শুক্লত্বাদির প্রত্যক্ষে হয় সংযুক্তসমবেত সমবায় সম্বন্ধ। মনেও সংযুক্তসমবায়ই সম্বন্ধ।

---

১ চক্ষুর প্রভার সহিত দৃশ্য বস্তুটি সংযুক্ত হইলে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে

ন্যায়মতে শ্রবণেন্দ্রিয় নিত্য পদার্থ—আকাশস্বরূপ। আকাশেই শব্দ উৎপন্ন হয়, আকাশেই থাকে, আকাশের সহিত শব্দের সম্বন্ধ—সমবায়। শ্রবণেন্দ্রিয়-রূপ আকাশে অবস্থিত শব্দের প্রত্যক্ষও সমবায় সম্বন্ধেই হইয়া থাকে। শব্দত্বধর্ম শব্দেই থাকে। ঐ শব্দত্ব প্রভৃতি প্রত্যক্ষের কালে সমবেত সমবায় সম্বন্ধই কারণ। কতকগুলি সমবায়রূপ নিত্য সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হয়; এইরূপ কতকগুলি অভাবেরও প্রত্যক্ষ হয়। অভাব-প্রত্যক্ষ স্থলে সম্বন্ধের নাম বিশেষণতা। অভাব-পদার্থ যেকালে যে আশ্রয়ে বর্তমান থাকে, সেইকালে সেই আশ্রয়রূপ বিশেষ্যই অভাবের সম্বন্ধ।

উল্লিখিত পদার্থগুলি লৌকিক প্রত্যক্ষ। ইহাদের সম্বন্ধও লৌকিক। কিন্তু অলৌকিক প্রত্যক্ষে বিষয়বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধের প্রয়োজন নাই। অলৌকিক প্রত্যক্ষে তিন প্রকার অলৌকিক সম্বন্ধ স্বীকার করা হইয়াছে—

ত্রিবিধ অলৌকিক প্রত্যক্ষ

(ক) বহু পদার্থের একই ধর্মের নাম সামান্য ধর্ম। সকল মানুষেই মনুষ্যত্ব রূপ ধর্ম আছে, সকল গরুতেই গোত্বরূপ ধর্ম আছে। যে কোন বস্তুতে তাহার সামান্য ধর্মের প্রত্যক্ষ হইলে সেই সামান্য ধর্মকেই সামান্য লক্ষণ সম্বন্ধ (the perception of classes) বলে। মনুষ্যত্বরূপ সামান্য ধর্মই সামান্য লক্ষণ নামক অলৌকিক সম্বন্ধ। কাহারও কাহারও মতে সামান্য ধর্ম বিষয়ক জ্ঞানই সেই সম্বন্ধ।

(খ) শঙ্খকে পীত বর্ণের বলিয়া ভ্রম করা, রজ্জুতে সর্প ভ্রম করা প্রভৃতি স্থলে বস্তুর অস্তিত্ব না থাকায় ভ্রমপ্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের সংযোগাদিরূপ লৌকিক সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। অন্যত্র দৃষ্ট পীত বর্ণ, বা সর্প প্রভৃতির স্মরণ জন্য এই ভ্রান্তি। স্মরণও এক প্রকার জ্ঞানমাত্র, সেই জন্য এই সম্বন্ধের নাম জ্ঞান লক্ষণ সম্বন্ধ (complication)।

(গ) যোগিগণের জ্ঞান দেশ বা কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে না—যোগ প্রভাবে তাঁহারা ত্রিকালজ্ঞ হইয়া থাকেন। তাঁহাদের যৌগিক প্রত্যক্ষের সম্বন্ধকে বলা হয় যোগজ সম্বন্ধ (intuitive perception of yogins)। যিনি যুক্ত তিনি সর্বদাই সর্ববিষয়ের অলৌকিক প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। আর যিনি যুঞ্জান, তিনি ধ্যানস্থ হইয়া যোগজ সন্নিকর্ষের দ্বারা সকল বিষয়ের

প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। সেজন্য যোগজ সন্নিকর্ষ, যুক্ত ও যুঞ্জান ভেদে দুই প্রকার। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষেও ইন্দ্রিয়াদির প্রয়োজন হয় না, তিনি নিজেই যথার্থ জ্ঞানের আশ্রয়[১]।

অনুমান বা Inference

অনুমান[২] দ্বিতীয় প্রমাণ। অনুমান শব্দের অর্থ পশ্চাৎ জ্ঞান। পক্ষ ও লিঙ্গের প্রত্যক্ষ, অনুমানের একটি কারণ বটে কিন্তু একমাত্র কারণ নহে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বিশেষের পরে প্রত্যক্ষজনিত যে যথার্থ জ্ঞান তাহাই অনুমান। ধূম দেখিয়া আমরা অগ্নির অনুমান করি, তারপর সেই স্থানে গেলে অগ্নিকে লাভ করাও যায়। এই উদাহরণে ধূমকে বলা যায় হেতু বা লিঙ্গ (middle term)। যে বস্তুকে সাধন করা হয়, হেতুর সাহায্যে যাহাকে পাওয়া যায়, তাহাকে বলা হয় সাধ্য (major term)। অগ্নিই উল্লিখিত উদাহরণে সাধ্য। যে স্থানে বা অধিকরণে সাধ্যের অস্তিত্ব স্থির করা হয়, তাহার নাম 'পক্ষ'[৩] (minor term)। হেতু সকল সময়েই সাধ্য অপেক্ষা অল্প অথবা সমান স্থান জুড়িয়া থাকে। যদি কোথাও এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়, সেখানে অনুমান ভুল হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বেশী জায়গায় অবস্থিতির নাম ব্যাপকতা, আর অল্প জায়গায় অবস্থিতির নাম ব্যাপ্যতা। হেতু ব্যাপ্য (one which is pervaded) এবং সাধ্য ব্যাপক (that which pervades)। হেতু এবং সাধ্যের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাবরূপ সাধারণ সম্বন্ধ। 'যত্র যত্র ধূমস্তত্র তত্র বহ্নিঃ' এই প্রকার ব্যাপ্তিজ্ঞান না জন্মিলে অনুমান হইতে পারে না।

উপরের আলোচনা হইতে বুঝা গেল যে অনুমানের বেলায় প্রয়োজন[৪]—(১) হেতুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান (২) হেতু ও সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধের জ্ঞান (৩) সাধ্যের ব্যাপ্তিযুক্ত-হেতুটি সাধ্যের অধিকরণে থাকা চাই। হেতু

---

১ নির্বিকল্প সবিকল্প এবং প্রত্যভিজ্ঞা ভেদে প্রত্যক্ষের ধারা বা mode তিনরূপ—দ্রঃ An Introduction to Indian Philosophy : Datta and Chatterjee, p. p. 204-206

২ 'সরল ন্যায়'—অমরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩৯-৪৮

৩ 'যে ধর্মীতে' সেই 'লিঙ্গীর' অনুমিতি হয়, সেই ধর্মী পক্ষ নামেও কথিত হইয়াছে—তর্কবাগীশ, পৃঃ ১৯২।

৪ Vide Kuppuswami Sastri—Introduction to Indian Logic

ও সাধ্যের সম্বন্ধজ্ঞান বা ব্যাপ্তিজ্ঞান বা ব্যাপ্তিস্মরণ (the logical condition of inference) হইতেই আসে অনুমান। পূর্বে কোথাও হেতু ও সাধ্যের সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ না হইলে সেই হেতু দ্বারা অনুমান হইবে না। অনুমানের মূলে সর্বত্রই প্রত্যক্ষের অনুভূতি থাকা চাই। ব্যাপ্তি সম্বন্ধ আবার তিন প্রকার ঃ (১) অন্বয়ব্যাপ্তি (২) ব্যতিরেকব্যাপ্তি (৩) অন্বয়ব্যতিরেকব্যাপ্তি—অন্বয়ব্যাপ্তি (relation of agreement in presence between two things)—অর্থাৎ যেখানে যেখানে ধূম, সেখানে সেখানেই আগুন (খ) ব্যতিরেকব্যাপ্তি (uniform agreement in absence between them) অর্থাৎ—যেখানে আগুন নাই, সেখানে ধূমও নাই এখানে অভাবমুখে সম্বন্ধ স্থির করা যায়। (গ) আবার কোথাও কোথাও অভাবমুখে সম্বন্ধ স্থির করা যায় না। যেমন, যে যে বস্তু জ্ঞানের বিষয়, সেই সেই বস্তু বাক্যেরও বিষয়, ইহার অভাবসম্বন্ধ চলে না—এস্থলে ভাবমুখে সম্বন্ধ গ্রহণ করিতে হয় বলিয়া ইহার নাম কেবলান্বয়ী (when based on a middle term which is always positively related to the major term)। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার ভাবমুখেও সম্বন্ধ পাওয়া যায় না, সেখানে শুধু অভাবমুখে সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তির ধারণা করিতে হয়। ইহাকে বলা হয় কেবলব্যতিরেকী (when the middle term is only negatively related to the major)। যেমন, পৃথিবী যাহা নহে, তাহা গন্ধযুক্ত হইতে পারে না।

ত্রিবিধ ব্যাপ্তি

গোতমের মতে অনুমান তিনভাবে হয়ঃ—(from cause to effect) কারণ হইতে কার্যের অনুমান, (from effect to cause) কার্য হইতে কারণের অনুমান এবং এই দুই প্রকার ভিন্ন অন্য অনুমান।[১] অনুমানকে অন্য এক প্রকারে কেহ কেহ ভাগ করিয়াছেন—স্বার্থ ও পরার্থ। নিজের সন্দেহ নিরসনের উদ্দেশ্যে মনে মনে যে অনুমান করা হয় (that which resolves

ব্যাপ্তি-অনুসারে ৩ প্রকার

১ ইহাদের পারিভাষিক সংজ্ঞা যথাক্রমে পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট। অথতৎপূর্বকং ত্রিবিধমনুমানম্—পূর্ববচ্ছেষবৎ সামান্যতোদৃষ্টঞ্চ—১।১।৫; অনুমান সম্বন্ধে দ্রঃ ন্যায় পরিচয়—তর্কবাগীশ পৃঃ ১৯০—১৯৮।

a doubt in one's own mind) তাহাকে বলে স্বার্থানুমান। আর পরকে বুঝানোর উদ্দেশ্যে যে অনুমান (that which does so in another's mind) তাহাই পরার্থানুমান।[১]

অপরকে বিশ্বাস করাইতে হইলে হেতু ভিন্ন আরও কয়েকটি উপকরণের প্রয়োজন হয়, ন্যায়ের ভাষায় যাহাকে বলা হইয়াছে 'অবয়ব'। এই অবয়ব পাঁচটি—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়, ও নিগমন।[২] সংস্কৃত Inference-এর এই পাঁচটিই হইতেছে অঙ্গ।

ইংরেজী একটা syllogism উদাহরণ স্বরূপ লওয়া যাক :—

Indian and Western Syllogism

Where there is smoke, there is fire.—Major Premise

The hill has smoke.—Minor Premise

The hill has fire (within it).—Conclusion

এই দুটি premise এবং একটি conclusion লইয়া যে Syllogism-এর উদাহরণ উপরে দেওয়া হইয়াছে, সংস্কৃত অনুমানে উহার প্রতিরূপ হইবে চারিটি premise ও একটি conclusion লইয়া। সংস্কৃতে conclusionটি থাকে পূর্বে এবং পরে চারিটি premise ; কিন্তু ইংরেজীতে conclusion থাকে শেষে ও দুটি premise থাকে পূর্বে। সংস্কৃত অনুমানের পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তেরই নৈয়ায়িকের ভাষায় অভিব্যক্তি দাঁড়াইবে নিম্নরূপ :—

১ এই পর্বতে নিশ্চয়ই অগ্নি আছে। (প্রতিজ্ঞা) The hill is fiery

২ পর্বতে ধূম (ঐ যে) দেখা যাইতেছে। (হেতু) Because it has smoke

১ অনুমান সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার জন্ম দ্রঃ History of Indian Philosophy, Vol. I, S. N. Dasgupta.

২ "পর্বতো বহ্নিমান্" এইরূপ অনুমিতি স্থলে 'পর্বত' পক্ষ এবং 'বহ্নি' সাধ্য।...যে পদে পঞ্চমী বিভক্তি থাকে সেই পদার্থই 'হেতু'। ধূম-পদে পঞ্চমী বিভক্তি থাকায় এখানে ধূম-পদার্থ 'হেতু' (সরল ন্যায়—অমরেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য, পৃঃ ৪০)

৩ পাকঘরে যখন ধূম দেখা যায়, তখন অগ্নিও সেস্থানে থাকে—ইহা ত পরীক্ষিত সত্যই। (উদাহরণ) **Whatever has smoke has fire, e.g. the kitchen.**

৪ এই পর্বতেও ধূম দেখা যাইতেছে। (উপনয়) **The hill has smoke, such as is always accompanied by fire.**

৫ এই পর্বতেও অগ্নি আছে। (নিগমন)[১] **Therefore the hill is fiery.**

সংস্কৃত ভাষায় ইহার প্রতিরূপ :—

অনুমানের উদাহরণ

পর্বতোঽয়ং বহ্নিমান্—প্রতিজ্ঞা

ধূমাৎ—হেতু

[যত্র যত্র ধূমস্তত্র তত্র বহ্নিঃ] যথা মহানসে—দৃষ্টান্ত

পর্বতোঽয়ং ধূমবান্—উপনয়

(অতঃ) পর্বতোঽয়ং বহ্নিমান্—নিগমন

এই পাঁচটি অবয়বের (premises of an inference) যথাযথ প্রয়োগের পর অনুমান যে সত্য, সে বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ইংরেজী syllogism-এর যে উদাহরণ দিয়াছি তাহার major premise-এর যে উক্তি তাহা শেষ পর্যন্ত একটি inductive truth এবং ঐ premise আমাদের সংস্কৃত তিনটি premise-এর কাজ করিতেছে। Premiseটিকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় :—

Where there is smoke, there is fire-এর অর্থ—অনেক দৃষ্টান্ত দেখিয়া এই অনুমানই করা হইয়াছে যে ধূম থাকিলেই অগ্নি থাকে। ইহার ব্যভিচার দেখা যায় নাই। ধূম থাকিলে অগ্নি থাকে, অগ্নি না থাকিলে ধূম থাকিবে না বা থাকে না ইহা প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট। Kitchen বা মহানসের fire অসংখ্য instance under investigation-এর একটি concrete instance মাত্র। আমরা এখানে পাঁচটি inductive method-এর একটি অর্থাৎ joint method প্রয়োগ

[১] দ্রঃ—প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস, পৃঃ, ১২০

করিয়া ইংরেজী inference-এর major premise পাইয়াছি।[১] সংস্কৃত অনুমানের প্রতিজ্ঞা, হেতু ও দৃষ্টান্ত দ্বারা যাহা পাওয়া যাইবে তাহা ইংরেজী Syllogism-এর major premise ছাড়া আর কিছুই নহে এবং তাহা ইংরেজী মতে inductively tested। উপনয় আমাদের ইংরেজী মতের minor premise ব্যতীত আর কিছু নয়। উহা deductive inference-এর অঙ্গ[২]।

অনুমান প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল হইলেও প্রত্যক্ষের ক্ষেত্র অপেক্ষা তাহার কার্যক্ষেত্র ব্যাপকতর। বর্তমান ভিন্ন অন্য স্থলে প্রত্যক্ষের অবস্থিতি সম্ভব নহে, কিন্তু অনুমান 'অতীতানাগতবর্তমান' ত্রিকালেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

একটি উদাহরণ বা যুক্তি নির্দোষ অনুমানপ্রসূত কিনা জানিতে হইলে দেখিতে হইবে হেতু ও সাধ্যের সম্বন্ধে বা ব্যাপ্তিতে এবং স্বীকৃত হেতুতে কোনো দোষ আছে কিনা। ন্যায়শাস্ত্রের মতে হেতু নির্দোষ কিনা বিচার করার উপায় প্রধানত তিনটি:—(ক) সাধ্যের বর্তমান অধিকরণে হেতুর নিশ্চিত অবস্থিতি। (খ) যেস্থলে সাধ্য পূর্বে ছিল সেস্থলেও হেতুর নিশ্চিত অবস্থিতি। (গ) যে অধিকরণে সাধ্যের থাকা অসম্ভব, হেতুরও সে অধিকরণে যেন অনবস্থিতি দেখা যায়। এই তিন প্রকারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইতে পারিলে বুঝিতে হইবে হেতু দোষযুক্ত। এই দোষযুক্ত

---

১ 1 Ram is mortal (প্রতিজ্ঞা)—first proposition asserting something.

2 Because he is a man (হেতু)—the reason for such assertion.

3 All men are mortal, e.g. Socrates, Kant, Hegel (উদাহরণ)—the universal proposition.

4 Ram also is a man (উপনয়)—application of the universal to the particular.

5 Therefore Ram is mortal (নিগমন)—Conclusion

২ "......the Nyaya-Vaisesika, like the rest of the Indian systems, rejects the verbal view of logic which is common in the West. It was never forgotten in India that the subject-matter of logic is thought, and not the linguistic form in which it may find expression".—Hiriyanna—The Essentials etc., p. 101.

হেতুকে ন্যায়শাস্ত্রে বলা হইয়াছে 'হেত্বাভাস'। আপাতত হেতু বলিয়া মনে হইলেও যাহা প্রকৃতপক্ষে হেতু হইবে না—তাহাই হেত্বাভাস (fallacy)। এই হেত্বাভাস আবার অনৈকান্ত বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ ও কালাত্যয়াপদিষ্ট ভেদে ৫ প্রকার।

হেত্বাভাস
Inferential fallacies

৫ প্রকার

সাধ্যের অধিকরণে হেতুর থাকা উচিত। কিন্তু যদি বলি—পর্বতে ধূম আছে যেহেতু অগ্নি দেখিতেছি,[১] তখন বুঝিতে হইবে, অগ্নিরূপ হেতুর দ্বারা পর্বতরূপ পক্ষে বা অধিকরণে ধূমরূপ সাধ্যের অনুমান করিতেছি। এস্থলে হেতুটি দোষযুক্ত। কারণ, ধূম যেস্থলে কখনও থাকে না, তেমন স্থলেও অগ্নিকে দেখা যায়, যেমন তপ্ত লৌহপিণ্ড। এই দোষটির নাম সব্যভিচার বা অনৈকান্ত। হেতুটি সাধ্যের অধিকরণ ছাড়াও বেশী স্থলে আছে, এই কারণে ঐ হেতু ব্যভিচারী বা অনৈকান্ত। ইংরাজীতে ইহাকে বলে fallacy of undistributed middle.

সব্যভিচার

গোত্বরূপ ধর্মের সাধন করিতে গিয়া যদি অশ্বত্বকে হেতুরূপে গ্রহণ করা হয়,[২] তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে গোত্বধর্মের অধিকরণ অর্থাৎ গোরুতে কখনও অশ্বত্ব থাকে না, গোত্ব ও অশ্বত্ব ধর্ম পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ। এই হেত্বাভাসের নাম 'বিরুদ্ধ'। বৈশেষিক মতে ইহাই 'অসৎ' শব্দে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

বিরুদ্ধ

অনুমানের সাহায্যে কাহাকেও কিছু বুঝাইতে গেলে সাধ্যবস্তু, তাহার অধিকরণ এবং হেতু, এই তিনেরই প্রসিদ্ধি থাকা চাই। কল্পিত অলীক বস্তুবিষয়ে কখনও অনুমান হয় না। যদি বলা হয় ছায়া একপ্রকার দ্রব্যই, কারণ তাহাতে কালো রং প্রভৃতি গুণ দেখা যায় (যেহেতু গুণপদার্থ শুধু দ্রব্যেই থাকে) তখন প্রশ্ন উঠিবে, ছায়াতে যে কৃষ্ণবর্ণ আছে বলা হইল

---

১ পর্বতো ধূমবান্ বহ্নিমত্ত্বাৎ;

'অনৈকান্তিকঃ সব্যভিচারঃ' ১।২।৫

২ গোত্ববান্ অশ্বত্বাৎ; সিদ্ধান্তমভ্যুপেত্য তদ্বিরোধী বিরুদ্ধঃ, ১।২।৬

তাহা কি সর্ববাদিসম্মত ? অপর কোনো হেতুর সাহায্যে এই হেতুর দৃঢ়তা সাধন করিতে হইবে—এই হেতুটিও সাধ্যের ন্যায় সাধনীয়। সেকারণে এই হেত্বাভাসের নাম 'অসিদ্ধি' বা 'সাধ্যসম'[১]। অসিদ্ধি পুনরায় আশ্রয়াসিদ্ধি, স্বরূপাসিদ্ধি এবং ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধিভেদে তিন প্রকার।

অসিদ্ধি

'আশ্রয়াসিদ্ধি'র উদাহরণ—স্বর্ণময় পর্বতে অগ্নি আছে, কারণ ধূম দেখা যাইতেছে।[২] কিন্তু স্বর্ণময় পর্বত অপ্রসিদ্ধ, কেননা কেহ কখনও স্বর্ণময় পর্বত দেখেন নাই, শোনেনও নাই। 'স্বরূপাসিদ্ধি'র উদাহরণ—পুষ্করিণী দ্রব্য বিশেষ, কারণ তাহাতে ধূম আছে।[৩] ধূম কখনও পুষ্করিণীতে থাকে না বলিয়া অনুমান নির্দোষ নয়—এজন্যই স্বরূপাসিদ্ধি। পর্বতে অগ্নি আছে কারণ নীলধূম দেখিতেছি[৪]—এইরূপ স্থলে কেবল ধূমকে হেতুরূপে গ্রহণ করিলেই চলে—নীলরূপ অতিরিক্ত বিশেষণ যোজনা করার কোনো সার্থকতা নাই, কারণ নীলধূমরূপ ধূমকে তো জানা হয় নাই এবং সেরূপ ধূমে ব্যাপ্তিও গৃহীত হয় নাই। সেজন্য এই হেতুটির নাম ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি।

যে স্থলে সাধ্য এবং সাধ্যের অভাব উভয়ের সাধক দুইটি হেতু দেখান হয়, অথচ উভয় হেতুর মধ্যে সত্যাসত্য নির্ণয় করার উপায় থাকে না সেই হেত্বাভাসের নাম 'সৎপ্রতিপক্ষ'। যে হেতুর প্রতিপক্ষ বা সমানবলবিরোধী হেতু সৎ বা বিদ্যমান থাকে তাহার নাম 'সৎপ্রতিপক্ষ'। ইহারই অপর নাম 'প্রকরণসম'।[৫]

সৎপ্রতিপক্ষ

যে হেতু অনুমানের কাল ব্যতীত অন্য কালে প্রযুক্ত হয় তাহাকে বলে 'বাধ', 'কালাতীত' বা 'কালাত্যয়াপদিষ্ট'[৬] নামক হেত্বাভাস। যেমন বহ্নির

---

১ সাধ্যাবিশিষ্টঃ সাধ্যত্বাৎ সাধ্যসমঃ, ১।২।৮

২ মণিময়ঃ পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ

৩ হ্রদো দ্রব্যং ধূমবত্ত্বাৎ

৪ পর্বতো (বহ্নিমান্ নীলধূমাৎ)

৫ যস্মাৎ প্রকরণচিন্তা, সা নির্ণয়ার্থমপদিষ্টঃ প্রকরণসমঃ ১।২।৭

৬ কালাত্যয়াপদিষ্টঃ কালাতীতঃ ১।২।৯

উষ্ণতা প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। কোনো হেতুর সাহায্যেই অগ্নির অনুষ্ণতার অনুমিতি সম্ভব নহে। কেহ যদি অনুমান করেন যে উৎপত্তির ক্ষণে ঘটে গন্ধ আছে, যেহেতু ঘট পার্থিব দ্রব্য, তখন আমরা বুঝিব, পার্থিব দ্রব্যত্বরূপ হেতুর সাহায্যে উৎপত্তিক্ষণে ঘটে গন্ধের সাধন করা হইতেছে; কিন্তু আসলে উৎপত্তিক্ষণে ঘটে গন্ধ থাকে না, সেজন্য এই হেতু দোষযুক্ত।

বাধিত

পূর্বে বলা হইয়াছে যে পাঁচটি দোষের কোনো একটি বর্তমান থাকিলেই অনুমান হয় 'অসৎ'। সেই অনুমানের দ্বারা নির্ভুল অনুমিতি হয় না। অনুমানে হেতুই সর্বাপেক্ষা প্রধান, কারণ হেতুর উপরেই প্রায় সব কিছু নির্ভর করে। এই কারণে এই সকল দোষে হেতুকেই 'দুষ্ট' বলা হয়।

উপাধি

হেতু যদি সাধ্যের ব্যাপ্য না হয় তো সেস্থলে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ থাকে না বলিয়া দোষ হয়—এই দোষের সংজ্ঞা 'উপাধি'।[১]

সাদৃশ্যজ্ঞান হইতে কোনো বস্তুর পরিচয়রূপ যে অনুভূতি জন্মে তাহার নাম '**উপমিতি**'। উপমিতির কারণ বা হেতু স্থানীয় যে সাদৃশ্যজ্ঞান তাহাকেই বলে 'উপমান'।[২] পরিচিত কোনো বস্তুর সাহায্যে তাহার সাদৃশ্যবিশিষ্ট অপর কিছুকে জানিতে পারাই উপমান-প্রমাণের ফল বা উপমিতিরূপ প্রমিতি। বৃক্ষ, লতা, পত্র, ওষধি প্রভৃতি অনেক বস্তুরই জ্ঞান উপমান-প্রমাণের সাহায্যে হইয়া থাকে। কোনো কোনো আচার্যের মতে দুই বস্তুর সাদৃশ্য থাকিলে যেমন উপমিতি হয়, বৈসাদৃশ্য থাকিলেও ঠিক সেইরূপই হইয়া থাকে। এই প্রকার উপমিতির নাম 'বৈধর্ম্যোপমিতি'।

উপমান

যে বিষয়ে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও উপমান-প্রমাণের দ্বারা জ্ঞান জন্মে না,

১ অনুমান স্থলে যে পদার্থ সাধ্যধর্মের ব্যাপক ও ব্যাপ্য এবং হেতুপদার্থের অব্যাপক, উদয়নের মতে তাহাই মুখ্য উপাধি। যে পদার্থে সাধ্যধর্মের ব্যাপকত্ব অথবা হেতুপদার্থের অব্যাপকত্ব অথবা উভয়ই সন্দিগ্ধ, তাহার নাম সন্দিগ্ধ উপাধি।

২ তথেত্যুপসংহারাদুপমানসিদ্ধের্নাবিশেষঃ ২।১।৪৮; প্রসিদ্ধসাধর্ম্যাৎ সাধ্যসাধনমুপমানম্, ১।১।৬

সেই বিষয়ে শব্দ-প্রমাণকেই[১] (testimony of a trustworthy person) অবলম্বন করিতে হয়। শব্দতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিকে বলা হয় 'আপ্ত'। ঋষি, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি সকলেই আপ্ত হইতে পারেন। প্রত্যেক শব্দের মধ্যে যে অর্থবোধক শক্তি নিহিত থাকে, নৈয়ায়িকমতে সেই শক্তি 'ঈশ্বরীয় ইচ্ছামাত্র'। দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ ভেদে 'আপ্তবাক্য' দুই প্রকার। ইহলোকে যে আপ্তবাক্যের অর্থ প্রত্যক্ষ দেখা যায় বা অন্য কোনো প্রমাণের সাহায্যে জানা যায় তাহাই 'দৃষ্টার্থ' (perceptible objects)। আর যে আপ্তবাক্যের অর্থ ইহলোকে অন্য কোনো প্রমাণের সাহায্যে জানা যায় না, তাহাই 'অদৃষ্টার্থ' (imperceptible objects)। বেদাদি শাস্ত্ররূপ আপ্তবাক্যই 'অদৃষ্টার্থ' এবং শব্দ-প্রমাণ।

শব্দ ২ প্রকার

কোন্ শব্দের কিরূপ অর্থ ঈশ্বরের অভিপ্রেত তাহা লোকব্যবহার ব্যাকরণ-শাস্ত্র, অভিধান প্রভৃতির সাহায্যে জানিতে হয়[২]। ইহাকে এক হিসাবে অলংকারশাস্ত্রের 'সংকেত' বলা চলে। গো, অশ্ব প্রভৃতি শব্দের জ্ঞান আমরা শিশুকাল হইতেই এই ঈশ্বরেচ্ছা-বলে জানিতে পারি রূপসংকেত। শব্দকে কোন কোন নৈয়ায়িক বৈদিক ও লৌকিক এই দুই প্রকারেও ভাগ করিয়াছেন।

উপরে বর্ণিত ৪টি প্রমাণের অল্প বা বেশী সংখ্যক প্রমাণ নৈয়ায়িকেরা স্বীকার করেন নাই।

বেদের সম্বন্ধে ন্যায়ের অভিমত কি আমাদের জানা প্রয়োজন। ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা এবং নিত্য জ্ঞানের আশ্রয়। জগৎসৃষ্টি করিয়া মানবের হিতার্থে তিনি প্রথমে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন সেই সকল উপদেশবাক্যের সমষ্টিই 'বেদ'। জীবের কল্যাণার্থে এই বেদ প্রচারিত হইয়াছে। ঈশ্বর তত্ত্বদর্শী এবং সর্বজ্ঞ—সেজন্য তিনিও আপ্ত এবং প্রমাণ[৩]। তাঁহার প্রামাণ্য দ্বারাই

বেদ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে ন্যায়

১ আপ্তোপদেশসামর্থ্যাচ্ছব্দাদর্থসম্প্রত্যয়ঃ ২।১।৫২, আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ স দ্বিবিধো দৃষ্টাদৃষ্টার্থত্বাৎ ১।১।৭-৮

২ 'শব্দশক্তিগ্রহঃ' ইত্যাদি

৩ মন্ত্রায়ুর্বেদপ্রামাণ্যবচ্চ তৎপ্রামাণ্যমাপ্তপ্রামাণ্যাৎ, ২।১।৬৮

তৎকর্তৃক উপদিষ্ট বেদেরও প্রামাণ্য। পরমেশ্বর কোনো প্রমাজ্ঞানের করণরূপে প্রত্যক্ষ প্রভৃতির মতো প্রমাণ নহেন, কিন্তু প্রমাতৃহিসাবে তিনিও প্রমাণ, কারণ সর্ববিষয়ে যথার্থ জ্ঞানবত্তাই তাঁহার প্রামাণ্য।

প্রমেয় ১২টি পদার্থের সমষ্টি

প্রমাণের পরেই আসে 'প্রমেয়'। প্রমাণের দ্বারা প্রমেয় পদার্থকেই জানিতে হয়। প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞেয় বস্তুই প্রমেয়। প্রমাণ-সিদ্ধ সকল বস্তুই আসলে প্রমেয়, কিন্তু ন্যায়দর্শনে আত্মা প্রভৃতি বারটি পদার্থকে প্রমেয় সংজ্ঞায় প্রকাশিত করা হইয়াছে। এই বারটি পদার্থের সম্বন্ধে মিথ্যাজ্ঞানই জীবের জন্মান্তরলাভের হেতু, কারণ এই পদার্থগুলির তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে মিথ্যাজ্ঞান তিরোহিত হয়। আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ এই বারটি 'প্রমেয়'[১] নামে বিখ্যাত।

আত্মা

'আত্মা'র অর্থ ন্যায়দর্শনে জীবাত্মা। আত্মা নিত্য, তাঁহার জন্মমৃত্যু নাই; প্রত্যেক শরীরে আছে ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মার সংযোগ, সেজন্য জীব অসংখ্য। 'আমি জানি', 'আমি করি'—এই আমি রূপে যাহার জ্ঞান হয় তিনিই আত্মা। 'আমি আছি'—এই প্রকার অনুভব সকল প্রাণীরই থাকে। ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞানের দ্বারা পরদেহস্থ আত্মার অনুমানও করা যায়।[২] পরদেহস্থ আত্মার সত্তা সম্পূর্ণভাবে অনুমানের উপরই নির্ভরশীল। দূর হইতে রথকে আসিতে দেখিলে বুঝা যায় যে নিশ্চয়ই তাহার সারথি (বা চালক) কেহ আছে,[৩] নতুবা অচেতন রথের চলা সম্ভবপর হইত না। আত্মা ও ইন্দ্রিয় এক নহে। শরীরও আত্মা নয়,[৪] কারণ মৃত শরীরে আত্মা থাকে না। যদি শরীরই সুকৃতদুষ্কৃত কর্মের কর্তা হয়, তবে শরীরের মৃত্যুর পরে কে পূর্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করিবে? অথচ প্রত্যেক প্রাণীই তো আপন আপন কর্মফল ভোগ

১ আত্মশরীরেন্দ্রিয়ার্থবুদ্ধিমনঃপ্রবৃত্তিদোষ প্রেত্যভাবফলদুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ম্, ১।১।৯

২ ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নসুখদুঃখজ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গম্, ১।১।১০; প্রেত্যাহারাভ্যাসকৃতাৎ স্তন্যাভিলাষবৎ, ৩।১।২১

৩ 'রথগত্যেব সারথিঃ'

৪ 'শরীরস্য ন চৈতন্যম্' ইত্যাদি

করিয়া থাকে। সেই জন্যই শরীর ভিন্ন অন্য কোনো পদার্থ হইতেছে এই আত্মা। মনও আত্মা নয়,[১] কারণ মনের সংযোগ হইলেই আত্মাতে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান উপস্থিত হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত। আত্মা জ্ঞাতা আর মন জ্ঞানের সাধন, আবার মন অণুপরিমাণযুক্ত। সুখদুঃখাদি মনে থাকে না, কারণ ইহারা মনের ধর্ম হইলে প্রত্যক্ষ হইত না। কারণ অণুপরিমাণবিশিষ্ট বস্তুতে যাহা থাকে, তাহা প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় না। সেজন্য মন এবং আত্মা পৃথক্ পদার্থ।

শরীর

আত্মার প্রযত্ন হইতে যে ক্রিয়া বা চেষ্টা জন্মে, সেই চেষ্টার আশ্রয়ই 'শরীর'।[২] শরীরের নাশে ইন্দ্রিয়ের নাশ অবশ্যম্ভাবী, কেননা ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় শরীরকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। শরীর সুখদুঃখভোগের আয়তন মাত্র। মর্ত্যলোকের সকল শরীরই পার্থিব, কারণ আমাদের পাঞ্চভৌতিক শরীরে পৃথিবীর অংশই বেশী।

ইন্দ্রিয়

ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষু, ত্বক্ ও শ্রোত্র—এই ৫টি বহিরিন্দ্রিয় আর মন অন্তরিন্দ্রিয়। প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞানের করণই ইন্দ্রিয়।[৩] ঘ্রাণ পৃথিবী হইতে উৎপন্ন ; রসনা জল হইতে, চক্ষু তেজ হইতে এবং ত্বক্ বায়ু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। শ্রোত্র আকাশস্বরূপ, সেজন্য নিত্য। মন আমরণস্থায়ী এবং নির্বিকার—জীবের শরীরেই মন থাকে। ইন্দ্রিয়কে চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না বা অন্য কোনও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হয় না। ইন্দ্রিয় বলিয়া যেগুলিকে মনে করি সেগুলি ইন্দ্রিয়ের 'আশ্রয়'-মাত্র। আশ্রয়ই যদি ইন্দ্রিয় হইত, তবে তাহার অপেক্ষা বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইতে পারিত না। অতএব ইন্দ্রিয় আশ্রয় হইতে পৃথক্ বস্তু এবং আমাদের প্রত্যক্ষের মধ্যে নহে।

১ জ্ঞাতুর্জ্ঞানসাধনোপপত্তেঃ সংজ্ঞাভেদমাত্রম্. ৩।১।১৬

২ চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরম্. ১।১।১১

৩ ঘ্রাণরসনচক্ষুস্ত্বক্শ্রোত্রাণীন্দ্রিয়াণি ভূতেভ্যঃ, ১।১।১২

ইন্দ্রিয় যাহা গ্রহণ করে তাহার নাম 'অর্থ'।[১] ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অর্থ 'গন্ধ'। রসনেন্দ্রিয়ের অর্থ 'রস'। ক্ষিতি, অপ্, তেজ প্রভৃতি বস্তুও ইন্দ্রিয়ের অর্থ বটে, কিন্তু ঐগুলির যথার্থ জ্ঞান মুক্তির কারণ নয় বলিয়া কোনো কোনো আচার্যের মতে উহারা অর্থই নহে। পৃথিবীতে থাকে গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শ, জলে থাকে রস; রূপ ও স্পর্শ; তেজে থাকে রূপ ও স্পর্শ; বায়ুতে থাকে স্পর্শ ও আকাশে থাকে শব্দ। যে জাতীয় বস্তুতে যে বিশেষ গুণের উৎকর্ষ থাকে, সেই বস্তুতে অন্যান্য গুণ থাকিলেও বিশিষ্ট গুণযুক্ত ইন্দ্রিয়েব দ্বারাই তাহার প্রত্যক্ষ হয়, যেমন, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গন্ধেরই প্রত্যক্ষ হয়।

অর্থ

জীবের প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানের নামই 'বুদ্ধি'।[২] দৃশ্য, শ্রব্য প্রভৃতি বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ঘটিলে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, পরে নষ্ট হইয়া যায়। বুদ্ধির আশ্রয় জীব, মন বুদ্ধির আশ্রয় নয়। অনুভূতি ও স্মৃতিভেদে 'বুদ্ধি' দুইপ্রকার। জ্ঞেয় বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগ হইলে প্রথম যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহার নাম 'অনুভূতি'। আর অনুভূত বিষয়ে পরে অনুভব হইতে যে জ্ঞান জন্মে তাহার নাম 'স্মৃতি'। যে বিষয়ে স্মৃতি হয়, সেই বস্তু সম্মুখে থাকার আবশ্যক নাই।

বুদ্ধি

যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জীব সুখ দুঃখ জ্ঞান প্রভৃতির প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, তাহার নাম 'মন'।[৩] ঘ্রাণ, শ্রবণ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয় আপন আপন বিষয়মাত্র গ্রহণ করিতে পারে। ইন্দ্রিয়গণ নির্দিষ্ট বিষয়ে সীমাবদ্ধ, কারণ তাহারা ভৌতিক। মন কিন্তু ভৌতিক নয়, এজন্য বহিরিন্দ্রিয়ের ন্যায় তাহার প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তু সীমাবদ্ধ নহে। কোনো ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মনের প্রত্যক্ষ না হইলেও অনুমান প্রমাণের সাহায্যে মনের অস্তিত্ব স্থির করা যায়।

মন

১ গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দাঃ পৃথিব্যাদিগুণাস্তদর্থাঃ, ১।১।১৪

২ বুদ্ধিরুপলব্ধিজ্ঞানমিত্যনর্থান্তরম্, ১।১।১৫

৩ যুগপজ্ জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গম্, ১।১।১৬

একাধিক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা একই কালে বিভিন্ন জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। অনেক সময় আমরা মনে করি যে, দেখাশোনা, গন্ধ, গ্রহণ প্রভৃতি অনেকগুলি জ্ঞান যেন একই সময়ে সম্পন্ন হইল, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে একই সময়ে হয় নাই, ক্রমিকত্ব আছে।[১] মনের গতি অতিশয় দ্রুত, এই কারণে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার ক্রমিক যোগ মন লক্ষ্য করিতে পারে না—এটি আমাদেরই ভ্রমের জন্য হয়।

সর্বব্যাপক সকল দ্রব্যই স্থির, গতিশীল নহে, যেমন আকাশ। কারণ, মন গতিশীল চঞ্চল[২]—এইজন্য মন সর্বব্যাপী নহে, উহা অণুপরিমাণ বা অতি সূক্ষ্ম। অন্তঃকরণ, চিত্ত, হৃদয় প্রভৃতি মনেরই পর্যায়শব্দ। মন বিভিন্ন বিষয়ের সহিত সম্বন্ধবশত নানা আকারে প্রতিভাত হয়। বাস্তবিক পক্ষে প্রত্যেক প্রাণীরই একটি করিয়া 'মন' আছে।

প্রবৃত্তি

শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা যে চেষ্টা বা প্রযত্ন করা হয় তাহার নাম 'প্রবৃত্তি'।[৩] মানবের শুভ এবং অশুভ কর্মই প্রবৃত্তি। শারীরিক, মানসিক ও বাচিক ভেদে প্রবৃত্তি তিন প্রকার। পুণ্য ও পাপের জনক শুভ এবং অশুভ কর্মই 'প্রবৃত্তি'। শুভাশুভ কর্ম হইতে উৎপন্ন পুণ্য এবং পাপকেও প্রবৃত্তি শব্দেই প্রকাশ করা হইয়াছে; কিন্তু এই অর্থে প্রবৃত্তি শব্দের প্রয়োগ গৌণ।

দোষ

যাহা হইতে আমাদের কাজ করিবার প্রবৃত্তি জন্মে, যাহার প্রেরণায় ভালো বা মন্দ কর্মের অনুষ্ঠান করি, তাহার নাম 'দোষ'।[৪] রাগ, দ্বেষ ও মোহ ভেদে দোষ তিন প্রকার। দোষই প্রবৃত্তির কারণ। মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হইলেই বুঝিতে হইবে তাহার প্রবৃত্তির মূলে রাগ

১ যৌগপদ্যাভাবাৎ

২ গীতা, ৬।৩৪

৩ প্রবৃত্তির্বাগ্‌বুদ্ধিশরীরারম্ভঃ ১।১।১৭

৪ প্রবর্তনালক্ষণাদোষাঃ, ১।১।১৮

বা দ্বেষ বর্তমান। যাঁহার অনুরাগ ও দ্বেষ নাই, তিনি উদাসীন পুরুষ।[১] রাগ এবং দ্বেষের মূলে থাকে মোহের (infatuation) অনুপ্রেরণা। আত্মাই রাগ, দ্বেষ ও মোহের আশ্রয়। নিজের আত্মাতে রাগ প্রভৃতির মানস প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, কিন্তু অপরের প্রবৃত্তি দেখিয়া তাহার আত্মাতেও রাগাদি আছে, এই অনুমান করা যায়।

'প্রেত্যভাব' নবম পদার্থ।[২] প্রেত্যভাব শব্দের অর্থ মৃত্যুর পরে পুনর্জন্ম। 'প্রেত্য' শব্দের অর্থ মরণের পরে, আর 'ভাব' শব্দের অর্থ উৎপত্তি। জীবাত্মার সহিত দেহের বিশিষ্ট সম্বন্ধ-বিচ্ছেদকেই মরণ বলে, পুনরায় নূতন দেহের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধের নামই জন্ম। জীবাত্মা নিত্য বলিয়া তাহার উৎপত্তিবিনাশ নাই, তবে বিশেষ সম্বন্ধে শরীর-সংযোগ ও শরীর-সংযোগের ধ্বংসই তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ। জীবের এই জন্মমরণ-প্রবাহ অনাদি, কেবল মোক্ষেই ইহার শেষ হয়।

৫ প্রেত্যভাব

আমরা যে কোনো কর্মই করি না কেন, তাহার শেষ ফল সুখ অথবা দুঃখ; এই সুখদুঃখের অনুভবই 'ফল'।[৩] কাজের মুখ্য ফল সুখদুঃখের অনুভব, আর শরীর ইন্দ্রিয় প্রভৃতি গৌণ ফল। ধর্ম হইতে সুখ এবং অধর্ম হইতে দুঃখের উৎপত্তি হয়। সাধু কর্মে হয় পুণ্য, আর অসাধু কর্মে জন্মে পাপ। পুণ্যের ফলে হয় সুখানুভূতি, আর পাপের ফল দুঃখানুভূতি।

ফল

'দুঃখ'[৪] সকল প্রাণীরই বিশেষ পরিচিত এবং অপ্রিয় ও অনভিলষিত। পীড়া, তাপ প্রভৃতি শব্দ দুঃখবোধক। দুঃখের জ্ঞান গৌণভাবে মুক্তিরও অনুকূল। শরীর, ইন্দ্রিয়াদি পদার্থ এবং সুখও গৌণভাবে দুঃখেরই অন্তর্গত। সাংসারিক সুখ প্রকৃত

দুঃখ

১ 'রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি'।

২ পুনরুৎপত্তিঃ প্রেত্যভাবঃ, ১।১।১৯

৩ প্রবৃত্তিদোষজনিতোঽর্থঃ ফলম্, ১।১।২০

৪ বাধনালক্ষণং দুঃখম্ ১।১।২১

সুখ নয় বলিয়া ভবিষ্যৎ দুঃখেরই কারণ। সংসারের সকল বস্তুই দুঃখ, সেজন্য প্রমেয়বর্গের মধ্যে সুখকে ধরা হয় নাই। সুখ দুঃখেরই অবস্থান্তর মাত্র। ভারতীয় দর্শন সুখ কামনা করে নাই, চাহিয়াছে দুঃখেরই আত্যন্তিক নিবৃত্তি

বাসনা

আমার যেন দুঃখ না থাকে, আমি যেন সুখী হইয়া বাঁচিতে পারি— এই 'বাসনা' মানবের চিরন্তনী। যাহা প্রতিকূলভাবে অর্থাৎ স্বভাবতই অপ্রিয়রূপে আমাদের অনুভবকে স্পর্শ করে তাহাই দুঃখ। শরীর দুঃখের ভোগায়তন। যে অধিকরণে অধিষ্ঠিত থাকিয়া জীব দুঃখ-ভোগ করে, তাহাই ভোগায়তন। সুতরাং শরীরধারণ বা জন্মগ্রহণই সকল দুঃখের মূল, বুঝা গেল। ন্যায়াচার্যগণের মতে জীবের আছে জন্ম এবং মরণ, অথচ জীবসমূহ নিত্য। ন্যায়মতে শরীরের সহিত জীবাত্মার বিজাতীয় একপ্রকার সংযোগের নাম 'জন্ম' এবং সেই সংযোগের ধ্বংসের নাম 'মরণ'। জীবাত্মার তাহাতে কোনো অবস্থান্তর ঘটে না, কারণ জীব নিত্য এবং অপরিণামী। পাপপুণ্যের ফলভোগের নিমিত্ত শরীরের সহিত জীবাত্মার বিশেষ একটি সম্বন্ধ ঘটে, যাহাকে বলে জন্ম। শরীরকে এজন্যই বলা হয় 'সুখদুঃখ-ভোগের আয়তন', কারণ শরীর না থাকিলে সুখ-দুঃখ ভোগ করা চলে না।

দোষ
মিথ্যাজ্ঞান জনিত
আসক্তিতে কোন
আসক্তি ও দ্বেষ

শুভাশুভ প্রবৃত্তির মূল কারণ আসক্তি এবং দ্বেষ। দার্শনিক ভাষায় এই উভয়ই দোষ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছে।[১] আসক্তি (attachment) এবং দ্বেষের (hatred) মূলে আছে মিথ্যাজ্ঞান। যিনি আসক্তিদ্বেষশূন্য[২] তিনি বৈষয়িক কাজে প্রবৃত্ত হন না, অথবা দ্বেষবশত কাহারও অনিষ্ট সাধন করিতে চান না। যিনি ধ্যানধারণা প্রভৃতি যোগসাধনা দ্বারা অথবা গুরুর উপদেশ শ্রবণে মিথ্যাজ্ঞান হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন, তিনি কোনো বিষয়ের প্রতি আসক্ত হন না,

---

১ প্রবর্তনালক্ষণা দোষাঃ ১।১।১৮; তৎ ত্রৈরাশ্যং, রাগদ্বেষমোহার্থান্তরভাবাৎ ৪।১।৩

২ 'নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (গীতা)

অথচ অনভিপ্রেত কোনো বিষয়ে তাঁহার বিদ্বেষও থাকে না। এজন্য মিথ্যাজ্ঞানকে দোষের মূলীভূত কারণ বলা হইয়াছে। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতিতে আমিত্ব-বুদ্ধিরূপ মিথ্যাজ্ঞানের ফলেই আমরা আসক্তি ও দ্বেষের অধীন হইয়া থাকি।

যদিও সংসারে দুঃখের সংগে সুখকেও ভোগ করা হয়, তবুও সাংসারিক সুখ অত্যন্ত দুঃখমিশ্রিত বলিয়া আচার্যেরা তাহাকেও দুঃখের মধ্যেই ধরিয়াছেন।[১] সংসারে যে সুখ আছে, দার্শনিকদের ভাষায় তাহা কুপিত সর্পের ফণামণ্ডলের ছায়ার ন্যায়। সেই ছায়ার শীতলতা উপভোগ করিতে গেলে সর্পদংশনদুঃখ অপরিহার্য। যে দুঃখের হাত হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত জীব এত ব্যাকুল, তাহার মূলে রহিয়াছে মিথ্যাজ্ঞান। চিরদিনের জন্য যিনি দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চান, মিথ্যাজ্ঞানকে সমূলে উৎপাটিত করাই তাহার পক্ষে একমাত্র উপায়। সত্যজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয় এই মিথ্যাজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান হইতে আসে যে সংস্কার সেই সংস্কার মিথ্যাজ্ঞানের সংস্কারকে বিনাশ করে। মিথ্যাজ্ঞানের সংস্কার নাশের ফলে মিথ্যাজ্ঞানের অভাব হইবে, তাহার ফলে দোষের অভাব জন্মিবে এবং তাহার ফলে প্রবৃত্তির অভাব। প্রবৃত্তির অভাবে জন্মরূপ কারণের অভাব হইবে, তাহার ফলে দুঃখের অভাব আসিবে। ফলে দুঃখের আত্যন্তিক অবসান ঘটিবে। এই প্রকারে চিরকালের জন্য দুঃখের একান্ত নিবৃত্তির নামই 'অপবর্গ', 'মুক্তি' বা 'নির্বাণ'[২]।

দুঃখের মূল মিথ্যাজ্ঞান; তত্ত্বজ্ঞানলাভের পরই মুক্তি আসে; ফলে অপবর্গ, মুক্তি বা নির্বাণ লাভ হয়

বস্তুর প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানকে নাশ করে। ন্যায়শাস্ত্রের অনুশীলনে এই তত্ত্বজ্ঞানের উদয় সম্ভব হয়। শ্রুতি অনুসারে আত্মার শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন

তত্ত্বজ্ঞান

১ বাধনালক্ষণং দুঃখম্ ১।১।২১; বাধনাঽনিবৃত্তের্বেদয়তঃ পর্যেষণ-দোষাদপ্রতিষেধঃ। দুঃখবিকল্পে সুখাভিমানাচ্চ ৪।১।৫৬-৫৭

২ দোষনিমিত্তানাং তত্ত্বজ্ঞানাদহঙ্কারনিবৃত্তিঃ ৪।২।১; দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ।

করা উচিত। ন্যায়ের আলোচনার দ্বারা মনন সম্পন্ন হয়। মোক্ষলাভেচ্ছু ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান লাভের পথে এই মনন সহায়ক হয়।

হেয়পদার্থ

আত্মা, শরীর প্রভৃতি বারটি পদার্থ গোতমের মতানুসারে প্রমেয়বর্গের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের মধ্যে শরীর প্রভৃতি দশটি হয় দোষের কারণ, যে দোষের সম্বন্ধে পূর্বে বলা হইয়াছে। এইগুলি দুঃখের হেতু বলিয়া 'হেয়' নামে আখ্যাত হইয়াছে। এই প্রমেয়গুলির যথার্থ স্বরূপ জানিলেই জীব 'মুক্ত' হয়। ইহাদের তত্ত্বজ্ঞান মুক্তির সাক্ষাৎকারণ। মুক্তিতে অধিকারী—ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী সকলেই—নৈয়ায়িকগণের ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি যে কোনো আশ্রমেই থাকুন না কেন,

মুক্তিলাভে সকল আশ্রমবাসীই সমর্থ।

মুক্তিলাভে সমর্থ। সুষুপ্তি এবং প্রলয়ের সহিত মুক্তির অভেদ কল্পনা কেন করা যায় না, তাহার কারণও দেখানো হইয়াছে।

আত্মা

আত্মার স্বাভাবিক চেতনা নাই, আত্মার সহিত মনের সংযোগ ঘটিলে তাহাতে চেতনার আবির্ভাব হয়, এজন্য অচেতন আত্মাকেও বলা হয় 'চেতন'। মুক্ত পুরুষে চেতনার উৎপত্তি হয় না। মুক্তি হইলে জীবের সুখদুঃখের অনুভব থাকে না, সে বিষয়ে আচার্যগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। গৌতমের মতে, দুঃখের আত্যন্তিক বিচ্ছেদই 'অপবর্গ'।[১] বাৎস্যায়নের মতে মুক্তিতে সুখানুভূতি

অপবর্গ

হয় না। তাঁহার মতে অপবর্গ পরমশান্তির হেতু, অপবর্গে সকল কার্যের নিবৃত্তি হয়, লেশমাত্র দুঃখেরও অনুভব থাকে না। সেজন্য বুদ্ধিমান্ পুরুষ মোক্ষপ্রাপ্তির অনুকূল অনুষ্ঠান করেন।[২]

সাংসারিক সুখে সত্যকার সুখ নাই, আছে প্রতিপদেই দুঃখের আশংকা—এই ধারণার বশবর্তী যাঁহারা, মুক্তি তাঁহাদের করায়ত্ত। শরীর ভোগায়তন;

১ তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ, ১।১।২২

২ পাণিনির সূত্র 'তথাযুক্তং চানীপ্সিতম্' স্বাভাবিক অবস্থার লোকের জন্য নহে।

অপবর্গে যদি নিত্যসুখের সংস্পর্শও হয়, তাহা হইলে মোক্ষলাভ হইবে না, কারণ সেই নিত্যসুখ-ভোগের জন্যও শরীর-ধারণ অবশ্যম্ভাবী। শরীরের নিত্যতা কল্পনা অসম্ভব, কারণ শরীর মাত্রই বিনাশশীল; আর সেজন্যই সুখের নিত্যতাকল্পনাও অসম্ভব। শ্রুতিগত বাক্যে 'আনন্দ' 'রস' প্রভৃতি শব্দের অর্থ নিত্যসুখ নহে, দুঃখের আত্যন্তিক অভাব। দুঃখের নিবৃত্তিকেই সোজা করিয়া বলা হয় 'সুখ'। এ ছাড়া, নিত্যসুখের কামনাও একপ্রকার কামনা, আব সকল কামনাই মুক্তির প্রতিকূল। মুক্তপুরুষের সুখ বা দুঃখ কিছুই থাকে না, সে হয় নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বস্থ। নৈয়ায়িকমতে উৎপত্তিশীল যাবতীয় ভাববস্তুই বিনশ্বর, সেজন্য নিত্যসুখ নামে কোনো পদার্থই নাই।

দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি

মুক্তিতে জীবাত্মার পাষাণ প্রভৃতির ন্যায় জড়ত্ব ঘটে—উদয়নাচার্য ও জয়ন্তভট্ট বাৎস্যায়নের এই মত সমর্থন করেন, কারণ দুঃখের নিবৃত্তিই মুক্তি।[১]

মুক্তি

মুক্তিতেও সুখের অনুভূতি হয় বলিয়া কোন কোন আচার্য বলিয়াছেন। আচার্য শংকরের মতে, 'জীবের গুণসম্বন্ধ নাশ হইলে আকাশের ন্যায় অবস্থিতিই বৈশেষিক-সম্মত মুক্তি, আর ন্যায়দর্শনের অভিপ্রেত মুক্তিতে জীবের আনন্দানুভূতিও থাকে।' তার্কিকশিরোমণি রঘুনাথও সুখানুভূতি-পক্ষকেই সমর্থন করিয়াছেন। উদয়নের মতে জীব সর্বদাই নিত্যসুখবিশিষ্ট। তত্ত্বজ্ঞান নিত্যসুখানুভবের হেতু, আর মিথ্যাজ্ঞান তাহার প্রতিবন্ধক মাত্র। রঘুনাথ বলিয়াছেন,[২] 'যিনি সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া অথবা নিখিল জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া বর্তমান আছেন, অখণ্ডানন্দজ্ঞানময় সেই পূর্ণ, পরমাত্মাকে নমস্কার।'

মুক্তিতে সুখানুভূতি হয় কি ?

১। গোতমকে লক্ষ্য করিয়া এজন্যই নৈষধে বলা হইয়াছে :—
মুক্তয়ে যঃ শিলাত্বায় শাস্ত্রমূচে সচেতসাম্।
গোতমং তমবেত্যৈব যথা বিত্থ তথৈব সঃ॥ ১৭।৭৫

২। ওঁ নমঃ সর্বভূতানিবিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠতে।
অখণ্ডানন্দবোধায় পূর্ণায় পরমাত্মনে॥'—চিন্তামণিদীধিতির প্রারম্ভিক শ্লোক

যুক্তি অনুযায়ী ন্যায়ে বিচার যাহাই থাকুক না কেন, দুঃখবিমুক্ত জীবকে যে মুক্ত বলা হয়, এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নাই। দুঃখের এই প্রকারের আত্যন্তিক বিচ্ছেদই জীবের পরমপুরুষার্থ বা মুক্তি[১]। কিন্তু এই মুক্তি কি তত্ত্বজ্ঞানলাভের ঠিক পরেই হয়, না কিছু দেরীতে হয়? ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, তত্ত্বজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানের নাশক হইলেও তত্ত্বজ্ঞান লাভের পরক্ষণেই মুক্তি হয় না,—নাশ্য-নাশকের ক্রমিকতা থাকে। মুক্তি দুই প্রকার—'পরা' ও 'অপরা'। 'অপরামুক্তি' ঠিক তত্ত্বজ্ঞানের পরই হয়—উহাকে চলিত ভাষায় বলে 'জীবন্মুক্তি'। জীবন্মুক্ত পুরুষ প্রারব্ধ কার্যের ফলভোগের জন্য যতদিন শরীর ধারণ করে, ততদিন তাহার নির্বাণ হয় না। প্রারব্ধ কার্যের ফলভোগ শেষ হইলেই দেহ নষ্ট হইয়া যায়। তখন আসে 'পরামুক্তি' বা 'নির্বাণ'। ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত কিন্তু জীবের মুক্তি অসম্ভব। কেননা, তিনিই কর্মফলদাতা।

জীবন্মুক্তি

প্রমাণ ও প্রমেয় ছাড়া সংশয় প্রভৃতি যে ১৪টি পদার্থের ন্যায়শাস্ত্রে বর্ণনা আছে, অন্য কোনো শাস্ত্রে তাহা দেখা যায় না—ন্যায় বা আন্বীক্ষিকীর ইহাই বৈশিষ্ট্য। একই বস্তুতে নানা বিরুদ্ধ ধর্মের জ্ঞানের নামই 'সংশয়'[২]। যে বিষয়ে জ্ঞান অল্প, বস্তুটির স্বরূপ ভালো জানা নাই বা সে বিষয়ে সংশয় (সন্দেহ) আছে সে বিষয়টির তত্ত্ব জানিবার জন্যই প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পঞ্চাবয়বসমন্বিত বাক্যের প্রয়োজন হয়। সংশয় পাঁচ প্রকারে জন্মে[৩]:—(ক) উভয় বস্তুর সাধারণ বিশেষণ বা ধর্মের জ্ঞান হইতে এবং (খ) একই বস্তুর অসাধারণ বিশেষণের জ্ঞান হইতে। (গ) একই বিষয়ে এক সময়ে পরস্পর-বিরুদ্ধ কথা শুনিলেও সংশয় জাগ্রত হয়। এই প্রকার পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্মের জ্ঞান হইতে সংশয় উদ্ভূত হয়। (ঘ) যে বস্তুর বিষয়েই জ্ঞান হউক না কেন, বস্তুটি সত্য কি মিথ্যা,

প্রমাণ, প্রমেয় ভিন্ন ১৪টি পদার্থ

সংশয় (doubt) ৫ প্রকার

১। তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ, ১।১।২২

২। সমানানেকধর্মোপপত্তেরুপলব্ধ্যনুপ... ব্যবস্থাতশ্চ বিশেষাপেক্ষো বিমর্শঃ সংশয়ঃ, ১।১।২৩

৩। সমানানেকধর্মোপপত্তের্বিপ্রতিপত্তেঃ ইতি পঞ্চ সংশয়াঃ।

এই সংশয় সকল বিষয়েরই হওয়া স্বাভাবিক। (ঙ) যে সকল বস্তু আদৌ নাই, অথবা যে সকল বস্তুর সম্বন্ধে উপলব্ধি হইতেছে না, সে বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের উদ্ভব হয়।[১]

আমরা যে কোনো কাজ করি না কেন, তাহার একটা না একটা উদ্দেশ্য থাকেই—এই 'উদ্দেশ্য' বা লক্ষ্যই 'প্রয়োজন'[২]। প্রাপ্য বস্তুর ন্যায় ত্যাজ্য বস্তুতেও হয় জীবের প্রবৃত্তি, সেই প্রবৃত্তি পরিত্যাগের প্রবৃত্তি। যে পদার্থের প্রাপ্তি বা পরিত্যাগ বিষয়ে জীব প্রবৃত্ত হয়, সেই পদার্থের নাম 'প্রয়োজন'। মুখ্য ও গৌণভেদে এই প্রয়োজন দ্বিবিধ। সুখ ও দুঃখ নিবৃত্তিই আমাদের 'মুখ্য প্রয়োজন', আর এই দুইটি প্রয়োজনের যত কিছু উপায় বা পন্থা—সবই 'গৌণ প্রয়োজন'।

প্রয়োজন (An end-in-view)—২ প্রকার

যে বস্তুকে পণ্ডিত অপণ্ডিত সকলেই বুঝিতে পারে, তাহাকে বলা হয় 'দৃষ্টান্ত'[৩]। পঞ্চাবয়ব ন্যায়-প্রয়োগে উদাহরণ-বাক্য দেখাইতে হয়, দৃষ্টান্ত পদার্থের জ্ঞান না হইলে উহা দেখানো যায় না, এজন্য দৃষ্টান্তকেও পদার্থরূপেই গ্রহণ করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তের সাহায্যে অনেক কিছু বুঝা যায়, অন্যকেও বুঝানো যায়—দৃষ্টান্ত ভিন্ন কেবল যুক্তিতর্কের সাহায্যে বিষয়বস্তু পরিষ্কার করিয়া বুঝানো কঠিন। যে বস্তুর সম্বন্ধে বাদী ও প্রতিবাদীর মতদ্বৈধ থাকে, তেমন বস্তুকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যায় না। 'সাধর্ম্য' ও 'বৈধর্ম্য' ভেদে দৃষ্টান্ত দুই প্রকার। যদি বলা হয় এস্থলে অগ্নি আছে, কারণ এস্থলে ধূম আছে, যেমন পাকঘর—সে স্থলে অর্থ এই যে পাকঘরকে দৃষ্টান্ত হিসাবে স্থাপিত করা হইতেছে। ইহা 'সাধর্ম্য

দৃষ্টান্ত (Example)—দুই প্রকার

১। উপরের সংশয়স্থলগুলির যথাক্রমে উদাহরণ:—(ক) ডালপালাহীন গাছের কাণ্ড দেখিয়া—ইহা কি মানুষ, না গাছের কাণ্ড? (খ) শব্দ নিত্য, না অনিত্য? (গ) জগৎ সত্য না মিথ্যা? (ঘ) ইহা কি (মরুভূমির পথিকের পক্ষে) জলাশয় না মরীচিকা? (ঙ) আকাশ-কুসুম, শশকের শিং ইত্যাদি।

২। যমর্থমধিকৃত্য প্রবর্ততে তৎ প্রয়োজনম্. ১।১।২৪

৩। লৌকিকপরীক্ষকাণাং যস্মিন্নর্থে বুদ্ধিসাম্যং স দৃষ্টান্তঃ. ১।১।২৫

দৃষ্টান্ত'। যাহা আত্মাযুক্ত নহে, তাহা প্রাণযুক্ত নহে, যেমন ঘট—ইহা 'বৈধর্ম্য দৃষ্টান্তে'র উদাহরণ।

সিদ্ধান্ত
(A doctrine)
—৪ প্রকার
(ক) সর্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত
(খ) প্রতিতন্ত্র সিদ্ধান্ত
(গ) অধিকরণ সিদ্ধান্ত
(গ) অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত

কোন বিচার্য বিষয়ে ভুল ধারণা বা সংশয় থাকিলে শাস্ত্রের সাহায্যে যথার্থ ধারণায় পৌছনো যায়, এইজন্য শাস্ত্রের যথাযথ অর্থের নাম 'সিদ্ধান্ত'[১]। সর্বতন্ত্র, প্রতিতন্ত্র, অধিকরণ ও অভ্যুপগম ভেদে সিদ্ধান্ত চার প্রকার। সকল শাস্ত্রসম্মত যে সিদ্ধান্ত নিজের শাস্ত্রে গৃহীত হয়, তাহার নাম 'সর্বতন্ত্র-সিদ্ধান্ত'। যেমন, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা বিষয়ের জ্ঞান হয়। যে সিদ্ধান্ত নিজের শাস্ত্রে গ্রহণ করা হইয়াছে, কিন্তু অন্যের শাস্ত্রে অনাদৃত, তাহার নাম 'প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত'। যেমন—শব্দ যে নিত্য তাহা মীমাংসকদের সিদ্ধান্ত। ন্যায় বৈশেষিকের মতে কিন্তু শব্দ অনিত্য। যে সিদ্ধান্ত সমানতন্ত্রসিদ্ধ, পরতন্ত্রসিদ্ধ নহে, তাহাকে প্রতিতন্ত্র-সিদ্ধান্ত বলা হয়[২]। যে সিদ্ধান্ত একবার স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রসংগ-ক্রমে অন্য বিষয়ও স্থির হইয়া যায়, তাহাকে বলে 'অধিকরণ-সিদ্ধান্ত'। যেমন, আমরা জানি, যিনি কোনোও বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, তিনি সেই বস্তুসৃষ্টির উপযোগী উপাদান প্রভৃতি সম্বন্ধেও যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন। মৃত্তিকার বিষয়ে কুম্ভকারের যে কোনো জ্ঞান নাই, ইহা তো বলা চলে না। প্রতিবাদীর উক্তি সংগতই হোক আর অসংগতই হোক, সে বিষয়ে বিচার না করিয়া তাহা স্বীকার করিয়াই প্রতিবাদীর সহিত বিচার করার নাম 'অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত'। 'তোমার মত আমার অনভিমত হইলেও মানিয়া লইলাম, তবুও তুমি তোমার পক্ষ স্থাপন করিতে পারিতেছ না, কারণ তাহাতে আরও দোষ আছে'—এইভাবে স্বীকার করার নাম 'অভ্যুপগম'।

১। তন্ত্রাধিকরণাভ্যুপগমসংস্থিতিঃ সিদ্ধান্তঃ। স চতুর্বিধঃ, সর্বতন্ত্রপ্রতিতন্ত্রাধিকরণাভ্যুপগম-সংস্থিত্যর্থান্তরভাবাৎ, ১।১।২৬-২৭

২। যেমন সাংখ্য ও পাতঞ্জল পরস্পর সমানতন্ত্র।

'অবয়ব'[১] শব্দের অর্থ ন্যায়বাক্যের অংশবিশেষ। পরার্থানুমানে যে সকল বাক্য প্রয়োগ করা হয়, সেই বাক্যসমষ্টিকে 'ন্যায়' বলে। অনুমানে থাকে পাঁচটি অবয়ব। প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ দশটি অবয়ব স্বীকার করিতেন। মহর্ষি গোতম কিন্তু পঞ্চাবয়ববাদী।

অবয়ব (A member of the syllogism) —৫টি

'তর্ক' প্রমাণের সহায়ক জ্ঞান। বিচারের সাহায্যে যে বস্তুর স্বরূপ অবগত হওয়া প্রয়োজন, সে বিষয়ে সন্দিহ্যমান দুই পক্ষের মধ্যে—'প্রমাণ' এই বিষয়েই পাওয়া যাইতেছে, এই প্রকার মানস জ্ঞানের নাম 'তর্ক'। কোনো বিষয় নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানিতে হইলে তর্কের বিশেষ প্রয়োজন। সকল প্রমাণেই তর্কের বিশেষ স্থান আছে। তর্কের উদ্দেশ্য সংশয়ের উচ্ছেদ করা। সংশয় দূর করিতে হইলে উভয় পক্ষের মধ্যে যে পক্ষের অনুকূলে কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়, আমরা তাহার অনুকূলেই সম্মতি দান করি। এই সম্মতি বা সম্ভাবনাকেই ন্যায়শাস্ত্রে বলা হইয়াছে 'তর্ক'[২]। যেমন, আত্মা নিত্য না অনিত্য এই সংশয় উচ্ছেদের জন্য উভয়পক্ষে যুক্তি আরম্ভ হইলে দেখা যাইবে, আত্মার অনিত্যতা অযৌক্তিক, নিত্যতাই সম্ভবপর—এই প্রকারের সম্ভাবনাই নৈয়ায়িক-সম্মত তর্কপদার্থ। নব্য নৈয়ায়িকদের মতে, একপ্রকারের আরোপের নাম তর্ক। তর্ক নিজে প্রমাণ নহে বটে, কিন্তু প্রমাণের সত্যতানির্ণয় করিয়া প্রমাণকে শক্তিশালী করিয়া তোলে। আত্মাশ্রয়, ইতরেতরাশ্রয় (অন্যোন্যাশ্রয়, **Petitio Principii**), চক্রক, অনবস্থা (**Infinite Regress**) এবং অনিষ্টপ্রসংগ ভেদে তর্ক পাঁচ প্রকার।

তর্ক (Hypothetical argument)

তর্কের শেষ ফল 'নির্ণয়'। বিচারে পূর্ব-পক্ষের আশ্রিত যুক্তিতে দোষ দেখাইয়া আপন পক্ষ স্থাপন করিয়া বিচার্য বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হওয়ার নাম

১। প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণোপনয়নিগমনান্যবয়বাঃ, ১।১।৩২

২। অবিজ্ঞাততত্ত্বেঽর্থে কারণোপপত্তিতস্তত্ত্বজ্ঞানার্থমূহস্তর্কঃ, ১।১।৪০

নির্ণয়'[১]। বাদী প্রতিবাদীর যুক্তিতর্ক বিন্যাসের দ্বারা মধ্যস্থ ব্যক্তি একটি পক্ষ স্থির করিয়া থাকেন, সেই স্থির করা বা অবধারণকেই বলা হয় 'নির্ণয়'। প্রমাণে দোষ থাকিলে নির্ণয়েও ভুল হইবে। মধ্যস্থ কাহাকেও না রাখিয়া গুরুশিষ্যের মধ্যেও বাদী এবং প্রতিবাদী হইয়া যে তত্ত্বের স্থিরীকরণ, তাহাকেও 'নির্ণয়'ই বলা চলে।

নির্ণয় (certain knowledge about anything)

প্রতিবাদীকে নিগৃহীত করার জন্য ন্যায়ানুগ বাক্যপ্রয়োগকে বলা হয় 'কথা'। বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা ভেদে এই কথা আবার ত্রিবিধ। বস্তুর সত্যতা নিরূপণের জন্য দুই জনের মধ্যে ন্যায়ানুসারে শাস্ত্রীয় বিচাররীতিতে যে আলোচনা তাহাকে বলে 'বাদ'। বাদে কোনো মধ্যস্থ ব্যক্তির প্রয়োজন হয় না—ইহাতে নিরর্থক কথা কাটাকাটির স্থান নাই। শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত বিরোধী কোনো কথার প্রসংগ এখানে উঠিতে পারে না।[২] প্রশ্নকর্তাকে বলা হয় বাদী বা পূর্বপক্ষবাদী, আর উত্তর-দাতাকে বলা হয় প্রতিবাদী বা উত্তরপক্ষবাদী। আমাদের বর্তমান debating societyতে আজও এই ধরণের বাদপ্রতিবাদই চলিয়া আসিতেছে। যাঁহারা তত্ত্বনির্ণয় করিতে ইচ্ছুক, শান্তপ্রকৃতি, যুক্তি-সংগত অর্থের অপলাপ করেন না, বিচারে প্রতিপক্ষকে সাহায্য করেন, তাঁহারাই বাদকথার প্রকৃত অধিকারী।

কথা :—
(১) বাদ (a discussion conducted according to logical rules and aiming at finding out the truth of the matter discussed)

বিষয়ের তত্ত্বনির্ণয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কেবল প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যে যে বিচার প্রবর্তিত হয়, তাহাকে বলে 'জল্প'। জল্পে আপন আপন মত সমর্থন করার জন্য অশাস্ত্রীয় রীতিতেও বিচার চলে। যে কোনো প্রকারে পরমত খণ্ডন ও স্বমত স্থাপনই জল্পের উদ্দেশ্য। এখানে দুজন মধ্যস্থের আবশ্যক হয়।

(২) জল্প বা mere wrangling)

১। বিমৃশ্য পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ, ১।১।৪১
২। "বাদঃ প্রবদতামহম্", গীতা, ১০।৩২

কেবলমাত্র প্রতিপক্ষের অভিমত খণ্ডনার্থে বিজিগীষু বিচারক যে বচন উপস্থাপিত করেন তাহারই নাম 'বিতণ্ডা'[১]। শাস্ত্রের কোনো রীতি এখানে মানা হয় না, প্রতিপক্ষকে নিরস্ত করিতে পারিলেই বৈতণ্ডিকের জয় হয়। স্থলবিশেষে যে মুক্তিকামী ব্যক্তির পক্ষেও জল্প এবং বিতণ্ডার প্রয়োজন হয়, সে বিষয়ে গোতম বলিয়াছেন—

(৩) বিতণ্ডা (a debate in which the opponent merely tries to refute the position of the opponent)

জল্প ও বিতণ্ডার সার্থকতা

"তত্ত্বাধ্যবসায়সংরক্ষণার্থং জল্পবিতণ্ডে বীজপ্ররোহসংরক্ষণার্থং কণ্টকশাখাবরণবৎ"[২]। কিন্তু ধনলাভ বা পাণ্ডিত্যের খ্যাতিলাভের উদ্দেশ্যে কখনও জল্প বা বিতণ্ডা করা উচিত নহে, বাৎস্যায়ন এই কথাই বলিয়াছেন।

যে হেতু অনুমান প্রয়োগের সময় দোষযুক্ত হয়, তাহাকেই বলে 'হেত্বাভাস'[৩]। বাদাদিবিচারে অধিকার লাভ করিতে হইলে হেতু সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন।

হেত্বাভাস (fallacies of inference)

যে অর্থে বক্তা বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহার বিপরীত অর্থের কল্পনা দ্বারা বক্তার বাক্যে দোষ প্রদর্শনের নাম 'ছল' বা quibble।[৪] বাক্‌ছল, সামান্যচ্ছল এবং উপচারচ্ছল ভেদে ইহা তিনপ্রকার। শব্দের অনভিপ্রেত অর্থ গ্রহণ করিয়া প্রতিপক্ষকে অপদস্থ করার নাম 'বাক্‌ছল'। একস্থলে যে অর্থ সম্ভবপর, অন্যত্র অসম্ভব হওয়া সত্ত্বেও শুধু সাদৃশ্যের জোরে সম্ভবপরতা কল্পনা করার নাম 'সামান্যচ্ছল'। বক্তা অর্থে বা গৌণ অর্থে বাক্য প্রয়োগ করিলে তাহার বিপরীত অর্থ গ্রহণ করিয়া দোষ প্রদর্শন করার নাম 'উপচারচ্ছল'।

ছল (quibble) —৩ প্রকার

১ প্রমাণতর্কসাধনোপালম্ভঃ সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহো বাদঃ যথোক্তোপপন্নছলজাতিনিগ্রহস্থানসাধনোপালম্ভো জল্পঃ। স প্রতিপক্ষস্থাপনাহীনো বিতণ্ডা।

২। ন্যায়সূত্র, ৪।২।৫০

৩। সব্যভিচারবিরুদ্ধপ্রকরণসমসাধ্যসমকালাতীতা হেত্বাভাসাঃ, ১।২।৪; দ্রঃ ন্যায়পরিচয়—ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, পৃঃ ৩১৫-৩৩২

৪। বচনবিঘাতোঽর্থবিকল্পোপপত্ত্যা ছলম্, ১।২।১০

ব্যাপ্তির অপেক্ষা না করিয়া শুধু সাধর্ম্য অথবা বৈধর্ম্যের দ্বারা বাক্যে দোষের উদ্ভাবন করাকে বলা হয় 'জাতি'[১]। সাধর্ম্যসমা, বৈধর্ম্যসমা, উৎকর্ষসমা প্রভৃতি ভেদে জাতি ২৪ প্রকার।

জাতি (Evasive and shifty answer to an argument) ২৪ প্রকার

শব্দ উৎপত্তিশীল, সেজন্য শব্দের বিনাশও হইয়া থাকে, এই সিদ্ধান্তে দোষ উদ্ভাবন করিয়া যদি বলা হয় যে—আকৃতি-হীন আকাশ নিত্য সেইরূপ শব্দও আকৃতিহীন বলিয়া নিত্য হইতে পারে, প্রতিবাদীর এরূপ উত্তরের নাম 'সাধর্ম্যসমা জাতি'। অনিত্যঘটের বৈধর্ম্য অমূর্তত্ব শব্দে আছে বলিয়া প্রতিবাদী যদি শব্দের নিত্যতায় আপত্তি জানান, তবে তাহাকে বৈধর্ম্যসমা জাতি বলা হয়। ঘটের ন্যায় শব্দেরও উৎপত্তি আছে বলিয়া ঘট শব্দের ন্যায় অনিত্য—বাদীর এই কথার উত্তরে প্রতিবাদী যদি দোষ দেখায় যে 'ঘটে রূপ থাকে; শব্দ যদি ঘটের ন্যায় অনিত্য হইত, তবে শব্দেও রূপ থাকিত'—এই প্রকার দোষোদ্ভাবনের নাম 'উৎকর্ষসমা জাতি'। প্রতিবাদীর এই সকল উক্তি কিন্তু ভিত্তিহীন, কারণ যে সমস্ত যুক্তি তিনি দেখাইয়াছেন তাহা টিকিতে পারে না। গোতমোক্ত ২৪টি জাতির নাম :—সাধর্ম্যসমা, বৈধর্ম্যসমা, উৎকর্ষসমা, অপকর্ষসমা, বর্ণ্যসমা, অবর্ণ্যসমা, বিকল্পসমা, সাধ্যসমা, প্রাপ্তিসমা, অপ্রাপ্তিসমা, প্রসঙ্গসমা, প্রতিদৃষ্টান্তসমা, অনুৎপত্তিসমা, সংশয়সমা, প্রকরণসমা, অহেতুসমা, অর্থাপত্তিসমা, অবিশেষসমা, উপপত্তিসমা, উপলব্ধিসমা, অনুপলব্ধিসমা, অনিত্যসমা, নিত্যসমা, কার্যসমা। এই জাতিপদার্থের লক্ষণাদি অত্যন্ত দুর্বোধ্য। সংক্ষেপে তাহার কিছুই ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।[২]

গোতমের শেষ পদার্থ 'নিগ্রহস্থান'। বিচারে পরাজয়ের নাম নিগ্রহ, নিগ্রহের কারণকেই বলে নিগ্রহস্থান।[৩] যে সমস্ত বাক্যে বাদী বা প্রতিবাদীর বিচার্য বিষয়ের বিপরীত জ্ঞান অথবা বিচার্য বিষয়ে অজ্ঞানতা প্রকাশ পায় তাহার নাম 'নিগ্রহস্থান'। ফল কথা, পরা-

নিগ্রহস্থান—২২টি (Grounds of Defeat in debate)

১। সাধর্ম্যবৈধর্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিঃ, ১।২।১৮

২। এইগুলি জানিবার জন্য দ্রঃ ন্যায়দর্শন ৫ম খণ্ড—তর্কবাগীশ

'বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিশ্চ নিগ্রহস্থানম্', ১।২।১৯ ; নিগ্রহের প্রাচীন নাম 'ধলীকার'।

জয়রূপ নিগ্রহ এবং বাদস্থলে খলীকাররূপ নিগ্রহের যাহা স্থান অর্থাৎ 'কারণ', তাহাকে বলে নিগ্রহস্থান। নিগ্রহস্থানের বাইশটি প্রকার আছে :—প্রতিজ্ঞাহানি, প্রতিজ্ঞান্তর, প্রতিজ্ঞাবিরোধ, প্রতিজ্ঞা-সন্ন্যাস, হেত্বন্তর, অর্থান্তর, নিরর্থক, অবিজ্ঞাতার্থ, অপার্থক, অপ্রাপ্ত-কাল, ন্যূন, অধিক, পুনরুক্ত, অননুভাষণ, অজ্ঞান, অপ্রতিভা, বিক্ষেপ, মতানুজ্ঞা, পর্য্যনুযোজ্যোপক্ষেপণ, নিরনুযোজ্যানুযোগ, অপসিদ্ধান্ত, হেত্বাভাস। বাদী বা প্রতিবাদী প্রথমে প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পঞ্চাবয়ব প্রয়োগ করিয়া নিজপক্ষ স্থাপন করিয়া পরে তাঁহার প্রতিবাদীর প্রদর্শিত কোনো দোষের উদ্ধারে অসমর্থ হইয়া যদি তাঁহার পূর্বোক্ত 'পক্ষ' অর্থাৎ যে কোনো পদার্থ পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার'প্রতিজ্ঞাহানি' নামক নিগ্রহস্থান হয়। এইরূপে অপর নিগ্রহ-স্থানেও পরাজয় সূচিত হয়। বাইশ প্রকার নিগ্রহস্থানের মধ্যে 'অপসিদ্ধান্ত' ও 'হেত্বাভাস' বাদকথাতেও দেখানো চলে। জল্প ও বিতণ্ডাতে সকল নিগ্রহস্থানেরই উদ্ভাবন করা যায়। শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে 'অপসিদ্ধান্ত' নামে নিগ্রহস্থান হয়। বাদীর স্বপক্ষ-স্থাপনের বেলায় বিপক্ষ হেত্বাভাস দেখাইলেও বাদীর নিগ্রহ হইয়া থাকে।[১]

ন্যায়দর্শনের পরমাণুবাদ বৈশেষিকদর্শনেও পাওয়া যায়। ন্যায় ও বৈশে-ষিকের মতে আকাশ, কাল, জীব—এই সকল পদার্থ সর্বব্যাপী এবং নিত্য।

পরমাণু (Atom)

ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ এই চারিটি দ্রব্যের পরমাণু স্বীকার করা হইয়াছে। পরমাণু নিত্য, অতিশয় সূক্ষ্ম এবং উৎপত্তিশীল সকল দ্রব্যের উপাদান। যে সূক্ষ্ম অংশের আর ভাগ করা চলে না, সেই নিরবয়ব দ্রব্যই 'পরমাণু'। সাবয়ব বস্তুর বিভাগ যখন আর করা চলে না—তখন তাহাই পরমাণু।[২] ঈশ্বরের ইচ্ছার জন্য দুইটি পরমাণুর সংযোগে

দ্ব্যণুক

খণ্ডপ্রলয়ের পরে নূতন সৃষ্টিতে সর্বপ্রথম যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে বলে 'দ্ব্যণুক'। তিনটি দ্ব্যণুক অর্থাৎ

১। নিগ্রহের বিভিন্ন প্রকারের বিশদ বিবরণের জন্য দ্রঃ ন্যায়পরিচয়—তর্কবাগীশ, পৃঃ ৩৪০-৩৪৪

২। ন্যায়কোশ—ঝালকীকর

ছয়টি পরমাণুর সংযোগে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহাকে বলে 'ত্রসরেণু'।[১]

ত্রসরেণু

সংসারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল দ্রব্যের মধ্যে ত্রসরেণুই সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। ত্রসরেণুর আকৃতি molecule-এর মত—ইহার অপেক্ষা ক্ষুদ্র দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় না। কেননা উহাতে মহত্ত্ব নাই। ত্রসরেণুর অপর নাম 'ত্রুটি'। পরমাণু হইতেই স্থূল পরিদৃশ্যমান জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। ত্রসরেণুর উপাদান-কারণ দ্ব্যণুক আর দ্ব্যণুকের উপাদান কারণ 'পরমাণু'।[২]

আরম্ভবাদ

পরমাণুর কারণ থাকিতে পারে না, যেহেতু তাহা নিত্য।[৩] এই পরমাণু-কারণবাদকে বলে 'আরম্ভবাদ'। মহর্ষি গোতম আরম্ভবাদের মূল যুক্তি প্রকাশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—ব্যক্ত কারণ হইতে ব্যক্ত কার্যের উৎপত্তি হয় (৪।১।১১); তাৎপর্য এই যে, রূপাদি গুণবিশিষ্ট মৃত্তিকা প্রভৃতি স্থূল ভূত হইতে তজ্জাতীয় ঘটাদি দ্রব্যের উৎপত্তি দেখা যায়, অতএব এই দৃষ্টান্তের দ্বারাই 'অদৃষ্ট' অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় মূল কারণ পরমাণুসমূহ প্রমাণসিদ্ধ হয় (indirect proof; ether-এর অস্তিত্বও এই ভাবে প্রমাণ করা হইয়াছিল)। কিন্তু ঘট প্রভৃতি দ্রব্যে যে রূপরস প্রভৃতি বিশেষ গুণ জন্মায়, তাহার মূল পরমাণুতেও সেই জাতীয় বিশেষগুণ অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়। সেইজন্যই বলা হইয়াছে—কারণদ্রব্যগত গুণ কার্যদ্রব্যে সেইজাতীয় গুণকে উৎপন্ন করে।

কার্যের উৎপত্তির পূর্বে তাহার উপাদানকারণ পরমাণু বিদ্যমানই থাকে, কিন্তু উপাদানকারণ পরমাণুতে কার্যটি তখন থাকে না। অতএব যে কার্যটি

অসৎকার্যবাদ

'অসৎ' বা অবিদ্যমান, সেই কার্যের উৎপত্তির নামই আরম্ভ (The theory of origination)।[৪] উৎপত্তির পূর্বে ঘট ছিল না, পরমাণুরূপ উপাদানকারণ হইতে আরম্ভ হইল ঘটরূপ অসৎকার্যের। এই অসৎকার্যবাদই (The theory of not-pre-existent effect) আরম্ভবাদ। এক একটি খণ্ডপ্রলয়ের পরে ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং

১। তর্কালংকার ; ভাষা পরিচ্ছেদ

২। Nyaya-Vaisesika Metaphysics—Bhaduri

৩। 'পারিমাণ্ডল্যভিন্নানাং কারণত্বমুদাহৃতম্'—ভাষা পরিচ্ছেদ

৪। Nyaya Theory of Knowledge S.C. Chatterjee ; ন্যায়পরিচয়, পৃঃ ৮২-১১৪

জীবগণের অদৃষ্টের জন্য প্রথমে দুইটি পরমাণুর যোগে অনুকূল ক্রিয়ার আরম্ভ পরমাণুতেই হয় এবং পরমাণুগুলি পরস্পর সংযুক্ত হইতে থাকে (concatenation of atoms)। জীবগণের অদৃষ্টরূপ প্রকৃতি বা মায়া যদিও স্বয়ং অচেতন, তবুও ঈশ্বরের অধিষ্ঠানের বলে পরমাণুতে সংযোগের অনুকূল ক্রিয়া উৎপন্ন করে। এইভাবে ক্রমে স্থূল জগতের সৃষ্টি হয়।[১]

পদার্থসংকলনের মধ্যে কিন্তু ঈশ্বরের নাম নাই। কিন্তু কেন? তবে কি গোতম নিরীশ্বরবাদী? এ প্রশ্ন স্বভাবতই ওঠে। ন্যায়সূত্রে মাত্র তিন জায়গায় 'ঈশ্বরের' কথা আছে। ৪।১।২১ সূত্রে মহর্ষি বলিয়াছেন, জীবের কর্ম এবং কর্মফলের নিয়ন্তা 'ঈশ্বর'।

ঈশ্বর

সুতরাং শুধু ঈশ্বর অথবা শুধু কর্মফলরূপে অদৃষ্টই যে জগৎসৃষ্টির কারণ, তা বলা সম্ভব নয়। কিন্তু জীবের কর্মফল এবং ঈশ্বর, দুইই জগতের সৃষ্টির নিমিত্তকারণ। 'ঈশ্বর' কর্মফল অনুসারে জীবের ভোগের নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ঈশ্বর অধিগন্তা, অধিগন্তব্য বা হেয় কিছুই নহেন। ন্যায়দর্শনে জীব ও পরমাত্মা দুইটি ভিন্ন পদার্থ। জীব কিন্তু এইমতে ঈশ্বরের উপাসক মাত্র। প্রমেয়গুলির অযথার্থ জ্ঞানই সংসারের হেতু। ঈশ্বর সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান গোতমের মতে মুক্তির কারণ নয়।[২] ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান না থাকিলেও যদি বারটি প্রমেয়ের মিথ্যাজ্ঞান কাহারও তিরোহিত হয়, তবে তিনি অবশ্যই মুক্তি লাভ করিবেন। অন্যান্য পদার্থের স্বরূপ হইতে ঈশ্বরকে পৃথকভাবে জানিবার কোনো আবশ্যকতা ন্যায় স্বীকার করে নাই।

'কুসুমাঞ্জলি'তে উদয়ন প্রথমেই বলিয়াছেন—'ঈশ্বর'কে সকলেই স্বীকার করে। তাঁহার সম্বন্ধে কাহারও কোনো সংশয় নাই। এই কারণে ঈশ্বর-নিরূপণের আবশ্যকতা না থাকিলেও ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা ঈশ্বরের মননস্বরূপ উপাসনা'…ইত্যাদি দেখা যায়। অর্থাৎ ন্যায়ের ঈশ্বর বেদের কর্তা, পাপ-

১। Cultural Heritage of India. Vol. III

২। ন্যায়পরিচয়—তর্কবাগীশ, পৃঃ ১৫৪—১৭২, তর্কালংকার—পৃঃ ১০৯

পুণ্যময় অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা এবং সকল অনিত্য পদার্থের উৎপত্তির অন্যতম নিমিত্তকারণ। এই তিনপ্রকার যুক্তিতেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা হইয়াছে।[১]

বেদ কোন্ সময়ে, কোন্ স্থানে, কাহার দ্বারা কিভাবে রচিত হইয়াছিল তাহার কোনো প্রমাণ নাই। সেজন্য বেদের বক্তা নিশ্চয়ই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সর্বজ্ঞ কোনো অভ্রান্ত পুরুষ। শরীরধারী জীবের মধ্যে এইরূপ কোনো পুরুষ আছেন বলিয়া তো প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং শ্রুতিসিদ্ধ সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই বেদের কর্তা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বেদকর্তা ঈশ্বরের ভ্রমপ্রমাদ প্রভৃতি না থাকায় তাঁহার রচিত বেদ নির্ভুল হওয়াই স্বাভাবিক। বেদপ্রামাণ্যস্থাপনে ন্যায়সূত্রকার ঈশ্বরের উল্লেখ করেন নাই, বেদ আপ্তপুরুষের বাক্য এইমাত্রই তাঁহার বক্তব্য (সূ ২।১।৬৮)। আপ্তশব্দের অর্থ ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য পুরুষ।[২] বাচস্পতি মিশ্র বেদকে ঈশ্বরের রচিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। উদয়নের মতে, বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ ঐশ্বর্যশালী সর্বজ্ঞ পুরুষ ভিন্ন অপর কেহ সর্বজ্ঞানের আকর এবং বহুবিধ অলৌকিক বিষয়ের প্রতিপাদক বেদ রচনা করিতে পারেন না। যদি বলা যায় যে ব্যাস প্রভৃতি সর্বজ্ঞ মুনিগণ বেদের রচয়িতা, তাহা হইলে বেদের বহুকর্তৃকত্ব স্বীকার করিতে হয়, এ সিদ্ধান্ত অশ্রদ্ধেয়। যখন একজন কর্তাকে স্বীকার করিলেই চলিতে পারে, তখন বহুজনের কর্তৃত্ব অযথা কল্পনা করিয়া কল্পনাকে ভারাক্রান্ত করা কেন? সর্ববিষয়ে নিত্যজ্ঞানবান্ ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোনো পুরুষ বেদের কর্তা হইতে পারেন না। বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলিয়াছে—বেদ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই ঈশ্বরের নিঃশ্বসিত। এই সকল যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা বেদের কর্তারূপে ঈশ্বরের অনুমান করা সম্ভব।

অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা এবং সংসারের নিমিত্তকারণ হিসাবেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সমর্থন করা যায়। ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত জীবের কর্মফল লাভ সম্ভব হয় না। ঈশ্বর সকল প্রাণীকেই একভাবে দেখিয়া থাকেন—তাঁহার

১। The Essentials of Indian Philosophy—Hiriyanna, p 92

২। Nyayasutras of Gautama.

শত্রুও নাই, মিত্রও নাই।[১] এইজন্যই স্বীকার করিতে হইবে যে প্রাণীদের বিচিত্র কর্ম অনুসারেই তিনি এই বিচিত্র সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন। জীব আপন কর্ম অনুসারে ফলভোগ করিতেছে, ঈশ্বর নিমিত্তমাত্র। জীবই সমস্ত কর্ম করে, ঈশ্বর জীবের কর্ম অনুসারে ফলদান করেন—ইহা ঘোষণা করিয়াছে বৃহদারণ্যকোপনিষদ্। অন্ধ ব্যক্তি যদি বৃক্ষের কাণ্ড দেখিতে না পায় তবে তাহা কি বৃক্ষের অপরাধ? সেইরূপ অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিগণ যে ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না, ঈশ্বরের স্বরূপ জানিতে পারে না তাহার কারণ তাহাদের সাধনারই অভাব। সাধক পুরুষগণ ঠিকই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।[২] উদয়ন ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য অনেকগুলি বিখ্যাত যুক্তির আলোচনা করিয়াছেন। তিনি একস্থলে বলিয়াছেন যে অনিত্য এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টাকে আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, এই কারণে তাহার বিষয়ে পরিষ্কার কোনো ধারণাও করিতে পারি না, কিন্তু বিশ্বের মূলে অচিন্ত্য অনির্বচনীয় শক্তি-বিশেষের সত্তাকে স্বীকার করিতে বাধ্য হই। সেই শক্তিকেই ব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমেশ্বর, ভগবান প্রভৃতি নামে প্রকাশ করা হয়। অনুমান-প্রমাণ ব্যতীত শ্রুতিতেও বহুস্থানে তাঁহারই মাহাত্ম্য প্রকাশ করা হইয়াছে।

ন্যায়ের মতে ঈশ্বর সগুণ,—তাঁহার জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ন প্রভৃতি নিত্য। বেদান্তসম্মত নির্গুণ ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতিগুলিকেও নৈয়ায়িকগণ সগুণব্রহ্মপক্ষেই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ন্যায়মঞ্জরীতে ঈশ্বরকে নিত্য সুখের আশ্রয় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ঈশ্বরের বাক্য হিসাবেই বেদকে প্রমাণ বলিয়া এই দর্শনে গ্রহণ করা হইয়াছে।

ঈশ্বর যে শরীরী প্রাণী হইবেনই, এমন কোনো কথা নাই, কারণ শরীরবত্তা আর কর্তৃত্বের মধ্যে কোনোরূপ ব্যাপ্তিসম্বন্ধ দেখা যায় না। কার্যের অনুকূল প্রযত্নবত্তা এবং কর্তৃত্ব একই জিনিস। ঈশ্বরের শরীর না থাকিলেও তাঁহার প্রযত্ন থাকিতে দোষ কি? তিনি সর্বশক্তিমান্, সেজন্য অশরীরী হইয়াও শুধু ইচ্ছার শক্তিতে সমস্তই করিতে পারেন।

১। 'সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ', গীতা, ৯।২৯

২। দ্রঃ The Nyaya Theology :—(An Intro. to Indian Philosophy—Datta and Chatterjee, pp. 240-252)

পাপপুণ্যরূপ অদৃষ্ট ঈশ্বরের নাই। তবুও জীবগণের অদৃষ্টবশতঃ কখনও কখনও তিনি শরীর ধারণ করিয়া থাকেন। তাঁহার সেই অবস্থাকেই 'অবতার' বলা হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি ন্যায়মতে প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতি ষোলটি পদার্থের জ্ঞানই 'নিঃশ্রেয়স' লাভের উপায়। এইটিই প্রাচীন বা গোতম-প্রণীত ন্যায়। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও আগম বা শব্দ এই চার প্রকার প্রমাণ। নব্যন্যায়ে শুধু এই চারি প্রকারের প্রমাণ লইয়াই আলোচনা করা হইয়াছে। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মিথিলা নিবাসী গঙ্গেশ উপাধ্যায় নব্যন্যায়ের প্রবর্তন করেন।[১] গঙ্গেশের পূর্ববর্তী বাচস্পতি মিশ্র এবং আচার্য উদয়নের জন্মভূমিও মিথিলা। মিথিলাতেই প্রাচীনকালে ন্যায়শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। গঙ্গেশ প্রাচীন ন্যায়কে সম্পূর্ণ নূতন প্রণালীতে সাজাইয়া যে গ্রন্থ রচনা করেন তাহার নাম 'তত্ত্বচিন্তামণি'। গঙ্গেশের গ্রন্থেই অনেক অভিনব পারিভাষিক শব্দ সর্বপ্রথম স্থানলাভ করিল। গঙ্গেশের পুত্র বর্ধমান উপাধ্যায় এবং মৈথিল নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রই এই সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত মৈথিল গ্রন্থকার। মিথিলায় 'তত্ত্বচিন্তামণি'র অনেক টীকা লেখা হইয়াছিল। তত্ত্বচিন্তামণি পড়িবার জন্য দেশবিদেশ হইতে ছাত্রেরা মিথিলায় যাইতেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাসুদেব সার্বভৌম বাঙ্গালায় এই পুস্তকের অধ্যয়ন প্রবর্তন করেন। বিশেষ করিয়া তাঁহার শিষ্য রঘুনাথ শিরোমণির প্রচেষ্টায় বাঙ্গালায় নব্যন্যায় সুপ্রচলিত হয়।[২] সে সময় বাঙলায় নবদ্বীপ ছিল নব্যন্যায় শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র।[৩] বৌদ্ধ ও জৈন পণ্ডিতবর্গের,—বিশেষ করিয়া সুপণ্ডিত বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙ্‌নাগের—বিচার ও আলোচনা নব্যন্যায় প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে। ন্যায়শাস্ত্রের উন্নতির জন্য বাৎস্যায়ন,[৪]

নব্যন্যায়

১। ন্যায়পরিচয়—তর্কবাগীশ পৃঃ ৫৩—৫৪

২। বাঙ্গালার সারস্বত অবদান,

৩। 'ন্যায়ের বিধান ছিল রঘুমণি'—দ্বিজেন্দ্রলাল

৪। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস—পৃঃ ১১৯

বাচস্পতি মিশ্র, উদয়ন, জয়ন্ত ও ভাসর্বজ্ঞ প্রভৃতি গঙ্গেশের পূর্ববর্তী হিন্দু নৈয়ায়িকগণের দান উল্লেখযোগ্য। নব্যন্যায়ের সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইবে।[১]

"নব্যন্যায়ের ভাষা সাধারণ সংস্কৃত ভাষা হইতে পৃথক্। পরিভাষাবহুল বলিয়াই অসংখ্য সূক্ষ্মবিচার অল্পসংখ্যক কথায় প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি অক্ষর ওজন করিয়া লেখা।......নব্যনৈয়ায়িকগণ গোতমের ষোড়শ পদার্থকে সাতটি পদার্থের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা সপ্তপদার্থবাদী। দ্রব্য (substance), গুণ, কর্ম (action), সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাব এই সাতটি পদার্থ। ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন—এই নয়টি দ্রব্যবর্গের (substance) অন্তর্গত। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম, অধর্ম এবং শব্দ এই চব্বিশটি গুণ (quality) পদার্থ। ঘটত্ব, পটত্ব, মনুষ্যত্ব, ব্রাহ্মণত্ব প্রভৃতি নিত্যপদার্থ 'সামান্য' বা 'জাতি' (universals) নামে অভিহিত। সাবয়ব বস্তুগুলি আপন আপন আকৃতির বৈশিষ্ট্যেই পরস্পর ভিন্ন, কিন্তু পরমাণুর আকৃতি বা অবয়ব না থাকায় পরস্পর ভেদের কোনো হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই কারণে বলিতে হয়, প্রত্যেক পরমাণুতে 'বিশেষ' নামে একটি পদার্থ আছে, ঐ 'বিশেষ'ই পরমাণুসমূহের পরস্পরের ভেদক।... ...অবয়ব ও অবয়বী, জাতি ও ব্যক্তি, গুণ ও গুণী, ক্রিয়া ও ক্রিয়াবান্, নিত্যদ্রব্য পরমাণু ও বিশেষ—ইহাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ স্বীকৃত হয়, তাহাই সমবায়পদার্থ নামে বিখ্যাত। অভাবপদ (non-existence) দুই প্রকার, সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব। সংসর্গাভাব তিনপ্রকার, প্রাগভাব,[২] ধ্বংস এবং অত্যন্তাভাব। যে বস্তু ভবিষ্যতে উৎপন্ন হইবে, বর্তমান কালে তাহার অভাব আছে, এরূপ অভাবই সেই বস্তুর প্রাগভাব। বস্তুটি নাশ হইলে তাহার ধ্বংসাভাব[৩] হইয়া থাকে। যে সংসর্গাভাব নিত্য

১। 'দর্শনে বাঙালীর দান' এই শিরোনামায় ইহার আলোচনা করা হইবে।

২। The denial of a thing with the suggestion that it will only hereafter come to be—Hiriyanna.

৩। The denial (non-existence) of a thing with the suggestion that it has already been

তাহাই অত্যন্তাভাব[১]। অন্যোন্যাভাবের[২] অপর নাম ভেদ। প্রত্যেক বস্তুতে অপর বস্তুর ভেদ বা অন্যোন্যাভাব থাকে, এই কারণে সকল বস্তুই পরস্পর ভিন্ন।

নব্যন্যায়ে চারিটি অংশ আছে। প্রত্যক্ষখণ্ড, অনুমানখণ্ড, উপমানখণ্ড ও শব্দখণ্ড। নব্যন্যায়ের অনুমানখণ্ডকে দুই অংশে ভাগ করা হয়, ব্যাপ্তিবাদ ও জ্ঞানকাণ্ড। ব্যাপ্তিবাদে অনুমানের বিচার এবং জ্ঞানকাণ্ডে জ্ঞানের বিশেষ্যতা, বিশেষণতা, প্রতিবধ্যতা, প্রতিবন্ধকতা, প্রভৃতির বিচার; সংস্কৃতভাষায় লিখিত শাস্ত্রসমূহের মধ্যে নব্যন্যায় অত্যন্ত কঠিন ও সূক্ষ্মবিচার-বহুল। বিশেষতঃ অনুমানখণ্ড সর্বাপেক্ষা কঠিন। নব্যন্যায় মিথিলা ও বাঙলার নিজস্ব কীর্তি, বাঙালীর দানেই নব্যন্যায় সমৃদ্ধ।"।[৩]

"ন্যায়ের পদ্ধতি বিশ্লেষণমূলক ও যৌক্তিক।[৪] বস্তুত ন্যায় শব্দের অর্থ শুদ্ধভাবে যুক্তি প্রয়োগের বিজ্ঞান। এই দর্শন অনেকাংশে অ্যারিষ্টটল-এর ন্যায়ের মত, যদিও এই দুয়ের মধ্যে মূলগত পার্থক্য আছে। অন্য সকল দর্শনে ন্যায়ের বিচারনীতি গৃহীত হয়েছে। যুক্তি প্রয়োগের অনুশীলনের জন্য প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই শাস্ত্র বরাবর অধীত হত।…দর্শন অধ্যয়নের আগে ন্যায়কে অপরিহার্যরূপে শিক্ষণীয় মনে করা তো হতই, তা ছাড়া প্রত্যেক শিক্ষিত লোকের পক্ষে মানসিক দক্ষতা লাভের জন্য এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করা আবশ্যক বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে।

এদেশের পুরাতন শিক্ষাপদ্ধতিতে এর স্থান তেমনি উচ্চ, যেমন হয়ে আছে অ্যারিষ্টটল-এর ন্যায়ের স্থান ইউরোপীয় শিক্ষা-পদ্ধতিতে।"[৫]

---

১ The denial of a thing somewhere with the suggestion that it is somewhere else.

২। Mutual Exclusion

৩। ন্যায়দর্শন—সুখময় ভট্টাচার্য, পৃঃ ৫৮-৬০

৪। 'কাব্যেঽপি কোমলধিয়ো বয়মেব নান্যে তর্কেঽপি কর্কশধিয়ো বয়মেব নান্যে'—রঘুনাথ শিরোমণি

৫। ভারত সন্ধানে—নেহেরু (সিগনেট প্রেস), পৃঃ ১২৭

পঞ্চাবয়বযুক্ত ন্যায় কতকটা অ্যারিষ্টটল-এর প্রণালীর অনুরূপ। এই কারণে ম: ম: সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ[১] মনে করেন যে আলেকজান্দ্রিয়া ও সিরিয়ার মারফত গ্রীকপ্রণালী তক্ষশীলায় আসা সম্ভবপর—অর্থাৎ ভারতের ন্যায়শাস্ত্র গ্রীকদের নিকট হইতে লাভ করা হইয়াছে। আবার কাহারও কাহারও মতে আলেকজাণ্ডার কর্তৃক ভারত আক্রমণের সময় গ্রীকগণ হিন্দু নৈয়ায়িকগণের সংস্পর্শে আসেন এবং সেই সূত্রে ভারতীয় দর্শন গ্রীসে প্রচারিত হয়। রাধাকৃষ্ণণ[২] সতীশ বিদ্যাভূষণের মত সমর্থন করেন নাই। ম্যাকস্‌মূলারের[৩] ধারণা যে উভয় দেশেই স্বাধীনভাবে এই প্রণালী আবির্ভূত হইয়াছিল। রাধাকৃষ্ণণও এই মতকেই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছেন।

Indian and Western Syllogism

১। History of Indian Logic—Mm. S.C. Vidyabhusana
২। Indian Philosophy, Vol. II—Radhakrishnan
৩। Six Systems of Hindu Philosophy—Maxmüller

॥ ঘ ॥ বৈশেষিক দর্শন

সুকুমারমতি বিদ্যার্থী বালকদিগকে জগত্তত্ত্ব বিচারে প্রবৃত্ত করাইবার প্রথম সোপান বৈশেষিক দর্শন।[১] অতি সহজ সহজ যুক্তিদ্বারা বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা মহর্ষি উলূক বালকাদগের বুদ্ধিকে জগত্তত্ত্ব বিচারে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তণ্ডুলকণা ভক্ষণ করিয়া ইনি জীবন ধারণ করিতেন বলিয়া ইঁহার নাম হইয়াছিল 'কণাদ' এবং কণাদ নামেই ইনি সচরাচর পরিচিত। ঈশ্বরের স্বরূপ কি, জীবের স্বরূপ কি, জীব ও ঈশ্বরে কিরূপ সম্বন্ধ, জগতের উৎপত্তি কিরূপে হইয়াছে, জীবের সহিত জগতের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে কিরূপে—এই প্রকার কঠিন প্রশ্নের বিচার এই দর্শনে পাওয়া যাইবে না। কিন্তু এই সকল প্রশ্ন উদয় হইবার নিমিত্ত জিজ্ঞাসু মন যাহাতে ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইতে থাকে, তজ্জন্য মহর্ষি কণাদ অতি সহজ উপদেশ প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন বৈশেষিকসূত্রে। কিন্তু এই সূত্রের ব্যাখ্যাকারগণ এই দর্শনকে জগত্তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্বনির্ণায়ক সম্পূর্ণ দর্শন বলিয়া প্রচার করিয়াছেন এবং ইঁহাদের মতই বৈশেষিক মত বলিয়া সুধীসমাজে পরিচিত। এই বৈশেষিক মত বেদান্তদর্শনে খণ্ডিত হইয়াছে।

বৈশেষিকের প্রয়োজনীয়তা

কণাদ-শব্দের অর্থ

বৈশেষিকের বিষয়বস্তু

মল্লিনাথ নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিতে যাইয়া বলিয়াছেন—যিনি বাণীং কাণভুজীম্ অজীগণৎ, তিনি সেই ব্যক্তি; অর্থাৎ তিনি কণভুক্ বা কণাদের বাণীও পাঠ করিয়াছেন। এই কণাদই যে বৈশেষিক দর্শনের প্রবর্তক সূত্রকার তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

মল্লিনাথও বৈশেষিকের পরিচয় জানিতেন

১ দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা : ১ম খণ্ড

কণাদ 'বিশেষ' বলিয়া এক পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন। এইজন্যই তাঁহার দর্শনের নাম 'উলূক্য দর্শন' থাকা সত্ত্বেও উহা বৈশেষিক দর্শন নামেই অধিকতর প্রসিদ্ধ। বৈশেষিক ন্যায়দর্শনের ন্যায় 'ষোড়শপদার্থবাদী' নহে, এই দর্শন 'সপ্তপদার্থবাদী' এবং কণাদের মতে নিষ্কাম কর্মের অনুশীলনে চিত্ত নির্মল হইলে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ এবং সমবায়—এই ছয় পদার্থের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য বিচার দ্বারা যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় তাহাই 'নিঃশ্রেয়স' বা মুক্তি লাভের উপায়। বৈশেষিকের মতে জাগতিক সমস্ত বস্তুই 'তৎ'-অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অবয়ব দ্বারা গঠিত। সুতরাং পৃথিবী প্রভৃতি বস্তুসকল বিভাগ করিতে করিতে যখন তাহাদের ক্ষুদ্রতম অবয়বে পৌছান যায়, তখন সেই ক্ষুদ্রতম অবয়বকে বলে পরমাণু। পরমাণু সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়, যেমন পার্থিব পরমাণু, জলীয় পরমাণু ইত্যাদি। এই সকল 'পরমাণু'কে আর বিভাগ করা যায় না; ইহারা প্রত্যেকে এক একটি 'বিশেষ'—ইহাদের মধ্যে এমন একটা কিছু ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য আছে যেজন্য ইহাদের অপর পরমাণু হইতে পৃথক্ করা সম্ভবপর হয়। ভাষা-পরিচ্ছেদে বলা আছে যে যদি পরমাণুতে কোন বিশেষত্ব না থাকিত তাহা হইলে মুদ্গ পরমাণু হইতে মসুর সৃষ্ট হইতেও পারিত। কিন্তু তাহা কখনই হয় না, কারণ অণুতেই রহিয়াছে বিশেষ। বর্তমান কালের আণবিক গুরুত্বের পার্থক্যও এই ধরণের পরমাণুস্থিত একপ্রকার বিশেষত্ব। পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই চারি প্রকারের পরমাণুপুঞ্জ হইতে সৃষ্ট হয় চরাচর সমস্ত জগৎ। কিন্তু ঐ পরমাণুপুঞ্জ হইতে বিভিন্ন বস্তু সৃষ্টি হওয়া সম্ভবপর হয় এই 'বিশেষ' পদার্থের প্রভাবে। বিশেষই পার্থিব প্রভৃতি একই প্রকার পরমাণুজাত যে কোনো দুইটি পদার্থের মধ্যে ফলগত ও স্বরূপগত পার্থক্য সাধন করিয়া থাকে।

'সপ্তপদার্থবাদী'

পদার্থজ্ঞানই নিঃশ্রেয়সলাভে সহায়ক

পরমাণু

'বিশেষ'

বিশেষের প্রয়োজনীয়তা

সূত্রাকারে লিখিত বৈশেষিকদর্শন সম্ভবত বুদ্ধেরও পূর্ববর্তীকালে

লিখিত।[১] শোনা যায় যে, প্রাচীনকালে ইহার উপর দুইটি টীকা লেখা হইয়াছিল—'রাবণভাষ্য' ও 'ভরদ্বাজভাষ্য'। এই গ্রন্থগুলি এখন পাওয়া যায় না। ইহা ছাড়া 'ব্যোমবতী' (ব্যোমশেখরাচার্যের লেখা), 'ন্যায়কন্দলী' (শ্রীধরের লেখা), 'কিরণাবলী' (উদয়নাচার্যের) এই বৈশেষিক-সূত্রের উপরই টীকামাত্র। প্রশস্তপাদের লেখা 'প্রশস্তপাদভাষ্য' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ন্যায়সূত্রের টীকাই শুধু নহে[২]; বৈশেষিকদর্শনের সারমর্ম অবলম্বনে লিখিত ইহা একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ। ইহারই টীকার নাম 'ন্যায়কন্দলী'। প্রশস্তপাদভাষ্যের উপর আরও দুইখানি টীকা লেখা হয়, তাহাদের নাম 'ভাষ্যসূক্তি' ও 'কণাদরহস্য'। ১৫শ শতকের শঙ্কর-মিত্র বৈশেষিক সূত্রগুলির একটি টীকা লিখিয়াছিলেন—তাহার নাম, 'উপস্কার'।

বৈশেষিকের টীকা-টিপ্পনী প্রভৃতি

এই সকল গ্রন্থের মধ্যে 'ন্যায়কন্দলী'ই অতি প্রসিদ্ধ। খৃষ্টীয় ১০ম শতকে শ্রীধর ইহা লিখিয়াছিলেন।

'ন্যায়কন্দলী'

পরবর্তী যুগে বৈশেষিকদর্শন ন্যায়দর্শনের সহিত মিশিয়া যায় এবং তাহার স্বতন্ত্রতা হারাইয়া ন্যায়দর্শনের সহিত একীভূত হইয়া 'ন্যায়বৈশেষিক' এই প্রসিদ্ধি লাভ করে[৩]।

'ন্যায়বৈশেষিক'

প্রশস্তপাদের 'পদার্থধর্মসংগ্রহ' অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহার প্রামাণিক টীকাকার উদয়নাচার্য স্বকৃত টীকায় বলিয়াছেন যে সূত্র অত্যন্ত কঠিন, ভাষ্য অত্যন্ত বিস্তৃত, এইজন্য সরলতা ও সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে 'পদার্থধর্মসংগ্রহ' রচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে সমস্ত বৈশেষিক দর্শনের তাৎপর্য সংক্ষেপে ও যোগ্যতার সহিত সংগৃহীত আছে। ইহা ছাড়া মূলদর্শনে বলা হয় নাই যে জগতের সৃষ্টিসংহারপ্রণালী, তাহাও ইহাতে সমীচীনভাবেই দেখান হইয়াছে। পরবর্তী গ্রন্থসকলের মধ্যে বল্লভাচার্যের ন্যায় লীলাবতী একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। বর্ধমানের 'কিরণাবলী প্রকাশ', 'লীলাবতী প্রকাশ' এবং মথুরা তর্কবাগীশের 'কিরণাবলীরহস্য' ও 'লীলাবতীরহস্য'

'পদার্থধর্মসংগ্রহ'

১। An Intro to Class. Sanskrit (1st edn) p. 200

২। Ibid

৩। History of Philosophy : E & W I p. 232

প্রশংসিত টীকা। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন কণাদসূত্রবিবৃতি নামে বৈশেষিক-দর্শনের এক সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যাখ্যার শেষভাগে তিনি ভাষাপরিচ্ছেদ ও সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর রীতি অনুসারে বৈশেষিকদর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়ের যে সারসংগ্রহ যোজনা করিয়াছেন, পাঠার্থীদিগের পক্ষে তাহা উপাদেয়। বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত এক বৈশেষিক বার্তিক পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার প্রচার বিশেষ কিছু হয় নাই।

বৈশেষিকদর্শন দশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ে আছে দুইটি করিয়া 'আহ্নিক': সমস্ত দর্শনে আছে ৩৭০টি সূত্র। মন দিয়া বৈশেষিকের সূত্র, অধ্যায় ও বিষয়বিভাগ বিচার করিলে দেখা যায় যেন ইহার মধ্যে পাশাপাশি দুইটি চিন্তার সূত্র পরস্পরকে জড়াইয়া চলিয়াছে। এই দর্শনের আরম্ভ "ধর্মকে ব্যাখ্যা করিব,"[১] বলিয়া। যাহা হইতে 'নিঃশ্রেয়স' ও 'অভ্যুদয়' লাভ হয় তাহাই 'ধর্ম'। ইহার পর ষষ্ঠ অধ্যায়ে রীতিমত বৈদিক ধর্মের আলোচনা চলিয়াছে[২]। দান, শ্রাদ্ধ, ভোজন, প্রতিগ্রহ ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিগত অনেক বিষয়ের আলোচনাই হইয়াছে। কর্মের ফল কতক দৃষ্ট আর কতক অদৃষ্ট অর্থাৎ পরলোকে প্রাপ্য—একথাও বলা হইয়াছে। এই সমস্তই কিন্তু মীমাংসা দর্শনের বিষয়বস্তু। আবার ঈশ্বরের রচনা বলিয়া বেদ 'প্রমাণ'—এই বলিয়া এই দর্শনের সমাপ্তি ঘটিয়াছে। তাই আরম্ভ, ষষ্ঠ অধ্যায় এবং দশমের শেষ একত্রে লইলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বৈশেষিক দর্শন বৈদিক ধর্মের ব্যাখ্যা—মীমাংসা জাতীয় দর্শন। কিন্তু অন্যান্য বাকি অধ্যায়গুলিতে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে দ্রব্য, গুণ ইত্যাদি পদার্থ। এই দুইটি বিষয়ের সম্বন্ধ তো খুব ঘনিষ্ঠ নয়। অথচ বৈশেষিক ধর্মব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ষট্‌পদার্থের ব্যাখ্যায় ডুবিয়া গিয়াছে। অধ্যাপক উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ইহাকে "বৈশেষিকের দোটানা" আখ্যা দিয়াছেন[৩]।

এই দর্শনের আলোচ্য বিষয়

ইহার 'দোটানা'

১। অথাতো ধর্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

২। দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা ১ম খণ্ড

৩। ভারত দর্শনসার

দর্শনগুলির মধ্যে বৈশেষিক যে সহজ তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। ইহাতে সূক্ষ্ম বিচার বিশেষ নাই এবং উচ্চাঙ্গের কল্পনাবিলাসও নাই। সব বস্তুরই প্রায় বিচার হইয়াছে, কিন্তু কাহারও বিচার দীর্ঘ বা জটিল হয় নাই। সন্তদাস বাবাজীর মতে[1] বৈশেষিক বালকদের মনে দার্শনিক জিজ্ঞাসা উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টামাত্র, ইহা পূর্ণাবয়ব দর্শনই নহে—আর তর্কবিচারে বৈশেষিক ন্যায় বা বেদান্তের তুলনায় শিশু মাত্র।

ইহা সহজতর দর্শন

প্রমাণ সম্বন্ধে বৈশেষিক বলিয়াছে 'তদ্বচনাৎ আম্নায়স্য প্রামাণ্যম্'[2]—ঈশ্বর কর্তৃক উক্ত বলিয়াই বেদ প্রমাণ। এই উক্তি দুই স্থলে আছে দেখা যায়। এই হিসাবে শ্রুতি বা শব্দ একটি প্রমাণ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কণাদ স্বীকার করিয়াছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন দুইটি 'প্রমাণ'—'প্রত্যক্ষ' ও 'অনুমান'। শব্দাদি অন্য সকল প্রমাণকে এই দুই-টিরই অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ৯।২।৩ সূত্রেই বৈশেষিক শব্দপ্রমাণের বিচার শেষ করিয়াছে।

প্রমাণ

শব্দকে পৃথক্ প্রমাণ হিসাবে স্বীকার না করিলেও কণাদ বেদবিরোধী ছিলেন না। বেদে যাহা পাওয়া যায়, সকলই সত্য। কিন্তু বেদস্থ শব্দার্থের সম্বন্ধ বা সাহিত্য হইতেই আমরা জানিতে পারি বেদের বক্তব্য—অতএব ঐটি অনুমানই, পৃথক 'প্রমাণ' নহে। প্রশস্তপাদ শব্দকে বলিয়াছেন 'বক্তৃপ্রামাণ্যসাপেক্ষ' অর্থাৎ বক্তা বিশ্বাসযোগ্য হইলে শব্দের প্রামাণ্য স্বীকার করা যাইতে পারে। বেদ ঈশ্বরের মুখের কথা বলিয়াই প্রমাণ।

বেদ পৃথক্ প্রমাণ নহে

বৈশেষিক দর্শন আরম্ভ হইয়াছে 'অথাতো ধর্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ'[3] বলিয়া, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু নিঃশ্রেয়সলাভের উপায় যে ধর্ম তাহার বিশদ ব্যাখ্যা না করিয়া সূত্রকার যে শেষ পর্যন্ত পদার্থের আলোচনায় ডুবিয়া গিয়াছেন এবং উহাই তাঁহার দর্শন, তাহাও পূর্বে দেখাইয়াছি। ষষ্ঠ

পদার্থের আলোচনাই এই দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য

১। দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা ১ম খণ্ড

২। সূত্র ১।১।৩

৩। „ ১।১।১

অধ্যায়ে অবশ্য ধর্মের কিছু আলোচনা যে নাই তাহা নহে, তবুও কণাদের লক্ষ্য ও বক্তব্যের মধ্যে আপাতবিরোধ আছে বলিয়াই মনে হয়।

মহর্ষি কণাদ ষট্‌পদার্থবাদী কি সপ্তপদার্থবাদী—সে বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। উদ্দেশ্যসূত্রে[১] ইনি ছয়টি পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়। নিবৃত্তিলক্ষণরূপে ধর্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এই ছয়টি পদার্থ। ইহাদের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যরূপে অর্থাৎ কোন্ ধর্ম কোন্ কোন্ পদার্থের বিরুদ্ধ ধর্ম—এইরূপে তত্ত্বজ্ঞান বা যথার্থ জ্ঞানের সাক্ষাৎকার হইলেই 'নিঃশ্রেয়স' লাভ হয়। এই সূত্রে কণাদ অভাবের উল্লেখ না করিলেও অন্যস্থলে অভাবের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ইহাই মতভেদের প্রকৃত কারণ।

কণাদ ষট্‌পদার্থবাদী, না, সপ্তপদার্থবাদী

মতভেদের কারণ

ন্যায়ভাষ্যকার কণাদকে ষট্‌পদার্থবাদী বলিয়াই বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন। ন্যায়মতে প্রমেয় পদার্থগুলির ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন—'অস্ত্যন্যদপি দ্রব্যগুণকর্মসামান্যবিশেষসমবায়াঃ প্রমেয়ম্।' বৈশেষিক দর্শনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই নিশ্চয় এই উক্তি করা হইয়াছিল। সাংখ্যসূত্রকারের মতেও বৈশেষিক ষট্‌পদার্থবাদীই।

কণাদ ষট্‌পদার্থবাদীই

শুধু কণাদই নহেন, সাংখ্য ও মীমাংসাদি দর্শনকারদের মতেও 'অভাব' নামে অতিরিক্ত কোনো পদার্থ নাই, অথচ তাঁহাদের দর্শনে অভাবের বিস্তর উল্লেখ দেখা যায়। অভাব নামক কোনো পদার্থ না থাকিলে অভাবের উল্লেখ কেন রহিয়াছে,—এ রহস্যের সমাধান এক কুমারিল ছাড়া আর কেহই করিতে পারেন নাই। তাঁহার মতে, কোনোরূপ বৈলক্ষণ্যের অভিপ্রায়ে এক ভাবপদার্থই অপর ভাবপদার্থের অভাবরূপে ব্যবহৃত হয়। এই অভাব আকাশকুসুমের ন্যায় অলীকও নহে, অপর একটি পদার্থও নহে। অভাব একটি পদার্থ বটে, কিন্তু ছয় পদার্থের অতিরিক্ত ইহা আর একটি পদার্থ নহে।

অভাব কোনো অতিরিক্ত পদার্থই নহে

১ বৈশেষিকসূত্র ১।১।৪

যে সকল আচার্য কণাদকে ষট্‌পদার্থবাদী মনে করিয়াছেন, তাঁহাদের মত উপরে দেখান হইল। এখন যাঁহারা তাঁহাকে সপ্তপদার্থবাদী বলিয়াছেন, তাঁহাদের যুক্তি দেখান হইতেছে। প্রশস্তপাদই এই মতের প্রবর্তক বলিয়া মনে হয়। অন্তত তাঁহার গ্রন্থেই প্রথম কণাদকে সপ্তপদার্থবাদী বলা হইয়াছে। তিনি বলেন, দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ এবং সমবায় পদার্থ এবং অভাব সপ্তম পদার্থ। কণাদের দর্শনের আলোচনা করিলে অভাব পদার্থও মানিতে হয় বলিয়া অভাব সপ্তপদার্থরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। বল্লভাচার্যের মতে, 'অভাবশ্চ বক্তব্যো নিঃশ্রেয়সোপযোগিত্বাৎ ভাবপ্রপঞ্চবৎ। কারণাভাবেন কার্যাভাবস্য সর্বসিদ্ধত্বাদুপযোগিত্বসিদ্ধঃ।' 'অভাবশ্চ বক্তব্যঃ' এই উক্তির দ্বারা যেন জোর করিয়া কণাদের মুখ হইতে অভাবেরও কথা বাহির করাইয়া লওয়া হইয়াছে। কিরণাবলীকার বলিয়াছেন—'এতে চ (ষট্‌-) পদার্থাঃ প্রধানতয়োদ্দিষ্টাঃ। অভাবস্তু স্বরূপবানপি নোদ্দিষ্টঃ প্রতিযোগিনিরূপণাধীননিরূপণত্বাৎ, ন তু তুচ্ছত্বাৎ।' ঘটের অভাব, পটের অভাব ইত্যাদি স্থলে প্রতিযোগিভেদেই অভাবের ভেদ হয়। এইজন্যই অভাবের প্রতিযোগিস্বরূপ ষট্‌পদার্থের কথা উদ্দেশ্যসূত্রে বলা হইয়াছে।

কণাদ সপ্তপদার্থবাদী কোন্ যুক্তি অনুসারে ?

পরবর্তী সকল বৈশেষিক গ্রন্থেই অভাবের সপ্তমপদার্থত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে। আজকাল এই মতের একাধিপত্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতএব আমরা এই আলোচনায় অভাবকে সপ্তম পদার্থ ধরিয়াই অগ্রসর হইবে।

পরবর্তী বৈশেষিক গ্রন্থাদিতে অভাবের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়

মুক্তির জন্য আত্মার শ্রবণ ও মনন প্রভৃতি বিহিত এবং মনন অনুমানসাধ্য। অনুমান ব্যাপ্তিজ্ঞানাধীন আর ব্যাপ্তিজ্ঞান আবার পদার্থতত্ত্বজ্ঞানসাপেক্ষ। সুতরাং পদার্থতত্ত্বজ্ঞান পরম্পরাভাবেই মুক্তির কারণ।

পদার্থতত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির কারণ

দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়কে বলা হয় 'ভাবপদার্থ', আর অনুদ্দিষ্ট সপ্তমপদার্থই 'অভাব'। যে পদার্থে কোনো না কোনো একটি গুণ অবশ্যই থাকে তাহাকে বলে দ্রব্য। অথবা যে পদার্থে থাকে দ্রব্যত্বজাতি তাহার নামও 'দ্রব্য'। যে সামান্য (জাতি)

সাতটি পদার্থ

গুণবৃত্তি না হইয়া গগনবৃত্তি, তাহাই 'দ্রব্য'। সত্তা দ্রব্য নহে, কারণ তাহাতে গুণবৃত্তিও থাকে। দ্রব্য নয় প্রকার—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, কাল, দিক্, আত্মা ও মন। ক্ষিতি, অপ্ তেজ, মরুৎ ও ব্যোমকে আমরা পঞ্চভূত বলি। ইহাদের সাধারণ সংজ্ঞাও 'ভূত'ই। পৃথিবীর গন্ধ, জলের রস, তেজের রূপ, বায়ুর স্পর্শ ও আকাশের শব্দই বিশেষ বিশেষ গুণ। যেহেতু ঐ সকল গুণ বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সেজন্য এগুলিকে 'ভূত' আখ্যা দেওয়া হয়। জ্ঞান আত্মার বিশেষ গুণ হইলেও উহা মনোগ্রাহ্য বলিয়া উহাকে 'ভূত' বলা যায় না।

দ্রব্য ৯ প্রকার

যাহাতে গন্ধ আছে (অর্থাৎ গন্ধের অত্যন্তাভাব যাহাতে নাই), অথবা যাহাতে পৃথিবীত্বজাতি আছে তাহাই 'পৃথিবী'। সত্তা, দ্রব্যত্ব ও গুণত্বাদি জাতিকে পৃথিবীত্ব বলা যায় না। ফলপুষ্প প্রভৃতি সকলই পাথিব পদার্থ। পৃথিবী ভিন্ন অপর কোন দ্রব্যের গন্ধ নাই। উহাই পৃথিবীর differentia ; জল ও বায়ুতে গন্ধের উপলব্ধি জন্মে না।

পৃথিবী

পৃথিবীপদার্থ আবার দুই প্রকার—নিত্য ও অনিত্য। পরমাণুই নিত্য পৃথিবী, তদ্ভিন্ন সমস্ত পৃথিবীই অনিত্য। পরমাণু প্রত্যক্ষ নহে, কিন্তু অনুমেয়। অনুমানের প্রণালী এইরূপ :—ঘটাদি সমস্ত বস্তুই সাবয়ব। উৎপন্ন দ্রব্যমাত্রেই সাবয়ব, নিরবয়ব নহে। সাবয়ব দ্রব্যের অবয়বপরম্পরায় বিশ্রাম অবশ্যই আছে। ঘটের অবয়ববিভাগ করিতে গেলে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতর হইতে সূক্ষ্মতম অবয়বে উপনীত হইবার পর এমন অবয়ব উপস্থিত হয়, যাহার বিভাগ অসম্ভব। যাহার বিভাগ হয় না, যাহা অভেদ্য তাহাই পরমসূক্ষ্ম, তাহাই বৈশেষিকের পরমাণু।

পৃথিবী ২ প্রকার

পরমাণুনির্ণয়ে অনুমান প্রণালী

অবিভাজ্য সূক্ষ্মতম বস্তুর অংশই পরমাণু

পরমাণুর উৎপত্তি হয় না। পরমাণু নিরবয়ব ; যুক্তির জন্য যদি ইহারও অবয়ব আছে স্বীকার করা হয়, তবে তাহার অবয়ব হইবে পরমাণুই। এই যুক্তি অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত সকল বস্তুই অনন্তাবয়ব বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

অতএব সর্বসূক্ষ্মতম অবয়বের অর্থাৎ পরমাণুর অবয়ব নাই, উহা নিরবয়ব স্বীকার করিতেই হইবে। নিরবয়ব দ্রব্য উৎপত্তিবিনাশহীন। যাহার উৎপত্তিবিনাশ নাই তাহাকেই তো আমরা বলি নিত্য। অতএব সর্বসূক্ষ্মতম অবয়ব বা পরমাণু নিত্য।

পরমাণু নিরবয়ব ও নিত্য

উপরের যুক্তির ধারা হইতেই বুঝা যায় যে, পরমাণু ভিন্ন অপর সকলই সাবয়ব। দ্ব্যণুক হইতে আরম্ভ করিয়া মহাবয়বী বা অন্ত্যাবয়বী ঘটপটাদি পর্যন্ত সকল বস্তুই 'সাবয়ব'। দুইটি পরমাণুর সংযোগে হয় 'দ্ব্যণুক'। আর তিনটি দ্ব্যণুকের সংযোগে 'ত্রসরেণু'। আমাদের এই দ্ব্যণুক হইতে মহাবয়বীর অবয়ব পর্যন্ত অবয়বসকলের সাধারণ নাম 'molecule'; আমাদের শাস্ত্রমতে যাহা পরমাণু তাহাই বিজ্ঞানশাস্ত্রের 'atom'; কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞানে atomকেও বিভাগ করা হইয়াছে।

দ্ব্যণুক ও ত্রসরেণু

পরমাণু ও atom

অনিত্য পৃথিবী শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ভেদে তিনপ্রকার। শরীর ভোগায়তন, ইন্দ্রিয় ভোগকরণ এবং বিষয়ের উপলব্ধিই ভোগ। শরীর দুই প্রকার—যোনিজ এবং অযোনিজ। যোনিজ শরীর আবার জরায়ুজ এবং অণ্ডজ ভেদে দ্বিবিধ। অযোনিজ শরীরও স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জভেদে দ্বিবিধ। বৃক্ষাদিতেও জীবাত্মা আছে। ইহাই বৈশেষিকের ঘোষণা।

পৃথিবী আবার ৩ প্রকার

ঘ্রাণেন্দ্রিয় পার্থিব, কেননা তাহার দ্বারা গন্ধের অনুভব হয়। ইন্দ্রিয়মাত্রই অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। নাসিকা ঘ্রাণেন্দ্রিয় নহে, উহা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের স্থানমাত্র। ঘ্রাণেন্দ্রিয় পরিষ্কৃত পার্থিব অংশবিশেষ মাত্র।

স্নেহ নামক যে গুণ দ্রব্যে আছে তাহার নাম অপ্ (জল)। জল ভিন্ন আর কোনো দ্রব্যের স্নেহগুণ নাই। তৈলাদিতে যে স্নেহগুণ আছে তাহাও জলীয়, অর্থাৎ তৈলাদির অভ্যন্তরস্থ জলভাগের এই গুণ। যে দ্রব্যে আছে জলত্বজাতি তাহাই জল। ইহা নিত্য ও অনিত্য ভেদে দুই প্রকার। জলীয় পরমাণু নিত্য, তদ্ভিন্ন সমস্ত জলই অনিত্য। অনিত্যজল আবার ত্রিবিধ—শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। জলপরমাণু শরীরের

অপ্: দ্বিবিধ

আরম্ভক যেমন পার্থিব পরমাণু শরীরের আরম্ভক। জলীয় ইন্দ্রিয় আমাদের রসনা। রসনেন্দ্রিয় রসের অভিব্যঞ্জক। অতএব উহাও জলীয়। শরীর ও ইন্দ্রিয় ভিন্ন সমস্ত জলের সাধারণ নাম বিষয়।

তেজঃ দ্বিবিধ

যে দ্রব্যে রস নাই, আছে রূপ, তাহার নাম তেজ। যে দ্রব্যে আছে তেজত্ব-জাতি, তাহার নাম তেজ। রূপই তেজের Differentia। তেজ দুই প্রকার: নিত্য ও অনিত্য। পরমাণুরূপ তেজ নিত্য, তদ্ভিন্ন সমস্ত তেজ অনিত্য। শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ভেদে আবার অনিত্য তেজ তিন প্রকার। সূর্যলোকস্থিত প্রাণীদিগের শরীর তেজস, চক্ষুরিন্দ্রিয় তেজস, আলোক তেজস। শরীর ও ইন্দ্রিয় ভিন্ন সমস্ত তেজ 'বিষয়' নামে প্রসিদ্ধ।

বায়ু: দ্বিবিধ

যে দ্রব্যে রূপ নাই, আছে স্পর্শ, তাহাই বায়ু। স্পর্শই বায়ুর Differentia। নিত্য ও অনিত্যভেদে বায়ু দুই প্রকার। বায়বীয় পরমাণু নিত্য, তদ্ভিন্ন বায়ু অনিত্য। শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় ভেদে আবার অনিত্য বায়ু ত্রিবিধ। ত্বগিন্দ্রিয় স্পর্শমাত্রের অভিব্যঞ্জক বলিয়া উহা বায়বীয়।

আকাশ

শব্দের আশ্রয় দ্রব্যের নাম আকাশ। শব্দই আকাশের Differentia[১]। শব্দের উৎপত্তির জন্য বায়ুর অপেক্ষা থাকিলেও বায়ু শব্দের আশ্রয় বা অধিকরণ নহে। বায়ু থাকিতেও তো শব্দ নষ্ট হইয়া যায়—ইহা আমরা দেখিতে পাই। কোনো কোনো বৈজ্ঞানিকের মতে বায়ুহীন প্রদেশেও শব্দ হওয়া সম্ভব। সুতরাং শব্দ বায়ুর গুণ নহে বুঝা গেল। সমস্ত শব্দ আকাশে বা Ether-এ বিলীন হয়, ইহাই বিজ্ঞানশাস্ত্রের ঘোষণা। শব্দগ্রহণের হেতু শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশরূপ। কর্ণচ্ছিদ্রপ্রদেশবিশিষ্ট আকাশের নামই শ্রবণেন্দ্রিয়।

কাল, দিক্

যে দ্রব্য দ্বারা 'এ জ্যেষ্ঠ, এ কনিষ্ঠ' এইরূপ ব্যবহার সূচিত হয়, তাহার নাম কাল। পূর্বপশ্চিম প্রভৃতি ব্যবহারের কারণ দ্রব্যবিশেষের নাম দিক্। আকাশ কাল ও দিকের বহুত্ব ঔপাধিক, বস্তুত উহারা একই। ঘটাকাশ, মঠাকাশ প্রভৃতি আকাশের ঔপাধিকভেদ মাত্র।

১। 'শব্দগুণং বৈ আকাশম্'।

জ্ঞানের আশ্রয় দ্রব্য আত্মা—পরমাত্মা বা ঈশ্বর ও জীবাত্মাভেদে ইহা দুই প্রকার। বিশ্বের স্রষ্টারূপে ঈশ্বর অনুমেয়, আর আমিত্ব-বোধে জীবাত্মা মানসপ্রত্যক্ষসিদ্ধ। শরীরভেদে জীবাত্মা ভিন্ন। বুদ্ধি, সুখ প্রভৃতি ইহার ১৪টি গুণ।

আত্মা : দ্বিবিধ

জীবাত্মা এবং সুখদুঃখাদি প্রত্যক্ষকরণের নাম মন। যাহা সুখাদি উপলব্ধির কারণ তাহাই মন। মন বহিরিন্দ্রিয় নহে, উহা অন্তরিন্দ্রিয় বা অন্তঃ-করণ। রূপাদি বাহ্য বিষয়ের উপলব্ধির জন্য যেমন প্রয়োজন বহিরিন্দ্রিয়ের, সুখাদি আন্তর বিষয়ের উপলব্ধির জন্যও সেইরূপ অন্তরিন্দ্রিয়ের প্রয়োজন। এককালে পঞ্চেন্দ্রিয়জনিত চাক্ষুষাদি পঞ্চ-প্রকার জ্ঞান হয় না, উহার কোনো একটির জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। তাহার কারণ যে ইন্দ্রিয়ের সহিত মনঃসংযোগ ঘটে, সেই ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানটিই জন্মিয়া থাকে। এইজন্যই মনকে স্বীকার করিতে হয়। যে কারণে মনকে স্বীকার করিয়াছি, সেই কারণেই মনের অণুত্ব স্বীকার করিতে হয়, কারণ তাহা না হইলে মনেরও মহত্ত্ব আসিয়া পড়ে। মনের ধর্ম অণুত্ব, মন ধর্মী। যে প্রমাণ বলে মন সিদ্ধ হইয়াছে, সেই প্রমাণবলে মনের অণুত্বও সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব মনের মহত্ত্ব-কল্পনা অসম্ভব। মন আশুসঞ্চারী বলিয়া তাহার সংযোগক্রম এবং তাহার ফলে জ্ঞানক্রম এতই দুর্লক্ষ্য যে, তাহা বোধগম্যই হয় না। এইজন্যই এককালে একাধিক জ্ঞান হইয়াছে মনে হয়। কিন্তু এ ধারণা ভ্রমাত্মক।

মন

বৈশেষিকমতে চারিপ্রকার পরমাণু এবং আকাশ প্রভৃতি পাঁচটি দ্রব্য নিত্য। তদ্ভিন্ন দ্ব্যণুক হইতে ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ু অনিত্য। ইহাদের অর্থাৎ অনিত্য দ্রব্য সকলের সৃষ্টি ও সংহার হয়।

কণাদের দ্রব্যপদার্থ সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। রাসায়নিক পণ্ডিতবর্গ জড় পদার্থ বা ভূতকে প্রায় ১০০টি প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু কণাদ ও গোতমের মতে ভূতপদার্থ ৫টি। এজন্য কণাদের মতকে অনেকে 'পঞ্চভূতের মত' বলিয়া উপহাস করেন। কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে কণাদ ও গোতম জগৎ-নির্মাণের ও জাগতিক ব্যবহারের উপযোগী যাবতীয় জড় পদার্থকে পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করিয়া গিয়াছেন।

ভূত ও Elements

রাসায়নিক পণ্ডিতগণ কিন্তু যে সকল পদার্থের বিশ্লেষণ করিতে পারেন নাই, তাহাকেই element নাম দিয়া একশ প্রকারে ভাগ করিয়া গিয়াছেন। রসায়ন-শাস্ত্রে ভূত শব্দের অর্থ element বা মৌলিক পদার্থ, কণাদের 'ভূতের' অর্থ যে কি তাহা পূর্বেই দেখাইয়াছি। রাসায়নিকের elementগুলিকে পুনরায় বিশ্লেষণ করিলে এই ৫টি ভূতই শেষ পর্যন্ত থাকে।

জাগতিক বস্তুমাত্রই 'ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুৎ'-এর কার্য, কিন্তু আকাশ কোনো দ্রব্যের আরম্ভক নহে। আকাশ বিভু বা সর্বগত। জাগতিক কোনো পদার্থই আকাশসম্পর্কশূন্য নহে, আকাশের সহিত ওতপ্রোতভাবে সংবদ্ধ। সুতরাং জাগতিক পদার্থ নির্বাচন করিবার সময় আকাশকে উপেক্ষা করা যায় না। কণাদ প্রভৃতির মতে আকাশ শব্দের আশ্রয়। আকাশ ভিন্ন শব্দ হইতে পারে না। রাসায়নিক পণ্ডিতেরা রসায়ন প্রক্রিয়ানুসারে অবিশ্লেষণীয় যে ১০৫টি মৌলিক ভূতের বা পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন, কে বলিতে পারে যে আজকালের সংখ্যাবৃদ্ধির ন্যায় ভবিষ্যৎ কালে সংখ্যাহ্রাস হইয়া তাহা পঞ্চভূতে পর্যবসিত হইবে না?

বৈশেষিক প্রভৃতির মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা বা ঈশ্বর সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ হইলেও উভয়েরই জ্ঞান বা চেতনা আছে। কোনো কোনো নৈয়ায়িক জ্ঞানবত্ত্ব-রূপ উভয়সাধারণধর্ম অবলম্বন করিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে এক শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা জড়বর্গকে অবস্থানুসারে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—Solid, liquid, gas, ether and energy। তাহা হইলে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের মতেও প্রকারান্তরে পদার্থসকল পাঁচশ্রেণীতেই বিভক্ত। বিজ্ঞানের

বিজ্ঞানমতে পদার্থের অবস্থাগত ও শ্রেণীগত বিভাগ

ক্ষিতি : Solid

Solid-এর লক্ষণ—নিরেট, কঠিন, ঘন, দৃঢ় ও সংহত। কণাদের ক্ষিতি ও বিজ্ঞানের Solid এক পদার্থই নয় কি? কঠিনস্পর্শ ক্ষিতি ভিন্ন তো অপর পদার্থের ধর্ম নহে। ইহা বৈশেষিকদিগের অবিসংবাদী সিদ্ধান্ত।

সাধারণত ক্ষিতিপদার্থ ঘন হইলেও কোনো কোনো পার্থিব পদার্থ আগ্ন-

সংযোগে সাময়িক তরলতা বা দ্রবত্ব লাভ করিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক liquid চলনশীল, তরল ও দ্রব। কণাদের অপ্‌পদার্থও ঐরূপ। বৈজ্ঞানিক এনার্জির (Energy) অন্যতম ধর্ম প্রকাশ ও তাপ, কণাদের তেজ পদার্থের ধর্মও প্রকাশ ও উষ্ণস্পর্শ বা তাপ। বৈজ্ঞানিক gas কণাদের বায়ু ভিন্ন কিছুই নহে, কারণ গ্যাস ও বায়ু উভয়ই তির্যগ্‌গমনশীল। বৈজ্ঞানিক Ether-শব্দের আভিধানিক অর্থ আকাশ, শূন্য, সম্পাদনশীল, নীরূপ ও সর্বব্যাপী। ইথারও বিভু একমাত্র, কণাদের আকাশও নীরূপ, সর্বব্যাপী ও একমাত্র।

অপ্: Liquid
তেজ: Energy
মরুৎ: Gas
ব্যোম: Ether

বৈজ্ঞানিক ইথার কণাদের আকাশ পদার্থ কিনা, দেখা প্রয়োজন। বিজ্ঞান-শাস্ত্রানুযায়ী ether শব্দের অধিকরণ নহে, পৃথিবী প্রভৃতিই শব্দের অধিকরণ। আকাশই বেদান্তাদি দর্শনের মতে শব্দের আকর। কণাদ বলেন, শব্দ একটি বিশেষ গুণ, পৃথিবী প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যের স্পর্শগুণ আছে, তাহার একটি বিশেষ গুণ, কারণ গুণ-পূর্বক হইয়া থাকে।

শব্দের অধিকরণ মৃদঙ্গ প্রভৃতি নহে। মৃদঙ্গ প্রভৃতিতে আঘাত করিলে সেই প্রদেশস্থ আকাশে শব্দের উৎপত্তি হয়। আকাশ সর্বব্যাপী। কঠিন কাষ্ঠের একদিকে অভিঘাত করিলে অপর দিকে শব্দ শোনা যায়। বৈজ্ঞানিক মতে ether-এর স্পন্দন আছে, বৈশেষিক মতে আকাশে কোনও ক্রিয়া নাই। সূত্রকার দ্রব্যপদার্থের মধ্যে আকাশের পরিগণনা করিয়াছেন, অথচ দ্রব্যের সাধারণ লক্ষণ যে ক্রিয়া, স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন।

আকাশ শব্দগুণ

কণাদ কাল ও দিক্‌পদার্থ মানিয়াছেন, তাহা কেন মানিতে হইবে তাহার কারণও প্রদর্শন কারয়াছেন; কিন্তু কাল ও দিক্‌পদার্থ প্রকৃতপক্ষে পঞ্চভূতের অতিরিক্ত বলিয়া ·ণাদের অভিপ্রেত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কণাদ প্রথমত পৃথিবী, অপ্, তেজ ও বায়ুর লক্ষণ নির্দেশ ও অপ্রত্যক্ষ বায়ুপদার্থের সাধন এবং তাহার নানাত্ব সংস্থাপন করিয়া শব্দগুণের অধিকরণরূপে আকাশের অনুমান করিয়াছেন। আকাশ যে এক, বহু নহে, ইহাও সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। বায়ু, পৃথিবী, অপ্ ও তেজের লক্ষণ স্পর্শাদির পরীক্ষা

কাল ও দিক্‌পদার্থ কি পঞ্চভূতের অতিরিক্ত?

করিয়া কাল ও তাহার একত্ব এবং দিক্ ও তাহার একত্ব স্থাপন করিয়া এক পদার্থেরও কার্যভেদে ঔপাধিক ভেদ হইয়া থাকে, ইহা বলার পর দিক্‌পদার্থ এক হইলেও ঔপাধিকভেদে পূর্বদক্ষিণ প্রভৃতি ব্যবহারভেদ সমর্থন করিয়া আকাশের বিশেষ গুণ শব্দের পরীক্ষা করিয়াছেন। তাহার পর আত্মা ও মনের পরীক্ষা করা হইয়াছে।

কণাদের মতে আকাশ, কাল ও দিক্ এক পদার্থই

সূত্রকার কেবল দিক্‌পদার্থেরই ঔপাধিক ভেদ কেন প্রদর্শন করিলেন, কাল ও আকাশের ঔপাধিক ভেদ কেন দেখাইলেন না—এই প্রশ্ন স্বতই উঠে। কেবল তাহাই নয়, কাল ও আকাশের উপাধিক ভেদ না দেখানর জন্য সূত্রকারের ন্যূনতাও বোঝা যায়। এজন্য মনে হয় যে সূত্রকারের অভিপ্রায় স্বতন্ত্র। তাঁহার মতে আকাশ, কাল ও দিক্ এক পদার্থ, কার্যভেদে নামভেদমাত্র। একই পদার্থ কার্যভেদে আকাশ, কাল ও দিক্ নামে অভিহিত হয়। প্রকৃতপক্ষে কাল ও দিক্ আকাশ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। পৃথিবী প্রভৃতির লক্ষণ আকাশে নাই, অর্থাৎ আকাশ পৃথিবী প্রভৃতির অন্তর্গত হইতে পারে না, উহা পৃথিব্যাদি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ।[১]

শব্দের অধিকরণ আকাশ

আকাশপদার্থের বিষয়ে বক্তব্য শেষ করিয়া আকাশের বিশেষগুণ শব্দের পরীক্ষা করিয়াছেন। কারণ ধর্মিনিরূপণের পরেই ধর্ম নিরূপণ করা সর্বথা যুক্তিযুক্ত। কাল ও দিক্ যে বস্তুত আকাশ হইতে অতিরিক্ত নহে, সূত্রকারের এইরূপ বর্ণনা করার আরও হেতু আছে। তাহা এই যে শব্দের অধিকরণ বা আশ্রয় আকাশ। শব্দ আত্মা বা

শব্দ আত্মার গুণ নহে, মনেরও নহে

মনের গুণ নহে, কারণ আত্মার গুণ জ্ঞান সুখ প্রভৃতি আত্মসমবেত, শব্দ আত্মসমবেত নহে। সুতরাং শব্দ আত্মার গুণ হইতে পারে না। শব্দ আত্মসমবেত হইলে 'আমি জানিতেছি', 'আমি সুখী' এইরূপ বোধ হইত, কিন্তু তাহা তো হয় না। অতএব শব্দ আত্মার গুণ নয়। শব্দ মনেরও গুণ নয়, কারণ শব্দের প্রত্যক্ষ হয়। মনের গুণ প্রত্যক্ষ হয় না। কেননা মন যে অণু। সেজন্য, শব্দ যখন পৃথিবী, অপ্, তেজ,

[১] 'পরিশেষাল্লিঙ্গমাকাশস্য'

বায়ু, আত্মা ও মনের গুণ হইতে পারিল না, তখন পরিশেষ বশত উহা আকাশেরই গুণ বুঝিতে হইবে।

সাংখ্যমতেও দিক্ ও কাল আকাশাতিরিক্ত নহে

সাংখ্যাচার্যগণের মতেও কাল ও দিক্ আকাশের অতিরিক্ত নহে। 'দিক্কালাবাকাশাদিভ্যঃ'[১] তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। জনৈক নৈয়ায়িকের মতে আকাশও ঈশ্বর হইতে অতিরিক্ত নহে।

গুণঃ

যে পদার্থে গুণত্বজাতি আছে তাহার নাম গুণ। সংযোগ ও বিভাগ এই দুইটিতে সমবেত সত্তা-ভিন্ন জাতির নাম গুণত্ব। দ্রব্যত্ব, কর্মত্ব পৃথিবীত্বাদি জাতি সংযোগবিভাগে সমবেত নহে। সত্তাজাতি, সংযোগ-বিভাগ উভয়ে সমবেত হইলেও, সত্তাভিন্ন নয়। এইজন্য উহারা গুণত্ব নয়। গুণ ২৪ প্রকার—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার ধর্ম ও অধর্ম।

২৪ প্রকার

রূপ

রূপ শ্বেত, নীল, পীত প্রভৃতি ভেদে নানাপ্রকার। পৃথিবীতে নানাপ্রকার রূপ আছে। জলে ও তেজে আছে কেবল শুক্ল বা শ্বেতরূপ। জলের রূপ ভাস্বর অর্থাৎ পরপ্রকাশক নয়। তেজের রূপ ভাস্বর অর্থাৎ তেজ পরকে প্রকাশিত করে।

রস

রস মধুর, অম্ল, তিক্ত ইত্যাদি ভেদে নানাপ্রকার। পৃথিবীতে নানাপ্রকার রস আছে। জলে কিন্তু কেবল মধুর রস। গন্ধ সুরভি এবং অসুরভি ভেদে দুই প্রকার। গন্ধ একমাত্র পৃথিবীরই বৈশিষ্ট্য। উষ্ণ, শীত এবং অনুষ্ণাশীত (temperate) ভেদে স্পর্শ তিন প্রকার। তেজের স্পর্শ স্বভাবতই উষ্ণ, জলের স্বাভাবিক স্পর্শ শীতল,[২] বায়ুর স্বাভাবিক স্পর্শ অনুষ্ণাশীত। পৃথিবীর স্পর্শ কঠিন ও সুকুমার ভেদে দ্বিবিধ। কঠিন বা দৃঢ় বস্তুর

গন্ধ

স্পর্শ

১ সাংখ্যসূত্র

২ 'শৈত্যং হি যৎ সা প্রকৃতির্জলস্য।' রঘুবংশে কালিদাস

স্পর্শের নাম কঠিন স্পর্শ, কোমল বস্তুর স্পর্শের নাম সুকুমার স্পর্শ। ইহা ছাড়া পৃথিবীর পাকজ স্পর্শও আছে।

শব্দ দুই প্রকার—ধ্বনি ও বর্ণ। মৃদঙ্গ প্রভৃতির শব্দের নাম ধ্বনি, আর কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি প্রদেশে অভ্যন্তরস্থ বায়ুর আঘাতে যে শব্দ জন্মে, তাহার নাম বর্ণ।

শব্দ

একত্ব হইতে পরার্ধ পর্যন্ত সংখ্যা বহুবিধ। তাহার মধ্যে দ্বিত্ব প্রভৃতির সংখ্যা অপেক্ষাবুদ্ধিজাত। অপেক্ষাবুদ্ধির নাশ হইলে দ্বিত্বাদির বিনাশ হয়। একত্বানেকত্ববিষয়ক বুদ্ধির নাম অপেক্ষাবুদ্ধি। পরিমাণ অণু, মহৎ, হ্রস্ব ও দীর্ঘ ভেদে ৪ প্রকার। আচার্য শঙ্কর-মিশ্রের মতে প্রত্যেক বস্তুতে দ্বিবিধ পরিমাণ থাকে। যাহাতে থাকে অণুত্ব-পরিমাণ, তাহাতেই থাকে হ্রস্বত্বপরিমাণ। এইরূপ মহত্ত্ব ও দীর্ঘত্ব এক বস্তুতেই থাকে। মন এবং পরমাণুতে থাকে পরম অণুত্ব আর আকাশ, কাল, দিক্‌ও আত্মাতে আছে চরম মহত্ত্ব।

সংখ্যা

পরিমাণ

যে গুণ অনুসারে ঘট হইতে পৃথক্ পট, পৃথিবী হইতে পৃথক্ জল ইত্যাদির বোধ জন্মে, তাহার নাম পৃথক্ত্ব। যে সকল একাধিক বস্তু পরস্পর-সম্বন্ধ-শূন্য হইয়াও বর্তমান থাকে, তাহাদের সম্বন্ধের নাম সংযোগ। অন্যতরকর্মজন্য, উভয়কর্মজন্য ও সংযোগজন্য ভেদে সংযোগ তিন প্রকার। সংযোগে প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থাৎ যে গুণ উৎপন্ন হইলে সংযোগ বিনষ্ট হয়, তাহার নাম বিভাগ। সংযোগের ন্যায় বিভাগও তিনপ্রকার।

পৃথক্ত্ব

সংযোগ

বিভাগ

পরত্ব এবং অপরত্ব কালিক ও দৈশিক ভেদে দুই প্রকার। কালিক পরত্ব ও অপরত্ব জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্বের ন্যায়। দূরত্ব ও অন্তিকত্বই দৈশিক পরত্ব এবং অপরত্ব। জ্ঞানই বুদ্ধি এবং ইহা অনেক প্রকারে বিভক্ত। নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক ভেদে জ্ঞান দ্বিবিধ। যাহাতে কেবল বস্তুর স্বরূপমাত্রেরই বোধ হয়, বিশেষ্য-বিশেষণভাবের বোধ হয় না, তাহাকে বলে 'নির্বিকল্পক'। এই জ্ঞান অতীন্দ্রিয়, অপ্রত্যক্ষ এবং অনুমানগম্য। আর যে জ্ঞানে বিশেষ্য-বিশেষণভাবের বোধ জন্মে, তাহাকে বলে 'সবিকল্পক'। 'এই ঘট'—এই প্রত্যক্ষ

পরত্ব, অপরত্ব

বুদ্ধি=জ্ঞান

সবিকল্পক, কেননা এই জ্ঞানে ঘট বিশেষ্য আর ঘটত্ব বিশেষণ। সবিকল্পক জ্ঞানেরই আর এক নাম বিশিষ্ট জ্ঞান।

বিশেষরূপে কল্পনাই বিকল্প, আর বিকল্প মানেই বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব। এইটি বিশেষ্য, এইটি বিশেষণ—নির্বিকল্পকজ্ঞানে এইরূপ বিশেষরূপের কল্পনা নাই বলিয়াই উহা বিকল্পশূন্য। শব্দ দ্বারা নির্বিকল্পক জ্ঞানের আকার প্রকাশ করা যায় না। কারণ শব্দের দ্বারা যাহাই প্রকাশিত হইবে, তাহা অবশ্যই বিশেষ্য-বিশেষণ ভাবাপন্ন হইবে। নির্বিকল্পক জ্ঞান এইজন্যই শব্দদ্বারা অপ্রকাশ্য।

সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক

'অনুভূতি' এবং স্মৃতিভেদেও জ্ঞান দুই প্রকার। প্রত্যক্ষ এবং লৈঙ্গিক বা অনুমিতিভেদে 'অনুভূতি' দুই প্রকার। ঘ্রাণজ, রাসন, চাক্ষুষ, স্পার্শন, শ্রাবণ ও মানসভেদে প্রত্যক্ষ ছয় প্রকার। আর সংস্কারজন্য জ্ঞানবিশেষের নাম 'স্মৃতি'।

অনুভূতি ও স্মৃতি

বিদ্যা-অবিদ্যা বা প্রমা-অপ্রমা ভেদেও জ্ঞান দুইপ্রকার। যে বস্তুটি ঠিক যেরূপ, সেই বস্তুর ঠিক সেইরূপে জ্ঞানই বিদ্যা (প্রমা)। আর যে বস্তু ঠিক যেরূপ, অন্যপ্রকারে সেই বস্তুর জ্ঞানই অবিদ্যা (অপ্রমা)। সংশয় ও বিপর্যাস ভেদে এই অবিদ্যা পুনরায় দ্বিবিধ। অনিশ্চয়াত্মক জ্ঞানই 'সংশয়'। 'অয়ংস্থাণুর্বা পুরুষো বেতি'—এইরূপে যে অনিশ্চয়াত্মক জ্ঞান জন্মে, তাহাই 'সংশয়'। নিশ্চয়াত্মক ভ্রমের নাম 'বিপর্যাস'। শুক্তিতে রজতবুদ্ধি, দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি বিপর্যাসের উদাহরণ।

বিদ্যা ও অবিদ্যা অথবা প্রমা ও অপ্রমা

যে জ্ঞানের বিষয় প্রকৃতই বিদ্যমান নাই, তাহাই মিথ্যাজ্ঞান বা 'অবিদ্যা'। স্বপ্নজ্ঞানও অবিদ্যা। স্বপ্নের সময়েও জাগ্রদবস্থার ন্যায় বিষয়সকলের অনুভব জন্মে, কিন্তু ইন্দ্রিয়সকল তখন থাকে নিষ্ক্রিয়, আর বিষয়ও তখন প্রকৃতপক্ষে অনুপস্থিতই। সেজন্য উহা মিথ্যা-জ্ঞানই বা অবিদ্যাই। কোনো কোনো আচার্যের মতে স্বপ্নজ্ঞান পূর্বানুভূতের স্মরণমাত্র।

অবিদ্যা

স্বপ্নজ্ঞান = অবিদ্যা

সুখ-দুঃখ-ইচ্ছা-দ্বেষের ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। উহা সকলেই নিজের নিজের

অনুভব দ্বারা বুঝিতে পারে। যত্ন তিন প্রকার—প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবন-যোনি। ইষ্টসাধনতাজ্ঞান, চিকীর্ষা, কৃতিসাধ্যত্বজ্ঞান ও উপাদানপ্রত্যক্ষ—এইগুলিই প্রবৃত্তির কারণ। যাহা করিবার ইচ্ছা হয় না, তাহা করিবার জন্য কেহই প্রবৃত্ত হয় না। ইচ্ছা হইলেও যদি মনে হয় যে এ কার্য আমার করা সম্ভব বা সাধ্য নয়, অর্থাৎ এ কার্য নির্বাহ করা আমার সাধ্যাতীত, তাহা হইলেও সেই কার্যে প্রবৃত্তি হয় না। অসাধ্য বিষয়ে প্রবৃত্তি হয় না। শরীরে প্রাণবায়ুর সাধারণ অর্থাৎ নিশ্বাসপ্রশ্বাসাদি যে যত্নপ্রভাবে সম্পন্ন হয়, তাহার নাম জীবনযোনি-যত্ন।

সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ যত্ন

পতনের কারণ 'গুরুত্ব'। পৃথিবীর আকর্ষণশক্তির প্রভাবে বস্তু পৃথিবীর অভি-মুখে আকৃষ্ট হইলেও, গুরুত্ব বা গুরুত্বের পতনহেতুত্ব প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে না। কারণ বস্তুর গুরুত্বানুসারে আকর্ষণশক্তির কার্যকারিতার তারতম্য অস্বীকার করার উপায় নাই। পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি আমাদের দেশে অনেকদিন পূর্ব হইতেই জানা ছিল। গুরুবস্তু পৃথিবীকর্তৃক আকৃষ্ট হয়, ইহা সূত্রকার স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন।

গুরুত্ব

স্যন্দনের হেতু গুণবিশেষের নাম 'দ্রবত্ব'। দ্রবত্ব আছে বলিয়াই জল স্থিরভাবে থাকে না, গড়াইয়া পড়ে। স্নেহ নামক গুণ যে দ্রব্যে আছে তাহার নাম জল। যে গুণপ্রভাবে গুণ্ডিকার পিণ্ডাকার অবস্থা সম্পাদিত হয়, তাদৃশ গুণবিশেষের নাম 'স্নেহ'। 'সংস্কার' বেগ, ভাবনা ও স্থিতিস্থাপক ভেদে তিন প্রকারের। ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণ দূরের লক্ষ্য বেধ করে। কিন্তু ধনু হইতে লক্ষ্য পর্যন্ত বাণের গতিক্রিয়া একপ্রকারের নহে। কারণ বৈশেষিকমতে ক্রিয়া চারিক্ষণমাত্র বর্তমান থাকে। প্রথম ক্ষণে ক্রিয়ার উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে বিভাগ, তৃতীয় ক্ষণে পূর্বসংযোগনাশ, চতুর্থক্ষণে উত্তর সংযোগের উৎপত্তি, কিন্তু পঞ্চম ক্ষণেই ক্রিয়ার বিনাশ হয়। উত্তর সংযোগই ক্রিয়ার নাশক। লক্ষ্যের দূরত্ব অনুসারে লক্ষ্য পর্যন্ত ধনু হইতে বাণ পৌছাইতে বহুক্ষণ সময়ের প্রয়োজন। বৈশেষিকা-চার্যগণের মতে ধনুর নোদন বা নিপীড়নে বাণে গতিক্রিয়া জন্মে। সেই গতি ক্রিয়াই বেগাখ্য সংস্কার বাণস্থ পর-পর গতিক্রিয়া জন্মাইয়া

দ্রবত্ব, সংস্কার

বেগ : Velocity

দেয়। এইরূপে বাণ লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হইল লক্ষ্য বেধ করে। ভাবনাখ্য সংস্কার স্মরণের কারণ—উহা নিশ্চয় হইতে জাত। নিশ্চয় হইলেও সেই বিষয়ে উপেক্ষা বুদ্ধি থাকিলে ভাবনাখ্য সংস্কার জন্মায় না। সেজন্য বলা যায়, যে উপেক্ষাণাত্মক বা গুণবশত আকৃষ্ট বৃক্ষশাখা প্রভৃতি পরিত্যক্ত হইবামাত্র পূর্ববৎ অবস্থিত হয় তাহাকে বলে স্থিতিস্থাপক সংস্কার।

ধর্ম ও অধর্ম

পুণ্য ও পাপের নাম ধর্ম ও অধর্ম। বিহিত-ক্রিয়ার অনুষ্ঠানেই জন্মে ধর্ম, উহা সুখের হেতু। নিষিদ্ধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে অধর্ম জন্মে, উহাই দুঃখের হেতু। ধর্ম ও অধর্মের সাধারণ নাম 'অদৃষ্ট'। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, স্নেহ, স্বাভাবিক দ্রবত্ব, ভাবনাখ্য সংস্কার এবং অদৃষ্ট—এইগুলির সাধারণ নাম বিশেষগুণ।

কর্ম : ৫ প্রকার

যাহাতে কর্মত্বজাতি থাকে, তাহার নাম কর্ম। উৎক্ষেপণ এবং অবক্ষেপণ, এই উভয়বিধ ক্রিয়াতে সমবেত সত্তাভিন্ন-জাতির নাম কর্মত্ব। কর্ম পাঁচপ্রকার—উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন। যে কর্মের দ্বারা অধোদেশের সহিত বিভাগ এবং ঊর্ধ্বদেশের সহিত সংযোগ হয়, তাহার নাম 'উৎক্ষেপণ'। ইহার বিপরীতই 'অবক্ষেপণ'। বিদ্যমান বস্তুর অবয়বসকলের আগন্তুক, পরস্পর-সংযোগ-জনক কর্মের নাম 'আকুঞ্চন'। ঐ আগন্তুক-সংযোগের বিনাশক কর্মই 'প্রসারণ'। এতদ্ভিন্ন সমস্ত কর্মের সাধারণ নাম 'গমন'—নমন, উন্নমন, চক্রাদির পরিভ্রমণ, অগ্নির ঊর্ধ্বজ্বলন প্রভৃতি গমনের অন্তর্গত।

সামান্য = জাতি : ২ প্রকার

নিত্য এবং অনেকসমবেত পদার্থের নাম সামান্য বা জাতি। একাধিক বস্তুর সংযোগ হয়, সেজন্য সংযোগ অনেকসমবেত হইলেও নিত্য নহে। জাতি দুই প্রকার—'পরা' ও 'অপরা'। অধিকদেশবৃত্তি জাতিই 'পরা', আর অল্পদেশবৃত্তি জাতি 'অপরা'। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই তিন পদার্থেই আছে সত্তাজাতি; অথচ সত্তা অপেক্ষা অধিকদেশবৃত্তি জাতি নাই বলিয়া সত্তা পরা জাতি। ঘটত্বাদি জাতি সর্বাপেক্ষা অল্পদেশবৃত্তি; সেজন্য উহারা অপরা জাতি। দ্রব্যত্বাদি জাতি কিন্তু পরাপর জাতি।

গুণকর্ম ভিন্ন একমাত্র সমবেত পদার্থের নামই 'বিশেষ'। 'বিশেষ'-পদার্থ স্বীকার করিবার সংক্ষিপ্ত যুক্তি এই যে, দ্ব্যণুক হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ত্যাবয়বী অর্থাৎ ঘটাদি পর্যন্ত সকল সাবয়বদ্রব্যের সেই-সেই অবয়ব-ভেদে ভেদ হইতে পারে। নিরবয়ব একজাতীয় পরমাণু দুইটির পরস্পরের ভেদও নিশ্চয়ই কোনো ধর্ম দ্বারা সম্পন্ন হইবে। মুদ্গ(মুগ) ও মাষের (মাষ কলাইয়ের) যথাক্রমে আরম্ভক (constituent) মুদ্গপরমাণু ও মাষপরমাণু অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন। এস্থলে পরস্পরের ভেদক ধর্ম (distinguishing characteristic) কি ? ইহার উত্তরে বলিতে হয় যে মুদ্গের আরম্ভক পরমাণু ও মাষের আরম্ভক পরমাণু সমানরূপ হইলেও উভয় পরমাণুতেই আছে ভিন্ন ভিন্ন অসাধারণ ধর্ম। তাহার দ্বারা উভয় পরমাণু পরস্পর ভিন্ন হইতেছে। সেই ভিন্ন ভিন্ন অসাধারণ ধর্মই 'বিশেষ' পদার্থ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ অণুতেই বর্তমান থাকে 'বিশেষ' বা differentia ; তাহা না হইলে আম গাছে কাঁঠাল ফলিত, কিন্তু তাহা তো হয় না, সেজন্যই 'বিশেষকে' স্বীকার করিতেই হয়। আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকগণ অণুতে বিশেষ স্বীকার করিয়াছেন পরোক্ষভাবে atomic gravity স্বীকার করিয়া।

বিশেষ

বিশেষ পদার্থ সাবয়বদ্রব্যবৃত্তি নহে, নিরবয়বদ্রব্যমাত্র বৃত্তি। কতকগুলি পরমাণু মুদ্গ ও মাষ উভয়েরই আরম্ভক, উহারা সেজন্য উভয়েই বর্তমান থাকে ; সেজন্য মুদ্গ ও মাষ পরস্পর ভিন্ন হইলেও অনেকটা সমান-আকার-বিশিষ্ট।

অবয়বীর সহিত অবয়বের, গুণ ও ক্রিয়ার সহিত দ্রব্যের, জাতির সহিত ব্যক্তির এবং বিশেষের সহিত নিত্য দ্রব্যের যে সম্বন্ধ তাহার নাম 'সমবায়'। ঘটের অবয়ব কপাল, বস্ত্রের অবয়ব তন্তু। 'কপালে ঘট বা তন্তুগুলিতে পট', এইরূপ স্থলে কপাল ও তন্তুতে যথাক্রমে ঘট ও পটের সম্বন্ধই সমবায়। সাদা ঘট, এস্থলে ঘটে শুক্ল (সাদা—) গুণের সমবায় সম্বন্ধ হইয়াছে। এইভাবেই ক্রিয়ার অধিকরণে, ক্রিয়ার জাতির অধিকরণে, জাতির এবং বিশেষের অধিকরণে বিশেষের সমবায়সম্বন্ধ হয়।

সমবায়

'সংসর্গাভাব' এবং 'অন্যোন্যাভাবভেদে' 'অভাব' দুইপ্রকার। সম্বন্ধ বা সংসর্গের অভাবই 'সংসর্গাভাব'—'প্রাগভাব', 'ধ্বংসাভাব' এবং 'অত্যন্তাভাব' ভেদে ইহা পুনরায় তিনপ্রকারের। বস্তু উৎপন্ন হইবার পূর্বে বস্তুর অভাবই 'প্রাগভাব'। 'কপালে ঘট হইবে' প্রাগভাবের উদাহরণ।

অভাব : ২ প্রকার

প্রাগভাবের আদি বা আরম্ভ নাই, অন্ত বা শেষ আছে। ঘট একবার উৎপন্ন হইলে আর 'প্রাগভাব থাকিবে না, সেজন্য ইহা অনাদি কিন্তু সান্ত। মুদ্গর, যষ্টি প্রভৃতির আঘাতের দ্বারা উৎপন্ন ঘটের যে বিনাশজাত অভাব, তাহাই 'ধ্বংসাভাব'। 'ঘট নষ্ট হইয়াছে'—এইরূপ ক্ষেত্রে ঘটের ধ্বংসাভাবের বোধ জন্মিতেছে। ধ্বংসাভাবের উৎপত্তি আছে কিন্তু বিনাশ নাই, অর্থাৎ ধ্বংসাভাব সাদি কিন্তু অনন্ত। ধ্বংস ও প্রাগভাব ভিন্ন সংসর্গাভাবের নাম 'অত্যন্তাভাব'। যে সংসর্গাভাব কোন বিশেষ সময়ে সীমাবদ্ধ নহে, যাহা সর্বকালে থাকে, তাহাই 'অত্যন্তাভাব'। বায়ুতে রূপ নাই, ঘটে চৈতন্য নাই, ভূতলে ঘট নাই প্রভৃতি 'অত্যন্তাভাবের' উদাহরণ। ভূতলে ঘট আনা হইলেও ঘটের অত্যন্তাভাবের বিনাশ হয় না, কারণ তখনও প্রদেশান্তরে ঘটের 'অত্যন্তাভাব' থাকে। ভূতলে ঘট আনা হইলে সেসময় ঐ ভূতলে ঘটের অত্যন্তাভাবের সম্বন্ধ থাকে না,—এই যা পার্থক্য। পরস্পরেতে পরস্পরের যে অভাব তাহাই 'অন্যোন্যাভাব'। যে বস্তু যে বস্তু নহে, সেই বস্তুতে সেই বস্তুর যে অভাব তাহাই 'অন্যোন্যাভাব'। পটে ঘটের যে অভাব এবং ঘটে পটের যে অভাব তাহাই 'অন্যোন্যাভাব'। ইহার অপর নাম ভেদ। 'ঘটঃ পটো ন, ঘটঃ পটাদন্যঃ, ঘটঃ পটাদ্ভিন্নঃ'—এই সকল স্থলে ঘটে পটের অন্যোন্যাভাবের প্রতীতি হইতেছে।

প্রাগভাব

ধ্বংসাভাব

অত্যন্তাভাব

অন্যোন্যাভাব : ভেদ

'সমবায়ি', 'অসমবায়ি' এবং 'নিমিত্ত' ভেদে কারণ তিনপ্রকার। যে কারণে কার্য সমবেত বা সমবায়সম্বন্ধে থাকে তাহাই 'সমবায়ি কারণ'। কপাল ও

কপালিকা ঘটের 'সমবায়ি কারণ'। তন্তু পটের 'সমবায়ি কারণ'। প্রকৃতপক্ষে যে উপাদানে কার্য নির্মিত, হয় তাহাই 'সমবায়ি কারণ'। সমবায়ি কারণে যে কারণ সমবেত, তাহা 'অসমবায়ি কারণ'। কপাল ও কপালিকার সংযোগ ঘটের 'অসমবায়ি কারণ', তন্তুসকলের পরস্পরের সংযোগ পটের 'অসমবায়ি কারণ'। 'অসমবায়ি কারণ' নষ্ট হইলে দ্রব্যও বিনষ্ট হয়।

কারণ : ৩ প্রকার
সমবায়ি কারণ

অসমবায়ি কারণ

নিমিত্ত কারণ

সমবায়ি কারণ ও অসমবায়ি কারণ ভিন্ন সমস্ত কারণের নাম 'নিমিত্ত কারণ'। দণ্ড, চক্র প্রভৃতি ঘটের এবং তুরী, বেম প্রভৃতি পটের 'নিমিত্ত কারণ'।

প্রমাণ : ২টি

বৈশেষিকমতে প্রত্যক্ষ ও অনুমানভেদে প্রমাণ দুই প্রকার। প্রত্যক্ষ প্রমাণ যেহেতু ছয় প্রকার সেজন্য প্রত্যক্ষপ্রমা ছয় প্রকারই। চক্ষু, ঘ্রাণ, রসনা, শ্রোত্র, ত্বক্ ও মন—এই ৬টি 'প্রত্যক্ষ প্রমাণ'। প্রমার করণই 'প্রমাণ'। চক্ষু প্রভৃতি ৬টি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ প্রমার কারণ, অতএব প্রত্যক্ষ প্রমাণ। যে কারণ কোনও একটি ব্যাপারের সাহায্যে কার্য সম্পাদন করে, তাহার নাম করণ। 'অসিদ্বারা ছেদন করিতেছে'—এস্থলে অসি 'ছেদন' ক্রিয়ার 'করণ' আর ছেদ্য ও অসির সংযোগই 'ব্যাপার'। ছেদ্যের সহিত অসির সংযোগ না হইলে ছেদনক্রিয়া হইতেই পারে না। 'কাষ্ঠ দ্বারা পাক করিতেছে'—এস্থলে কাষ্ঠ পাকের 'করণ', আর জ্বালা তাহার 'ব্যাপার'। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যে সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ, তাহাই তাহার 'ব্যাপার', কেননা বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ না হইলে বিষয়ের প্রত্যক্ষ হওয়া সম্ভব নহে।

প্রত্যক্ষপ্রমাণ : ৬টি

করণ ও ব্যাপার

সন্নিকর্ষ = সম্বন্ধ

লৌকিক সন্নিকর্ষ : ৬ প্রকার

সংযোগ

লৌকিক সন্নিকর্ষ ছয় প্রকার—সংযোগ, সংযুক্ত সমবায়, সংযুক্তসমবেত সমবায়, সমবায়, সমবেত-সমবায় ও বিশেষণতা বা স্বরূপ। চক্ষু ঘটের সহিত সংযুক্ত হইলে ঘটের প্রত্যক্ষ হয়। এখানে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধই 'সংযোগ'। ইন্দ্রিয়ের সহিত অসম্বন্ধ বস্তুর প্রত্যক্ষ হওয়া অসম্ভব। ঘট

চক্ষু-সংযুক্ত, ঘটত্বজাতি এবং শুক্লরূপ এবং ঘটসমবেত, অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে ঘটবৃত্তি। সেজন্য ঘটত্ব জাতি ও ঘটগত শুক্লরূপের সহিত চক্ষুর সম্বন্ধই 'সংযুক্ত-সমবায়'। আবার শুক্লত্ব-জাতির সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ হইতেছে 'সংযুক্তসমবেত সমবায়'। গন্ধত্ব ও রসত্বের সহিত ঘ্রাণ ও রসনেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ সংযুক্তসমবেত সমবায়। শব্দ আকাশসমবেত, কর্ণপ্রদেশের দ্বারা অবচ্ছিন্ন আকাশই শ্রবণেন্দ্রিয়, সুতরাং শব্দপ্রত্যক্ষের সম্বন্ধ 'সমবায়'। শব্দত্ব-(কত্ব, গত্ব প্রভৃতি) প্রত্যক্ষের সম্বন্ধ সমবেত সমবায়। কেননা, শব্দত্বাদি শব্দসমবেত। অভাব প্রত্যক্ষের সম্বন্ধই 'বিশেষণতা' বা স্বরূপ। ভূতলে ঘটাভাবের প্রত্যক্ষস্থলে বিশেষণতা সন্নিকর্ষ, কারণ ভূতলে বিশেষণরূপেই ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ হয়। ঘট চক্ষুগ্রাহ্য, ঘটবৃত্তি গুণক্রিয়াদি ধর্ম এবং ঘটের অভাবও চক্ষুগ্রাহ্য।

সংযুক্তসমবায়

সংযুক্তসমবেতসমবায়

সমবায়

সমবেতসমবায়

বিশেষণ = তাস্বরূপ

প্রত্যক্ষের কারণ উদ্ভুত রূপ ও মহত্ত্ব। পরমাণুর মহত্ত্ব নাই। এইজন্য পরমাণু দেখিতে পাওয়া যায় না। বহ্নির অস্তিত্ব বুঝা যায় বটে, কিন্তু বহ্নির রূপ উদ্ভুত নহে বলিয়া তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। কোনো কোনো পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে বস্তুর গুণমাত্রেরই প্রত্যক্ষ হয়, বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু কণাদের মতে বস্তুরও প্রত্যক্ষ হয়। কারণ বস্তু তো গুণের সমষ্টিমাত্রই নহে, বস্তু গুণের আধার। সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন যে, শ্বেত ঘট, পীত পট দেখা যায়। শুক্ল ও পীত গুণ দেখিতেছি—একথা তো কেহ বলেন না। আর এক কথা। মহত্ত্ব প্রত্যক্ষের কারণ। যাহার মহত্ত্ব নাই, তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। এই মহত্ত্ব গুণগত নহে, দ্রব্যগত। বিজ্ঞানও বলে যে atom অদৃশ্য, কিন্তু molecule দৃশ্য। পরিদৃশ্যমান ঘট, পট প্রভৃতি দ্রব্য পরমাণু-পুঞ্জস্বরূপ নহে, পরমাণুপুঞ্জ কর্তৃক আরব্ধ দ্রব্যান্তর (transformation)। ঐ দ্রব্যান্তরের নামই 'অবয়বী'। যাহার অবয়ব আছে, তাহাকেই বলে 'অবয়বী'। ঘটপটাদি অবয়ববান্, অতএব তাহারা 'অবয়বী'। যে জাতীয় পরমাণু

বস্তুর গুণ ও রূপের প্রত্যক্ষ হয়

অবয়বীর জনক (creator) হয়, অবয়বীও সেই জাতীয় হইবে। পরমাণু অতীন্দ্রিয় (invisible)। পরমাণু অতীনিয় হইলে পরমাণুপুঞ্জও দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না। অতীন্দ্রিয়ের অর্থ ইন্দ্রিয়ের অতীত অর্থাৎ 'অবিষয়'। পরমাণু যখন চাক্ষুষ ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে তখন প্রচুর পরিমাণে পরমাণু মিলিত হইলেও উহা অর্থাৎ পরমাণুপুঞ্জ দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না। 'একটি অন্ধ যেমন দেখিতে পায় না, শত অন্ধ একত্র হইলেও তেমনই দেখিতে পাইবে না।' পরমাণুপুঞ্জের বেলায়ও অনুরূপ ন্যায়ই প্রযোজ্য। মহত্ত্বের সহায়তাভিন্ন ইন্দ্রিয়শক্তি কার্য করিতে পারে না ; চক্ষুর পরমাণু দেখিবার শক্তি নাই। পরমাণুপুঞ্জও চাক্ষুষ ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত নহে। এই জন্যই পরমাণু দ্বারা সমারব্ধ অবয়বীকে স্বীকার করিতে হয়। 'একঃ স্থূলো মহান্ ঘটঃ'— এই প্রত্যক্ষ অনুভবই তাহার প্রমাণ।

অবয়বী

মহত্ত্বই প্রত্যক্ষের সহায়ক

'অলৌকিক সন্নিকর্ষ'-'সামান্যলক্ষণ', 'জ্ঞানলক্ষণ' ও 'যোগজ'ভেদে তিন প্রকার। যে সামান্য যাহাতে থাকে, ঐ সামান্যই সেই আশ্রয়ের বা তাহার প্রত্যক্ষের সন্নিকর্ষরূপ হয়। কোন একটি ঘটে চক্ষুর সংযোগ ঘটিলে, ঐ 'সামান্যরূপ' সম্বন্ধে সমস্ত তদাশ্রয়ের অলৌকিক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। একটি ঘট দেখিয়া ঘটত্ব সম্বন্ধে নিখিল ঘটের অলৌকিক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ইহার উদাহরণ। Western Logic-এর Geometrical Symbols লইয়া যে perception সে সমস্ত এই প্রকারেরই। 'জ্ঞানলক্ষণের' অর্থ জ্ঞানই সন্নিকর্ষ-স্বরূপ। যাহার জ্ঞান হয়, ঐ জ্ঞান তাহারই অলৌকিক প্রত্যক্ষের সন্নিকর্ষ স্বরূপ হয়। 'সুগন্ধযুক্ত চন্দন',— এইস্থলে জ্ঞানলক্ষণ চক্ষু সন্নিকর্ষবশত সৌরভের অলৌকিক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতেছে। 'যোগজ' ধর্মপ্রভাবে যোগিগণ অতীত-ভবিষ্যৎ, সূক্ষ্ম-ব্যবহিত-বিপ্রকৃষ্ট সর্বপ্রকার পদার্থের প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।

অলৌকিক সন্নিকর্ষ : ৩ প্রকার

সামান্যলক্ষণ

জ্ঞান লক্ষণ

যোগজ

অনুমিতির কারণই 'অনুমান'। হেতুর অপর নাম 'লিঙ্গ', কারণ তাহার দ্বারা 'সাধ্যকে' চেনা যায়। যাহাতে সাধ্যের অনুমিতি হয় তাহাকে বলে 'পক্ষ'। পর্বতে বহ্নির অনুমিতি হয় বলিয়া পর্বত 'পক্ষ'। সাধ্যনিশ্চয়ের অভাবই 'পক্ষতা'। অনুমিতির পূর্বে পর্বতে বহ্নির নিশ্চয় হয় নাই। অতএব পর্বতে 'পক্ষতা' আছে। সেজন্য পর্বত 'পক্ষ'। সিদ্ধি বা সাধ্যনিশ্চয় থাকিলেও সাধনের ইচ্ছা (সিষাধয়িষা) বা অনুমতির ইচ্ছা হইতেই অনুমিতি হইতে পারে।

অনুমান

'সিষাধয়িষা'ই অনুমিতির জনক

অনুমানের প্রণালী এইরূপ—প্রথমত পর্বতে ধূম দেখা গেল। ইহাকে 'প্রথম লিঙ্গ পরামর্শ' বলা যায়। 'লিঙ্গ' হেতু, 'পরামর্শ' তাহার জ্ঞান। পর্বতে ধূমদর্শন প্রথম লিঙ্গজ্ঞান। পরক্ষণেই ধূম বহ্নির ব্যাপ্য—এইরূপ ব্যাপ্তিস্মরণ হয়। ইহাই অনুমান (বা অনুমিতির করণ)। ইহা 'দ্বিতীয় লিঙ্গ পরামর্শ'। ইহার পর বহ্নিব্যাপ্য ধূম পর্বতে আছে, এইরূপ জ্ঞান হয়। ইহা 'তৃতীয় লিঙ্গ পরামর্শ'। ইহারই অপর নাম 'পক্ষতাধর্ম জ্ঞান'। ইহাকে অনেক সময় কেবল 'পরামর্শ' শব্দ দিয়া আখ্যাত করা হয়। ইহার পর পর্বত বহ্নিমান্ এইরূপ অনুমিতি হইবে। ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতির করণ, পরামর্শ তাহার ব্যাপার। কেননা পরামর্শ ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য অনুমিতির জনক। প্রথম লিঙ্গ পরামর্শ ব্যাপ্তিজ্ঞানের, ব্যাপ্তিজ্ঞান তৃতীয় লিঙ্গ পরামর্শের এবং তৃতীয় লিঙ্গ পরামর্শ অনুমিতির হেতু বা কারণ।

অনুমানের প্রণালী

যে হেতুর বলে অনুমিতি জন্মিবে, সেই হেতুতে 'পক্ষসত্ত্ব', 'সপক্ষসত্ত্ব' ও 'বিপক্ষসত্ত্ব', এই তিনটি রূপ বা ধর্ম থাকা আবশ্যক। যে অধিকরণে সাধ্যের অনুমিতি হয় তাহার নাম 'পক্ষ'। যে অধিকরণে সাধ্যের নিশ্চয় আছে তাহার নাম 'সপক্ষ'। যে অধিকরণে সাধ্যের অভাবের নিশ্চয় আছে তাহার নাম 'বিপক্ষ'। পর্বতে বহ্নির অনুমিতি স্থলে পর্বত পক্ষ, মহানস সপক্ষ, জলহ্রদ নাই। ধূম যে পরম্পরাসম্বন্ধে বহ্নির অনুমিতির কারণ, তাহার উপায়স্বরূপ ঐ তিনটি রূপ হইতেছে।

উক্ত রূপ তিনটি বা তাহার কোন একটি রূপ হেতুতে না থাকিলেই, হেতু দোষযুক্ত হয়। আপাতত তাহা হেতু বলিয়া বোধ হইলেও, প্রকৃতপক্ষে তাহা হেতু হয় না—এইরূপ হেতুর নামই 'হেত্বাভাস'। যাহা হেতুর ন্যায় ভাসমান অথচ প্রকৃতপক্ষে হেতু হইতে পারে না, তাহাই 'হেত্বাভাস'। দুষ্ট হেতুর নামান্তরই 'হেত্বাভাস'। কণাদ ইহাকে 'অনপদেশ' আখ্যা দিয়াছেন।

হেত্বাভাস = দুষ্ট হেতু বা অনপদেশ

কণাদের মতে এই অনপদেশ (বা হেত্বাভাস) অপ্রসিদ্ধ, অসন্ এবং সন্দিগ্ধ ভেদে তিন প্রকার। যে হেতুর প্রসিদ্ধি নাই তাহাই 'অপ্রসিদ্ধ'। প্রসিদ্ধির অর্থ প্রকৃষ্টরূপে ব্যাপ্তি। যে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি নাই অথবা ব্যাপ্তি থাকিলেও কোনো কারণে তাহার জ্ঞান হয় না, সে হেতু 'অপ্রসিদ্ধ'। ইহারই অপর নাম 'ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ'। ধূমের অনুমিতি বিষয়ে বহ্নিরূপ হেতু অপ্রসিদ্ধ।

৩ প্রকার

অপ্রসিদ্ধ = ব্যাপ্যাসিদ্ধ

যে হেতু পক্ষে বা সাধ্যের অধিকরণে থাকে না, তাহা 'অসন্'। ইহার অপর নাম বিরুদ্ধ। 'গোত্ববান্ অশ্বত্বাৎ' অথবা 'অশ্বো বিষাণিত্বাৎ',—এই উভয় উদাহরণেই হেতু 'অসন্'। কেননা গোজাতিতে নাই অত্ব বা অশ্ব জাতিতে শৃঙ্গ নাই। শঙ্করমিশ্র বলেন যে 'বিরুদ্ধও' একপ্রকার 'অপ্রসিদ্ধ'। যে হেতুতে সাধ্যব্যাপ্তির সন্দেহ হয় বা যে হেতু সাধ্যের নিশ্চায়ক হইতে পারে না, পক্ষে সাধ্যের সন্দেহমাত্র জন্মায়, তাহার নাম 'সন্দিগ্ধ', সন্দিগ্ধেরই অপর নাম 'অনৈকান্তিক। কারণ সাধ্যও এক অন্ত, সাধ্যাভাবও এক অন্ত। একটি মাত্র অন্তের (সাধ্যের অথবা সাধ্যাভাবের) সহিত সম্বদ্ধ যাহা তাহাই ঐকান্তিক। যে হেতু সাধ্য এবং সাধ্যাভাব উভয়ের সহিতই সম্বদ্ধ তাহা ঐকান্তিক নহে, অর্থাৎ অনৈকান্তিক। শৃঙ্গ (বিষাণিতব)কে হেতু করিয়া গোত্বসাধন করিতে গেলে বিষাণিত্বহেতু 'সন্দিগ্ধ' বা অনৈকান্তিক হয়। কারণ গরুর যেমন শৃঙ্গ আছে, মহিষাদিরও সেরূপ শৃঙ্গ আছে। গোপশুতেও যেমন ইহা সম্বদ্ধ, গবেতর পশু মহিষাদিতেও তেমনই ইহা সম্বদ্ধ এবং এজন্যই ঐকান্তিক নহে বা 'অনৈকান্তিক'। বিষাণিত্ব হেতু দ্বারা গোত্বের

অসন্ = বিরুদ্ধ

সন্দিগ্ধ = অনৈকান্তিক

সন্দেহ বড় জোর হইতে পারে, গোত্বের নিশ্চয়তা জন্মে না বলিয়া ইহা 'সন্দিগ্ধ'।

বৈশেষিকমতে প্রমাণ মাত্র ২টি

বৈশেষিকমতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান—এই দুইটিই যে প্রমাণ পূর্বেই বলিয়াছি। শব্দাদি স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে, উহারা অনুমানেরই অন্তর্গত। প্রত্যক্ষ ধূম দেখিয়া যেমন অপ্রত্যক্ষ বহ্নির অনুমিতি হয়, সেইরূপ প্রত্যক্ষ শব্দশ্রবণে অপ্রত্যক্ষ পদার্থের অনুমিতি হয়। লিঙ্গদর্শনেই হোক বা শব্দ শ্রবণেই হোক, অপ্রত্যক্ষ পদার্থের জ্ঞানমাত্রই অনুমিতি। এইজন্য নৈয়ায়িকসম্মত উপমানও বৈশেষিক-মতে অনুমানেরই প্রকারভেদ বা অন্তর্গত।

ঈশ্বর

বৈশেষিক ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করে নাই: কিন্তু এই অস্তিত্ব স্পষ্টত না হইলেও প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছে। স্বীকারটা অবশ্য অভিনব-প্রকারে করা হইয়াছে। ঈশ্বর বা তদ্বাচক কোনো বিশেষ্য পদ বৈশেষিক সূত্রে ব্যবহার করে নাই। 'তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্' (১।১।৩, ১০।২।৯) এই সূত্রটিতে প্রসিদ্ধ অর্থেই 'তৎ' সর্বনামটি ব্যবহৃত হইয়াছে, এই যা। কারণ, বেদ আর কাহারই বা বচন হইতে পারে? 'তাঁহার' বচন বলিয়া বেদ প্রমাণ, এইকথা বলিলে তাঁহার অর্থ ঈশ্বরের ইহাই প্রমাণ হয়। এজন্যই ঈশ্বরের অস্তিত্ব বৈশেষিকের স্বীকৃত, ইহাই বুঝিতে হইবে। কিন্তু তাঁহার স্রষ্টৃত্ব সম্বন্ধে কোথাও স্পষ্ট করিয়া কিছু বলা হয় নাই। সেজন্য জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে বৈশেষিকের মত কি, তাহা লইয়া তর্ক করা যাইতে পারে।

আত্মা বা জীব

জীব বা আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ করিবার জন্য বৈশেষিক যে রীতি ধরিয়াছে, তাহা আধুনিক জ্ঞানের বিরোধী নহে। প্রথমত, জ্ঞানের আশ্রয় বা জ্ঞাতাহিসাবেই আমরা আত্মাকে জানি। ইন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয় আমরা সবাই জানি। কিন্তু এই জ্ঞান জ্ঞেয় বস্তুতে অথবা ইন্দ্রিয়তে থাকে না, তাহাও আমরা বুঝিতে পারি, সুতরাং জ্ঞাতা এক আত্মাতে স্বীকার করিতেই হয়। তাহা ছাড়া সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা,

দ্বেষ, প্রযত্ন ইত্যাদি হইতেও 'আত্মা'র অস্তিত্বের অনুমান হয়। আর 'আমি' এই বোধ হইতেও শরীরাতিরিক্ত 'আত্মা'কে জানা যায়।

মন

আত্মার সহিত মনের কথাও ভাবিয়া দেখা দরকার। মন আত্মা হইতে পৃথক্। মন ইন্দ্রিয় হইতেও পৃথক্। আত্মা এবং মন উভয়েই যে নিত্য দ্রব্য একথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। প্রত্যেক দেহে একটি মাত্র জীবাত্মা থাকে। তাহার প্রমাণ 'আমি জানি' বা 'আমার দুঃখ' এই জ্ঞান সাধারণ। এই অহংজ্ঞানের কোথাও বিরতি নাই। আর ভিন্ন ভিন্ন দেহে যে আত্মা ভিন্ন ভিন্ন এবং আত্মা যে সংখ্যায় বহু তাহার প্রমাণ এই যে জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি সকলের তো এক সংগে হয় না এবং একই কারণে হয় না। এছাড়া শাস্ত্রও[১] বিভিন্ন আত্মার গতি, মুক্তি ইত্যাদির কথা বলিয়া আত্মার বহুত্ব দেখাইয়াছে। বৈশেষিক এস্থলে সাংখ্যের সহিত প্রায় একমত। যুক্তিও উভয় স্থলে প্রায় একই।

আত্মার বহুত্ব

আত্মার ব্যক্তিত্ব ও বহুত্ব বৈশেষিক স্বীকার করিয়াছে। তাহার গুণ ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন প্রভৃতির কথাও চিন্তা করা হইয়াছে। কিন্তু এই সকল হইতে ভিন্ন আরও একটি ব্যাপার আত্মার হয়—তাহাকে কিন্তু গুণ বলিয়া বর্ণনা করা হয় নাই। উহার নাম 'অদৃষ্ট'।

অদৃষ্ট

অদৃষ্টের অর্থ কৃতকর্মের সঞ্চিত শক্তি; আত্মার অপসর্পণ (বা দেহত্যাগ) এবং উপসর্পণ (বা নূতন দেহে প্রবেশ) ইত্যাদি এই অদৃষ্ট দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। ইহার বিনাশ হইলেই আত্মার গতি রুদ্ধ হয় এবং সে 'মুক্ত' হয়।—

স্রষ্টা বা ঈশ্বরের আলোচনা বৈশেষিক করে নাই, পূর্বেই বলিয়াছি। ঈশ্বর যে আছেন তাহাও 'তৎ' শব্দের দ্বারা গৌণভাবে বুঝান হইয়াছে মাত্র। ইহাকে মন্থন করিয়াই টীকাকারেরা ঈশ্বর বাহির করিয়াছেন। আর একস্থলে[২] বেদবক্তা ঈশ্বর এবং দেবতাদের অস্তিত্বের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই পর্যন্ত বৈশেষিকে ঈশ্বর-সত্তার আলোচনা।

---

১ "শাস্ত্রসামর্থ্যাচ্চ" (৩।২।২১)

২ সূত্র ২।১।১৮-১৯

বৈশেষিক ও ন্যায়ের মধ্যে যে কোনো পার্থক্য নাই, এমন নয়। বৈশেষিকের মতে প্রমাণ দুইটি, ন্যায়ের মতে চারটি। শেষ দুইটি প্রমাণ উপমান ও শব্দ বৈশেষিকের দুইটি প্রমাণের অন্তর্গত। উভয়ের পদার্থসংখ্যাও এক নহে; 'পদার্থ' শব্দের অর্থও সেইজন্য ঠিক এক নহে। কিন্তু মিলও উভয়ের অনেক। 'পরমাণু' উভয়েই স্বীকার করিয়াছে, আত্মা ও ঈশ্বর উভয়স্থলেই স্বীকৃত। জগতের সত্যতা সম্বন্ধেও উভয়ের মতৈক্য আছে, কার্যকারণের সম্বন্ধেও মতভেদ নাই। অতএব উভয়ের মধ্যে বৈষম্য অপেক্ষা সাম্যই অনেক বেশী।

বৈশেষিক ও ন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য

কিন্তু প্রমাণ ও প্রমেয়ের আলোচনা বৈশেষিকে অত্যন্ত লঘু এবং অপূর্ণ। ন্যায় সেখানে অনেক বেশী কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। ন্যায় ও বৈশেষিকের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বিশ্বনাথের 'ভাষা পরিচ্ছেদ' অন্নংভট্টের 'তর্কসংগ্রহ' খুবই প্রসিদ্ধ। বালকদের বুঝিবার সুবিধার জন্য এই গ্রন্থ দুইখানি সংক্ষিপ্ত সারসংগ্রহ মাত্র। বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন বাঙালী, কিন্তু অন্নংভট্ট অন্ধ্রদেশবাসী। উভয়েরই আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতাব্দী।

॥ ৬ ॥ পূর্বমীমাংসা দর্শন

'মীমাংসা' শব্দের অর্থ বিচার। বেদের উত্তর ভাগ, উপনিষদ্ বা বেদান্ত সম্বন্ধে যে বিচার ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতিতে দেখা যায়, তাহাকে যেমন 'উত্তরমীমাংসা'

মীমাংসা শব্দের অর্থ

বলা যায়, সেরূপ বেদের পূর্বভাগ অর্থাৎ যাগযজ্ঞ সম্পাদন বিষয়ে যে সমস্ত বিচার ও আলোচনা আছে তাহাকে 'পূর্বমীমাংসা' বলে। অতি আদিমকালে হয়তো ঋষিরা সহজভাবে বৈদিক

পূর্বমীমাংসা কাহাকে বলে?

স্তোত্রের দ্বারা বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির আরাধনা করিতেন, কিন্তু পরবর্তীকালে এই আরাধনা বিশেষ বিশেষ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। এই অনুষ্ঠানের মূলে কতকগুলি ধারণা দেখা যায়, যেমন বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ ঈশ্বর বা অন্য কোনো ব্যক্তি বেদ রচনা করেন নাই। বেদ অনাদিকাল হইতে আকাশে নিত্য হইয়া রহিয়াছে। বিভিন্ন ঋষিদের মনে তাহা আবির্ভূত হইয়াছে মাত্র। অতএব বেদে কোনো ভ্রম বা পুনরুক্তি নাই। মানুষ যাহা বুদ্ধি দিয়া বুঝিতে পারে না এমন কর্তব্য বা অকর্তব্য নির্ণয় করাই বেদের উদ্দেশ্য, সেজন্য বেদের বাক্য হয় কাহাকেও কোনো কার্যে প্রবৃত্ত করাইতে

বিধি এবং নিষেধ

আদেশ দিতেছে, নয়তো কোনো কার্য হইতে নিবৃত্ত হইতে আদেশ দিতেছে। ইহাকেই বলে 'বিধি' এবং 'নিষেধ।' যদি কোনো স্থলে বেদে কোনো বস্তু বা ঘটনার বর্ণনা থাকে তবে তাহার

অর্থবাদ

নিশ্চয় কোনো গূঢ়ার্থ আছে—ইহাই বুঝিতে হইবে। সেই জাতীয় বাক্যগুলি কার্যে প্রবৃত্ত করাইবার বা নিবৃত্ত করাইবার ছলমাত্র। প্ররোচক বাক্যকে বলে 'অর্থবাদ'[১]।

১ ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা।

ক এই দর্শনের আলোচনায় লেখকদ্বয় বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের 'মীমাংসাদর্শন' ২ খণ্ড হইতে অনেকাংশ গ্রহণ করিয়াছেন। এজন্য তাঁহারা অকুণ্ঠচিত্তে উক্ত ঋণ স্বীকার করিতেছেন।

যে চারিটি আস্তিক দর্শনের আলোচনা আমরা এ পর্যন্ত করিয়াছি, তাহারা যে সত্য সত্যই বেদের ধর্মরক্ষার জন্য প্রচুর চেষ্টা করিয়াছিল, এমন বলা যায় না। তাহারা বেদ অস্বীকার করে নাই, উহাকে আক্রমণ করার মতো কিছু করে নাই। ন্যায় বেদের পক্ষের কথা বিশেষ কিছু বলে নাই; বৈশেষিক বেদের ধর্মের কথা তুলিয়াছে বটে, কিন্তু বেদের নিত্যত্ব, অপৌরুষেয়ত্ব ইত্যাদির সম্বন্ধে বিচারকে কোনো প্রাধান্য দেয় নাই। সাংখ্য-যোগ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। অথচ অবস্থাবৈগুণ্যে বেদের একজন রক্ষকের প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। এই রক্ষা-কার্যকেই পূর্বমীমাংসা ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল; সংক্ষেপে আমরা ইহাকে 'মীমাংসা' বলি।

বেদরক্ষারূপ কার্যই ছিল মীমাংসার ব্রত

'মীমাংসা'[১] ঠিক দর্শন নহে, ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ধর্মের ব্যাখ্যা করা। মীমাংসামতে এই ধর্ম, বেদোক্ত ধর্ম অর্থাৎ বেদবিহিত ধর্ম। "বেদে অনেক কর্মের উপদেশ রহিয়াছে; অগ্নিহোত্র হইতে আরম্ভ করিয়া রাজসূয় অশ্বমেধ প্রভৃতি ছোটোবড়ো, সহজ এবং আয়াসসাধ্য, অল্পব্যয়-সাধ্য এবং ব্যয়বহুল, সংক্ষিপ্ত এবং দ্রব্যবহুল, নানাবিধ কর্মের উপদেশ বেদ দিয়াছে, এবং ইহাদের ফলও বর্ণনা করিয়াছে। এই সকল প্রকার বিধি, উদ্দেশ্য, ফল ইত্যাদি বিচার করাই মীমাংসার প্রধান কার্য। বিশ্বের ব্যাখ্যা, দর্শনের কথা, আত্মা, জগৎ ও পরমেশ্বরের কথা ইহার নিকট অবান্তর; কিন্তু অবান্তর হইলেও আলোচনাটা মীমাংসা করিয়াছে, এবং সেই যুক্তিতেই উহা দর্শনের পর্যায়ে গৃহীত হয়।"[২]

মীমাংসা ঠিক দর্শন নহে—ইহা দার্শনিকগণের মীমাংসার বা reconciliation-এর চেষ্টা

---

১ "যেখানে সংশয় সেখানেই মীমাংসার প্রয়োজন। বেদের কর্মকাণ্ডে যে সমস্ত বিধান আছে সে সকল বিষয়ে কোনো সংশয় উপস্থিত হইলে তাহার নিরাকরণ করাই পূর্বমীমাংসার উদ্দেশ্য। কোন্ শব্দের কিরূপ অর্থ করিতে হইবে, কোন্ বাক্যের কিরূপ তাৎপর্য কল্পনা করিতে হইবে—এই সকল বিষয় এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে।" (প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস—৩০ পৃষ্ঠা দ্রঃ)।

২ ভারতদর্শনসার, পৃঃ ২১০।

মীমাংসার মতে বেদ বলিতে বুঝায় মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। উপনিষদ্‌ও এই মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণেরই অন্তর্গত। চতুর্বেদের মধ্যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, শাংখায়ন—ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ, ঋক্‌সংহিতা প্রভৃতি ঋগ্বেদের মন্ত্রভাগ। তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ, ষড্‌বিংশ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সামবেদের ব্রাহ্মণ আর সামসংহিতা প্রভৃতি সামবেদের মন্ত্রভাগ[১] ইত্যাদি।

'বেদ' মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক

ব্রাহ্মণ এবং মন্ত্র বা সংহিতা আধানাদি পুরুষমেধান্ত কর্মের বিধিস্বরূপ এবং অনুষ্ঠানকালে উচ্চারণ দ্বারা গৃহস্থাশ্রমের উপযোগী মন্ত্রস্বরূপ। আরণ্যক ও উপনিষৎ সাধারণত ব্রাহ্মণেরই অন্তর্গত। ঐতরেয়াদি আরণ্যক এবং ঈশাদি উপনিষৎ তৃতীয় ও তুরীয় আশ্রমীর অবলম্বন। তবে উপনীত মানবককে সংহিতা-সমেত ব্রাহ্মণাদি উপনিষদন্ত সমগ্র বেদই স্ব স্ব শাখাক্রমে গুরুর নিকট অধ্যয়ন ও যথাবিধি গ্রহণ করিতে হয়।

মন্ত্র

ব্রাহ্মণ

স্বরূপত বেদ এক হইলেও ঋক্‌, যজু, সাম ও অথর্ব—এই যে চারিটি ভাগ তাহা যজ্ঞাদি কর্মে আবশ্যকতা অনুসারেই বুঝিতে হইবে। দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ যজ্ঞে চারি হইতে ষোলজন পর্যন্ত ঋত্বিকের প্রয়োজন। তাঁহাদের মধ্যে হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্যু এবং ব্রহ্মাই প্রধান। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই পুনরায় তিনজন করিয়া সহকারী আছেন[২]। ইঁহাদের মধ্যে যজুর্বেদে প্রধানত অধ্বর্যু নামক ঋত্বিকের ক্রিয়াকলাপ এবং তাঁহার পাঠ্যমন্ত্র পঠিত হইয়াছে। ঋগ্বেদে হোতার, সামবেদে উদ্গাতার এবং অথর্বেদে ব্রহ্মার যথাক্রমে ক্রিয়াকলাপ ও পাঠ্যমন্ত্র পঠিত হইয়াছে। এইজন্য ঐ চারি বেদকে যথাক্রমে অধ্বর্যু-বেদ, হোতৃবেদ, উদ্গাতৃবেদ এবং ব্রহ্মবেদও বলা হয়। ইহার মধ্যে আবার ব্রাহ্মণাংশে প্রধানত কর্মের বিধি এবং মন্ত্রাংশে সেই বিহিত কর্মের অর্থ অথবা ক্রম অথবা দ্রব্যদেবতাদি যাহাতে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ মন্ত্র পঠিত হইয়াছে।

বেদের সংহিতাগুলির চারিটি ভাগ কেন ?

ব্রাহ্মণগুলিতেই আছে কর্মের বিধি

১ দ্রঃ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা ১ম ভাগ

২ মীমাংসা সূত্র ৩।৭।৩৭

এই কারণে ব্রাহ্মণাংশে প্রধানত বিধি এবং সাধারণত উপনিষৎ রহিয়াছে বলিয়া মীমাংসা এবং বেদান্তদর্শনে এই ব্রাহ্মণাংশেরই আবশ্যকতা সর্বাধিক। এই ব্রাহ্মণাংশ যদি বেদ না হয়, তাহা হইলে মীমাংসাকে যে 'বেদার্থবিচার' এবং বেদান্তকে যে 'শ্রুতিশিরঃ' বলা হয়, দুইটিই ব্যাহতার্থক হইয়া পড়ে।

মীমাংসা এবং বেদান্তের সহিত ব্রাহ্মণগুলির সম্পর্ক অতি নিবিড়

মীমাংসার অপর নাম 'বেদার্থবিচার'

অনেকবিদ্যাস্থানে উপবৃংহিত এই যে বেদ-বৃক্ষ, যাহার সুশীতল ছায়ায় তাপদগ্ধ জীবগণ শান্তিলাভ করিতে পারে, ইহার যে অর্থ-বিচার, তাহারই নাম মীমাংসা। এই কারণেই মীমাংসার অর্থ বেদবিচার। এই কর্মমীমাংসা বেদাধিকারী ত্রৈবর্ণিকেরই কর্তব্য; আর ব্রহ্মমীমাংসা সন্ন্যাসিগণের পক্ষে সন্দেহস্থলে নিত্যই করণীয়।

বৈদিক মন্ত্রাদির অর্থ-বিচারই মীমাংসা

বেদান্তমতে কর্ম অনপেক্ষিত, ইহা অনভিজ্ঞের কথা। যাঁহারা যথাবিধি কর্ম করেন না, কিন্তু শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ লঙ্ঘনপূর্বক স্বৈরাচারমূলক অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের সেই সকল আচরণ ধর্ম নহে—তাহাতে পুণ্য অথবা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ তো হয়ই না, উপরন্তু পাপ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক অপকর্ষই ঘটিয়া থাকে। ইহাই বেদান্তিগণের শাস্ত্রসংবাদী সিদ্ধান্ত। সুতরাং বেদান্তমার্গে কর্ম অনপেক্ষিত নহে এবং কর্মমীমাংসাও অনাবশ্যক হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে বাক্য-বিচারাত্মক বেদান্তশাস্ত্রের পূর্ণজ্ঞান মীমাংসা ব্যতিরেকে অসম্ভব।

বেদান্তকে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইলে মীমাংসার জ্ঞান অপরিহার্য

প্রশ্ন এই যে কর্মমীমাংসার প্রয়োজন কি? উত্তরে বলিতে হয় যে বর্তমান যুগে শ্রৌত কর্মকলাপ অনুষ্ঠানের অযোগ্য হইলেও মীমাংসা-দর্শন যে আলোচনার যোগ্য নহে, ইহা বলা যায় না। কারণ উপনিষদ্ বিষয়ক বেদান্তদর্শনের আলোচনার যখন এযুগে বহুল প্রচার দেখা যাইতেছে, তখন উহার উপকারকরূপেও এই শাস্ত্র অবশ্যই আলোচনার যোগ্য। কারণ, মীমাংসাশাস্ত্রের এক একটি

কর্মমীমাংসার প্রয়োজন কি?

অধিকরণে বর্ণ-বিষয়ক শ্রুতিবাক্য লইয়া যে পদ্ধতিতে, যে যুক্তিসহকারে বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে, উপনিষদ্-বিচারাত্মক বেদান্ত দর্শনে তথা ধর্ম-বিচারাত্মক স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতিতে তত্ত্বার্থ জানিতে হইলে সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করিতে হয়। ফলত, ব্যাকরণ যেমন প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি বিভাগের দ্বারা পদ-পদার্থ নিরূপণ করিবার উপায় বলিয়া 'পদ-শাস্ত্র', মীমাংসাও সেইরূপ বাক্যার্থ নির্ণয়ের উপায় বলিয়া বাক্যশাস্ত্র। অতএব বর্ণাশ্রমীর সমস্ত কর্মই যখন বাক্যাত্মকশ্রুতিস্মৃতিসাপেক্ষ, তখন এই মীমাংসারূপ বাক্যশাস্ত্রের সম্যক্ অনুশীলন করিতে যে যথার্থ বাক্যার্থ অর্থাৎ শাস্ত্রার্থ অবগত হওয়া সম্ভব হয় না, ইহা অবধারিত। তর্কাদি প্রমাণশাস্ত্র ইহার পরিপোষক হইতে পারে বটে, কিন্তু মীমাংসাই শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের তাৎপর্যাবগতির উপায়-স্বরূপ। এই কারণেই উহার অপর নাম 'ন্যায়'। 'ন্যায়' বলিতে 'নীয়তে প্রাপ্যতে বিবক্ষিতার্থসিদ্ধিঃ অনেন' এই ব্যুৎপত্তি বলে মীমাংসা অভিহিত হয়। এই কারণে মীমাংসার প্রাচীন গ্রন্থসকল ন্যায়কণিকা, ন্যায়মালা, ইত্যাদি আখ্যায় প্রসিদ্ধ। এই কারণেই মীমাংসা এবং বেদান্তের এক একটি অধিকরণের এক একটি সিদ্ধান্তকে 'ন্যায়' বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়া থাকে।

বাক্যার্থ নির্ণয়ের উপায় বলিয়া মীমাংসা 'বাক্যশাস্ত্র'

শ্রুতিস্মৃতি প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য মীমাংসাদর্শন পাঠে জানা যায়

মীমাংসাও এজন্যই 'ন্যায়' নামেও কখনো কখনো অভিহিত হয়

মীমাংসা বলিতে যদিও বেদার্থবিচারই বুঝায় তবুও ইহার দ্বারা স্মৃতি-পুরাণ প্রভৃতিরও বিচার অর্থাক্ষিপ্ত। কারণ, বেদের ন্যায় সেগুলিও যে ধর্মেই প্রমাণ। এই কারণেই শ্রুতির ন্যায় স্মৃতি-পুরাণ প্রভৃতিরও প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে (তৃতীয় পাদ প্রভৃতি স্থলে)। এই কারণেই আবার শ্রুতিবাক্যসকলের ন্যায় স্মৃতিপুরাণাদির পরস্পর বিরোধ প্রভৃতি মীমাংসোক্ত পদ্ধতিতেই মীমাংসিত হয়।

মীমাংসা বলিতে স্মৃতি-পুরাণ প্রভৃতির বিচারও বুঝায়

শ্রুতি-স্মৃতি বিরোধের সমাধানের জন্যও মীমাংসার প্রয়োজন হয়

এইরূপ যে মীমাংসাশাস্ত্র, তাহা যে কেবলমাত্র কর্মোপযোগী যাজ্ঞিকগণেরই উপকারক হইবে, এরূপ বিবেচনা নিতান্তই একদেশদর্শিতার পরিচায়ক।

মীমাংসা দর্শনের দর্শনত্ব কি জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হয়—'দৃশ্যতে অনেন' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে দর্শনের অর্থ 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ'[১] এই শ্রুতিবাক্যে যে আত্মসাক্ষাৎকার উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার হেতু বা উপায়। আর শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনই আত্মতত্ত্বদর্শনের হেতু বলিয়া শাস্ত্রে উপদিষ্ট হওয়ায় দর্শনশাস্ত্রসকলও শ্রবণ বা মননের সাধন। এ কারণে তাহাও দর্শনের হেতু। এই কারণেই সেগুলি 'দর্শন' নামে অভিহিত হয়। এই জন্যই মীমাংসা দর্শনে[২] যে প্রমাণ পরীক্ষার প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহা হইতেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মবাদ পর্যন্ত বিষয়গুলি সূত্রকারের লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

মীমাংসা কিজন্য দর্শন হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে ?

আপাতদৃষ্টিতে মীমাংসা দর্শনের সূত্র হইতে দর্শনশাস্ত্রের আলোচ্য সৃষ্টিতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব এবং ঈশ্বরতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে পরবর্তী মীমাংসকরা যাহা বলিয়াছেন, সেই অনুসারে মীমাংসাসিদ্ধান্তে বটবীজের ন্যায় সংসার অনাদি বলিয়া সৃষ্টি ও প্রলয় নাই। আত্মা বেদবিহিত কর্মের কর্তা এবং তাহার ফলভোক্তা বলিয়া বৈশেষিকগণের সিদ্ধান্তের ন্যায় ব্যবহারিক জীবই আত্মা—অর্থাৎ অহংকারই আত্মা, তাহা শরীরাতিরিক্ত কিন্তু সুখদুঃখভোক্তা এবং জন্ম, মরণ, স্বর্গ ও নরক প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত। চিরবিনষ্ট কর্মের ফলোপপত্তির জন্য 'অপূর্ব' নামক পদার্থ স্বীকৃত হওয়ায় মীমাংসক মতে ঈশ্বর ফলদাতা নহেন। আর তাঁহাদের মতে ঈশ্বরোক্তি বলিয়াই যে বেদ প্রমাণ তাহা নহে, কিন্তু বেদ অপৌরুষেয় অনাদি বলিয়া এবং পুরুষসুলভ ভ্রমপ্রমাদ প্রভৃতি রহিত হওয়ায় অবাধিত শাব্দবোধ জন্মাইয়া থাকে বলিয়াই প্রমাণ, যেহেতু প্রমাণের প্রামাণ্য পরের অপেক্ষা রাখে না, তাহা স্বতঃসিদ্ধ (axiomatic)। এজন্যই সৃষ্টিকর্তৃত্বরূপে অথবা কর্মফলদাতৃত্বরূপে কিংবা বেদবক্তৃত্বরূপে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

মীমাংসার বক্তব্য

'অপূর্ব'

ঈশ্বর ফলদাতা নহেন

বেদ অনাদি ও অপৌরুষেয়

১। বৃহদারণ্যক উপ ২।৩।৫

২। সূত্র ১।১।৩

মীমাংসকমতে অতীন্দ্রিয় সুখ নাই; বেদ ক্রিয়াপ্রতিপাদক। আপাত-দৃষ্টিতে কর্ম হইতেই মুক্তি, আর তাহা স্বর্গসুখপ্রাপ্তিস্বরূপ। কর্ম আবার যাগ, দান, হোম প্রভৃতি ভেদে বৈধ, এবং ব্রহ্মহত্যা, কলঞ্জভক্ষণ প্রভৃতি ভেদে নিষিদ্ধ। এই নিষিদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠানের ফল অনিষ্টবিধায়ক নরকাদি। দেবতাদের উদ্দেশে বিধিবিহিতভাবে দ্রব্যত্যাগই যাগ; অর্থাৎ যে দেশে, যে কালে, যে অধিকারীর পক্ষে যেভাবে তাহা কর্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, সেইভাবে যদি সেই কর্মের অনুষ্ঠান হয়, তবেই তাহা ধর্ম। ইহার পালনেই সুখ বা আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়।

কর্ম হইতেই মুক্তি—মুক্তির অর্থই স্বর্গলাভ

শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্মের অনুষ্ঠানই ধর্ম

মীমাংসক মতে দেবতা শব্দময়ী—ত্যাজ্যমান দ্রব্যের উদ্দেশ্যভূত। যিনি, তিনিই দেবতা। আপাতদৃষ্টিতে দেবতার বিগ্রহাদি পঞ্চক নাই; কিন্তু তত্ত্বদৃষ্টিতে যে নামে, যে শব্দে বা যে ভাবেই দেবতা শাস্ত্রানুসারে উদ্দেশ্যভূতা হউন না কেন, তিনি সনাতন একব্রহ্ম পরমেশ্বর ভিন্ন আর কেহই নহেন। তাই শ্রুতিতে[১] বলা আছে যে পরমেশ্বরই সকল দেবতারূপে বিরাজিত।

দেবতা শব্দময়ী

এক পরমেশ্বরই সকল দেবতারূপে বিরাজমান

ঋষি জৈমিনি এই মীমাংসা দর্শনের রচয়িতা। ইনি ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের শিষ্য। বাদরায়ণ (কৃষ্ণদ্বৈপায়ন) যে চারি জন শিষ্যের মধ্যে সম্প্রদায়ক্রমে এক এক বেদ বহন করিবার ভার দেন, জৈমিনি তাঁহাদের অন্যতম। ইনি সামবেদের ভার পাইয়াছিলেন। কুমারিলের তন্ত্রবার্তিক হইতে জানা যায় যে জৈমিনি ছান্দোগ্যানুবাদ প্রভৃতি অপরাপর কয়েকখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু আজকাল তাহাদের আর পাওয়া যায় না। 'সংকর্ষকাণ্ড' নামে মীমাংসাশাস্ত্রের চারি অধ্যায় বিশিষ্ট অপর একখানি গ্রন্থ জৈমিনি রচনা করেন। প্রসিদ্ধি আছে যে তাহাতে উপাসনাকাণ্ডের তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। প্রাচীনগণের উক্তি হইতে জানা যায় যে এই

মীমাংসা দর্শনের রচয়িতা: ব্যাসের শিষ্য ইনি

ছান্দোগ্যানুবাদ ও সংকর্ষকাণ্ড ইঁহার রচনা

জৈমিনির জীবন-কাহিনী আজও রহস্যাবৃত

১। ঋগ্বেদ ১।১৪৮।৩৬; বৃ. আ. উপ. ১।৪।৬

সংকর্ষকাণ্ডের অপর নাম ছিল দেবতাকাণ্ড। এই গ্রন্থ এখন সমগ্রভাবে পাওয়া যায় না, ইতস্তত কিছু কিছু সূত্রমাত্র দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন. উহা জৈমিনির রচিত নহে। সে যাহাই হউক, জৈমিনির জীবন সম্বন্ধে অন্যান্য বার্তা আজও অন্ধকারাচ্ছন্ন।

জৈমিনির পূর্বেও মীমাংসার পূর্বাচার্যগণ

বর্তমানে প্রসিদ্ধ মীমাংসা দর্শন জৈমিনির প্রণীত হইলেও তিনিই যে এই শাস্ত্রের প্রথম আচার্য তাহা নহে। কারণ তিনিও আত্রেয় (৬।১।২৬ সূত্রে), ঐতিশায়ন (৩।২।৪৩), কামুকায়ন (১১।১।৫৭), কার্ষ্ণাজিনি (৬।৭।৩৫), বাদরায়ণ (১।১।৫), বাদরি (৩।১।৩), লাবুকায়ন (৬।৭।৩৭), প্রভৃতি প্রাচীন মীমাংসক আচার্যের নামোল্লেখ করিয়াছেন।

'মীমাংসার উদ্দেশ্য বেদের বিচার'—কুমারিল

কুমারিল বলিয়াছেন[১] যে বেদের যে ইতিকর্তব্যতা অংশ অর্থাৎ অপেক্ষিত বিচার অংশ, তাহা মীমাংসার পূরণীয়। কালের কুটিল আবর্তে যখন শাস্ত্রার্থ দুর্বোধ্য হইয়া পড়িল তখন বহ্বর্থের সূচক স্মারক সূত্রগুলির তাৎপর্য গ্রহণ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। এই সময়ে বোধায়ন দ্বাদশলক্ষণী মীমাংসা, চতুর্লক্ষণ সঙ্কর্ষকাণ্ড এবং চতুরধ্যায়ী উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত—এই বিংশতি অধ্যায়ের উপর কৃতকোটিভাষ্য নামে এক অতি বিশাল ভাষ্য রচনা করেন। সেই অতি বৃহদাকারের ভাষ্যগ্রন্থ আয়ত্ত করা কালক্রমে কঠিন হইয়া পড়ে। ইহা দেখিয়া উপবর্ষ সেই বিংশতি অধ্যায়েরই উপর বৃত্তি রচনা করেন। এই গ্রন্থে আবার পূর্বমীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসার সাংকর্য উপস্থিত দেখিয়া দেবস্বামী উত্তর-খণ্ডের চারি অধ্যায় পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র কর্ম-মীমাংসারই সংকর্ষকাণ্ডসমেত ষোড়শ অধ্যায়ের উপর সংক্ষিপ্ত ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। ভবদাস ভট্ট আবার ঐ ষোড়শ অধ্যায়ের অনতিবিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। এই সকল গ্রন্থ এখন

বোধায়ন

উপবর্ষ

দেবস্বামী

ভবদাস ভট্ট

১। 'ইতিকর্তব্যতাভাগং মীমাংসা পূরয়িষ্যতি'—কুমারিল

নামমাত্রেই অবশিষ্ট রহিয়াছে—প্রাচীন আচার্যগণের উক্তির মাধ্যমেই ইহাদের পরিচয় পাই।

শবর স্বামী

কালক্রমে শবরস্বামী কেবলমাত্র দ্বাদশ অধ্যায়ের, কেবলমাত্র সিদ্ধান্ত-বোধের উপযোগী পরম গম্ভীর অতি সংক্ষিপ্ত এক ভাষ্য রচনা করেন, যাহা বর্তমানে উপলব্ধ দর্শন গ্রন্থসকলের ভাষ্যের মধ্যে প্রাচীনতম এবং আদর্শভূত। ইহার ভাষা যেরূপ সরল, ভাব সেইরূপ পরম গম্ভীর। তীক্ষ্ণধী, অধ্যবসায়শীল ব্যক্তি ভি অন্যের পক্ষে ইহার তাৎপর্য উপলব্ধি করা অসম্ভব।

শাবরভাষ্য সংস্কৃত সাহিত্যে অনুপম

"যাহাতে সূত্রগত পদ গ্রহণপূর্বক সূত্রানুকারী নূতন পদ নিবদ্ধ করা আছে এবং পুনরায় সেই স্বনিবদ্ধ সূত্রানুসারে পদ সকলের ব্যাখ্যা আছে তাহাকেই ভাষ্যবিদ্গণ ভাষ্য বলিয়া থাকেন।"[১] শাবর ভাষ্যের মধ্যে এই লক্ষণের বহুলতা দেখা যায়। প্রাচীনগণের রীতিই ছিল যে বক্তব্য বিষয়টিকে সংক্ষেপে বলিয়া পরে তাহার বিশদ ব্যাখ্যা করা।

ভাষ্য কাহাকে বলে?

মীমাংসাভাষ্যকার শবরস্বামীর এমনই খ্যাতি, প্রামাণিকতা এবং শ্রেষ্ঠতা যে আচার্য শঙ্করও তাঁহাকে ভাষ্যের মধ্যে[২] পূজার্থক বহুবচন প্রয়োগে পরম শ্রদ্ধাসহকারে 'শাস্ত্রতাৎপর্যবিৎ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে শবরস্বামী যদি হন শাস্ত্র-তাৎপর্যবিদ্ তো শাঙ্কর সিদ্ধান্তের স্থান কোথায়? শবর কর্মবাদী আর শঙ্কর জ্ঞানাত্মক অদ্বৈতবাদী। উভয়ের মত তো অত্যন্ত বিরুদ্ধই হওয়ার কথা। কিন্তু ফলত ভাষ্যকারদ্বয়ের সিদ্ধান্তের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। কর্মবাদ সম্বন্ধেও ইহাদের মধ্যে পারমার্থিক কোনো বিরোধ নাই।

শবর স্বামীর শ্রেষ্ঠত্ব

শবর কর্মবাদী আর শঙ্কর অদ্বৈতবাদী

মূলত ইঁহাদের মধ্যে কোন বিরোধ নাই

১। 'সূত্রস্থং পদমাদায় বাক্যৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ।
স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ॥'

২। 'যদপি শাস্ত্রতাৎপর্যবিদামনুক্রমণম্' ইত্যাদি অংশে

যাগের অর্থ দেবতার উদ্দেশে যথাবিধি দ্রব্যত্যাগ, পূর্বেই বলিয়াছি। মীমাংসাদর্শনের ৪।২।২৭ ইত্যাদি স্থলে এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলা আছে। শ্রৌতসূত্রকার কাত্যায়নও[১]—'যজ্ঞং ব্যাখ্যাস্যামঃ। দ্রব্যং দেবতা ত্যাগঃ'।—এই সূত্রে ইহাই বলিয়াছেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা আছে (২।১।৮)—"যে দেবতার উদ্দেশে হবির্দ্রব্য গ্রহণ করা হয় তাহার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগের পূর্বে তাঁহার ধ্যান করা উচিত।' এইসকল বেদবচন হইতে বুঝা যায় যে দেবতার ধ্যান করার পর হবি প্রভৃতি দ্রব্য ত্যাগ করিতে হয়। শবরস্বামীর মতে—"ন হি নিন্দা নিন্দ্যং নিন্দিতুং প্রযুজ্যতে; কিং তর্হি, নিন্দিতাদিতবৎ প্রশংসিতুম্। তত্র ন নিন্দিতস্য প্রতিষেধো গম্যতে। কিন্তু ইতরস্য বিধিঃ'। অতএব কর্মপ্রতিপাদনোন্মুখ মীমাংসাশাস্ত্রে যদি কর্মের প্রাধান্যের জন্য আপাতত অন্যের অপ্রাধান্য কোথাও বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও উহার দ্বারা অপরের অপ্রাধান্য প্রতিপন্ন হয় না, কিন্তু সেস্থলে প্রতিপাদ্য কর্মেরই প্রাধান্য স্থাপিত হয়। অতএব বাহ্যরূপ আধারে দেবপূজাত্মক যাগ যদি নাও সম্পন্ন হয়, তবুও অন্য প্রতীকে যদি তাহা শাস্ত্রানুসারে সম্পাদিত হয়, তাহা হইলেও তাহা মীমাংসাসম্মত যাগই বটে।

যাগের অর্থঃ

দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগ

মীমাংসাসম্মত যাগ কি?

মীমাংসক মতে আপাতদৃষ্টিতে মুক্তি নিষ্কামকর্মলভ্য বটে, কিন্তু শ্রুতিই যে নিত্যমোক্ষের কর্মজন্যতার প্রতিবাদ করিয়াছেন—'ইহলোকে সেবাদি কর্মে যে ফল পাওয়া যায়, তাহা যেমন ক্ষয়লাভ করে, পরলোকেও সেইরূপ পুণ্যলব্ধ ফল ক্ষয় হইয়া থাকে[২] ইত্যাদি স্থলে। মীমাংসামতে স্বর্গই মুক্তিস্বরূপ। যাহা দুঃখমিশ্রিত নহে, পরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না এবং যাহাতে অভিলাষানুযায়ী বস্তু তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায়, এরূপ সুখই স্বর্গপদবাচ্য—এই বাক্যে[৩] স্বর্গের যে লক্ষণ দেখি, তাহা তো মুক্তিরই নামান্তর। কারণ

মীমাংসক মতে স্বর্গই মুক্তিস্বরূপ

স্বর্গ কাহাকে বলে?

১। ১।২।১,২

২। 'তদ্ যথেহ কর্মজিতোলোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো. লোকঃ ক্ষীয়তে।

৩। 'যন্ন দুঃখেন সংভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্।
অভিলাষোপনীতং চ তৎ সুখং স্বপদাস্পদম্॥'

মুক্তিতেই হয় ভূমানন্দের প্রকাশ। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৮।২।১ এবং বেদান্ত-সূত্রের ৪।৪।৮ স্থলে ঘোষিত হইয়াছে যে ব্রহ্মলোকস্থিত মুক্ত পুরুষেরই সংকল্পানুসারে অভিপ্রায়ানুরূপ বিষয় সমুপস্থিত হয়। এই জন্যই বলিতে হয় যে, কর্মজন্য যে স্বর্গ—লোকবিশেষে ভোগ্য সুখবিশেষ—তাহা স্বতন্ত্র।

মীমাংসার স্বর্গ বেদান্তের মোক্ষের সমতুল

এই শাস্ত্রতাৎপর্যবিৎ আচার্য শবরের জীবন-বৃত্তান্ত ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন—কিংবদন্তী অনুসারে ইনি দার্শনিকপ্রবর বাক্যপদীয় প্রভৃতি নিবন্ধের কর্তা ভর্তৃহরির পিতা। আর তাঁহার আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যায় যে তিনি মহারাজ কণিষ্কের পরবর্তী। খুব সম্ভব খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। কারণ তিনি ভাষ্যমধ্যে বৌদ্ধ মহাযান মার্গের উল্লেখ করিয়াছেন। আর বৌদ্ধধর্মের মহাযান এবং হীনযান মার্গভেদ প্রভৃতি যে মহারাজ কণিষ্কের সময়েই হইয়াছিল, ঐতিহাসিকগণের ইহাই সিদ্ধান্ত।

শবরের কাল ঃ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতক

মহাযান ধর্মের উল্লেখ

কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মীমাংসা যখন লোকায়তীকৃত হইতে লাগিল, তখন অভ্যুদয় হইল কুমারিল ভট্টের। তিনি বৈদিকমার্গ প্রতিষ্ঠার জন্য, বেদের মত এবং প্রামাণ্য প্রচার করিবার জন্য কুশাগ্রবুদ্ধি ও অবৈদিক বৌদ্ধ দার্শনিক গণের সহিত বিচার করিয়া মীমাংসা শাস্ত্রের বার্তিক রচনা করিয়া পুনরায় ত্রয়ীধর্ম প্রচার করেন এবং মীমাংসার লোকায়তিকতা দূর করেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষাংশে কুমারিল মধ্যভারতে প্রাদুর্ভূত হন। কুমারিল জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বেদের প্রামাণ্য, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব, অভ্রান্তত্ব, স্বতঃপ্রমাণত্ব প্রচার করিয়া বৈদিক মার্গের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। মীমাংসা দর্শনের ভাষ্যের উপর তাঁহার যে 'শ্লোক-বার্তিক' এবং 'তন্ত্রবার্তিক' আছে, তাহা তাঁহার অলোক-সামান্য মনীষারই পরিচায়ক।

কুমারিল ভট্ট ঃ খৃঃ সপ্তম শতকের শেষ ইঁহার আবির্ভাবকাল

'শ্লোকবার্তিক' এবং 'তন্ত্রবার্তিক'

ঐতিহাসিকগণের গবেষণার ফলে জন-সাধারণের এই ধারণা বোধ হয়

জন্মিয়াছে যে কুমারিল ভট্ট কেবল বৌদ্ধগণকে নিগৃহীত করিয়াই বেড়াইতেন। কিন্তু অপক্ষপাতবুদ্ধিতে বিচার করিলে বেদপন্থিগণের প্রতি, ব্রাহ্মণগণের প্রতি তৎকালীন বৌদ্ধগণের অত্যাচার যে কতদূর চরমে উঠিয়াছিল ভাবিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়।[১] এই কুমারিলের সিদ্ধান্ত মীমাংসায় 'ভাট্টমত' বলিয়া বিদিত। ইহাতে মতের এমনই গাম্ভীর্য এবং দৃঢ়তা দেখা যায় যে অদ্বৈতবেদান্তিগণ ব্যবহারিক জগতে ভাট্টমতকে বৈদিক সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

কুমারিল ও বৌদ্ধ দার্শনিকবৃন্দ

কুমারিলের মতের নাম 'ভাট্টমত'

ভাট্টমতকে বৈদিক সিদ্ধান্ত হিসাবে স্বীকার করা হইয়াছে

প্রভাকরের মতেরই নামান্তর 'গুরুমত'। প্রভাকর যে তৎকালের বহুলপ্রচার বৌদ্ধমতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তাঁহার ভাষ্যব্যাখ্যা তাহারই নিদর্শন। প্রভাকর কুমারিলের শিষ্য হইলেও কেন কুমারিল তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করেন, এ বিষয়ে একটি সুন্দর কিংবদন্তী আছে; গ্রন্থবিস্তারের ভয়ে আর তাহা বলা সম্ভব হইল না। প্রাভাকর মতে নিত্যকর্মের অনুষ্ঠানে পুণ্য নাই, নিষিদ্ধ অনুষ্ঠানে পাপ নাই। এই গুরুমতেরই যুক্তিজাল ছিন্ন করিবার জন্য ন্যায়শাস্ত্রের 'চিন্তামণি' 'কুসুমাঞ্জলি' প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষ প্রয়াস দেখা যায়।

'গুরুমত' প্রভাকর মিশ্রের মত

এ বিষয়ে কিংবদন্তী বৌদ্ধ মত দ্বারা গুরুমত বহু পরিমাণে প্রভাবান্বিত

মুরারি মিশ্রেরও এইরূপ মত আছে, যাহা ভট্টমতানুযায়ীও নহে বা প্রভাকরমতানুসারীও নহে, কিন্তু তৃতীয় প্রকার। এই জন্যই বলা হয় 'মুরারেস্তৃতীয়ঃ পন্থাঃ'। এই মতবাদ সম্বন্ধে বিশেষ কোনো গ্রন্থাদি পাওয়া যায় না।

মুরারি মিশ্রঃ 'মুরারেস্তৃতীয়ঃ পন্থাঃ

১ অনুসন্ধিৎসু পাঠক মীমাংসা দর্শনম্ (১ম খণ্ড)—বসুমতী সাহিত্য মন্দির, পৃঃ ২৬-২৭ দেখিয়া লইবেন।

মীমাংসার দিক্‌পালস্বরূপ মণ্ডনমিশ্র, ভট্টোম্বেক প্রভৃতি আচার্যগণের যুক্তিতর্কে স্থলবিশেষে স্বাতন্ত্র্য, অভিনবত্ব দেখা যাইলেও ইঁহারা সকলেই কুমারিলেরই মতানুসারী। মণ্ডনমিশ্র এবং ভট্টোম্বেক কুমারিলেরই শিষ্য ছিলেন—এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। ভট্টোম্বেক নাকি মহাকবি ভবভূতিরই নামান্তর বলিয়া জানা যায়।[১]

মণ্ডন মিশ্র

ভট্টোম্বেক বা ভবভূতি

প্রাভাকরমতের যদিও 'প্রকরণপঞ্চিকা' ইত্যাদি অনেক গ্রন্থ পাওয়া যায় এবং রামানুজ প্রভৃতি কোনো কোনো আচার্য প্রাভাকর-মতেরই সমর্থক, তবুও ভাট্টমতই কর্মকাণ্ডাদিস্থলে এবং লোকব্যবহারে বেশী আদর পায় এবং বেশী যুক্তিপ্রবণতা ইহার বৈশিষ্ট্য—ইহাই প্রাচীন আচার্যগণেরও মত।

ভাট্টমতই সর্বাধিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছে

এইরূপ সুবিশাল ও সুগভীর যে 'মীমাংসা' (বা পূজ্য বিচার)—যাহার উপর শবর-কুমারিল-প্রভাকর-মণ্ডনমিশ্র-সোমেশ্বর-খণ্ডদেব প্রভৃতি মনীষিগণ ভাষ্য-টীকা-টিপ্পনী লিখিয়া গিয়াছেন—ইহা এক 'সাগর বিশেষ', কারণ সায়ণও ইহাকে 'মীমাংসা-সাগর' বলিয়া গিয়াছেন।

সায়ণ মীমাংসাকে 'মীমাংসা সাগর' বলিয়াছেন

মীমাংসকমতে কর্মেই বেদের তাৎপর্য, জ্ঞান সেই কর্মেরই অঙ্গ বা পরিপোষক। 'বিধিবিহিতভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হইলে পুরুষার্থ সিদ্ধ হইবে' ইহাই মীমাংসার ঘোষণা। বস্তুত জ্ঞানবাদিগণও বলেন যে ইহজন্মেই হোক বা জন্মান্তরেই হোক, শাস্ত্রবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান ভিন্ন জ্ঞানের সম্ভাবনা নাই। কাজেই অবশ্যকরণীয় নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম এবং নিষ্কামভাবে কাম্যকর্ম অবশ্যই অনুষ্ঠেয়।

কর্মেই বেদের তাৎপর্য ; জ্ঞান কর্মেরই পরি-পোষক

মীমাংসকমতে কর্মই যে বেদের প্রতিপাদ্য এবং বেদ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক—একথা পূর্বেই বলিয়াছি। দ্রব্য, দেবতা এবং ত্যাগ অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগই প্রধান কর্ম। এই প্রধান কর্ম নির্বাহের জন্য অনেক অঙ্গকর্মেরও প্রয়োজন হয়। যে বেদবচনের দ্বারা

প্রধান কর্ম কি ?

---

১ চিৎসুখাচার্যের 'প্রত্যক্‌তত্ত্বদীপিকা'গ্রন্থের 'নয়নপ্রসাদিনী' টীকায় বলা আছে।

যজ্ঞীয় দ্রব্য এবং দেবতা প্রভৃতির মনন সাধিত হয়, তাহাই মন্ত্র (মন্ত্রাঃ মননাৎ)।

মন্ত্র কাহাকে বলে ?

ব্রাহ্মণ কি ?

আর যাহা কর্মাদির বিধি বা কর্তব্যতা প্রতিপাদন করে—এমন বেদের অংশবিশেষকেই বলা হয় ব্রাহ্মণ ('বিধায়কং ব্রাহ্মণম্')।

স্তুতিনিন্দা প্রভৃতির দ্বারা বিধিরই উপকারক অঙ্গ হইল অর্থবাদ।

অর্থবাদ

বিধি

অপূর্ব, নিয়ম এবং পরিসংখ্যা ভেদে বিধি তিন প্রকার। উৎপত্তি, বিনিয়োগ, প্রয়োগ এবং অধিকারভেদে পুনরায় এই বিধি চারি প্রকার। আবার উপদেশ ও অতিদেশভেদে বিধি দুইপ্রকারও বটে। এই বিধির দ্বারা ধর্ম প্রমিত হয়, আর ধর্ম বিচারই তো মীমাংসা দর্শনের প্রধানতম উদ্দেশ্য।

'দ্বাদশলক্ষণ মীমাংসা'

মীমাংসাকে বলা হয় দ্বাদশলক্ষণী[১]। লক্ষণের অর্থ অধ্যায়। মীমাংসা-দর্শনের দ্বাদশটি অধ্যায়ে দ্বাদশটি পদার্থ বিচারিত হইয়াছে। ইহাতেই ধর্মের স্বরূপ মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে।[২] প্রথম অধ্যায়ের নাম 'প্রমাণ লক্ষণ'। ইহাতে ধর্মের প্রমাণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। বেদের বিধিই সাক্ষাৎ ধর্মে প্রমাণ; অর্থবাদগুলি বিধিগুলির সহায়ক বলিয়া সেগুলিও ধর্মে প্রমাণ। আর এই বিধি এবং মন্ত্রের অর্থবাদমূলক

প্রমাণ লক্ষণ ১ম অধ্যায়

যে মনু প্রভৃতি রচিত স্মৃতি, তাহাও বেদমূলক বলিয়াই ধর্মে প্রমাণ। অতএব যাহা বেদমূলক নহে তাহা যোগিগণের যোগজ প্রত্যক্ষই হোক, কিংবা তাহা কোনো অতিমানুষের উপদেশই হোক, কিংবা কোনো প্রতিভাপ্রসূত জ্ঞানই হোক, তাহা ধর্মে প্রমাণ হইবে না—শিষ্টাচার যদি বেদবিরুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে তাহাও ধর্মে প্রমাণ—তাহাও ধর্ম হিসাবেই গ্রহণীয়, কিন্তু বেদবিরুদ্ধ অথবা বেদমূলক শাস্ত্রবিরুদ্ধ শিষ্টাচার গ্রহণযোগ্য নহে। যাঁহারা যথাবিধি বেদাদি শাস্ত্রগ্রহণ, তদনুসারে আচরণ

১। নিখিলকলাকলাপস্যাপি মূলভূতস্য বেদস্য নিকৃষ্টবাক্যার্থবর্ণনব্যাজেনাশেষপুরুষার্থরত্নাকরস্য ভগবতো ধর্মস্য, বাস্তবিকং তত্ত্বমবগময়িতুং প্রবৃত্তেয়ং দ্বাদশলক্ষণী ভগবতী মীমাংসা…' (পী. এন. পট্টভিরাম শাস্ত্রী) তন্ত্রসিদ্ধান্তরত্নাবলির ভূমিকা।

২। মীমাংসা দর্শন (বসুমতী সিরিজ), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫।

এবং সেই গ্রহণ ও আচরণ পুত্রশিষ্যাদিতে সংক্রামিত করান তাঁহারাই শিষ্ট। প্রথম অধ্যায়ের চারিটি পদে এই সকলই বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম 'ভেদলক্ষণ।' উৎপত্তিবিধি দ্বারা বোধিত যেধর্ম, তাহার ভেদ দ্বিতীয় অধ্যায়ের চারিটি পাদে বিচারিত হইয়াছে। সে জন্য এই অধ্যায়ে উৎপত্তিবিধির আলোচনাই প্রধান।

ভেদ লক্ষণ ২য় অধ্যায়

এই দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়কে বলা হয় 'শেষলক্ষণ' অর্থাৎ প্রধানের উপকারক অধ্যায়। ইহা দ্বারা সেজন্য বিনিয়োগ বিধির স্বরূপ প্রভৃতিও আলোচিত হইয়াছে, কারণ 'বিনিয়োগবিধি' দ্বারাই শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যারূপ ছয় প্রমাণের সাহায্যে অঙ্গত্বের বোধ জন্মে।

শেষ লক্ষণ ৩য় অধ্যায়

মীমাংসার চতুর্থ অধ্যায়ের নাম 'প্রয়োগ-লক্ষণ'—কোন্ কর্ম কাহার দ্বারা প্রবৃত্ত, অপূর্বই কর্মের প্রযোজক কি না ইত্যাদি নানা প্রকার প্রয়োগ সম্বন্ধীয় বিচার এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রয়োগ লক্ষণ ৪র্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়ের নাম 'ক্রমলক্ষণ'—শ্রুতি, অর্থ, পাঠ, স্থান, মুখ্য এবং প্রবৃত্তি অনুযায়ী কর্মের ক্রম অর্থাৎ পারম্পর্য বিষয়ক বিচার এই অধ্যায়ের চারিটি পাদে দেখা যায়। অতএব চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে 'প্রয়োগবিষয়ক' আলোচনাই হইয়াছে বলা যায়।

ক্রম লক্ষণ ৫ম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায় 'অধিকারলক্ষণ' নামে পরিচিত। শাস্ত্রীয় কর্মে কাহার 'অধিকার', কোন্ কর্মের কোন্ 'অধিকার', তাহা এই অধ্যায়ের আটটি পাদে বর্ণিত হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে এজন্যই 'অধিকারবিধি'র বিশদ আলোচনা পাওয়া যায়।

অধিকার লক্ষণ ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

ইহার পর সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ের অতিদেশের সামান্য এবং বিশেষ অবস্থার বিচার করা হইয়াছে। এজন্য সপ্তমকে 'সামান্যতোঽতিদেশলক্ষণ' এবং অষ্টমকে 'বিশেষতোঽতিদেশ-লক্ষণ' বলা হইয়া থাকে। নবম অধ্যায়কে বলে 'উহলক্ষণ'। ইহার চারিটি পাদে আছে উহবিষয়ক বিচার। দশম অধ্যায়ের আটটি পাদে আছে 'বাধ'বিষয়ক বিচার। এজন্য উহার নাম 'বাধলক্ষণ'। একাদশ অধ্যায়ের নাম 'তন্ত্রলক্ষণ'—উহাতে আছে

সামান্যতোঽতিদেশ লক্ষণ—৭ম এবং বিশেষতোঽতিদেশ লক্ষণ ৮ম অধ্যায়

উহ লক্ষণ ৯ম অধ্যায়

বাধ লক্ষণ ১০ম অধ্যায়

তন্ত্র লক্ষণ ১১শ অধ্যায়

প্রসঙ্গ লক্ষণ ১২শ অধ্যায়

তন্ত্রতা সম্বন্ধে আলোচনা; আর দ্বাদশ অধ্যায় 'প্রসঙ্গলক্ষণ' রূপ—উহাতে প্রসঙ্গবিষয়ক বিচার দেখা যায়।

এই দ্বাদশলক্ষণী মীমাংসার উপর শবর স্বামী যে ভাষ্য রচনা করেন, তাহার উপর যে টীকা বর্তমানে পাওয়া যায়, তাহাতে দুইটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। উহাদের নাম ভট্ট সম্প্রদায় এবং প্রভাকর সম্প্রদায়—ইহাদের কথা পূর্বেও কিছু বলা হইয়াছে। ভাট্টমতের অপর নাম 'তৌতাতিত' মত, আর প্রাভাকরমত 'গুরুমত' বলিয়াই প্রসিদ্ধ। এই দুই মতের ব্যাখ্যার মধ্যে বহু স্থলে বহু পার্থক্য আছে। এজন্য অতি সংক্ষেপে ভাট্ট এবং প্রাভাকর মতের (ক) অল্প পরিচয় দেওয়া হইল।

তৌতাতিত ও গুরুমত

ভাট্ট এবং প্রাভাকর, উভয় মতেই প্রথমত পদার্থ দ্বিবিধ (প্রমাণ এবং প্রমেয় ভেদে)। পদ অর্থাৎ শব্দের দ্বারা যাহা শক্তি অথবা লক্ষণাবলে জ্ঞাত বা বোধিত হয়, তাহাই পদার্থ।

প্রাভাকরমত[১] ঃ—এই মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ এবং অর্থাপত্তি ভেদে প্রমাণ পাঁচ প্রকার। প্রমার করণকেই বলে 'প্রমাণ'। 'প্রমা'র অর্থ যথার্থ জ্ঞান (বা true knowledge)। এই মতে অনুভূতিই প্রমাণ—স্মৃতি ভিন্ন যে সম্বিৎ তাহাই অনুভূতি (feeling)। প্রত্যক্ষাদিভেদে এই অনুভূতিই পাঁচ প্রকার। সমস্ত জ্ঞান বা সম্বিৎ প্রমাত্মক। কেবল অসংসর্গের অগ্রহের জন্যই জন্মে ভ্রম। শুক্তিতে যে রজতের সম্বন্ধ নাই, ইহা যখন গৃহীত হয় না (অর্থাৎ জ্ঞানে বা সম্বিতে যখন তাহা প্রকাশিত হয় না), তখনই তাহাকে ভ্রম বলা হইয়া থাকে। অথচ সত্যই এখানে ভ্রম বলিয়া কিছু তো নাই; কারণ এখানে শুক্তির গ্রহণাত্মক জ্ঞান এবং রজতের স্মরণাত্মক জ্ঞান ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও দোষ বশতঃই (due to fallacy) ঐ জ্ঞান দুইটির ভেদ বোঝা যায় না এবং এই দুইটি জ্ঞানের বিষয় দুইটি বস্তুর ভেদও বোঝা যায় না। য়ুরোপীয় তর্কশাস্ত্রে

প্রমাণ ৫ প্রকার

সকল জ্ঞানই প্রমাত্মক

(ক) উভয়ের পার্থক্য সংক্ষেপে মনে রাখিবার জন্য দ্রঃ তন্ত্রসিদ্ধান্তরত্নাবলি পৃঃ ১৭৫—১৭৬

১। রামানুজের 'তন্ত্ররহস্য' অবলম্বনে লেখা।

ইহাকেই malobservation বলা হইয়া থাকে। এইভাবে প্রাভাকরমত বিবেকের অগ্রহ অর্থাৎ অসংসর্গের অখ্যাতি স্বীকার করে না বলিয়া ইহাকে 'অখ্যাতিবাদী' বলা হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান কিন্তু বাধিত হয় না, কেননা সকল জ্ঞানই যথার্থ। প্রভাকরমতে জ্ঞান এবং সম্বিৎ এক নহে। আত্মার সহিত মনের সংযোগই জ্ঞান, আর আত্মার গুণই সম্বিৎ—ইহারই অপর নাম 'প্রকাশ'।

প্রাভাকর মত 'অখ্যাতিবাদী'

জ্ঞান ও সম্বিৎ এক নহে

সাক্ষাৎভাবে প্রতীতিই প্রত্যক্ষ। বিষয়ের যে অপরোক্ষতা তাহাই সাক্ষাৎ প্রতীতি। অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের দ্বারা প্রমেয় বিষয়টির যে প্রকার প্রকাশ হয়, প্রত্যক্ষ দ্বারা তাহার অপেক্ষা বিশদ প্রকাশ হয় বলিয়া ইহার আর এক নাম 'বিশদাবভাস'। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে প্রমেয়, প্রমিতি ও প্রমাতা—এই তিনটি অংশের সাক্ষাত্ত্ব সকলেরই অনুভবগম্য। অনুমিতি, শাব্দবোধ প্রভৃতি পরোক্ষ প্রমাতে, প্রমিতি এবং প্রমাতাতে এই সাক্ষাত্ত্বের উপলব্ধি জন্মে।

প্রত্যক্ষ

'বিশদাবভাস'

মীমাংসকেরা বৈশেষিকদর্শনের ন্যায়ই প্রমেয়ের বিভাগ স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু কোনো কোনো স্থলে উভয় মতের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। প্রাভাকর মতে প্রমেয় পদার্থ আটটি—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, সমবায়, শক্তি, সংখ্যা ও সাদৃশ্য। দ্রব্য নয়টি—পৃথিবী, অপ্, তেজ, মরুৎ, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন। প্রাচীন বৈশেষিক দর্শনবাদিগণ বায়ুর প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন নাই, কিন্তু প্রাভাকরমতে ত্বক্-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বায়ুর প্রত্যক্ষ হয়। এই মতে কেবল পৃথিবীরই শরীরারম্ভকত্ব আছে। জরায়ুজ, অণ্ডজ এবং স্বেদজ ভেদে শরীর ত্রিবিধ। প্রাভাকরমতে উদ্ভিজ্জ বৃক্ষ প্রভৃতি শরীর নহে, কারণ 'শরীরে'র অর্থ ভোগের আশ্রয় বা আয়তন। সুখ দুঃখের যে অনুভব তাহাই 'ভোগ'। উদ্ভিদ্ সুখ ও দুঃখের অনুভব জানে না; কাজেই উদ্ভিজ্জ শরীর নয়। তবে যে শাস্ত্রে 'অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখ-সমন্বিতাঃ' প্রভৃতি দেখা যায়, তাহা অর্থবাদমাত্র।

দ্রব্য

প্রাভাকরমতে আত্মা সকল জ্ঞানেই জ্ঞানের আশ্রয়রূপে ভাসমান থাকে এবং

'অস্মদ্' শব্দ দ্বারাই তাহাকে বোঝান হয়। আত্মার গুণ ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, ধর্ম, অধর্ম প্রভৃতি। এইমতে আত্মার মানস-প্রত্যক্ষ হয় না, কারণ তাহাতে 'কর্মকর্তাবিরোধ' হয়। আত্মা জড়—সম্বিৎ আত্মার গুণ। এই সম্বিৎ স্বয়ং-প্রকাশা—এজন্যই প্রাভাকরমত বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনের ন্যায় 'অনু-ব্যবসায়' স্বীকার করে না; এজন্য প্রত্যেক জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞান, জ্ঞানের আশ্রয় আত্মা এবং বিষয় তিনটিই প্রকাশিত হয় বলিয়া প্রাভাকরমতকে বলা হয় 'ত্রিপুটী-প্রত্যক্ষবাদী'।

আত্মা

তমঃ

এইমতে 'তমঃ' পৃথক্ দ্রব্য নয়—উহা তেজেরই অভাব, অতএব অধিকরণ-স্বরূপ। সুতরাং আলোকবিহীন যে ভূভাগ প্রভৃতি, তাহাই ছায়া। প্রভাকর সংখ্যাকে গুণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, শব্দ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম এবং অধর্ম এই তেইশটি গুণ। ইহাদের সম্বন্ধে অন্যান্য বিশেষত্ব বৈশেষিকেরই মত। তবে প্রাভাকর মতে বর্ণাত্মক শব্দ নিত্য, কিন্তু বৈশেষিক মতে তাহা অনিত্য

গুণ

প্রাভাকরমতে কর্ম চলনাত্মক এবং সংযোগ ও বিভাগের পারম্পর্য হইতেই অনুমিত হয়। কর্ম স্বভাবতই সাধ্যস্বরূপ—এজন্য ইহাই সাক্ষাৎ বিধির বিষয়ীভূত। দ্রব্য এবং গুণ সিদ্ধ-স্বরূপ, সাধ্য নহে। এজন্য ইহারাও বিধির বিষয়ীভূত। কেবল প্রত্যক্ষ দ্রব্যে জাতি থাকে—একাধিক দ্রব্যের মধ্যে অনুগতভাবে থাকাই এই জাতির ধর্ম। জাতি ব্যক্তি হইতে অত্যন্ত ভিন্ন এবং জাতি ও ব্যক্তির সম্বন্ধ হইতেছে সমবায়। প্রাভাকরমতে সত্তা জাতি স্বীকৃত হয় না। ইঁহারা আবার বৈশেষিক দর্শনের 'বিশেষ' পদার্থটিকেও স্বীকার করেন না। পৃথক্ত্বের দ্বারাই 'বিশেষ' নামক পদার্থের প্রয়োজন সাধিত হয়। এইমতে সমবায় স্বীকৃত। বৈশেষিক মতে সমবায় কেবল নিত্যই হইয়া থাকে; কিন্তু প্রাভাকর মতে সমবায় নিত্য এবং অনিত্য দুইই হয়। সম্বন্ধি-

কর্ম

জাতি (সামান্য)

বিশেষ

সমবায়

দুইটি নিত্য হইলে সমবায় সম্বন্ধও নিত্য হয়, অন্যত্র অনিত্য। অভাব প্রাভাকর-মতে অতিরিক্ত পদার্থ নয়, ইহা অধিকরণস্বরূপ। ভূতলে যে ঘটাভাব তাহা ভূতল হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে এইজন্য অনুপলব্ধি প্রমাণও প্রভাকর স্বীকার করেন নাই। শক্তি এই মতে অতিরিক্ত পদার্থ, ইহা নিত্য এবং অতীন্দ্রিয়। সমস্ত পদার্থের মধ্যেই শক্তি বিদ্যমান। কার্যের দ্বারা শক্তি অনুমিত হইয়া থাকে। কারণ প্রতিবন্ধক-রহিত শক্তি হইতেই কার্যের উৎপত্তি হয়।

অভাব

শক্তি

প্রাভাকরমতে সংখ্যা একটি অতিরিক্ত পদার্থ; কিন্তু বৈশেষিকমতে ইহা চব্বিশটি গুণেরই একটি। প্রাভাকরগণ বলেন যে সংখ্যা গুণ হইতে পারে না; কারণ গুণের মধ্যে গুণ থাকিতে পারে না। অথচ ত্রিবিধ স্পর্শ ইত্যাদি গুণের মধ্যেও সংখ্যার অস্তিত্ব দেখা যায়। সেজন্যই সংখ্যা একটি স্বতন্ত্র পদার্থ। সাদৃশ্যও একটি স্বতন্ত্র পদার্থ—ইহা দ্রব্য নয়, জাতি বা সামান্য নয়।

সংখ্যা

সাদৃশ্য

আত্মাই ভোক্তা, শরীর ভোগায়তন, ইন্দ্রিয়গুলি ভোগসাধন, এবং বাহ্য ও আন্তরভেদে ভোগ্য দ্বিবিধ। পৃথিবী প্রভৃতি বাহ্য ভোগ্য পদার্থ, আর সুখ প্রভৃতি আন্তরভোগ্য। সুখদুঃখের অনুভবকেই 'ভোগ' বলা হয়।

সকল প্রকার দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশই 'মুক্তি'। আত্মজ্ঞান হইতেই সেই মুক্তিলাভ সম্ভবপর। যিনি অস্থায়ী পুরুষার্থত্রয়ে (ধর্ম, অর্থ ও কামেতে) বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়া সকল প্রকার দুঃখের উচ্ছেদ কামনা করেন, তিনিই ঐ মুক্তির অধিকারী। সকাম পুরুষের জন্যই বেদমধ্যে কর্মকাণ্ডের উপদেশ রহিয়াছে, কারণ সাধারণ বর্ণাশ্রমী মাত্রেই কর্মের অধিকারী। কিন্তু মোক্ষাধিকারীর জন্য রহিয়াছে জ্ঞানকাণ্ড। আবার এই উভয় প্রকার অধিকারীরই পূর্বে বর্ণিত প্রমেয় সকলের জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

মোক্ষ

প্রভাকর অন্বিতাভিধানবাদী; তাঁহার মতে কেবল সিদ্ধার্থে 'সংগতিগ্রহ'

হয় না, কিন্তু ক্রিয়ার সহিত অন্বিত ভাবেই 'সংকেতগ্রহ' হইয়া থাকে। এই মতে ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইয়া সংকেতগ্রহ হয় বলিয়া প্রভাকরের মতাবলম্বিগণকে 'অন্বিতাভিধানবাদী' বলা হয়।

অন্বিতাভিধানবাদ

এই মতে যাগাদিকর্মের জন্য 'অপূর্ব'ই (ফল) ধর্ম, যাগাদি ধর্ম নহে। কাজেই বিধির অর্থ 'অপূর্ব'। 'যজ্ঞ করা উচিত'—এইস্থলে অর্থ 'অপূর্ব' কাজের অনুষ্ঠান কর। প্রভাকরের মতে একমাত্র বেদবাক্যই স্বতঃপ্রমাণ—লৌকিকবাক্য অর্থের জ্ঞাপক মাত্র। এই স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ ভাট্ট এবং প্রাভাকর মত উভয়ত্রই স্বীকৃত। প্রভাকর জ্ঞান বা সম্বিৎকে স্বতঃপ্রকাশ মনে করেন, কিন্তু কুমারিল-মতে জ্ঞান অনুমিতি-জন্য বলিয়া নিত্যই অনুমেয়।

বিধি অর্থ 'অপূর্ব'

বেদবাক্য স্বতঃপ্রমাণ

জ্ঞান স্বতঃপ্রকাশ

ভাট্ট মত[১] :—প্রমার করণই 'প্রমাণ'। অজ্ঞাততত্ত্বের অর্থ সম্বন্ধীয় জ্ঞান 'প্রমা'। স্মৃতি এবং অনুবাদ জ্ঞানবিষয়ক বলিয়া প্রমা নহে। এই মতে মিথ্যাজ্ঞান স্বীকার করা হয়। প্রাচীন তার্কিকগণের মত ইঁহারাও 'অন্যথাখ্যাতি' বা 'বিপরীতখ্যাতি' স্বীকার করেন। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধিভেদে 'প্রমাণ' ছয় প্রকার। ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজাত জ্ঞানই 'প্রত্যক্ষ প্রমাণ'। চক্ষু, রসনা, ঘ্রাণ, ত্বক্, শ্রোত্র ও মন ছয়টি ইন্দ্রিয়। বৈশেষিক-গণের ন্যায় ভাট্ট মতেও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ভৌতিক। এই মতে মন বিভু এবং সুখ দুঃখ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের করণ 'ইন্দ্রিয়'। মন বিভু হইলেও কেবল শরীরেই মনের ইন্দ্রিয়ত্ব আছে, বাহ্যস্থলে নাই।

প্রমাণ ছয় প্রকার

ছয়টি ইন্দ্রিয়

ভাট্ট মতে 'বিষয়েন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ' তিনপ্রকার—সংযোগ, সংযুক্ততাদাত্ম্যতাদাত্ম্য। দ্রব্যের সহিত গুণ, ক্রিয়া ও জাতির তাদাত্ম্য সম্বন্ধ স্বীকার করা হইয়া থাকে, কারণ ভাট্টগণ সমবায় স্বীকার করেন না। দিক্, আকাশ ও তমঃ—এই তিনটি দ্রব্যেরও ইঁহারা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন। এ জন্য এই তিনটি দ্রব্যের সহিত চক্ষুর সংযোগসন্নিকর্ষ স্বীকার করেন।

বিষয়েন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ ত্রিবিধ

১। 'মানমেয়োদয়' অনুসারে লিখিত।

ভাট্টমতে শব্দ বিভু দ্রব্যপদার্থ বলিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত শব্দের সংযোগ-সন্নিকর্ষ স্বীকার করা হয়। মনের সহিত আত্মার সংযোগসন্নিকর্ষের জন্য আত্মার মানস প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। আত্মা ও মন উভয়েই বিভু হইলেও ইহাদের নিত্যসংযোগ স্বীকার করা হয়। এই মতে 'কাল' সর্বেন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগসন্নিকর্ষের দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে। ভাট্টগণ বলেন যে 'অভাবের' প্রত্যক্ষ হয় না, তাহা 'অনুপলব্ধি প্রমাণে'র দ্বারা পাওয়া যায়। 'সমবায়কে' ইঁহারা স্বীকার করেন না বলিয়া 'বিশেষণ-বিশেষ্য ভাব-সন্নিকর্ষ'ও ইঁহাদের দ্বারা স্বীকৃত হয় নাই।

অভাবের প্রত্যক্ষ হয় না

'নির্বিকল্পক' ও 'সবিকল্পক' ভেদে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজাত জ্ঞান দুই প্রকার। ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষের পরই দ্রব্যাদির স্বরূপমাত্রবিষয়ক শব্দোল্লেখহীন যে জ্ঞান জন্মে তাহাই 'নির্বিকল্পক'। বিশিষ্ট কল্পনা নাই বলিয়া ইহাকে 'নির্বিকল্পক' বলা হয়। এই নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের পর শব্দস্মরণ সহযোগে জাত্যাদিবিশিষ্ট বস্তুবিষয়ক যে প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয় তাহাকে বলে 'সবিকল্পক'। দ্রব্য, জাতি, গুণ, কর্ম এবং নাম দ্বারা 'বিকল্প' পঞ্চপ্রকারের হয়। ভাট্টেরা 'স্বতঃপ্রামাণ্যবাদী'। ইঁহারা অপ্রামাণ্যের দোষজন্যত্ব স্বীকার করেন।

নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক জ্ঞান

এই মতে দ্রব্য, জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও অভাব ভেদে প্রমেয় পদার্থ ৫টি। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, ব্যোম, দিক্, কাল, আত্মা, মন, অন্ধকার ও শব্দ এই এগারটি দ্রব্য। ভাট্টমতে আত্মা-চৈতন্যের আশ্রয় এবং মানসপ্রত্যক্ষগম্য।

প্রমেয় ৫টি, দ্রব্য ১১টি

দেহ, ইন্দ্রিয়াদি হইতে ভিন্ন এবং শরীরভেদে ভিন্ন এই আত্মা—ইহা বিভু-পরিমাণ, নিত্য এবং ভোগ, স্বর্গ ও অপবর্গভাগী। দুঃখসমূহের আত্যন্তিক উচ্ছেদের দ্বারা আনন্দানুভবই 'মুক্তি'। পার্থসারথিমিশ্র প্রভৃতি কিন্তু কেবল-মাত্র দুঃখের অত্যন্ত উচ্ছেদকেই মুক্তি বলেন। নিষিদ্ধ এবং কাম্য কর্ম পরিত্যাগ করিয়া নিত্যনৈমিত্তিক এবং প্রায়শ্চিত্ত কর্মের অনুষ্ঠানদ্বারা সঞ্চিত পাপরাশির বিনাশ করিয়া এবং আরব্ধ

আত্মা

কর্ম সুখদুঃখের অনুভব দ্বারা ক্ষীণ করিয়া ব্রহ্মচর্যাদি এবং শমদমাদি দ্বারা যুক্ত হইয়া ভাট্টগণের মতে বেদান্তোক্ত রীতিতে আত্মমীমাংসার দ্বারা 'মুক্তি'লাভ হইয়া থাকে। আর এই 'মুক্তি' নিত্যানন্দপ্রকাশস্বরূপিণী।

মুক্তি

কুমারিলের মতে বর্ণাত্মক শব্দ সর্বগত বিভু, দ্রব্য এবং শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। ইনি শব্দকে আকাশের গুণ বলেন নাই। জাতি সর্বগত, নিত্য এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত। ইঁহারা জাতির সহিত ব্যক্তির তাদাত্ম্য স্বীকার করেন। ভাট্টমতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সংস্কার, ধ্বনি (বা ধ্বন্যাত্মক শব্দ), প্রাকট্য এবং শক্তি —এই চব্বিশটি গুণ।

শব্দ

জাতি

গুণ

আত্মার বিশেষ গুণ—বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন। বুদ্ধি ব্যতীত সুখাদি পাচটি মানসপ্রত্যক্ষগম্য। 'বুদ্ধি' মানসপ্রত্যক্ষগম্য নহে, বিষয়প্রকাশরূপ প্রাকট্যের দ্বারা তাহা অনুভূত হইয়া থাকে। বুদ্ধির অর্থ জ্ঞান। যাহা 'ঘট প্রকাশিত হইতেছে' কিংবা 'ঘট প্রকট' এইরূপ ব্যবহারের কারণ, তাহাই প্রাকট্য। ইহা সর্বদ্রব্যবৃত্তি সামান্য গুণ।

আত্মার বিশেষ গুণ

এই মতে লৌকিক ও বৈদিক ভেদে শক্তি দুই প্রকার। লৌকিক শক্তি অর্থাপত্তির দ্বারা বুঝা যায়, আর বৈদিক শক্তি বেদৈকগম্য। 'কর্ম' এবং 'অভাব' সম্বন্ধীয় আলোচনা বৈশেষিকমতের অনুগামিনী।

কর্ম ও অভাব

ভাট্টমত 'অভিহিতান্বয়বাদী'। এই মতে এক একটি পদ পদান্তরনিরপেক্ষ ভাবেই অভিধার দ্বারা পদার্থের 'অভিধান' করিয়া থাকে। এই যে 'অভিধান'—ইহা এক প্রকার জ্ঞান এবং স্মৃতি হইতে ও অনুভূতি হইতে পৃথক্ এক তৃতীয় প্রকার। এইভাবে পদাভিহিত পদার্থ সকল পরে বিশেষণবিশেষ্যরূপে জ্ঞানে ভাসমান হইয়া সংসর্গরূপে

অভিহিতান্বয়বাদ

বাক্যার্থের বোধ উৎপাদন করে। ইহাদের মতে লৌকিক এবং বৈদিক পদ-পদার্থের ভেদ স্বীকৃত হয় না।[১]

কুমারিলের মতে বিধিবিহিত যাগপ্রভৃতিই ধর্ম; আর ব্রহ্মহত্যা, কলঞ্জ-ভক্ষণ প্রভৃতি অধর্ম। ইহাই অতি সংক্ষেপে ভাট্ট এবং প্রাভাকরমতের পরিচয়।[২]

মীমাংসার একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় বিধিপ্রত্যয়ার্থনিরূপণ।[৩] ইহা নিরূপণ করিবার জন্য 'বিধিবিবেক', 'বিধিরসায়ন' প্রভৃতি প্রাচীন ও নব্য বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এখানে অতি সংক্ষেপে ইহার আলোচনা করিতেছি।

বিধি

কুমারিলের মতে লিঙ্, লোট্, তব্য প্রত্যয়যুক্ত বাক্যে দ্বিবিধ ভাবনা বুঝা যায়—শব্দভাবনা এবং অর্থভাবনা। আখ্যাত কেবল অর্থভাবনাকেই বুঝায়, আর লিঙ্, লোট্ প্রভৃতি শব্দভাবনাকে জ্ঞাপিত করে। "ইহাই 'অভিধাভাবনামাহুঃ' ইত্যাদি বার্ত্তিকের অনুসারী সুচরিত মিশ্র প্রভৃতির মত। আর 'ইষ্টসাধনত্বই বিধ্যর্থ'; ইহা 'শ্রেয়ঃসাধনতা হ্যেষাং নিত্যং বেদাৎ প্রতীয়তে', 'কর্তুরিষ্টাভ্যুপায়ে হি কর্তব্যমিতি লোকধীঃ' ইত্যাদি বার্ত্তিকানুসারে মণ্ডনমিশ্র, চিদানন্দ প্রভৃতি আচার্যগণ বলিয়াছেন। পরিতোষমিশ্র, পার্থসারথিমিশ্র প্রভৃতি ভট্টমতানুসারী আচার্যগণ উভয় পক্ষ অবলম্বন করিয়াই বিধ্যর্থ নিরূপণ করিয়াছেন।"[৪]

এখন কথা হইতেছে এই যে, এই জাতীয় বিচারের সহিত দার্শনিকতার যোগ কোথায়? পূর্বেই বলিয়াছি যে বেদ কেবল বিধি দেয় বা হুকুম করে, কিন্তু হুকুম করিতে হইলেই কোনো ব্যক্তিকে হুকুম করে। কাজেই ব্যক্তিতত্ত্ব বা জীবতত্ত্ব

ব্যক্তিতত্ত্ব বা জীবতত্ত্বই মীমাংসার বিচার্য

মীমাংসার বিচারের বিষয়। জাগতিক বস্তু ছাড়া যজ্ঞ হয় না, কাজেই জাগতিক বস্তুর স্বরূপটি এবং প্রমাণ বলিতে আমরা কি বুঝি তাহাও মীমাংসার বিচারের

১। ভাট্টমত এবং প্রাভাকরমতের প্রভেদের জন্য দ্রঃ তন্ত্রসিদ্ধান্তরত্নাবলিঃ পৃঃ ১৬১—১৭৪

২। ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা, পৃঃ ৪১-৪৩

৩। ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা ৫—৬

৪। মীমাংসাদর্শনম্ (দ্বিতীয় খণ্ড), বসুমতী সাহিত্য মন্দির (পৃঃ ১৮

বিষয়। মীমাংসকেরা জগৎকে সত্য বলিয়া মানেন। তাঁহারা কোনো 'ঈশ্বর' মানেন না এবং জগৎ যে কোনো সময় সৃষ্ট হইয়াছিল এবং কোনো সময় যে ইহা ধ্বংস হইবে তাহাও তাঁহারা মানেন না—কাজেই 'ঈশ্বর' সম্বন্ধে কোনো আলোচনা মীমাংসার বিষয় নহে : যাগযজ্ঞে নানা দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু মীমাংসকেরা সেই সকল দেবতার স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেন না—উচ্চারিত মন্ত্রের মধ্যেই তাঁহাদের সত্তা। যজ্ঞীয় অনুষ্ঠান সম্যক্ সম্পাদিত হইলে সেই অনুষ্ঠানের ফলে যজ্ঞফল, যথা স্বর্গলাভ, পুত্রলাভ ইত্যাদি লাভ করা যায়। কোনো দেবতার অনুগ্রহে ও বিদ্বেষে কোনো সুফল বা কুফল হয় না, কাজেই স্বতন্ত্র দেবতা স্বীকার করিবার কোনো প্রয়োজন নাই।

জগৎ সত্য, ঈশ্বর নাই

মীমাংসকেরা আত্মাকে সর্বব্যাপী বলিয়া মনে করেন। কুমারিল বলেন যে, মানস প্রত্যক্ষের দ্বারা আমরা আত্মাকে 'জ্ঞাতা আমি' বলিয়া বুঝিতে পারি। আত্মাই 'এই আমি' বলিয়া বুঝিবার বস্তু। কুমারিল ও প্রভাকর—উভয়েই আত্মাকে স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়া মানেন না এবং সুষুপ্তিতে যে আনন্দের অনুভব হয় একথাও মানেন না। তাঁহারা বলেন যে সুষুপ্তিতে আমাদের কোনো জ্ঞান থাকে না—এইখানে শাংকরবেদান্তিগণের সহিত মীমাংসকদের প্রভেদ। কুমারিল বলেন যে 'আত্মা' জ্ঞানশক্তিস্বরূপ ; কিন্তু জ্ঞান হইতে হইলে মন, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সহিত সংযোগ হওয়া চাই। কিন্তু মোক্ষদশায় এইরূপ সংযোগ থাকে না, কাজেই তখন কোনো জ্ঞান হয় না। কাজেই মোক্ষের সময় আত্মার কোনো সুখ ও দুঃখ বোধ থাকে না। সমস্ত কাম্যকর্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল নিত্যকর্ম করিয়া গেলে কাম্যফল আর ঘটে না, কারণ নিত্যকর্মে (যেমন সন্ধ্যা বন্দনা ইত্যাদিতে) কোনো ফল নাই। এইরূপে সকল সঞ্চিত কর্ম যখন ভোগের দ্বারা ক্ষয় হয় এবং নূতন কর্ম আর সঞ্চিত হয় না, তখনই মোক্ষ হয়।

আত্মা সর্বব্যাপী

আত্মার দর্শন ঘটে মানস প্রত্যক্ষে

আত্মা জ্ঞান-শক্তিরূপ

মোক্ষের সময় আত্মা নিজস্ব ও নিত্যসত্ত্বস্থ হয়

ভোগের দ্বারা কর্মক্ষয় হইলেই আসে মোক্ষ

'ভ্রম' সম্বন্ধে মীমাংসকমতের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এই ভ্রমের নাম 'অখ্যাতি'। অদ্বৈত-বেদান্তীরা বলেন যে, অল্প আলো থাকায় বা চোখের দোষে বা দূরত্ব বশত বা মানসিক বিকারের ফলে রজ্জুকে যখন আমরা সর্প বলিয়া মনে করি তখন সেই রজ্জুর উপর একটি অনির্বচনীয় সর্পের সৃষ্টি হয়। এইজন্য ভ্রমের বিষয়বস্তু অনির্বচনীয়। জগৎও এমনি একটি অনির্বচনীয় সৃষ্টি, এই ভ্রমকে অনির্বচনীয় খ্যাতি কহে।

ভ্রমকে বলা হয় 'অখ্যাতি'

বেদান্ত মতে 'ভ্রম'

'ব্যাকরণ' ছয়টি বেদাঙ্গের একটি বেদাঙ্গ। ব্যাকরণের সঙ্গে বেদপাঠের অতি নিকট সম্বন্ধ। 'বেদাঙ্গ' শ্রুতি নয়, স্মৃতি। এই যুক্তিতেই তাহাদের প্রামাণ্য যে দ্বিতীয় স্তরের তাহা বুঝানো যায়। তবুও তাহাদের একটা মূল্য আছে। মুখ্যভাবে ব্যাকরণ মীমাংসার আলোচ্য না হইলেও গৌণভাবে অনেক সূক্ষ্ম কথা মীমাংসার আলোচনার ফলে ব্যাকরণে প্রবেশ করিয়াছে। শব্দের নিত্যতা, শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ, প্রকৃতি ও প্রত্যয়, স্ফোট প্রভৃতি বিষয় কতক অভিধানের বা নিরুক্তের, আর কতক ব্যাকরণের বিচার্য। ব্যাকরণের সকল সূক্ষ্ম তত্ত্বের আবিষ্কারে সম্মান দর্শনগুলির মধ্যে ন্যায় ও মীমাংসারই বিশেষভাবে প্রাপ্য। মীমাংসা এই সব তর্কবিচারে যোগ দিয়াছিল, ইহা স্মরণ না রাখিলে মীমাংসার প্রতি অবিচার করা হয়।

মীমাংসা ও ব্যাকরণ

দর্শন হিসাবে মীমাংসার স্থান যে খুব উন্নত নয়, একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। অনেক সূক্ষ্ম বিচার মীমাংসা করিয়াছে এবং সেইজন্য সমস্ত মীমাংসকদিগকে—জৈমিনি, শবর, কুমারিল, প্রভাকর, মুরারি প্রভৃতি লেখককে—তাঁহাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

দর্শন হিসাবে মীমাংসার স্থান

দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলির প্রতি মীমাংসা অতি অল্পই দৃষ্টি দিয়াছে। সেজন্য আধুনিক চিন্তার ভাণ্ডারে রক্ষিত হইবার মতো সামগ্রী ইহার কাছে আমরা বেশী পাই নাই। বেদের বিধিবাক্যের অর্থোদ্‌ঘাটন করাই তাহার প্রধান কাজ; এ বিষয়ে অনেক সূক্ষ্ম বিচারই দেখানো হইয়াছে।

তাহার ফলে বিধির অর্থ আবিষ্কারের কতকগুলি নির্দিষ্টপথ মীমাংসা বাঁধিয়া দিয়াছে—হিন্দু-আইনের ব্যাখ্যায় সে সকল আধুনিক আদালতেও অনেক সময়েই প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু স্বাধীন ভারতের হিন্দুনরনারীর জীবনে এই মীমাংসার শাসন অধুনা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। বেদবিরোধী সমাজের অনুশাসন এখন মীমাংসাকে অগ্রাহ্য করিয়া উত্তরাধিকার, বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপারে অভিনব স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছে।

মীমাংসা এবং আধুনিক চিন্তাপ্রণালী

মীমাংসা দর্শন সম্বন্ধে পণ্ডিত নেহেরু বলেন, "এটি অনুষ্ঠান-প্রধান ও এর গতি বহুদেববাদের দিকে। এই দর্শনের বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায় বর্তমান হিন্দুধর্ম ও হিন্দু আইনের উপর। এতেই বিধিবদ্ধ হয়ে আছে সৎজীবনযাপনের নিয়মগুলি, আর হিন্দুদের এগুলি মানতে হয়। একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক যে এই দর্শনে বিবৃত বহুদেববাদ বিচিত্র প্রকারের, কারণ দেবতাদের বিশেষ বিশেষ শক্তি থাকলেও তাঁদের মানুষ অপেক্ষা নিম্নস্তরের বলে মনে করা হয়েছে। ......"[১]

মীমাংসা সম্বন্ধে পণ্ডিত নেহেরু

মীমাংসক আচার্যগণ[২] :—জৈমিনির আবির্ভাবকাল সর্বসম্মতিক্রমে খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতক হইতে তৃতীয় শতক। ইনি ব্রহ্মসূত্র-প্রণেতা বাদরায়ণের সমকালবর্তী। কারণ মীমাংসার মধ্যে বাদরায়ণের এবং বেদান্তের মধ্যে জৈমিনির উল্লেখ পাওয়া যায়। ইঁহারই গ্রন্থের নাম 'মীমাংসাদর্শন'।

জৈমিনি

উপবর্ষ পূর্বমীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসার বৃত্তিকার বলিয়া প্রসিদ্ধ। কাহারও কাহারও মতে ইঁহারই অপর নাম বোধায়ন। পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণের মতে ইঁহার আবির্ভাবকাল খৃঃ পূঃ প্রথম শতক হইতে খৃঃ অব্দ ২০০র মধ্যে। আমাদের পণ্ডিতগণের মতে কিন্তু উপবর্ষের আবির্ভাব এই কালের বহু পূর্বে।

উপবর্ষ

১ ভারত সন্ধানে—জওহরলাল নেহেরু [সিগনেট প্রেস এডিশন] পৃঃ ২০২-২০৩

২ According to K. R. Pisharoti's Introduction to 'Tattvabindu'.

শবর স্বামী

শবরস্বামীর আবির্ভাবকাল সম্ভবত ২০০ খৃষ্টাব্দ। ইনি বর্তমান মীমাংসা ভাষ্যের রচয়িতা। কিংবদন্তী অনুসারে ইঁহার প্রকৃত নাম আদিত্যদেব। জৈনগণের ভয়ে ইনি শবরপল্লীর মধ্যে আত্মগোপন করিয়া থাকিতেন বলিয়া ইঁহার নামান্তর হয় শবরস্বামী।

কুমারিল ভট্ট

মীমাংসাশাস্ত্রের যুগপ্রবর্তক আচার্য ভট্ট কুমারিল। ইঁহাকে মূর্তিমান্ মীমাংসাশাস্ত্র বলিলেও অত্যুক্তি ঘটে না। মণ্ডনমিশ্র, উম্বেকাচার্য বা ভবভূতি প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ মীমাংসকগণ ইঁহারই ছাত্র। ইনি মীমাংসাদর্শনের উপর বৃহট্টীকা, তন্ত্রটীকা, শ্লোকবার্তিক, তন্ত্রবার্তিক এবং টুপ্‌টীকা রচনা করেন। ইঁহার সময় ৬২০-৭০০ খৃঃ অব্দ।

প্রভাকর মিশ্র

কুমারিলভট্টের শিষ্যগণের অন্যতম প্রভাকর মিশ্র। কিন্তু ইঁহার মত ভাট্টমতের বিরোধী। ইঁহার কাল ৬৫০-৭২০ খৃষ্টাব্দ। মীমাংসাদর্শনের উপর ইনি 'বৃহতী' (বা নিবন্ধন) এবং 'লঘ্বী' (বা বিবরণ) নামে টীকা লেখেন।

মণ্ডন মিশ্র

মণ্ডনমিশ্র একজন ধুরন্ধর মীমাংসক, ৬৮০-৭৫০ খৃষ্টাব্দ ইঁহার কাল। তৎকালে ইঁহার সমকক্ষ কোনো পণ্ডিত ছিলেন না, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। মীমাংসা সম্বন্ধে ইনি 'মীমাংসানুক্রমণিকা', 'বিধিবিবেক', 'ভাবনাবিবেক', 'বিভ্রমবিবেক' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। অদ্বৈতবেদান্তের 'ব্রহ্মসিদ্ধি' ইঁহারই রচনা। কাহারও কাহারও মতে ইনিই আচার্য শংকরের সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং তখন হইতে 'সুরেশ্বরাচার্য' নামে অভিহিত হন। বিদুষী উভয়ভারতী ছিলেন ইঁহার পত্নী।

উম্বেকভট্ট বা ভবভূতি

কিংবদন্তী অনুসারে উম্বেকভট্ট ছিলেন কুমারিলের ছাত্র এবং অনেকের মতে ইনিই প্রসিদ্ধ নাট্যগ্রন্থসমূহের রচয়িতা মহাকবি ভবভূতি। ইনি কুমারিলের শ্লোকবার্তিকের উপর প্রথম টীকা রচনা করেন। ইহাই সম্ভবত শ্লোকবার্তিকের উপর প্রথম টীকা। ইনি মণ্ডনমিশ্রের 'ভাবনাবিবেক' নামক গ্রন্থেরও উপর টীকা লিখিয়াছিলেন, তাহা বর্তমানে মুদ্রিতও হইয়াছে। (৬৭০-৭৫০ খৃষ্টাব্দ ইঁহার আবির্ভাবকাল)

বাচস্পতিমিশ্র একজন অসাধারণ পণ্ডিত এবং সকল দার্শনিকের নিকটই সুপরিচিত। ছয়খানি দর্শনশাস্ত্রের মূল গ্রন্থের উপরই ইঁহার রচনায় এক অসাধারণতা দেখা যায়। মীমাংসা সম্বন্ধে ইনি মণ্ডনমিশ্রের বিধিবিবেকের উপর অতি গম্ভীর 'ন্যায়কণিকা' টীকা রচনা করিয়াছেন। সময় ৮০০-৯০০ খৃষ্টাব্দ।

বাচস্পতি মিশ্র

সুচরিতমিশ্রের আবির্ভাবকাল ১০০০-১১০০ খৃষ্টাব্দ। কুমারিলের শ্লোকবার্তিকের উপর 'কাশিকা' নামে একটি বিস্তৃত টীকা রচনা করেন।

সুচরিতমিশ্র

১০৫০-১১২০ খৃষ্টাব্দের লোক পার্থসারথিমিশ্র। ইনি ভাট্টমতাবলম্বী ছিলেন। কুমারিলের শ্লোকবার্তিকের উপর ইনি 'ন্যায়রত্নাকর' এবং টুপ্‌টীকার উপর 'তন্ত্ররত্ন' নামে টীকা রচনা করেন। মীমাংসা সম্বন্ধে ইনি 'ন্যায়রত্নমালা' এবং 'শাস্ত্রদীপিকা' নামে দুইখানি অত্যুৎকৃষ্ট নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। মীমাংসার সিদ্ধান্তগুলি 'অধিকরণ'রূপে সাজাইয়া গ্রন্থ রচনা বোধ হয় ইনিই প্রথম করেন।

পার্থসারথিমিশ্র

ভবদেবভট্টের আবির্ভাবকাল ১১০০ খৃষ্টাব্দ। ইনিও একজন অসাধারণ মীমাংসক এবং বিচারমল্ল অদ্বৈতবাদী ছিলেন। তন্ত্রবার্তিকের বক্তব্য লইয়া 'তৌতাতিত-মত-তিলক' নামে নিবন্ধ লেখেন। ইনি বাঙালী এবং প্রসিদ্ধ স্মৃতি-নিবন্ধ-কার ছিলেন।

ভবদেবভট্ট

মুরারিমিশ্র ১২০০ খৃষ্টাব্দের শেষে ও ১৩০০ খৃষ্টাব্দের প্রথমে আবির্ভূত হন। ইঁহার মত ভাট্ট ও প্রাভাকর সম্প্রদায় হইতে ভিন্ন প্রকারের। ইঁহারই সম্বন্ধে বলা হয় 'মুরারেস্তৃতীয়ঃ পন্থাঃ'। ইঁহার রচিত গ্রন্থকে বলা হয় 'নীতিনয়ন'।

মুরারি মিশ্র

১২৯৭-১৩৩৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন মাধবাচার্য। ইঁহার তুল্য সর্বশাস্ত্রজ্ঞ এবং সকল শাস্ত্রের নিবন্ধকর্তা পণ্ডিত অতি বিরল। ইঁহার মীমাংসা সম্বন্ধীয় সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'জৈমিনীয় ন্যায়মালা' বা 'অধিকরণমালা' এবং 'জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তর' ইঁহারই

মাধবাচার্য

মীমাংসা শাস্ত্রজ্ঞত্বের অপূর্ব নিদর্শন। সমগ্র মীমাংসা দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় বুঝিতে এমন সরল, এমন সুন্দর গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই।

লৌগাক্ষি ভাস্কর

লৌগাক্ষি ভাস্কর ১৬০০ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হন। মীমাংসা শাস্ত্রে ইনি ভাট্টমতে 'অর্থ সংগ্রহ'[১] নামক অতি সংক্ষিপ্ত এবং সরল গ্রন্থ রচনা করেন।

চিন্নস্বামী শাস্ত্রী

উপরে মীমাংসা শাস্ত্রের অতি প্রসিদ্ধ আচার্যগণের নাম করা হইল। ইহা ছাড়া আরও অসংখ্য প্রসিদ্ধ লেখকের নাম ও তাঁহাদের মীমাংসার উপর উল্লেখযোগ্য রচনার সন্ধান পাওয়া যায়[২]। গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে আর তাঁহাদের উল্লেখ করা হইল না। আধুনিক যুগের, বিশেষ করিয়া বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ মীমাংসক ম.ম. চিন্নস্বামী শাস্ত্রী ছিলেন মীমাংসাকেশরী এবং ইঁহার উল্লেখযোগ্য মীমাংসা দর্শনের উপর প্রকরণগ্রন্থের নাম 'তন্ত্রসিদ্ধান্তরত্নাবলি'।

১ দ্রঃ অর্থসংগ্রহঃ (Critically edited and translated by D.V. Gokhale [Poona Oriental Book Agency]

২ অন্যান্য লেখকের জন্য দ্রঃ 'মীমাংসাদর্শনম্' ২য় খণ্ড—ভূতনাথ সপ্ততীর্থ সম্পাদিত, পৃঃ২২—৩২

॥ চ ॥ উত্তরমীমাংসা বা

বেদান্ত দর্শন[1]

ন্যায় ও বৈশেষিকের মত বিচার করিয়া পূর্বে দেখা গিয়াছে যে তাঁহাদের মতে ঈশ্বর রচিত বেদ নিত্য ঐশী প্রজ্ঞারই প্রকাশ এবং পরমেশ্বরের বাণী বলিয়াই বেদ প্রমাণ। আচার্য শংকরের মতেও পরমেশ্বরই বেদের রচয়িতা। সর্বজ্ঞানের আকর বেদরচনা দ্বারাই ভগবানের সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমত্তা পরিস্ফুট হইয়া থাকে। ভগবানই ব্রহ্মযোনি। বেদ, উপনিষৎ প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রই তাঁহার নিঃশ্বাস। আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস যেমন অনায়াসে প্রবাহিত হয়, সেইরূপ সৃষ্টির উপায় পরমেশ্বরের হৃদয়কন্দর হইতে সহজে ও সাবলীল গতিতে বেদপ্রবাহ উদ্ভূত হইয়াছে।

বেদান্তমত

কিন্তু কথা হইতেছে যে, পুরুষোত্তমই বেদের রচয়িতা,—ইহাই যদি হয় শ্রুতির সিদ্ধান্ত, তবে বেদকে অপৌরুষেয় বা পুরুষকৃত নহে বলা হয় কেন?[2] ইহার উত্তরে বেদান্তীর যুক্তি এই যে সাধারণ পুরুষের রচিত গ্রন্থে রচয়িতার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে, গ্রন্থকার ইচ্ছা করিলেই ভাব ও ভাষার যাহা খুশী পরিবর্তন করিতে পারেন, লেখকের দোষ-গুণ ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন করে তাঁহার রচনা—গ্রন্থ পাঠ কারলেই গ্রন্থকারের সহিত পাঠকের পরিচয় ঘটে। বেদ কিন্তু ঐ জাতীয় সাধারণ গ্রন্থ নহে। বেদ রচনায় ভগবান্ ভগবান্ হইলেও তাঁহার কোনো স্বাধীনতা নাই—বেদ মন্ত্রের একটি অক্ষরকেও এদিক ওদিক করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার নাই। কল্পকল্পান্তরে ভগবান্ এই একই রূপ বেদ রচনা করিয়া হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতিকে উপদেশ দিয়া থাকেন। সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি

১। এই দর্শনের আলোচনার জন্য লেখকদ্বয় ডাঃ আশুতোষ শাস্ত্রীর বেদান্ত দর্শন ১ম খণ্ডের এবং ডাঃ রমা চৌধুরীর বেদান্ত দর্শনের নিকট বিশেষভাবে ঋণী।

২ দ্রঃ বেদান্ত দর্শন—অদ্বৈতবাদ—ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য শাস্ত্রী পৃঃ ৩৯—৪০।

ভগবানের বেদ রচনায় সর্বপ্রকার স্বাধীনতা অস্বীকার করার অর্থ এই যে পুরুষোত্তমের মানস উৎস হইতে একইরূপ বেদ প্রবাহ একই ছন্দে জগতের নানা সৃষ্টি ও ধ্বংসলীলার মধ্যেও ছুটিয়া চলিয়াছে অবাধ গতিতে এবং অনন্ত কাল ধরিয়া চলিবেও। বেদ চিন্ময় ভগবানের শব্দময় বিগ্রহ। এই শব্দশরীর সর্বদা অপরিবর্তনশীল, সৃষ্টি প্রলয়ের নানা আবর্তন বিবর্তনের মধ্যেও বেদের এই শব্দময় অপরিবর্তনীয় রূপের কোনো প্রকার পরিবর্তন হয় না। পুরুষের স্বাধীন কর্তৃত্বের অভাবই অপৌরুষেয় শব্দ দ্বারা সূচিত হয়।

ভারতীয় দর্শন-জিজ্ঞাসার মূল লক্ষ্য আত্মদর্শন বা আনন্দময় প্রেমময়ের সাক্ষাৎকার। উপনিষৎ পরিপূর্ণ আত্মজ্ঞান এবং ভূমানন্দের সন্ধান দেয় বলিয়া বেদ-জ্ঞান-ভাণ্ডারের অমূল্যরত্ন উপনিষৎ। পরমাত্মাই পরব্রহ্ম। উপনিষদে এই ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচিত এবং প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়াই উপনিষদের অপর নাম ব্রহ্মবিদ্যা[১]। ইহাকে অনেক সময় বেদান্ত আখ্যায়ও অভিহিত করা হয়। বেদের কর্মকাণ্ডের উপর জৈমিনীর পূর্বমীমাংসা দর্শন এবং জ্ঞানকাণ্ডের উপর ব্যাসকৃত উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত-দর্শন প্রসিদ্ধ। বেদান্ত কাহাকে বলে, এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়—উপনিষদের যাহা প্রমাণ তাহাই বেদান্ত, আবার তর্কের আলোক সম্পাতে যে শাস্ত্রের সাহায্যে উপনিষদের অর্থবোধ সুগম হইয়া থাকে তাহাই উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত। বিচার করিলে দেখা যায় যে উপনিষদের অর্থবোধের সহায়ক বলিয়া ব্রহ্মসূত্র বা গীতা প্রভৃতি বেদান্ত শব্দের গৌণ অর্থ। কিন্তু বেদব্যাসের 'ব্রহ্মসূত্র' আচার্য শংকরকৃত 'ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য', বাচস্পতিমিশ্রকৃত ভাষ্যটীকা 'ভামতী', অমলানন্দের 'বেদান্তকল্পতরু' এবং অপ্যয়দীক্ষিতের 'বেদান্তকল্পতরু-পরিমল —এই পাঁচটি গ্রন্থই 'বেদান্ত' বলিয়া প্রসিদ্ধ। বেদান্ত বলিলে সাধারণতঃ 'ব্রহ্মসূত্র'কেই বুঝায় ; কিন্তু এই প্রসংগে ইহাও অবশ্য স্বীকার্য যে 'বেদান্তসার', 'বেদান্তপরিভাষা', 'চিৎসুখী', 'অদ্বৈতসিদ্ধি', 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য' প্রভৃতি গ্রন্থও বেদান্ত-দর্শনের পর্যায়েই পড়ে। এই যে সকল অমূল্য গ্রন্থসম্ভারের ভিত্তিতে রচিত হইয়াছে বেদান্তের অভ্রভেদী সৌধ, তাহাদিগকে বেদান্তের অন্তর্ভুক্ত না

বেদান্ত কাহাকে বলে ?

১ দ্রঃ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা, ১ম ভাগ

করিলে বেদান্ত দর্শন পূর্ণতাই লাভ করে না। ইহা ছাড়া, বেদান্তের চিন্তা-রাজ্যে অদ্বৈতবাদের পাশাপাশি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ প্রভৃতি যে সকল বিভিন্ন বেদান্ত-মতবাদ প্রস্থানত্রয়ের ভিত্তিতে ভারতের বক্ষে গড়িয়া উঠিয়াছে, ঐ সকল মতবাদকে বেদান্তচিন্তার বিভিন্ন ধারা বলিয়া গ্রহণ না করিলে সেই বেদান্ত মত হইবে যে একদেশী, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

'প্রস্থান'-ত্রয়ে বিভক্ত এই বেদান্তশাস্ত্র,—একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।[১] 'প্রস্থান' শব্দের অর্থ আকর বা মূলগ্রন্থ। উপনিষৎ বেদান্তের শ্রুতিপ্রস্থান, ব্রহ্মসূত্র তর্কপ্রস্থান আর ভগবদগীতা স্মৃতিপ্রস্থান বলিয়া খ্যাত। পূর্বেই দেখা গিয়াছে যে শ্রুতি আত্মদর্শনের জন্য শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন এই তিন রূপ সাধনের উপদেশ দিয়াছেন। উপনিষদ্বাক্য হইতে বেদান্তের অর্থ শ্রুত, হইয়া থাকে সেজন্যই উপনিষৎকে বলা হয় 'শ্রুতি-প্রস্থান'। উপনিষদের শ্রুত অর্থ ব্রহ্মসূত্র ও তাহার ভাষ্যটীকা প্রভৃতিতে নানা যুক্তিতর্কের সাহায্যে বিচার করা

বেদান্তের প্রস্থানত্রয়

হইয়া থাকে বলিয়া ব্রহ্মসূত্রকে বলে বেদান্তের 'তর্ক-প্রস্থান।' আত্মজিজ্ঞাসায় এই তর্ক মনন স্থানীয়। আর তর্কের সাহায্যে বিচারিত অর্থ—'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', 'সনৎসুজাতীয়' প্রভৃতি অধ্যাত্মশাস্ত্র আলোচনার ফলে—পুনঃপুনঃ চিত্তে উদিত হইয়া স্থির ও দৃঢ় হইয়া থাকে বলিয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে বেদান্তের 'স্মৃতিপ্রস্থান' বলে। আত্ম-জ্ঞানের পথে এই স্মৃতিপ্রস্থান নিদিধ্যাসনস্বরূপ।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে বেদান্তবিদ্যালাভের অধিকারী কে? ইহা ত অধ্যাত্ম-

বেদান্তের অধিকারী কে

বিজ্ঞানের দুর্গম এবং গহন পথ,—এই পথের পাথেয় তো প্রয়োজন। শংকরের মতে,—কামনার নাগপাশ ছিন্ন করিয়া জীবনের লক্ষ্যে পৌছিতে হইলে নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান পূর্বক চিত্তের আবিলতা দূর করিতে হইবে আর শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিয়া চিত্তের শুচিতা ও সমতা সাধন করা প্রয়োজন। এইরূপ পবিত্রচেতা নিষ্কাম সাধকের বিশুদ্ধ চিত্তভূমিতে উপ্ত ব্রহ্মজ্ঞানবীজ স্ফুট-

১। দ্রঃ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা ঃ ১ম ভাগ

নোন্মুখ হইলেই তিনি বেদান্তজিজ্ঞাসার ও মুক্তিমন্দিরে প্রবেশের অধিকারী রূপে বিবেচিত হইবেন।

বেদান্তের বিষয় বা প্রতিপাদ্য জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য। সুতরাং বেদান্ত জীব-ব্রহ্মের ঐক্যের প্রতিপাদক। শাশ্বতমুক্তিই বেদান্তজ্ঞানের একমাত্র প্রয়োজন। অবিদ্যার সমূলে নিবৃত্তি এবং আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তিই জীবের মুক্তি—বেদান্তের ইহাই মূল বক্তব্য। জীবব্রহ্মের একত্র সাক্ষাৎকারের ফলেই আসে এই মুক্তি। জীব এবং ব্রহ্মের ঐক্যের সাক্ষাৎকার হইলেই জীব 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ বুঝিয়া মুক্ত হইয়া থাকে, আর তখনই বেদান্তের অনুশীলনের চরম প্রয়োজন সাধিত হয়। জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করে বলিয়া এই প্রকার বেদান্ত মতবাদ 'অদ্বৈতবাদ' নামে পরিচিত।

বেদান্তের বিষয়-বস্তু ও প্রয়োজন

দার্শনিক চিন্তার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ দার্শনিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং তাঁহাদের মধ্যে বিলক্ষণ মতভেদেরও সৃষ্টি করিয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে 'দ্বৈতবাদ' ও 'অদ্বৈতবাদ' এই দুই মতবাদই পাশাপাশি স্থান লাভ করিয়াছে। 'দ্বৈতবাদ' জীব ও ব্রহ্ম দুয়েরই অস্তিত্ব স্বীকার করে—জীবাত্মা ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, জীবাত্মাসকলও পরস্পর ভিন্ন এব এইরূপ ভেদ সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। অপরপক্ষে 'অদ্বৈতবাদ' ৫ ভিন্ন দুইএর অস্তিত্ব স্বীকার করে না। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জীব ব্রহ্ম হইতে অত্যন্তই অভিন্ন, ভেদ মিথ্যা, অভেদই সত্য, একত্ববাদই বেদ ও উপনিষদের লক্ষ্য বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া থাকে। দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ আলোক এবং অন্ধকারের মতই পরস্পরবিরোধী। ইহাদের একটিকে স্বীকার করিলেই অপরটি অস্বীকার করিতে হইবে। এই জন্যই অনাদিকাল হইতে ভারতীয় দর্শনে দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের বিরোধ চলিয়া আসিতেছে।

দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ

'অদ্বৈতবাদের' প্রধান উপাসক ব্রহ্মবাদী বৈদান্তিক আচার্যগণ। ইহাদের মতে 'দ্বৈতবাদ' মায়িক ও মিথ্যা, অদ্বৈত ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। বেদান্ত-চিন্তারাজ্যে অদ্বৈতবাদের পাশাপাশি দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ

প্রভৃতি মতবাদের অভ্যুদয় দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদান্তিক মধ্বাচার্য দ্বৈতবাদী।[১] ন্যায় দর্শনের ষোড়শ পদার্থ ও বৈশেষিক দর্শনের সপ্ত পদার্থের ন্যায় আচার্য মধ্ব জাগতিক সমস্ত পদার্থকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, জাতি, বিশেষত্ব, বিশিষ্ট, অংশী, শক্তি, সাদৃশ্য ও অভাব—এই দশটি পদার্থের মধ্যে তিনি জাগতিক সমস্ত পদার্থই যে অন্তর্ভুক্ত তাহা দেখাইয়াছেন। এই সকল পদার্থ অস্বতন্ত্র বা হরির পরতন্ত্র। কেবলমাত্র হরিই একমাত্র স্বতন্ত্র বা স্বাধীন, আর সমস্ত বস্তুই শ্রীহরির অধীন। এইজন্যই মধ্বাচার্যের মত 'স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্র-বাদ' বলিয়া বিখ্যাত। জীব ভগবানের দাস, সে ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন। জীব সেবক, ব্রহ্ম বা শ্রীহরি তাহার সেব্য। সেবক যদি প্রভুর সমান হইতে চায় তবে প্রভু তাহাকে দণ্ডিত করিয়া থাকেন। অতএব 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই বোধ জীবের অধঃপাতেরই কারণ হইয়া থাকে। অপূর্ণ জীব ও পূর্ণ ব্রহ্মের অভেদ অসম্ভব বলিয়া জীব ব্রহ্মের সদৃশ—এইরূপ সাদৃশ্যই 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে বুঝাইয়া থাকে। জীবের ঐ ব্রহ্ম-সাদৃশ্য স্বীয় গুণোৎকর্ষের ফলে সারূপ্য, সালোক্য প্রভৃতি মুক্তিতে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। জীব অপূর্ণ, সে চিরকাল অপূর্ণই থাকিবে। কখনও পূর্ণ হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। ব্রহ্মই পূর্ণ, অনন্ত-কল্যাণ-গুণময়। জীব ও জগৎ হইতে তিনি সম্পূর্ণ পৃথক্। এই পৃথকৃত্ব ভগবানের নিত্যসিদ্ধ। জীবের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ সেব্য-সেবক সম্বন্ধ। জীবের মুক্তি তাঁহারই প্রসাদ-লভ্য। ভগবানের জগৎ-নিয়ন্তৃত্ব প্রভৃতি বিষয়ে মধ্বাচার্য ও রামানুজাচার্যের মতের অনেক সাদৃশ্য আছে।

মধ্বের দ্বৈতবাদ

রামানুজ 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী'।[২] তাঁহার মতেও ব্রহ্ম 'নিখিলকল্যাণকর'—নিকৃষ্ট তাঁহার মধ্যে কিছুই নাই। তিনি দোষ-গন্ধহীন। দৃশ্যমান সমস্ত জীব ও জড় প্রপঞ্চই তাঁহার শরীর। তিনি বিরাট-শরীরী। তিনি সর্বাত্মা, সর্বেশ্বর, সর্বান্তর্যামী এবং সর্বকর্মফলদাতা। কার্য ও কারণ উভয়ই তিনি। স্থূলরূপে তিনি কার্য, সূক্ষ্মরূপে আবার তিনিই কারণ। জীব ও জগৎ তাঁহারই শরীর, তাঁহারই অংশ। সুতরাং জীব

রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

১। পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন (সর্বদর্শনসংগ্রহ)
২। দ্রঃ রামানুজ দর্শন (সর্বদর্শনসংগ্রহ)

ও জগতের সহিত তাঁহার অংশাংশি-ভাব ও শরীর-শরীরিভাবই সম্বন্ধ। জীব অণু, নিত্য, স্বয়ংপ্রকাশ, চেতন ও প্রতি-শরীরে বিভিন্ন। জীবও ব্রহ্মে স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় কোনো ভেদ নাই, কিন্তু অণু-জীব ও বিরাট্-ব্রহ্মের স্বগত-ভেদ আছে। জীব ব্রহ্মের শরীর হইলেও জড়প্রকৃতির তুলনায় সে শরীরী, কর্তা এবং ভোক্তা। জগৎ ব্রহ্মশক্তিরই বিকাশ বা পরিণাম, স্থতরাং সত্য। জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপত অভিন্ন না হইলেও প্রভাকরের প্রভা যেমন প্রভাকর হইতে ভিন্ন নহে, সেরূপ জীব ব্রহ্মসূর্যের প্রভাস্থানীয়, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। কিন্তু প্রভাকর যেমন প্রভা হইতে অধিক, ব্রহ্মও সেইরূপ জীব হইতে অধিক। ব্রহ্মের অংশ এবং শরীর হিসাবে জীব ও জগতের স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও ইহা ব্রহ্মশরীর বলিয়া সেই বিরাট্ শরীরী ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। অংশাংশিভাবে ব্রহ্মে নিত্য জড়িত হইয়া জীব ও জগৎ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইয়া থাকে। চিৎ-অচিৎ বা জীবজড়-বিশিষ্ট ব্রহ্ম অদ্বৈত বলিয়াই এই মতকে 'বিশিষ্টাদ্বৈতমত' বলা হইয়া থাকে। এই মতে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ সূচিত হয় না। তুমি তাঁর, শ্রীভগবানের এইরূপ ভগবদানুগত্য এবং চিরদাস্যভাবই ঐ শ্রুতিবাক্যে সূচিত হইয়াছে। ভগবৎশরণই মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়। মুক্ত অবস্থায় জীব বৈকুণ্ঠলোকে ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করে, এবং সর্বদা ভগবানের সেবা করিয়া দিব্য আনন্দ উপভোগ করে। মুক্তির পক্ষে আমাদের পাঞ্চভৌতিক এই স্থূল শরীর ঘোর প্রতিবন্ধক। এই পাঞ্চভৌতিক দেহের বিনাশ না হইলে মুক্তি বা ভগবৎ-সান্নিধ্যলাভ কোনোমতেই সম্ভব হয় না, সেজন্য আচার্য রামানুজের মতে জীবন্মুক্তি অসম্ভব।

অদ্বৈতবেদান্তীর নির্বিশেষ-আত্মবাদ এবং জগৎ-মিথ্যাত্ববাদের[১] বিরুদ্ধে আচার্য রামানুজ তাঁহার দর্শনে তীব্র আপত্তি এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছেন। মায়াবাদের বিরুদ্ধে তাঁহার সাতটি দোষ প্রদর্শন প্রসিদ্ধ। এই সকল স্থলে রামানুজ তাঁহার অদ্ভুত বিচারশক্তি এবং অপূর্ব মনীষার পরিচয়

১ দ্রঃ বেদান্ত দর্শনে অদ্বৈততত্ত্ব, স্বপ্রকাশতত্ত্ব ও মিথ্যাত্বতত্ত্ব—ডঃ সীতানাথ গোস্বামী, এম. এ. ডি. ফিল.

দিয়াছেন। বেদান্তের মায়ার স্বরূপ বিচার প্রসংগে তাহার আলোচনা যথাস্থানে করা হইবে।

ভেদাভেদবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, অনেকান্তবাদ প্রভৃতি যে সকল বিভিন্ন মতবাদ বেদান্তের চিন্তাজগতে স্থানলাভ করিয়াছে, তাহা পূর্বোক্ত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদেরই নামান্তর মাত্র। তাহার বিস্তৃত পরিচয় পরে দেওয়া হইবে।

আচার্য ভাস্কর [১] এবং নিম্বার্ক ছিলেন ভেদাভেদবাদী আচার্য। তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম একও বটে, আবার অনেকও। একত্ব ও নানাত্ব, ভেদ এবং অভেদ উভয়ই সত্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহারা বলেন—একই তরু বৃক্ষরূপে এক, অথচ শাখারূপে নানা। একই বৃক্ষে একত্ব ও নানাত্ব এই উভয় প্রকার বোধই যথার্থ। শাখা বৃক্ষেরই অবয়ব, আর বৃক্ষ অবয়বী। অবয়বী এক, কিন্তু তাহার অবয়ব অনেক। এই দুইটি বোধের কোনটিই মিথ্যা নহে। মৃত্তিকা মৃত্তিকারূপে এক, কিন্তু ঘটকলসকার্যাদিরূপে তাহাই আবার নানা—একই কালে একই বস্তুতে একত্ব এবং নানাত্ব উভয়ই অবস্থিত থাকে, এবং উভয় প্রকার বোধই সত্য। কেবল দৃষ্টির প্রভেদ মাত্র। ঔপাদানিক দৃষ্টিতে সকল কার্যই অভিন্ন, কারণ সমস্ত কার্যের মধ্যে একই উপাদানকারণ অনুস্যূত থাকিয়া বিভিন্ন কার্যবর্গের সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই কার্যগুলি আমাদের জীবনের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন সাধন করে বলিয়া কার্যবর্গের সত্যতা কোনো মতেই অস্বীকার করা যায় না। এই জন্য সমস্ত কার্যই কারণ হইতে ভিন্নও বটে, আবার অভিন্নও বটে। জগৎ ব্রহ্মকার্য, ব্রহ্মই জগতের উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ, জগৎ ব্রহ্মেরই পরিণাম এবং সত্য। উর্ণনাভ যেমন নিজের শরীর হইতেই জালবিস্তার করে এবং নিজ শরীরেই উহা লয় করে, সেরূপ ব্রহ্ম হইতেই হয় জগতের উৎপত্তি, আবার পরিণামে ব্রহ্মেই জগৎ বিলীন হয়। আচার্য ভাস্করের মতানুসারে এই জগৎ-প্রপঞ্চই সমস্ত ব্রহ্মস্বরূপ, কিন্তু ব্রহ্ম প্রপঞ্চস্বরূপ নহেন।[২]

ভেদাভেদবাদ

ভাস্করীয় বেদান্ত দর্শন

১ ভাস্করের সময় কত খৃষ্টাব্দ নিশ্চিত করিয়া বলা সম্ভব নহে। তবে তিনি যে শংকরাচার্যের পরবর্তী তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। তিনি শংকরকে আক্রমণ করার জন্যই বাদরায়ণসূত্রের উপর তাঁহার ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন।

২ 'ব্রহ্মাত্মকো হি নামরূপপ্রপঞ্চো, ন প্রপঞ্চাত্মকং ব্রহ্ম'—ভাস্করভাষ্য, ২।১।১৪

জগৎকারণ ব্রহ্ম অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, অরূপ, নির্বিকার, নির্বিশেষ অথচ সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান্।

কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে যে নিরাকার, নির্বিশেষ ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ হন কিরূপে? কারণ, শক্তি থাকিলেই ক্রিয়া থাকিবে, ক্রিয়া থাকিলে আবার বিকারও অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য আচার্য ভাস্করের মত অনেকটা অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে।

আচার্য রামানুজের বর্ণিত মুক্তিতে জীব ও ব্রহ্মের পার্থক্য পরিষ্কার বুঝা যায়। সেস্থানে জীব দাস, ব্রহ্ম প্রভু; ভাস্করের মতে কিন্তু জীব ব্রহ্মভাব লাভ করায় জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। এই অংশে ভাস্কর মতের সহিত শৈব-বেদান্তী আচায শ্রীকণ্ঠের মতের সাদৃশ্য আছে।

ভাস্কর জ্ঞানসমুচ্চয়বাদী, আচার্য শংকরের ন্যায় অখণ্ড জ্ঞানবাদী নহেন। ভাস্করের মতে মুক্তি উপাসনার দ্বারা লাভ করা যায়। 'জ্ঞান' শব্দে তাঁহার মতে উপাসনাই অভিপ্রেত। মুক্ত অবস্থায় জীব-ব্রহ্মের অভিন্নতা ভাস্কর তাঁহার ভাষ্যে যেভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মতে ভেদ ঔপাধিক এবং অভেদই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। জীব ও ব্রহ্মের ঘটাকাশ-মহাকাশের মত অভেদ স্বীকার করার জন্য তিনি শংকরের মত খণ্ডন করিতে বাধ্য হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

ভাস্করের মত যে এককালে বেদান্তি সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল, সেকথার সাক্ষ্যস্বরূপ বলা যায় যে আচার্য কুল্লূকভট্ট মনুসংহিতার টীকার প্রথম অধ্যায়ে শ্রদ্ধার সহিত ভগবান ভাস্করের উল্লেখ করিয়া ভাস্করের মতানুসারে মনুর শ্লোক ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।[১]

নিম্বার্কের মত অনেক দিক দিয়া ভাস্করাচার্যের অনুরূপ হইলেও মুক্তিতে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ নিম্বার্ক স্বীকার করেন না—তাঁহার মতে মুক্ত জীবের জীবত্ব আসিতে বাধ্য। জীব ব্রহ্মের অংশ হইলেও জীব বিভু-ব্রহ্ম নহে।

১ দ্রঃ Manusamhita, Chapter, I by Prof Ashokanath Shastri (in collaboration with Prof S. Bhanja)— p. 31 [the notes on Kulluka section]; এখানে ভাস্করের দর্শন ও মতামত সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা মিলিবে।

জীবের ব্রহ্মভাব শ্রুত্যুক্ত কোনো কোনো বাক্যে প্রতিপাদিত হইলেও অল্পজ্ঞ জীব এবং সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ আছেই এবং চিরদিন থাকিবেও। এই জন্যই মুক্তিতে তাঁহার মতে জীব ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হইলে উপনিষদাদিতে জীব-ব্রহ্মের যে অভেদ অনেক স্থলে উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা অসংগত হয়। আবার জীব ও ব্রহ্মের অত্যন্ত অভেদ স্বীকার করিলে আমাদের ব্যবহারিক জীবন অচল হইয়া পড়ে। সেজন্যই ব্রহ্ম কিছুটা ভিন্ন আবার কিছুটা অভিন্ন— এই সত্য স্বীকার করিতেই হয়। কার্য ও কারণ অভিন্ন বলিয়া জীব পরমাত্মা হইতে অভিন্ন, কেননা জীব পরমাত্মারই অংশ এবং কার্য। আবার জীবভাব মুক্তিতেও বিলুপ্ত হয় না, জীব ও ঈশ্বর অজ এবং নিত্য। এই জন্য তাহা অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন। নিম্বার্কের এইরূপ পরস্পর বিরোধী মতের সমালোচনা পরে করা হইবে।[১]

নিম্বার্কের মতামত

জগতের উৎপত্তি এবং লয় সম্বন্ধে নিম্বার্কের মত ভাস্করাচার্যেরই ন্যায়। ভাস্করের মতে জগৎরূপে ব্রহ্ম পরিণত হইলেও ব্রহ্ম প্রপঞ্চস্বরূপ নহেন। কারণরূপে ব্রহ্ম নিরাকার, কার্যরূপেই আবার তিনি জীব ও প্রপঞ্চ। জীব তাঁহার ভোগ করিবার ক্ষমতা, আর জগৎ-প্রপঞ্চই তাঁহার ভোগ্য শক্তি। নিম্বার্কের মতেও ব্রহ্মই জগৎরূপে পরিণত হন। প্রলয়ে জগৎ-প্রপঞ্চ ব্রহ্মেতেই বিলীন হয়। চেতন ব্রহ্ম কখন হন অচেতন জগৎ, আবার জড়জগৎ প্রলয়কালে ব্রহ্মে বিলীন হওয়া সত্ত্বেও ব্রহ্ম তখন অবিকৃত থাকেন। কিন্তু ইহা কি সম্ভব? এই সমস্যার সমাধানের জন্যই ব্রহ্মকে বলা হইয়াছে সর্বশক্তিমান্। চেতন হইয়াও তিনি জড়ের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ। সমস্ত বিকারের মধ্যেও তিনি অবিকারী। ইহাতেই তাঁহার সর্বশক্তিমত্তা প্রকটিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মশক্তির এই বিভাব অচিন্ত্য; ইহা হইতেই পরবর্তীযুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের উৎপত্তি হইয়াছে।

নিম্বার্কের দর্শনে ব্রহ্মের সগুণভাবই সর্বত্র দেখা যায়। সর্বশক্তিমান্ ব্রহ্মের গুণের ইয়ত্তা হয় না—সেজন্যই তিনি নির্গুণ। রামানুজের মতে নির্গুণের অর্থ নিকৃষ্টগুণশূন্য, কিন্তু নিম্বার্কের মতে এই বিশেষণটির অর্থ অনন্তগুণময়।

১ দ্রঃ বেদান্তদর্শন—সন্তদাস ব্রজবিদেহী

জীবের এবং অনন্তগুণময় সেই ব্রহ্মের কিছু গুণসাম্যের কথা তত্ত্বমসি প্রভৃতি স্থলে বলা হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ অনেক দিক্ দিয়া নিম্বার্কের ভেদাভেদবাদেরই ন্যায়। তবে এই মতে দ্বৈতবেদান্তী মাধবসম্প্রদায়ের বিশেষ প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। চৈতন্য-দেবের মতে শ্রীমদ্ভাগবতই বেদান্তভাষ্য। মধ্বাচার্যের মতবাদ ভাগবতের অনুমোদিত বলিয়া চৈতন্য মাধ্বভাষ্য-কেই তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক ভাষ্য হিসাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। যে সকল স্থলে মাধ্বমতের সহিত ভাগবতের বিরোধের সম্ভাবনা ছিল, চৈতন্য সেই সকল স্থলে সংগত মীমাংসার পথ দেখাইয়া উহাদের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে বলদেব বিদ্যাভূষণ ব্রহ্মসূত্রের 'গোবিন্দ ভাষ্য' রচনা করিয়া 'অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদ' প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। বলদেবের মতে বেদান্ত-দর্শনে 'তত্ত্ব' মোট ৫টি—ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ ঈশ্বর, চিৎ (জীব) এবং অচিৎ (জড়বর্গ)—এই ৩টি পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন। রামানুজের মতে কাল ও কর্ম জড়পদার্থেরই অন্তর্গত। বলদেব প্রকৃতির বিশ্লেষণ করিয়া আরও দুইটি পদার্থকে যোগ করিয়াছেন। এই ৫টি তত্ত্বের স্বরূপবিচারে বলদেব বলেন যে ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি ও কাল—এই ৪টি পদার্থই নিত্য। জীব নিত্য হইয়াও প্রকৃতি ও কালের বশীভূত; কাল, প্রকৃতি—সমস্তই ঈশ্বরের আশ্রিত এবং ঈশ্বরের বশীভূত। ঈশ্বরের ভোক্তৃশক্তি জীব, আর ভোগ্যশক্তি প্রকৃতি। কর্ম বা অদৃষ্ট অনিত্য এবং বিনাশী। ঈশ্বরের গুণ জীব, ঈশ্বর গুণী। দেহ জীব, দেহী ঈশ্বর। জীব শক্তি, ঈশ্বর শক্তিমান্। ঈশ্বরের প্রসাদেই জীবের আনন্দভোগ হয়, ঈশ্বরবিমুখতাই জীবের বন্ধনের কারণ। সাধনা দ্বারা মুক্তি অর্জন করিতে হয় এবং ভগবানের প্রসাদেই তাহা লাভ করা যায়। জীব ও ব্রহ্মের মুক্তিতে ভেদ থাকিলেও দেহ-দেহিভাবে জীব আবার ব্রহ্মের সহিত অভিন্নও বটে। জীব সেবক, ভগবান্ প্রভু। শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অচিন্ত্যভেদাভেদ

শ্রীচৈতন্য

বলদেব বিদ্যাভূষণের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ

এবং মাধুর্য—এই ভাবগুলির সাহায্যে ভগবান্‌কে ভজনা করিয়া তাঁহাকে লাভ করা যায়। মাধুর্যভাবই ভক্তির পরাকাষ্ঠা।

প্রকৃতি সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণসম্পন্না। ঐ গুণ তিনটির সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। বলদেবের প্রকৃতি ও সাংখ্যদর্শনে বর্ণিত প্রকৃতির মধ্যে অনেক মিল আছে। তবে সাংখ্যের প্রকৃতি স্বতন্ত্র ; আর বলদেবের প্রকৃতি নিত্য হইয়াও ঈশ্বরপরতন্ত্র। বলদেবের দর্শন যে সাংখ্যদর্শনের দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হইয়াছিল তাহা বলিবার যথেষ্ট সংগত কারণ আছে।

অতীতানাগতবর্তমান প্রভৃতি ব্যবহারের অসাধারণ কারণ 'কাল'।—'কাল' সর্বদা পরিবর্তনশীল হইয়াও নিত্য। কর্মের অর্থ অদৃষ্ট। কাল ও কর্ম সকলেই ঈশ্বরপরতন্ত্র। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান্। নির্গুণ প্রতি-পাদক শ্রুতি-বাক্যগুলির তাৎপর্য এই যে ব্রহ্মে সত্ত্ব, রজ, তম প্রভৃতি প্রাকৃত গুণ থাকে না—ব্রহ্ম অতিপ্রাকৃত-গুণশালী এবং অনন্তকল্যাণগুণময়। ঈশ্বরই প্রকৃতিশরীরে প্রবেশ করিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন। ঈশ্বরই কারণরূপে চেতন, আবার কার্যরূপে তিনিই জড়। জগৎ সৃষ্টি করিয়াও তিনি থাকেন নির্বিকার।

কিন্তু জড় এবং চৈতন্য এই দুই বিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশ কেমন করিয়া নিত্য-চৈতন্যের বিগ্রহ ভগবানে সম্ভব হয়,—এই প্রশ্নের উত্তরে বলদেব ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিত্বের যুক্তি দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই অচিন্ত্যশক্তি যে কি তাহা তিনি বলেন নাই ; কারণ, এই শক্তি অচিন্ত্য বলিয়াই অনির্দেশ্য। এই ভেদা-ভেদবাদ নিম্বার্কমতেরই মত। নিম্বার্কের অচিন্ত্যশক্তিই বলদেবের দর্শনে অবিচিন্ত্যশক্তি আখ্যা লাভ করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে [১]। 'দর্শনে বাঙালীর দান' এই অধ্যায়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে।

ষোড়শ শতাব্দীতে বল্লভাচার্যের শুদ্ধদ্বৈতবাদ বা শুদ্ধাদ্বৈতবাদও এই

[১] History of the Early Vaisnava Faith and Movement in Bengal—S. K. De, দ্রঃ

অচিন্ত্যশক্তির ভিত্তিতেই স্থাপিত হইয়াছিল। 'অনুভাষ্যে' বল্লভ এই মতবাদ প্রচারিত করিয়াছেন। তাঁহার মত অনেকাংশে মাধ্বমতেরই ন্যায়। 'অবিকৃতপরিণামবাদ' স্বীকার করার জন্য তিনি লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তির শরণ লইতে বাধ্য হইয়াছেন। জগৎ ভগবানের লীলারূপ—লীলাময় লীলাবশেই জগৎলীলায় পরিণত হন। জগৎ মায়া নহে, ভগবান্ হইতে ভিন্নও নহে। জগৎ কারণ-রূপে ব্রহ্মেই অবস্থিত থাকে, আবার ভগবানের ইচ্ছায় তাহা আবির্ভূত হয় কার্যরূপে। লীলাবশে জগৎ সৃষ্ট করা সত্ত্বেও ভগবান্ অচিন্ত্য-শক্তিবলে শুদ্ধ ও অবিকারিরূপেই অবস্থান করেন। তিনি সর্বশক্তিমান্ অথচ গুণাতীত। শ্রুতিতেও তিনি নিগুর্ণ অথচ জগতের কর্তা বলিয়া[1] স্বীকৃত হইয়াছেন। ভগবানের অনুগ্রহে গোপীভাব পাইয়া গোলকে অখণ্ড রাসরসের উৎসবে পতিভাবে ভগবানের সেবাতেই জীবের মোক্ষলাভ হয়।

বল্লভাচার্যের শুদ্ধ-দ্বৈত বা শুদ্ধাদ্বৈতবাদ

বল্লভের মতে ব্রহ্ম শুদ্ধ,—জগৎও কারণ হিসাবে শুদ্ধব্রহ্মে অবস্থিত বলিয়া বিশুদ্ধ। কার্যকারণের অভেদের জন্যই বল্লভের মতবাদ 'শুদ্ধাদ্বৈত' নামে পরিচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীব ও জগতের শুদ্ধ সত্তা স্বীকার করায় এই মতকে 'শুদ্ধদ্বৈতবাদ' বলাই উচিত। কার্যকারণ এবং জগৎ ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ বিচার করিলে ভেদাভেদবাদের ছায়া স্পষ্টরূপেই বল্লভের দর্শনে দেখিতে পাওয়া যায়। "রামানুজ,[2] মাধ্ব ও নিম্বার্কের ভক্তিবাদ বল্লভীয় দর্শনে প্রেমের রক্তিম রাগে মধুর হইয়া প্রেমিক সাধকের হৃদয় জয় করিয়াছে"…।

বৈষ্ণব দার্শনিকগণের এই ভেদাভেদবাদ শৈব ও অদ্বৈতবেদান্তবাদী নানা যুক্তিতর্কের সাহায্যে খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে ভেদ এবং অভেদ পরস্পরবিরোধী। একই বস্তুতে একই কালে এই পরস্পর-বিরুদ্ধ ভেদ ও অভেদ থাকিতে পারে না। যদি ভেদ থাকে তবে অভেদ থাকে না, আবার যদি অভেদ থাকে তো ভেদ থাকে না—ভেদাভেদ একসঙ্গে কোনোমতেই সত্য হইতে পারে না। এইজন্য কোনো কোনো বেদান্তিক আচার্য অবস্থাভেদে

১ অনুভাষ্য, ২।১।২৭

২ বেদান্তদর্শন—অদ্বৈতবাদ, পৃ. ৫৯

ভেদ এবং অভেদের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিয়াছেন। অর্থাৎ একত্ব এবং নানাত্ব—এই উভয়ই অবস্থাভেদে সত্য। মোক্ষের অবস্থায় জীব ও ব্রহ্ম এক হইয়া যায়, সেইজন্য একত্ব তখন সত্য; আবার সাংসারিক অবস্থায় জীব ও ব্রহ্মের ভেদ এবং ভেদমূলক ব্যবহার সত্য বলিয়া নানাত্বও সত্য। কিন্তু এই সিদ্ধান্তও যে অসঙ্গত, যুক্তিসাহায্যে তাহাও প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

ব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তির স্বরূপ বা স্বভাব কি, ভেদাভেদবাদী বৈদান্তিক তাহা দেখান নাই। ব্রহ্মের এই অচিন্ত্যশক্তি যদি অদ্বৈত বেদান্তীর অনির্বাচ্য মায়াশক্তি হয়, তবে শক্তির এইরূপ অচিন্ত্যতা স্বীকার করায় এই মতবাদ আপনা হইতে অজ্ঞাতসারে মায়াবাদের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে।

শৈব বেদান্তিগণ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। তাঁহারা ভেদাভেদবাদ স্বীকার করেন না। তাঁহারা ভেদাভেদবাদ খণ্ডনই করিয়াছেন। কিন্তু অচিন্ত্যশক্তির প্রভাব তাঁহারা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের মতেও ব্রহ্মে আছে অনন্তশক্তি, যাহা অচিন্ত্য। সেই অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবেই ব্রহ্ম জগৎরূপে প্রকাশিত হন এবং জগৎরূপে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার একত্ব ও অবিকারিত্ব বিলুপ্ত হয় না।

শৈব বেদান্ত : বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

জীব ও জড়প্রপঞ্চময় শিবরূপী ব্রহ্ম অদ্বিতীয়।[১] জীব ও জড় তাঁহার শরীর। তিনি শরীরী—সূক্ষ্মরূপে তিনিই কারণ, স্থূলরূপে তিনিই কার্য। রামানুজের মতের সহিত এইপ্রকার শৈবমতের বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে আচার্য শ্রীকণ্ঠ ব্রহ্ম-সূত্রের শৈবভাষ্য রচনা করেন। আবার খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে অপ্যয়দীক্ষিত শ্রীকণ্ঠের শৈবভাষ্যের 'শিবার্কমণিদীপিকা' নামে এক অতি উপাদেয় টীকা রচনা করেন।

শ্রীকণ্ঠাচার্য
অপ্যয়দীক্ষিত

এই দার্শনিকদের মতে জীবও প্রপঞ্চ; ব্রহ্মের শরীর হওয়া সত্ত্বেও জীব ঈশ্বরের বশীভূত। এই পরাধীনতাই জীবের অসীম ও অনন্ত দুঃখের মূল। শিবের আজ্ঞা জীব মানিয়া না চলিলে দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে; কিন্তু শিব

১ শৈবদর্শন (সর্বদর্শনসংগ্রহ)

নিজে স্বাধীন বলিয়া তাঁহাকে কোন দুঃখই ভোগ করিতে হয় না। স্বাধীনতাই সুখ। বদ্ধজীব অনাদি অজ্ঞান বাসনা প্রভৃতি দ্বারা বদ্ধ হইয়া নানা শরীর ধারণ করে। এই জীব প্রতি শরীরভেদে ভিন্ন ও বিভু। অসীম জীবের এই সসীম বদ্ধভাবই শিবের পাশজাল।[১] 'আমি ব্রহ্ম'—এইরূপ উপাসনার ফলে শিবের অনুগ্রহে জীবের পাশজাল ছিন্ন হয়, ফলে জীব শিবত্ব লাভ করে। শ্রীকণ্ঠের মতে পূর্ণ শিবভাবই মুক্তি, দাস্যভাব নহে। মুক্তি উপাসনা সাধ্য এবং ভগবৎ-প্রসাদ লভ্য। জ্ঞান ও কর্ম উভয়ই তুল্যরূপে মুক্তির কারণ। এই জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ শংকরের অনভিপ্রেত।

শংকরের মতে জীব ও ব্রহ্মের সজাতীয়, বিজাতীয় বা স্বগত কোনোরূপে ভেদই স্বীকৃত হয় নাই, সেজন্য তাঁহার সিদ্ধান্ত 'শুদ্ধাদ্বৈত' নামে প্রখ্যাত। শ্রীকণ্ঠের মতে কিন্তু জীব এবং ব্রহ্মের সজাতীয় বা বিজাতীয় ভেদ না থাকিলেও স্বগত ভেদ আছে। এই দিক্ দিয়া শ্রীকণ্ঠের মত রামানুজের মতেরই অনুরূপ।

এইমতে জগৎপ্রপঞ্চও ব্রহ্মের শরীর। প্রপঞ্চ ভিন্ন ব্রহ্মকে জানিবার উপায় নাই, সেজন্য ব্রহ্ম প্রপঞ্চবিশিষ্ট,—কেননা, যাহাকে ছাড়া যাহাকে জানা যায় না সে তদ্বিশিষ্ট হয়। গুণ ভিন্ন গুণীকে জানা সম্ভব নয়, সেজন্যই গুণীকে আমরা গুণবিশিষ্ট বলিয়া থাকি। ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। উপাদান কারণ ব্যতীত কার্যের কোনো সত্তা নাই—ব্রহ্মকে বাদ দিলে প্রপঞ্চের সত্তাই থাকে না। শ্রীকণ্ঠের মতে ইহাই প্রপঞ্চ ও ব্রহ্মের অভেদ বা অনন্যত্ব। ব্রহ্ম প্রপঞ্চরূপে বহু হওয়া সত্ত্বেও অনন্ত এবং অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবেই তিনি এক এবং অবিকারী। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্; তাঁহার পক্ষে কিছুই অসাধ্য ও অসম্ভব নয়।

এই ব্রহ্মপরিণামবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি এই যে, ব্রহ্ম যে প্রপঞ্চরূপে নিজেকে প্রকাশিত করেন, সেখানে ব্রহ্মের সবটুকুই বা কৃৎস্নব্রহ্মই কি প্রপঞ্চাকারে নিজেকে প্রকাশিত করেন, না, ব্রহ্মের খানিকটা অংশ হয় পরিণত? যদি সমস্ত ব্রহ্মই জগতের আকারে পরিণত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মের সকল

১ 'য একো জালবানীশত ঈশানীভিঃ,' ইত্যাদি—শ্বেঃ উঃ, ৩।৩।১

অংশই যদি এই কার্যজগতের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া যায়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে এই দৃশ্য স্থূল কার্য বা জগৎ-প্রপঞ্চই ব্রহ্ম। কার্যজগতের বাহিরে আর ব্রহ্ম নাই। আর কার্যই যদি হয় ব্রহ্ম, তো, কার্য-ঘটাদির অবয়বের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মের অবয়ব ধ্বংস হইল—এইরূপ বুদ্ধি হওয়া আমাদের স্বাভাবিক, কিন্তু তাহাতো হয় না। অতএব, সমগ্র ব্রহ্ম প্রপঞ্চাকারে পরিণত হন, এই মত যুক্তিযুক্ত নহে।[১] আবার ব্রহ্মের আংশিক পরিণাম স্বীকার করিলেও ব্রহ্মকে বলিতে হয় সাবয়ব। ব্রহ্ম যদি সাবয়বই হন তো বলিতে হইবে যে তাঁহার এক অংশের পরিণাম হয়. অপর অংশের নয়। এই অপর অংশেই ব্রহ্ম প্রপঞ্চাতীতরূপে অবস্থান করেন। কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায় যে যাহা সাবয়ব, তাহারই বিনাশ হয়। পরিণাম-বাদের এই সকল অসামঞ্জস্যের সমাধান করা অসম্ভব বলিয়াই ভগবানের অচিন্ত্যশক্তির কল্পনা করা হইয়াছে। ভগবানের অবিচিন্ত্যশক্তি বলে অসম্ভবও সম্ভব হয়।

পরিণামবাদের ব্যাখ্যায় অদ্বৈতবেদান্তিগণ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। ইঁহারা পরিণামবাদী বেদান্তিগণের ব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তিকে অনিবার্য মায়া-শক্তিতে রূপান্তরিত করিয়া তর্কের সুদৃঢ় ভিত্তিতে তাঁহাদের দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদীর মতে জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম নহে। জগৎ ব্রহ্মের বিবর্তমাত্র। বিবর্তবাদের রহস্য এই যে—কারণ অবিকৃত থাকিয়াই কার্য উৎপন্ন করিয়া থাকে; রজ্জুতে সর্পভ্রম স্থলে রজ্জুই বিবর্ত সর্প। কারণ সর্পভ্রমের উৎপত্তিতে রজ্জুর কোনো হানি হয় না, সে যে রজ্জু সেই রজ্জুই থাকে—তাহার মিথ্যা সর্পরূপ আমাদের মানসকল্পনা মাত্র। আমাদের মানসকল্পনাজনিত সর্পরূপ রজ্জুর নিজরূপের কোনো পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না। রজ্জু অপরিবর্তিত থাকিয়াই মিথ্যা-সর্পের কারণ হয়। এইরূপে এই জগৎ ও ব্রহ্মের বিবর্ত। এই জগতের

অদ্বৈতবাদ

১ 'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।' গীতা
'স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্'—বেদ

উৎপত্তিতে তাহার কারণ ব্রহ্মের কোনো পরিবর্তন হয় নাই। ব্রহ্ম অপরিবর্তিত থাকিয়াই কার্য জগৎ উৎপাদন করিয়াছেন।

বিবর্তবাদীর ব্রহ্ম নিগুর্ণ, নিরাকার, নিরঞ্জন, নির্বিশেষ, এক এবং অদ্বিতীয়। অনাদি মায়াবশত এক ব্রহ্মই বহুরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। কিন্তু উহা মিথ্যা দৃষ্টি, সেজন্য জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য এবং জীব বস্তুত ব্রহ্ম-স্বরূপ। অদ্বৈতবাদের মূলসূত্র ইহাই। এক ব্রহ্মকে জানিলেই জানা যায় নিখিল বস্তুকে এবং তাহাতেই সকল জানার শেষ হয়—এই এক বিজ্ঞানে সর্ব-বিজ্ঞানই অদ্বৈতবেদান্তীর মূল প্রতিজ্ঞা। সমস্ত কার্যবর্গ এক উপাদান কারণেরই ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি। উপাদান কারণকে বাদ দিলে ঐ কার্যবর্গের কোনই অস্তিত্ব থাকে না। কার্যবর্গের কোনো স্বাধীন সত্তা নাই এবং উহা নাই বলিয়াই কার্যবর্গকে মিথ্যা বলা হইয়া থাকে। উপাদান মাত্রই সত্য—উপাদানকে জানিলে কার্যবর্গকেও জানা হইল।

জগতের কারণ ব্রহ্মকে জানিলে ব্রহ্মের জগৎপ্রপঞ্চকেও জানা হয়। এইজন্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসাই বেদান্তের প্রথম সূত্র। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম অর্থাৎ সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মাত্মক। কারণরূপে ব্রহ্ম জগতের সমস্ত পদার্থেই অনুস্যূত রহিয়াছে। সেই নিত্যসত্য ব্রহ্মবস্তুই সকলের আত্মা। সৃষ্টির পূর্বে সেই একমাত্র সদ্‌ব্রহ্মই বিদ্যমান ছিল। দৃশ্যমান নাম ও রূপ কিছুই ছিল না এবং পরিণামেও উহা থাকিবে না। একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মই চিরকাল আছে এবং থাকিবে।

শ্রুতিতে ব্রহ্মকে বলা হইয়াছে এক এবং অদ্বিতীয়; অর্থাৎ স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয়রূপে যে তিন প্রকার ভেদ জগৎপ্রপঞ্চে দেখা যায়, একম্, এব, অদ্বিতীয়ম্—এই তিনটি পদ দ্বারা শ্রুতি ব্রহ্মে ঐ তিনপ্রকার ভেদেরই বারণ করিয়াছেন। ব্রহ্ম এক, নিরবয়ব এবং নিরংশ—সেজন্য তাঁহাতে অবয়ব এবং অবয়বীর মধ্যে যে ভেদ থাকে, সেই 'স্বগত ভেদ' থাকিতে পারে না। ব্রহ্ম এক, তাঁহার জাতীয় অন্য কোনো পদার্থ নাই; ফলে 'সজাতীয় ভেদের আশংকাও বিদূরিত হইয়াছে। অদ্বিতীয় পদের দ্বারা ব্রহ্মের 'বিজাতীয় ভেদের'ও সম্ভাবনা নষ্ট করা হইয়াছে। সতের যাহা বিজাতীয় তাহা অসৎ;

অসতের কোনো অস্তিত্বই নাই। যাহার অস্তিত্বই নাই তাহার ভেদের কোনো প্রশ্নই উঠে না। সেজন্য সৎপদার্থের বিজাতীয় ভেদও অসম্ভব।

সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, সুতরাং সে সময়ে যে দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব ছিল না তাহাতে কোনো সন্দেহই থাকিতে পারে না। সৃষ্টির পরে সৃষ্টিক্রিয়ার ফলে যে দ্বৈতপ্রপঞ্চের উদ্ভব হইল, তাহা সত্য কি মিথ্যা আমাদের বিচার করা প্রয়োজন। একত্ব এবং নানাত্ব পরস্পরবিরোধী বলিয়া এই দুইটিই একসঙ্গে সত্য হইতে পারে না। ইহার একটি মিথ্যা হইবেই। এখন ইহার কোন্‌টি মিথ্যা হইবে তাহার বিচার করা দরকার। একত্ব ও নানাত্ব দুই জ্ঞানের মধ্যে নানাত্বনিরপেক্ষএকত্বজ্ঞান পূর্বে উৎপন্ন হয়, নানাত্বজ্ঞানের উৎপত্তি তাহার পরে হয়।

শ্রুতিতে একত্ব এবং নানাত্ব, অদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতবাদ সম্বন্ধে উপদেশ থাকিলেও যুক্তিদ্বারা শ্রুতির তাৎপর্য বিচার করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে একত্ববিজ্ঞান বা অদ্বৈতবাদই সত্য, নানাত্ব বা দ্বৈতবোধ মিথ্যা। দ্বৈত-প্রপঞ্চ মিথ্যা হইলেও তাহা আকাশ-কুসুম নহে বা অলীক নহে—ইহার ব্যবহারিক সত্যতা অনস্বীকার্য ; তবে যতক্ষণ ব্যবহারিক জীবন আছে ততক্ষণই তাহা সত্য, মুক্ত অবস্থায় যখন জীব ও ব্রহ্মের নির্বিশেষ একত্ব এবং অদ্বৈতভাব পরিস্ফুট হয়, তখন ঐপ্রকারের আত্মার ব্যবহারিক জীবনও থাকে না, ব্যবহারিক জগৎও থাকে না। সাধকের নিকট সমস্ত দ্বৈতপ্রপঞ্চই অবলুপ্ত হইয়া যায়, সুতরাং তাহারই পক্ষে উহা মিথ্যা।

অদ্বৈতবেদান্তী গভীর যত্নসহকারে প্রমাণ এবং প্রমেয়ের বিচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে দ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতাবাদ প্রভৃতি স্থূল আত্মজ্ঞান প্রচার করিয়া থাকে ; কিন্তু উহা তো যথার্থ আত্মজ্ঞান নয়। যথার্থ আত্মজ্ঞানলাভের জন্য অদ্বৈতবেদান্তের মার্গ ছাড়া নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

অদ্বৈতবেদান্তী সংবাদ এবং অসংবাদ উভয়কেই মানিয়া লইয়াছেন। উভয় মতই তাঁহার মতে প্রকারান্তরে সত্য। যাহা সৎ, তাহা চিরদিনই বিদ্যমান আছে এবং থাকিবেও। আবার যাহা অসৎ তাহার কোনোকালেই উৎপত্তি সম্ভব নয়। যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ প্রত্যক্ষই দেখা যায় সেই সকল জাগতিক

পদার্থ সৎও নহে, অসৎও নহে, অতএব ইহারা অনির্বাচ্য এবং মিথ্যা। এক ব্রহ্মই সত্য, আর সকলই মিথ্যা।

আপত্তি উঠিতে পারে যে, যদি ব্রহ্ম ছাড়া আর সব কিছুই মিথ্যা হয় তো অধ্যাত্মশাস্ত্রও এই যুক্তিতেই মিথ্যা হইয়া পড়ে। মিথ্যাশাস্ত্র হইতে কেমন করিয়া সত্য ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইবে? ইহার উত্তরে বলা হয় যে অসত্য হইতে যে সত্যের উৎপত্তি হয় ইহা প্রত্যক্ষই দেখা যায়। অসত্য সর্পও মিথ্যাদর্শীর মনে সত্য ভয়ই উৎপাদন করিয়া থাকে।

ব্রহ্মসূত্রের সাধারণ পরিচয়

অদ্বৈতবেদান্তের বিশদ আলোচনা যথাস্থানে করা হইবে। এস্থলে সকল-প্রকার বেদান্তালোচনার প্রকৃত মূলসূত্র ব্রহ্মসূত্রের সম্বন্ধে একটি সাধারণ পরিচয় দেওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি। ইদানীং সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হইতেছে।

বেদান্তের চিন্তাধারা বেদ উপনিষদ্ প্রভৃতির ভিতর দিয়া কিভাবে সাবলীল গতিতে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে,—এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে[১] আমরা তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছি। এখন আলোচ্য,—কিভাবে সেই ভাবধারা দার্শনিক আচার্যগণের প্রতিভার অবদানে পরিপুষ্ট হইয়া নবীনরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বেদ, উপনিষদ্ প্রভৃতি আকর গ্রন্থে বেদান্তচিন্তা পরিপুষ্ট-

ব্রহ্মসূত্রই বেদান্তের প্রথম দার্শনিক রূপ

ভাবে আত্মপ্রকাশ করিলেও তখনও উহা প্রকৃত দর্শনের আকারে গড়িয়া উঠে নাই। আচার্য বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রেই আমরা প্রথম বেদান্তের দার্শনিকরূপের সহিত পরিচিত হই। তর্কের সূত্রে বেদান্তের বিক্ষিপ্ত চিন্তারাজিকে একত্র গ্রথিত করিয়া বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছেন। ঐ ব্রহ্মসূত্রেরই অপর নাম 'বেদান্তদর্শন'। পরবর্তীকালে বৈদান্তিক আচার্যগণ ঐ ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শনের উপর ভাষ্য, বার্তিক, টীকা, বিবৃতি প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বেদান্তচিন্তার ইতিহাসে এইরূপে সূচনা হইল নবযুগের। এই যুগের পরিচয় দিতে হইলে যে ব্রহ্মসূত্রকে ভিত্তি করিয়া বেদান্তচিন্তার অভ্রংলিহ প্রাসাদ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার সম্যক্ পরিচয় দিতেই হয়।

১ দ্রঃ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা, ১ম ভাগ

বেদব্যাস এই ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা। কোন্ সুদূর অতীতে যে তিনি এই ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব ; কারণ বেদব্যাসের কাল প্রভৃতি লইয়া সুধীসমাজে মতভেদ দেখা যায়। অনেকে মহাভারতের রচয়িতা বেদব্যাসই যে ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছেন—এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেন ; কিন্তু 'গীতা'য়[১] অকাট্য প্রমাণ আছে যে ব্রহ্মসূত্র মহাভারতের সময় নিশ্চয়ই রচিত হইয়াছিল। মহাভারতের অন্যান্য অনেক স্থলেও বেদান্তদর্শনের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতের রচনাকাল ভিণ্টারনিৎসের মতে খৃঃ পূঃ ৪০০—খৃঃ অব্দ ৪০০র মধ্যে। একই বেদব্যাস যে মহাভারত এবং বেদান্তসূত্রের প্রণেতা, একথা একরূপ নিশ্চিতভাবেই বলা চলে। 'ব্রহ্মসূত্রে' বহুস্থলেই মহাভারতকে 'স্মৃতি' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ীতে'ও 'ভিক্ষুসূত্র' বা 'ব্রহ্মসূত্রে'র এবং ব্রহ্মসূত্রোক্ত 'বেদান্তদর্শনে'র প্রাচীন আচার্যগণের উল্লেখ দেখা যায়।

বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা

ব্রহ্মসূত্র এবং মহাভারত সমসাময়িক এবং একই লেখকের রচনা হইতেও পারে, কাল অঃ ৪০০ খৃঃ পূঃ —৪০০ খৃঃ অঃ

পাণিনির আবির্ভাবের কাল যাহাই হউক না কেন, তাঁহার আবির্ভাবের বহুপূর্বেই মহাভারত ও বেদান্তদর্শন রচিত এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। ব্রহ্মসূত্রে সর্বসমেত ৫৫৫ সূত্র আছে। ঐ সূত্রগুলি চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেকটি অধ্যায় আবার ৪টি পাদে বিভক্ত ; অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্রে ১৬টি 'পাদ' বা পরিচ্ছেদ আছে। প্রত্যেক পাদে আবার কতকগুলি 'অধিকরণ' আছে। এক একটি অধিকরণ পুনরায় কতকগুলি সূত্রের সমষ্টি। বিভিন্ন বিচার্য বিষয় ভিন্ন ভিন্ন এক একটি অধিকরণে আলোচিত ও মীমাংসিত হইয়াছে। অধিকরণগুলির প্রত্যেকটিতেই আছে ৫টি অঙ্গ বা অংশ (পঞ্চাঙ্গ)[২]—প্রথম অঙ্গে বিচার্য

৫৫৫ সূত্র আছে ব্রহ্মসূত্রে

১ 'ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ' (গীতা ১৩।৪)

১ বিষয়ঃ সংশয়শ্চৈব পূর্বপক্ষস্তথোত্তরম্।
নির্ণয়শ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রেঽধিকরণং স্মৃতম্ ॥—ভট্টচিন্তামণি

বিষয়ের উল্লেখ থাকে, দ্বিতীয়ে বিচার্য বিষয়ে সংশয়ের অবতারণা করা হয়, তৃতীয়ে সংশয়ের পোষক যুক্তির উপন্যাস করা হয়, চতুর্থে সেই সকল যুক্তি খণ্ডিত হয়, আর পঞ্চমে বিচারের ফল বা সিদ্ধান্ত বিবৃত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মসূত্রের বিচারের ধারা

এই ব্রহ্মসূত্রকে ভিত্তি করিয়াই বেদান্তদর্শনে নানাপ্রকার মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ বিভিন্ন মতাবলম্বী আচার্যগণের তর্ককোলাহলের মধ্যে সূত্র-কারের প্রকৃত অভিপ্রায় বা সূত্রগুলির প্রকৃত তাৎপর্য কি তাহা বোঝা শক্ত হইয়া পড়ে। এরূপ স্থলে বাদরায়ণের বেদান্তমতবাদ বুঝিতে হইলে আমাদের উচিত ভাষ্যকারদের ব্যাখ্যা, বিবৃতি প্রভৃতিকে দূরে সরাইয়া কেবলমাত্র সূত্রের ভিত্তিতে ব্রহ্মসূত্রের দার্শনিক তাৎপর্য বিশ্লেষণের চেষ্টা করা।

ব্রহ্মসূত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু

ব্রহ্মই বেদান্তের চরম ও পরম তত্ত্ব। সেজন্য ব্রহ্মকে নিরূপণ করাই বেদান্তের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। সূত্রের প্রারম্ভেই সেজন্য বেদান্তের একমাত্র নিত্য জিজ্ঞাস্য ব্রহ্মবস্তু উপন্যস্ত হইয়াছে। তাহার পর বহু পরপর সূত্রে ঐ ব্রহ্মের প্রকৃতস্বরূপ এবং স্বভাব বর্ণনার চেষ্টা করা হইয়াছে। তর্কের সাহায্যে 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম বা পুরুষকে'[১] প্রতি-স্থাপিত করা হইয়াছে বলিয়াই ব্রহ্মসূত্রের অপর নাম বেদান্তের 'তর্কপ্রস্থান'।

ব্রহ্ম

উপনিষদে মৃত্যুর পরপারে যাইবার যে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, সেই পরপার কোথায়? ব্রহ্মের পরেও কোনো তত্ত্ব আছে কি? বিশ্বের চরম তত্ত্ব কি? সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে পরিমাপিত করা যায় কি? এইপ্রকার নানা প্রশ্ন সূত্রকার ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের সপ্তম অধিকরণে তুলিয়া, তাহাদের মীমাংসা করিয়া, ব্রহ্মই যে বিশ্বের চরম তত্ত্ব, তাহা প্রতিপাদিত করিয়াছেন।

ব্রহ্মই বিশ্বের চরম তত্ত্ব

সূত্রকারের মতে, উপনিষদে ব্রহ্ম সেতুরূপে বর্ণিত হইলেও এবং সেতুর

---

১ ব্রহ্মসূত্রের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে জানার জন্য দ্রঃ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস, পৃঃ ১৩২-১৩৪

পরপারে যাইবার কথা উল্লিখিত হইলেও ব্রহ্ম সেতুর তুল্য নহেন। তিনি সর্বব্যাপী, সর্বভূতান্তরাত্মা—তাঁহাতেই সমগ্র বিশ্ব রহিয়াছে অনুস্যূত, তিনি বিশ্বের আশ্রয়—এইজন্যই তিনি সেতু। এই সেতুই পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা; ইনি পারাপারহীন। জড়জগৎকে বাদ দিয়া জগতের কারণাত্মাকে প্রত্যক্ষ করাই সেতু সমুত্তরণের নামান্তর।

ব্রহ্মই সেতু, অথচ সর্বব্যাপী, পারাপারহীন

সর্বব্যাপী আত্মার যে সসীমভাবের কথা 'চতুষ্পাৎ', 'সহস্রপাৎ' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা উপনিষদে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা শুধু সেই বিরাট পুরুষের উপাসনার সুবিধার জন্যই করা হইয়াছে। সসীম মন অসীমের ধারণা সহসা করিতে পারে না বলিয়াই অসীমকে সীমার গণ্ডীতে আনার চেষ্টা করা হইয়াছে। 'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর' গাহিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। এই সসীমকে অবলম্বন করিয়া অসীমের সন্ধানই প্রকৃত পরমতত্ত্বের সন্ধান। ব্রহ্ম অবাঙ্-মনসোগোচর। চিরঅসঙ্গ ব্রহ্মের কোনোরূপ সম্বন্ধ বা সঙ্গতির চিন্তা করা নিছক কল্পনা মাত্র।[১] যাহা কল্পিত বা ঔপাধিক, তাহাই মায়িক বা মিথ্যা—তাহার দ্বারা সত্যবস্তুর কোনো রূপান্তর ঘটে না। স্বপ্রকাশ, নিরাকার, পরব্রহ্ম, অন্তঃকরণ প্রভৃতি নানা উপাধি-পথে প্রকাশিত হইয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ ইত্যাদি নানা আকার ধারণ করেন, অসঙ্গ ব্রহ্মও সসঙ্গ বলিয়া প্রতিভাত হন। ইহা উপাধিরই দোষ, ব্রহ্মের নহে। উপাধি যখন বিলীন হয়, তখন উপাধির দ্বারা কল্পিত বিভিন্ন আকারও ব্রহ্মে লীন হয়। এই ব্রহ্মতাদাত্ম্যের কথাই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে।

ব্রহ্ম অসঙ্গ এবং অসীম ; সসঙ্গ এবং সসীম বলিয়া যে তাঁহাকে মনে হয় তাহা উপাধিরই দোষ, ব্রহ্মের নহে

শাস্ত্রই একমাত্র ব্রহ্মকে জানিবার উপায়। যদিও শাস্ত্রে নানাপ্রকার পরস্পরবিরোধী উক্তিপ্রত্যুক্তি দেখা যায়, তবুও ব্রহ্মতত্ত্বেই সমস্ত দ্বন্দ্বের চিরঅবসান ঘটে।[২] ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম দ্যাবাপৃথিবীর আশ্রয়, সর্বব্যাপী এবং সর্বশক্তিমান্।

ব্রহ্মের স্বরূপ

১ 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাভূতং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ' ইত্যাদি

২ 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ'—ব্রঃ সূত্র ১।১।৩, 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' ১।১।২ ইত্যাদি

তিনি অক্ষর, নিত্য, সৎস্বরূপ, প্রজ্ঞানঘন এবং আনন্দময়। নিখিলবিশ্বের তিনি উপদেষ্টা বা শিক্ষক, অন্তর্যামী এবং জীবের কর্মফলদাতা। তিনি জগদ্‌যোনি, সৃষ্টিস্থিতিলয়ের বিধাতা, জগতের নিমিত্ত এবং উপাদানকারণ। স্বতন্ত্রভাবে তিনি জগৎকে সৃষ্টি করেন। বিশ্বস্রষ্টার সৃজনী শক্তির মূলে চলিতেছে কামলীলা, সেই লীলাবশেই প্রজ্ঞানঘন আনন্দময় পুরুষ বহুরূপে, বহুনামে প্রতিভাত হন। এই বিশ্বসৃষ্টি লীলাময়ের লীলামাত্র। কিন্তু এই লীলাদ্বারা লীলাময় বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন না। তিনি আপ্তকাম, তিনি জীবের কর্মফলভোগসিদ্ধির জন্য যুগে যুগে সুখদুঃখময় এই বিশ্বনাটকের অভিনয় করেন। তিনি পক্ষপাত-দোষশূন্য। জীব তাহার কর্মানুসারে ভোগ করে। ঈশ্বর নিজে আনন্দময়—তিনি একা এই আনন্দ পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করিতে না পারায় তাঁহার লীলাময়ী মায়া বা অবিদ্যাকে সহচরী করিয়া বিশ্বলীলায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই লীলা বা মায়ার অবসানেই চলে ধ্বংসের রুদ্রলীলা—চরাচর সমস্ত বিশ্বকেই তিনি তখন গ্রাস করেন। সকলেই তাঁহার অন্ন, আর তিনিই সকলের ভোক্তা। একদিকে তিনি বিশ্বপতি, বিশ্বপ্রাণ, বিশ্বযোনিও যেমন, অপরদিকে তিনি তেমনই বিশ্বভুক্, দাবানল, মহাভয় বজ্র। বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে কোমলে কঠোরে মিশিয়া লীলাময়ের কি অপূর্ব লীলা। তিনি একাই অন্তরে অব্যক্ত, আবার বাহিরে ব্যক্ত। জগৎ সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টি-যবনিকার অন্তরালে নিজেকে আবৃত রাখিয়া সেই একই হইয়াছেন বহু, নানা রূপে, নানা নামে প্রকাশিত হইতেছেন।

ব্রহ্ম আনন্দময়

জগৎ বা বিশ্ব ব্রহ্মের লীলা

চেতন ব্রহ্ম কেমন করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিলেন, এই আশঙ্কার উত্তরে সূত্রকার বলেন—জগৎ যে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বা বিলক্ষণ তাহাতো কোনোমতেই অস্বীকার করার উপায় নাই। চেতন হইতে অচেতনের উৎপত্তি প্রত্যক্ষগম্য, যেমন চেতন জীবশরীরে অচেতন কেশ, নখ প্রভৃতির উৎপত্তি ও বৃদ্ধি সকলেই দেখিয়াছেন।

চেতন ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিলেন কিরূপে ?

---

১ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্, মৃদিত্যেব সত্যম্।

২ নামরূপে বিহায় ইত্যাদি (উপনিষদ্)

অবশ্য নামরূপাত্মক জগতের সহিত অরূপ ব্রহ্মের বৈসাদৃশ্য অস্বীকার করা যায় না, তবুও 'আরম্ভণ' শ্রুতির[১] তাৎপর্য বিচার করিলে দেখা যায় যে নাম ও রূপের[২] কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, তাহাদের অস্তিত্ব তাহাদের কারণেরই (বস্তুরই) অস্তিত্বের অধীন। ঘট, শরা, কলস প্রভৃতি মৃত্তিকারই বিভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র। এক মৃত্তিকাই কোনোরূপে ঘট, কোনোরূপে শরা, কোনোরূপে আবার কলস। মৃত্তিকা ভিন্ন ইহাদের কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নাই—ইহাদের ক্ষেত্রে একমাত্র সত্য উপাদান-কারণ মৃত্তিকা। সেইরূপ ব্রহ্মের কার্য জগৎ ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি—পরিণামে উহা ব্রহ্মস্বরূপতাই লাভ করে। নাম ও রূপের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে সমস্ত বস্তুই বিলীন হয় সেই সর্বকারণ-কারণ ব্রহ্মে। তখন বস্তুর কোনো নিজস্ব রূপ থাকে না; এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই তখন অবশিষ্ট থাকেন।

উত্তর: ব্রহ্মের কার্য জগৎ ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি মাত্র

জীব, জড়, ভোক্তা, ভোগ্য, দ্রষ্টা, দৃশ্য, চেতন, অচেতন, কার্য, কারণ প্রভৃতি যতপ্রকার ভেদের কল্পনা আমাদের মনে আসিতে পারে, সেসকলই সেই লীলাময় পরমপুরুষের বিভিন্ন লীলা। মহাবারিধির ফেনা, বীচি, তরঙ্গ যেমন পরস্পর ভিন্ন হইলেও উহা জলেরই বিকার; জলময় বারিধি হইতে বস্তুতঃ উহা ভিন্ন নহে, কিন্তু তবুও ফেনা, বীচি, তরঙ্গ ও বুদ্‌বুদের ভেদ যেমন আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, সেই রূপ অসীম অনন্ত ব্রহ্মপারাবারে অগণিত জড়-প্রপঞ্চের যে লীলালহরী ভাসিতেছে, উঠিতেছে, পড়িতেছে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মাত্মক হইলেও জড় প্রপঞ্চরূপে তাহাদের মায়িক ভেদও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি; সুতরাং ভোক্তা ভোগ্য, দ্রষ্টা দৃশ্য, স্রষ্টা সৃষ্ট প্রভৃতি ভেদ বাহিক দৃষ্টিতে অবশ্যই স্বীকার

ভেদ লীলাময়ের লীলা মাত্র

বাহ্যত ভেদ থাকিলেও মূলত সকলই ব্রহ্মময়

১। 'বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্' ইত্যাদি।

২। 'নামরূপে বিহায়'।

করিতে হইবে। মূলে সকলই ব্রহ্মময়—সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ, ইহাই বেদান্তের রহস্য।[১]

এই ব্রহ্ম আবার অরূপ, অদৃশ্য, অজ্ঞেয়, অব্যক্ত, অগোত্র, অবর্ণ, শব্দহীন, স্পর্শহীন, রসহীন ইত্যাদি প্রপঞ্চাতীতরূপে গুণবান্। ইনি নির্বিশেষ—এই রূপটিই ব্রহ্মের যথার্থ রূপ। নির্গুণ, নিরঞ্জন ব্রহ্ম মায়াশরীর ধারণ করিয়া সবিশেষ হন, তখনই তিনি বিরাজ করেন বহুরূপে। একত্ব এবং নানাত্ব, ভেদ ও অভেদ দুইই সত্য—কেবল দৃষ্টির প্রভেদ মাত্র। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এই ব্রহ্ম এক এবং অদ্বৈত ও অভিন্ন, আর মায়িক দৃষ্টিতে তাহাই আবার নানারূপ ও বিভিন্ন। অসংখ্য বিভিন্ন ভৌতিক (সৃষ্ট) বস্তু সেই এক মূলভূতেরই বিকার—সমস্ত ভূত এবং ভৌতিক সৃষ্টির অন্তরালেই বিরাজ করেন সেই পরমপুরুষ বিশ্বানুগ আত্মা[২]—সৃষ্টির প্রতি স্তরেই তিনি অনুস্যূত, বিশ্বের প্রতি পরমাণুতেই তিনি ওতপ্রোতরূপে বিরাজমান, অথচ তিনি নিরঞ্জন, নির্লেপ, নির্বিকার, প্রপঞ্চাতীত।

ব্রহ্ম নির্বিশেষ এবং এক সবিশেষরূপে বহু

জগৎরূপে তিনি বিবর্তিত হন; স্বরূপের বিচ্যুতি ইহাতে ঘটে না। স্বরূপের বিচ্যুতি না ঘটিয়া অন্যরূপে তাঁহার যে প্রকাশ তাহাই 'বিবর্ত'। ইহাই বেদান্তের মায়া, অবিদ্যা বা 'অধ্যাস'। ইহা মিথ্যা। একমাত্র বিশ্বাতীত রূপই সত্য।

জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত

ইহার পর সূত্রকারের মনে প্রশ্ন জাগিল: জীবের প্রকৃত স্বরূপ কি? পরমাত্মাই কি জীব? জীব কি জন্মমরণশীল? উহা কি এক না বহু, অণু না বিভু, সত্য না মিথ্যা? ইহার উত্তরে তিনি বলিতেছেন যে জীব বস্তুতঃ মরে না, অথচ জীবশূন্য হইলেই সমস্ত বিশ্ব মৃত্যু-কবলিত হয়। কিন্তু জীবকে তো স্বতন্ত্র তত্ত্ব বলিয়া মানিতে পারি না, কারণ তাহা হইলে বেদান্তের দ্বৈতবাদ স্বীকার করিতেই হয়। সেজন্য বলা হইয়াছে যে কি স্থাবর কি জঙ্গম সমস্ত জাগতিক পদার্থেরই এক একটি শরীর

জীবের স্বরূপ কি?

১ বেদান্তদর্শন—অদ্বৈতবাদ (ডঃ আশুতোষ শাস্ত্রী)—পৃঃ ১৪২।

২ তস্য মহতোভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ।

আছে এবং সেই শরীরে জীবনপ্রবাহও স্পন্দিত হইতেছে—উহাই সেই বিশ্বপ্রাণ পরমাত্মা ; শরীরের উৎপত্তিই জন্ম এবং শারীরিক ধ্বংসই মৃত্যু—ইহাই আমাদের প্রচলিত ব্যবহার।

জন্মমৃত্যুর অন্তরালে যে অনন্ত জীবন নিরন্তর স্পন্দিত হইতেছে উহাই জীবাত্মা, সত্য সনাতন পরব্রহ্ম। কর্মস্রোতে জীবাত্মা অবিরাম ছুটিয়া চলিয়াছে, ইহা জন্মমরণচক্রের অতীত ; শরীরের সহিত উহার গতিপথে সংযোগের ও বিয়োগের ফলে জন্মমৃত্যু প্রভৃতি শারীরিক ধর্ম উহাতে আরোপিত হয় ; ফলে অবিদ্যাগ্রস্ত সাধারণ লোক জীবাত্মারই জন্মমৃত্যু কল্পনা করিয়া থাকে।[১] জীবাত্মা এক হিসাবে এজন্য পরমাত্মারই আভাস। দেহভেদে পরমাত্মার এই আভাস ভিন্ন ভিন্ন ; জীব বস্তুত এক হইলেও শরীরভেদে তাহার ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে।

জীবাত্মা অজ এবং অমর

কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে যে, জীব যদি বিভুই হয় তবে তাহার ইহলোক পরলোক যাত্রা সম্ভব হয় কিরূপে? শাস্ত্রে যে কখনও কখনও তাহাকে অণু ও পরমাত্মার অংশ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে তাহারই বা সার্থকতা কি? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে বুদ্ধি যখন পরমাত্মার উপাধিরূপে উপস্থাপিত হয় তখন বুদ্ধির ধর্ম সুখদুঃখ প্রভৃতি আত্মাতে আরোপিত হয়, ফলে মুক্ত আত্মা সংসারের নাগপাশে ধরা দেয়, দুঃখের কণ্টকাঘাতে জর্জরিত হয়। সংসারী হওয়ায় তাহাকে তাহার কৃতকর্মের ফল ভোগ করিতেই হয়[২]। জ্ঞানচক্ষু যখন উন্মীলিত হয় তখন কর্ম ভস্মসাৎ হয় এবং সাধক মুক্তি ও ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করেন। বুদ্ধি অণু, সেজন্য বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত জীবকে কল্পিতভাবে শাস্ত্রে কখনও কখনও অণু বলা হইয়াছে।

ব্রহ্মসূত্রের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা

১ ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিদ্ ইত্যাদি এবং অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্ (গীতা)।

২ মে কর্তব্যমিহাস্তি ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। গীতা।

যাইবে যে ব্রহ্মসূত্র সকল উপনিষদেরই সার সংকলন। ইহাই বেদান্ত দর্শনের মূল গ্রন্থ। কিন্তু এই মূলও আবার সমূলক। ব্রহ্মসূত্রে আত্রেয়, জৈমিনি, বাদরায়ণ, বাদরি, কার্ষ্ণাজিনি, কাশকৃৎস্ন, ঔড়ুলোমি এবং আশ্মরথ্য প্রভৃতি প্রাচীন আচার্যগণের[১] উল্লেখ আছে। ইহা দেখিয়া মনে হয় যে ব্রহ্মসূত্র রচিত হইবার বহুপূর্বেই সূত্রের আকারে বিভিন্ন বৈদান্তিক মত প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল এবং তাহার ফলে অসম্পূর্ণ ও বিচ্ছিন্ন আকারে কতকগুলি সূত্র রচিত হইয়াছিল। ঐ সকল প্রাচীন সূত্রের আদর্শে এবং উপনিষদের ভিত্তিতে পরবর্তীকালে ব্রহ্মসূত্রকার এক পূর্ণাঙ্গ সূত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাকেই বর্তমান 'ব্রহ্মসূত্র' বা 'বেদান্তদর্শন' আখ্যা দেওয়া হয়।

ব্রহ্মসূত্র সকল উপনিষদের সার

ব্রহ্মসূত্রে পূর্বাচার্যবৃন্দের উল্লেখ

"ব্রহ্মসূত্র রচনার বহুপূর্বেই প্রাচীন বৈদান্তিক সমাজে অদ্বৈতবাদের পাশাপাশি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ভেদাভেদবাদ, দ্বৈতবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন বেদান্তমতই গুরুপরম্পরাক্রমে আলোচিত হইয়া আসিতেছিল[২]।" এজন্যই ব্যাস স্বীয় গ্রন্থে সকল প্রকার বিভিন্ন মতবাদী আচার্যগণের নাম করিয়াছেন।

আশ্মরথ্য[৩] এক সুপ্রাচীন বৈদান্তিক আচার্য। তাঁহার মতে, বেদান্তে যে, এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা আছে অর্থাৎ 'এক'কে জানিলেই 'সকল বস্তু' জানা যায় বলিয়া কথিত হইয়াছে, ঐ প্রতিজ্ঞা সার্থক করিতে হইলে জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে ভেদদৃষ্টি দূর করিতে হইবে, ইহাদের মধ্যেও ঐক্যের সূত্র সন্ধান করিতে হইবে। বহ্নির স্ফুলিঙ্গ যেমন বহ্নি হইতে অত্যন্ত ভিন্নও নহে, অত্যন্ত অভিন্নও নহে, সেইরূপ জীবাত্মা পরমাত্মারই আংশিক বিকাশ, উভয়েই চিৎস্বরূপ বলিয়া তাঁহারা অত্যন্ত ভিন্নও নহেন, আবার অত্যন্ত অভিন্নও নহেন।

আশ্মরথ্য

ঔড়ুলোমির মতে, যে পর্যন্ত জীবাত্মা সংসারের আবিলতার মধ্যে দেহেন্দ্রিয়াদির বন্ধনে আবদ্ধ থাকিবে, সে পর্যন্ত পরমাত্মার সহিত তাহার ভেদবোধ অবশ্যম্ভাবী। যতক্ষণ

ঔড়ুলোমি

১ দ্রঃ বেদান্তদর্শন—অদ্বৈতবাদ পৃঃ ১৫১-১৬৩

২ বেদান্তদর্শন—অদ্বৈতবাদ (১ম খণ্ড) পৃঃ ১৫০

৩ বেদান্তদর্শনের ইতিহাস, ১ম ভাগ, পৃঃ ৬৮—৭৫

সংসারদশা, ভেদ কেবল ততক্ষণই। মুমুক্ষু আত্মার পরমাত্মার সহিত অভেদই বেদান্তে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই আলোচনা হইতে মনে হয় যে ঔড়ুলোমি ভেদাভেদবাদী ছিলেন। তাঁহার মত অনেকাংশে পাঞ্চরাত্র ও শৈব মতবাদের মত। এই আচার্যের মতে মুক্ত আত্মার কোনো গুণ বা ধর্ম থাকে না—আত্মা চৈতন্যের রূপ লাভ করে।

আত্রেয়, কাশকৃৎস্ন, কার্ষ্ণাজিনি, বাদরি

আত্রেয়ের মত খণ্ডন করিয়াছেন ঔড়ুলোমি। আত্রেয় খুব সম্ভবত মীমাংসক আচার্য ছিলেন। কাশকৃৎস্ন ছিলেন অদ্বৈতবাদী আচার্য। তাঁহার মতে পরমাত্মা ও জীবাত্মা ভিন্ন তত্ত্ব নহে। কার্ষ্ণাজিনির মতে ছান্দোগ্য শ্রুতির 'চরণ' শব্দে শুভাশুভ অদৃষ্টকেই বুঝাইয়া থাকে। বাদরি 'চরণ' শব্দে শুভ এবং অশুভ কর্মকেই বুঝিয়াছেন।

জৈমিনিও বাদরায়ণ পরস্পর পরস্পরকে উল্লেখ করিয়াছেন

বাদরায়ণ বহুস্থলেই পূর্বপক্ষ হিসাবে পূর্বমীমাংসার সূত্রকার জৈমিনির মত উল্লেখ করিয়াছেন। বাদরায়ণ যেমন জৈমিনির উল্লেখ করিয়াছেন, জৈমিনিও সেইরূপ পূর্বমীমাংসায় বাদরায়ণের মত কোথাও পূর্বপক্ষরূপে, কোথাও বা স্বীয় মতের পোষকরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে জৈমিনি ও বাদরায়ণ সম্ভবত সমসাময়িক ছিলেন। পুরাণের মতে ব্যাসের শিষ্য জৈমিনি, আর শবরস্বামীর মতে জৈমিনি যে বাদরায়ণের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা কেবল বাদরায়ণের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার জন্য। আবার বাদরায়ণ উত্তরমীমাংসার সূত্রকার, সে হিসাবে তাঁহার পক্ষে পূর্বমীমাংসার মত আলোচনা করা একান্ত স্বাভাবিক।

প্রাচীন ভাষ্যকার

ভাষ্যযুগে অনেক প্রাচীন ভাষ্যকারের পরিচয় আমরা পাই ; তাহার মধ্যে ভর্তৃপ্রপঞ্চ,[১] বোধায়ন, উপবর্ষ, দ্রমিড়, টঙ্ক, কপর্দী ও ভারুচি প্রসিদ্ধ। এই সকল ভাষ্যকারদের রচিত পুস্তকাদি এখন আর পাওয়া যায় না।

১ বেদান্তের এই সকল প্রাচীন ভাষ্যকারগণের বিবরণের জন্য দ্রঃ বেদান্তদর্শন—অদ্বৈতবাদ, পৃঃ ১৬০—১৬৮।

বেদান্তসূত্রের সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা করা হইয়াছে। এস্থলে সংক্ষেপে বেদান্তদর্শন সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদের আলোচনা করা হইবে। বেদান্তশাস্ত্র অতি বিশাল—সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দেওয়া অত্যন্ত দুরূহ। ভারতের মহামনীষিগণ অল্পবিস্তর প্রত্যেকেই বেদান্তের অনুরক্ত, আর বেদান্তের টীকা টিপ্পনী এবং ভাষ্যাদির আলোচনায় প্রাচীন ভারতীয় মনীষা অপূর্বরূপে স্ফুরিত হইয়াছে।

ব্রহ্মসূত্রের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকারগণ

ব্রহ্মসূত্রের বহু ভাষ্যকারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ শংকর, রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব ও বল্লভ। ইঁহারা বিখ্যাত পঞ্চ বেদান্ত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা'[১]। শংকরের মতের নাম কেবলাদ্বৈতবাদ, রামানুজের প্রচারিত মতের নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, মধ্বের দ্বৈতবাদ এবং বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ। এ সম্বন্ধে পূর্বেই সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। এস্থলে এই মতবাদগুলির বিস্তৃত আলোচনা করা হইতেছে।

শংকরের কেবলাদ্বৈতবাদ

কেবলাদ্বৈতবাদে[২] ব্রহ্মই একমাত্র তত্ত্ব অথবা সত্য। উপনিষদে এজন্যই বারবার 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বলিয়া ব্রহ্মকে বর্ণনা করা হইয়াছে। জীব ও জগৎ ব্রহ্মের অপেক্ষা নিম্নস্তরের তত্ত্ব, উহারা ব্রহ্মের অন্তর্ভূত এবং ব্রহ্মের আশ্রিত বলিয়া স্বীকৃত হইলেও উহারা যে ব্রহ্মের অতিরিক্ত তত্ত্ব তাহা তো অস্বীকার করা চলে না। ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, জীব ও জগৎ মায়ামাত্র, উহারা মিথ্যা, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য।[৩]

ব্রহ্ম সকলপ্রকার ভেদশূন্য, তিনি নির্বিশেষ। ভেদের আবার তিনটি শ্রেণী

১ বেদান্তদর্শন—রমা চৌধুরী, পৃঃ ২

২ দ্রঃ ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা পৃঃ ১০—১৮. History of Indian Philosophy Vol. II History of Philosophy : Eastern & Western—Vol I, pp. 272-304 ; ও মাধবীয় সর্বদর্শন সংগ্রহ (বঙ্গানুবাদ), পৃঃ ৪০৫—৪৯০।

৩ বেদান্তদর্শন—রমা চৌধুরী, পৃঃ ৩

আছে—সজাতীয়, বিজাতীয়, এবং স্বগত। এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম কিন্তু সজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগত সর্বপ্রকার ভেদরহিত।

ব্রহ্ম

তিনি সর্বব্যাপী, অনাদি, অনন্ত। তিনি একদিকে যেমন পরিপূর্ণ সমগ্র সত্তা, অপরদিকে তেমনি অংশবিহীন (বা abstract unity)। ব্রহ্ম নির্গুণ বা সকলপ্রকার বিশেষণরহিত, কারণ ব্রহ্মে গুণবিশেষের আরোপ করিলে তিনি সসীম হইয়া পড়েন; এজন্যই অনন্ত অসীম ব্রহ্ম নির্গুণ। শ্রুতিতে কোনো কোনো স্থলে তিনি সগুণ বলিয়া কীর্তিত হইলেও বুঝিতে হইবে যে সে সকল বর্ণনা ঈশ্বরবিষয়ক মাত্র, পরব্রহ্মের কথা সেস্থলে বলা হয় নাই।

ব্রহ্মের স্বরূপ সৎ চিৎ এবং আনন্দ। তিনি শাশ্বত, অনাদি, অনন্ত—জন্মাদি ষট্‌বিকার রহিত; তিনি চৈতন্য বা জ্ঞানস্বরূপ—তিনি বিজ্ঞানঘন (বৃ. আ. ২।৪।১২); তিনি অজড় এবং স্বপ্রকাশ। তিনি জ্ঞানমাত্র, জ্ঞাতা নহেন। তিনি আনন্দ, সর্ববিধ দুঃখক্লেশের অতীত তিনি। ব্রহ্মানন্দকে মানুষ পরিমাপিত করিতে পারে না, তাহা কেবল অনুভববেদ্য।

ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়; কারণ তিনি 'আপ্তকাম'। তাঁহার অভাব বা কামনা কিছুই থাকিতে পারে না। এজন্য তিনি কর্মকর্তা অথবা কার্যস্রষ্টা কারণ হইতে পারেন না। ব্রহ্মের বহিঃস্থিত কিছুই নাই—তিনি অপরিণামী এবং অপরিবর্তনীয় অর্থাৎ তিনি নিষ্ক্রিয়। অতএব "ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয়, নির্বিশেষ, নির্গুণ ও নির্বিকার।"

কেবলাদ্বৈতবাদীর মতে জীব ও জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত মাত্র, উহার পরিণাম নহে। পরিণামের অর্থ কারণ হইতে সত্যকার্য সৃষ্টি; বিবর্তের অর্থ কারণে মিথ্যা কার্যের প্রতীতি। প্রকৃতপক্ষে কারণ হইতে কার্যের উৎপত্তি হয় না—ব্রহ্মও সত্যই জীবজগতে পরিণত হন না। সংসার একটি ভ্রম মাত্র, যেমন আমরা প্রায়ই রজ্জুতে সর্পের ভ্রম করিয়া থাকি। শংকরের মতবাদ এজন্যই 'বিবর্তন বাদ' নামে প্রসিদ্ধ।

সৃষ্টি

জগৎ ব্রহ্মের বিবর্তমাত্র

সৃষ্টিকে শংকর 'রজ্জুসর্পভ্রম' প্রক্রিয়ার অনুরূপ বলিয়াছেন। রজ্জুরূপ অবলম্বন, আধার বা অধিষ্ঠানে সর্পের গুণাবলী ভ্রমক্রমে আরোপিত হয়

বলিয়াই রজ্জুতে সর্পভ্রম জন্মে। এক বস্তুতে অপর এক ভিন্ন বস্তুর ভ্রমাত্মক আরোপ, অর্থাৎ দুই ভিন্ন বস্তুর অভেদ প্রতীতিকে বলা হয় অধ্যাস। রজ্জু ও সর্প ভিন্ন বস্তু, কিন্তু তাহাদের অভেদপ্রতীতির (রজ্জুতে রজ্জু-সৃষ্টির স্থলে সর্পদর্শনের) নাম 'অধ্যাস'। এইরূপ অধ্যাসের কারণ রজ্জু-প্রত্যক্ষের 'অভাব' বা 'অবিদ্যা'। রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া জানিতে পারিলে কেহ আর উহাকে সর্প বলিয়া ভ্রম করে না; কিন্তু এইপ্রকার অবিদ্যার দুইটি কার্য বা শক্তি আছে। একটির নাম 'আবরণ শক্তি' (যেমন সর্পভ্রম রজ্জুর প্রকৃত স্বরূপটিকে আবৃত করে); দ্বিতীয়টিকে বলা হয় 'বিক্ষেপশক্তি' (অর্থাৎ ইহার পরে অবিদ্যা আবৃত রজ্জুর স্থলে মিথ্যা সর্পের সৃষ্টি করে)। এজন্য 'আবরণ ও বিক্ষেপশক্তিবিশিষ্ট অজ্ঞানই আধারাশ্রয়ী ভ্রম অথবা অধ্যাসের কারণ'।

রজ্জু হইতে যেভাবে মিথ্যা সর্পের সৃষ্টি হয়, ব্রহ্ম হইতে ঠিক একই প্রকারে সংসারের উদ্ভব হয়। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা। অজ্ঞান বা অবিদ্যার জন্যই জীব সত্য ব্রহ্মে মিথ্যা জগতের আরোপ করে। ফলে ব্রহ্মকে জগৎ বলিয়া তাহারা ভুল করে। জীবের অজ্ঞান অথবা অবিদ্যাই জগতের সৃষ্টির কারণ। আবার ব্রহ্মের অঘটন-ঘটনপটীয়সী ভ্রমসংঘটনকারী শক্তি মায়াই এই জগতের কারণ।[১] নিপুণ ঐন্দ্রজালিক বা মায়াবী যেমন এক বস্তুর স্থলে অপর বস্তু সৃষ্টি করিয়া দর্শককে বিমোহিত করে, সেরূপ মহামায়াবী, মহেন্দ্রজালিক ব্রহ্ম মায়াশক্তির মাধ্যমে মিথ্যা জগতের সৃষ্টি করিয়া জীবজগৎকে বিভ্রান্ত করেন। জগৎ তাঁহার লীলা বা ক্রীড়া মাত্র। কিন্তু এই লীলা জীবগণের কর্মকে অনুসরণ করে। কর্মের ফলভোগের জন্যই জীবকে বারবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়—উপভোগ ব্যতীত কর্মফল ক্ষয়লাভ করে না, আবার কর্মফলের ক্ষয় না হইলে মুক্তিও আসে না; অতএব জীবের মুক্তির জন্য সংসারসৃষ্টি আবশ্যক হয়।

জীবের অজ্ঞান বা অবিদ্যাই জগৎ সৃষ্টির কারণ

জীবের মুক্তির জন্য সংসারের সৃষ্টির প্রয়োজন হয়

[১] মায়াবাদ (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা)—শ্রীপ্রমথনাথ শর্মা

উপরের আলোচনা হইতে প্রতীত হয় যে শংকরের মতে জগৎ মিথ্যা, মরীচিকা, মায়ামাত্র। শংকরের মতবাদ এজন্য 'মায়াবাদ', 'বিবর্তবাদ' এবং 'অধ্যাসবাদ' নামে বিখ্যাত।

জগৎকে শংকর বলিয়াছেন মিথ্যা। এই মিথ্যার অর্থ কিন্তু অলীক নহে। যাহাকে প্রথমে সত্যরূপে দেখা যায়, কিন্তু পরে যাহা অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় তাহাই মিথ্যা। যেমন পূর্বোক্ত রজ্জুতে সর্পের ভ্রম। অথবা স্বপ্নপ্রত্যক্ষ।

জগন্মিথ্যাত্ব

ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পূর্ব পর্যন্ত জগৎ প্রত্যক্ষদৃষ্ট হয়, ব্রহ্মজ্ঞানের পশ্চাতে উহা ব্রহ্মেতেই বিলীন হইয়া যায়। সুতরাং মিথ্যাই। কিন্তু জগতের মিথ্যাত্ব স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর প্রত্যক্ষ এবং রজ্জুতে সর্পভ্রমের অপেক্ষা উন্নত পর্যায়ের। সত্তা তিন স্তরের—পারমার্থিক, ব্যবহারিক এবং প্রাতিভাসিক। এই মতের নাম 'সত্তা-ত্রৈবিধ্যবাদ'। পারমার্থিক সত্তা (যেমন ব্রহ্ম) ত্রিকালাবাধিত। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পূর্ব পযন্ত যাহার অস্তিত্ব থাকে অথচ ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হইবা মাত্র যাহা অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহাই ব্যবহারিক সত্তা যেমন জগৎ। আর যাহা কিছুক্ষণের জন্য প্রত্যক্ষগোচর হইয়া ক্ষণান্তরে সংসারাবস্থাতেই অপর ব্যবহারিক প্রত্যক্ষদ্বারা অপ্রমাণিত হয়, তাহাই প্রাতিভাসিক সত্তা,—যেমন স্বপ্নপ্রত্যক্ষ বা রজ্জুতে সর্পভ্রম।

প্রাতিভাসিক সত্তা ব্যবহারিক সত্তাপেক্ষা অল্পকালস্থায়ী, কিন্তু পারমার্থিক সত্তার উপলব্ধির পূর্বে ব্যবহারিক সত্তার বিনাশ নাই বলিয়া ব্যবহারিক সত্তা অতি দীর্ঘকাল স্থায়ী, জন্মজন্মান্তর ব্যাপী (যেমন জগতের মিথ্যাত্ব)। জগৎকে বলা হইয়াছে 'সদসদ্বিলক্ষণ অনির্বচনীয়' কেননা জগৎ সৎ নহে, অসৎও নহে, সদসৎও নহে। জগৎ অনির্বচনীয়—এজন্য শংকরের মতকে অনেক সময় 'অনির্বচনীয়বাদ'ও বলা হয়।

ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জগৎ সত্য (ব্রহ্মজ্ঞান-উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত)। জগৎও সৃষ্ট বস্তু, অতএব ইহার একজন স্রষ্টাকেও ব্যবহারিক দৃষ্টিতে স্বীকার করিতে হইবে। কেননা সৃষ্টি থাকিলে স্রষ্টা থাকিবেই। শংকর জগতের স্রষ্টা, পালক এবং ধ্বংসকর্তা হিসাবে স্বীকৃত ব্রহ্মকে 'ঈশ্বর' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

পারমার্থিক দৃষ্টিতে অবশ্য ব্রহ্ম মায়াবী, স্রষ্টা নহেন, শুদ্ধ, নিষ্ক্রিয়; কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ইনি 'ঈশ্বর' অর্থাৎ মায়াশক্তির সাহায্যে ইনি বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করেন। ঐন্দ্রজালিকের দৃষ্টান্তই এইরূপ ক্ষেত্রে সুখবোধ্য। ব্রহ্ম মায়াশক্তির সাহায্যে মিথ্যা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। যাঁহাদের নিকট জগৎ সত্যবস্তুরূপে প্রতিভাত হয় তাঁহাদের নিকট ব্রহ্মও মায়াবী এবং জগৎ-স্রষ্টা —ইহাকেই বলা হয় ব্যবহারিক সৃষ্টিভঙ্গী। ব্যবহারিক স্তরে মায়োপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মই ঈশ্বর। এই স্তরে ঈশ্বর 'জগতের কর্তা' প্রভৃতি অনন্তগুণে বিভূষিত। সেজন্য ঈশ্বরকে প্রায়ই 'সগুণব্রহ্ম' আখ্যায় অভিহিত করা হইয়া থাকে। জীব ও জগতের স্রষ্টা হিসাবে তিনি সবিশেষ। কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে সৃষ্ট জগতের ন্যায় স্রষ্টা ঈশ্বরও মিথ্যা মায়ামাত্র—কারণ ব্রহ্ম নির্গুণ, নিরঞ্জন, নির্বিশেষ ইত্যাদি। জগৎ-কর্তৃত্ব ব্রহ্মের তটস্থ-লক্ষণ মাত্র। ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ কিন্তু 'সচ্চিদানন্দ'।

ঈশ্বর (ব্যবহারিক স্তরের মায়োপাধি-বিশিষ্ট ব্রহ্ম)

জীব ও ব্রহ্ম পারমার্থিক দৃষ্টিতে অভিন্ন, কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ভিন্ন। শেষোক্ত দৃষ্টিতে জীব জ্ঞাতা, কর্তা, ভোক্তা, পরিচ্ছিন্ন এবং অসংখ্য। সাংসারিক জীবের জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, অণুত্ব এবং অসংখ্যত্ব উপাধিসঞ্জাত, স্বাভাবিক নহে। স্বীয় কর্মের জন্য জীব স্থূলদেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, অন্তঃকরণ (মন), বুদ্ধি ও সূক্ষ্মদেহ এই ষড়্‌বিধ উপাধির সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া সংসারে দেহলাভ করে। এই উপাধির প্রত্যেকটিই জড়প্রকৃতির কার্যরূপে জড়স্বভাবাপন্ন। জীব কিন্তু অজড় (চৈতন্যাত্মক) আত্মা এবং জড় দেহমনের সমাহার মাত্র। অজ্ঞান বা অবিদ্যার জন্য জড় দেহ-মনের ধর্ম প্রভৃতি গুণভাক্ হয়। কিন্তু আত্মা জ্ঞান ইত্যাদিরূপে প্রতিভাত হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। এই মতবাদের নাম 'প্রতিবিম্ববাদ'। ভ্রমবশত জীব দেহেন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি হইতে আত্মাকে অভিন্ন মনে করে। ফলে নানারূপ মিথ্যার প্রতীতি হয়। অব্যয় নির্বিকার আত্মায় দেহধর্ম, ইন্দ্রিয় ধর্ম, অন্তঃকরণ ধর্ম ইত্যাদি আরোপিত করিয়া জীব অশেষ ক্লেশভাগী হয়। অনাদি অবিদ্যাজন্য এইরূপ আমিত্ব বা 'অহংবোধই' জীবত্ব।

জীব (অজড় আত্মা এবং জড় দেহমনের সমাহার)

জীবের অবস্থা ৩টি : জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। সুষুপ্তিতে জ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতির অন্তর্ধান ঘটে, সেজন্য অধ্যাসও তিরোহিত হয়। কিন্তু সুষুপ্তি প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞান অবস্থার নামান্তর মাত্রই নহে—এইকালে দেহ-মন-রূপ শৃঙ্খল হইতে মুক্ত আত্মা শুদ্ধজ্ঞান এবং পূর্ণ আনন্দস্বরূপ রূপে বিরাজিত থাকে। এই অবস্থাতেই বদ্ধ জীব প্রথম মুক্তির আস্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হয়।

জীবের তিনটি অবস্থা

জগৎ ব্রহ্মের বিবর্তমাত্র, আর মায়োপহিত ব্রহ্মই জগৎস্রষ্টা। পারমার্থিক দৃষ্টিতে জগৎ মায়া। কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জগৎ ঈশ্বরের কৃতি বা কার্য। ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ।

"সৃষ্টিপ্রক্রিয়া নিম্নলিখিতরূপ (বেদান্ত পরিভাষা, সপ্তম পরিচ্ছেদ)। মায়া-উপাধিবিশিষ্ট অর্থাৎ চিৎ-ও-অচিৎ-শক্তিবিশিষ্ট ঈশ্বর হইতে যথাক্রমে পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূতের অথবা তন্মাত্রের সৃষ্টি হয়—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী। ইহারা ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণবিশিষ্ট। সত্ত্বগুণ-প্রধান পঞ্চ সূক্ষ্মভূত হইতে পৃথক্‌ভাবে যথাক্রমে শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, রসনা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; এবং মিলিতভাবে মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্তের উৎপত্তি হয়। রজোগুণপ্রধান পঞ্চ সূক্ষ্মভূত হইতে পৃথক্‌ভাবে বাক্, পাণি, পাদ প্রভৃতি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়; এবং মিলিতভাবে প্রাণ, অপান, ব্যান, উপাদান ও সমান—এই পঞ্চপ্রাণের সৃষ্টি হয়। তমোগুণপ্রধান পঞ্চসূক্ষ্মভূত পরস্পরের সহিত 'পঞ্চীকরণ' প্রথায় মিলিত হইয়া আকাশ ইত্যাদি পঞ্চ স্থূলভূতের সৃষ্টি করে। যথা, স্থূল আকাশ $= \frac{1}{2}$ সূক্ষ্ম আকাশ $+ \frac{1}{8}$ সূক্ষ্ম বায়ু $+ \frac{1}{8}$ সূক্ষ্ম অগ্নি $+ \frac{1}{8}$ সূক্ষ্ম জল $+ \frac{1}{8}$ সূক্ষ্ম পৃথিবী। ঈদৃশ পঞ্চীকৃত স্থূল আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী হইতে চতুর্দশ ভুবন এবং চতুর্বিধ স্থূল শরীরের (জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ) উদ্ভব হয়। অপঞ্চীকৃত পঞ্চসূক্ষ্ম মহাভূত হইতে সূক্ষ্মশরীর অথবা লিঙ্গশরীর জন্মে। এই সূক্ষ্মশরীর স্থূলশরীর, পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধির সহিত সম্মিলিত হয় এবং আত্মা এই সকল উপাধির সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া জীবরূপে পরিণত হয়; মৃত্যুর

জগৎ

'পঞ্চীকরণ'

পরে স্থূলশরীর ধ্বংস হইবার পরে সূক্ষ্মশরীর স্বর্গে বা নরকে গমনপূর্বক কর্ম-বশে পুনরায় নূতন স্থূলশরীরের সহিত সংযুক্ত হইয়া সংসারে জন্মগ্রহণ করে। কেবল মুক্তির পরেই সূক্ষ্ম শরীরও বিনষ্ট[১] হইয়া যায়, এবং জন্ম পুনর্জন্মের অবসান ঘটে।" জগতের ব্যবহারিক সত্তা একটি থাকিলেও ব্যবহারিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর দিক্ দিয়া শঙ্কর ঈশ্বরের উপাদান কারণত্ব প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন। ব্যবহারিক সত্তার পরিবর্তে ব্রহ্মকারণবাদ স্থাপিত করিবার উদ্দেশ্যে শংকরকে অনেক যুক্তি[২] দেখাইতে হইয়াছে। "সকল আপত্তি খণ্ডন করিয়া শংকর 'ব্রহ্মকারণবাদ' স্থাপন করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে এই সম্বন্ধে আলোচনা, তর্ক ও প্রমাণাদি সকলই ব্যবহারিক দৃষ্টিতে করা হইয়াছে। পারমার্থিক দৃষ্টিতে সৃষ্টিই নাই, অতএব বিতণ্ডার স্থান কোথায়?"

কিন্তু মিথ্যা সৃষ্টি কার্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হইলে, ব্রহ্মকে জগতের অভিন্ন নিমিত্ত ও উপাদান কারণরূপে প্রতিপন্ন করার দুরূহ সাধনায় অদ্বৈত-বাদিগণ কেন লিপ্ত হইয়াছেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে শ্রুতি প্রথমে ব্রহ্মকে জগতের উপাদান কারণ ও আশ্রয়রূপে নির্দেশ করিয়া পরে তাহারই নিষেধ বিধান করিয়া ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন যে 'জগৎ মিথ্যা, মায়া এবং ভ্রম' ব্যতীত আর কিছু নহে'[৩]।

'ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জীব ও জগৎ ব্রহ্ম (ঈশ্বর) হইতে ভিন্নাভিন্ন। ঈশ্বর কারণ, জীবজগৎ কার্য; এবং কারণ ও কার্য ভিন্নাভিন্ন...।[৪] কিন্তু পারমার্থিক

জীবজগৎ ও ব্রহ্ম

দৃষ্টিতে জীবজগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, কেন না শ্রুতিতে বলা হইয়াছে সব কিছুই ব্রহ্ম। যেমন আকাশ বস্তুত এক হইলেও ঘটাকাশ, মঠাকাশ ইত্যাদি ঔপাধিক সত্তাবশত ভিন্নতা লাভ করে,

১ বেদান্তদর্শন (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা)—রমা চৌধুরী, পৃঃ ১২-১৩

২ ব্রহ্মসূত্রের ২য় অধ্যায়ের ২য় পদের উপর শাংকরভাষ্য দ্রঃ

৩ দ্রঃ বেদান্ত পরিভাষা, ৭ম পরিচ্ছেদ

বেদান্তদর্শন—রমা চৌধুরী, পৃঃ ১৮

সেরূপ জীবের অজ্ঞানতাবশত জীব নিজেকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বোধ করে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু জীব এবং ব্রহ্ম অভিন্নই। দেহেন্দ্রিয়রূপ উপাধির বিলয় ঘটিলে চৈত্রমৈত্রাদির বোধ থাকে না। 'অজ্ঞানবশতই আবার জীব রজ্জুতে সর্পবৎ ব্রহ্মে জগৎকে কল্পনা করে; বস্তুত সর্প রজ্জুই এবং জগৎ ব্রহ্মই, আর কিছু নহে। এজন্য ব্রহ্মই একমাত্র সত্য; জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। শংকরের এইরূপ মতকে বলা হয় কেবলাদ্বৈতবাদ'।

মোক্ষ কি? না, এই অনাদি সংসার চক্র হইতে মুক্তিই মোক্ষ অথবা চরম পুরুষার্থ। অধ্যাস হইতেই হয় বন্ধের সৃষ্টি, সে জন্য অধ্যাসের অভাবই 'মোক্ষ'। জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্ম দেহ এবং মনের, কিন্তু আত্মার নহে। অধ্যাসের অভাবই যেহেতু মুক্তি সেজন্য অদ্বৈতবাদীর মতে মুক্তিলাভ জীবৎকালেও ঘটিতে পারে। মুক্তি প্রকৃতপক্ষে দুই প্রকার—জীবন্মুক্তি এবং বিদেহমুক্তি।

মোক্ষ

জীবৎকালে বর্তমান দেহপাতের পূর্বেই যে মুক্তি লাভ হয় তাহাকে বলে জীবন্মুক্তি; আর মৃত্যুর পরে অর্থাৎ পার্থিব এবং স্থূল দেহ ধ্বংসের পরে যে মুক্তি লাভ হয় তাহাকে বলে বিদেহমুক্তি। দেহধারী এবং সংসারী হইয়াও জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণ জগতের মিথ্যাত্ব এবং আত্মা-নাত্মাবিবেক লাভ করেন। এজন্য পার্থিব কিছুই তাঁহাদের বিচলিত করিতে পারে না। 'জীবন্মুক্ত' প্রারব্ধ দেহবিনাশের পরে বিদেহমুক্তি লাভ করেন।

অতএব মোক্ষের অর্থ দাঁড়ায় জীবের জীবত্ব বা আমিত্বের আত্যন্তিক বিনাশ, অর্থাৎ, ব্রহ্মের সহিত একত্বই মোক্ষ। শ্রুতিও বলিয়াছেন, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো[১]। ইহার অর্থ উপাধিবিমুক্ত জীবাত্মা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। মোক্ষ শুধু দুঃখের অভাবমাত্রই নহে, উহা পূর্ণ আনন্দঘন অবস্থা। সাংখ্যমতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই মোক্ষ। কিন্তু বেদান্তমতে, ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ বলিয়া ব্রহ্মস্বরূপ মুক্তজীবও পরিপূর্ণ সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দ।[২]

১ ছান্দোগ্য, ৬-৮

২ বেদান্তদর্শন, পৃঃ ২০

বস্তুত জীব সর্বদাই মুক্ত। জীবাত্মায় দেহ-ধর্মের আরোপ ঘটিলেও আত্মা স্বয়ং দেহ-ধর্মের দ্বারা স্পৃষ্ট হন না। ইনি অবদ্ধ, চিরমুক্ত। কেবল জীবের নিকটই আত্মা দেহধর্মী এবং সুখদুঃখভাগী বলিয়া প্রতিভাত হয়। মুক্তির অর্থ এই নিত্যমুক্ত আত্মারই স্বরূপের উপলব্ধি। জীবাত্মা নিত্যই সচ্চিদানন্দ, পরব্রহ্ম স্বরূপ, কিন্তু বদ্ধাবস্থায় জীবের পক্ষে সে জ্ঞানলাভ সম্ভব হয় না। মুক্তিলাভের পর তাহার এবিষয়ে পুনরুপলব্ধি ঘটে মাত্র।

ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানই মুক্তির একমাত্র সাধন। কিন্তু সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় কি? প্রথমত, শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্মের যথাযথ ও নিষ্কাম অনুষ্ঠান, তদ্দ্বারা চিত্তশুদ্ধিলাভ। ইহার পর সাধন চতুষ্টয়ের প্রয়োজন—(ক) নিত্যানিত্য বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান (খ) ইহলোকের এবং পরলোকের ভোগাদির প্রতি বীতস্পৃহা (গ) শমদম প্রভৃতি সাধন সম্পৎ লাভ (ঘ) মুক্তির জন্য আন্তরিক বাসনা।

সাধন

এইরূপ চারিটি সাধনের যথাযথ অনুষ্ঠানের পরই সাধক ব্রহ্মজ্ঞানলাভে অধিকারী হন। ইহার পর সাধক গুরুর নিকট হইতে তত্ত্বমসি এবং সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ইত্যাকার শাস্ত্র-নির্দিষ্ট ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ করিবেন। শ্রবণের পর মনন এবং তৎপর নিদিধ্যাসন। নিদিধ্যাসনের ফলে 'আমিই ব্রহ্ম' বা 'সোঽহম্' এই জাতীয় উপলব্ধি ঘটে, আর এই উপলব্ধিই মুক্তি। সেজন্য ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন। অধীত ও গৃহীত জ্ঞানের বারবার আলোচনা ও ধ্যান দ্বারা সাক্ষাৎ উপলব্ধিরও প্রয়োজন। সর্বশেষে অবিরাম ব্রহ্ম ও জীবের অভেদতত্ত্বের ধ্যানও প্রয়োজনীয়।

বস্তুবিষয়ক অযথার্থ জ্ঞানের নাম 'ভ্রম', যথার্থ জ্ঞানের নাম 'প্রমা'। নির্ভুল যথার্থ জ্ঞানলাভের উপায়কেই বলে 'প্রমাণ'। পারমার্থিক দৃষ্টিতে সাংসারিক

৬টি প্রমাণ

সকল জ্ঞানই ভ্রম অথবা মিথ্যা। কিন্তু ব্যবহারিক স্তরে সত্য এবং মিথ্যা জ্ঞানের পার্থক্য স্বীকার করিতেই হয়। ব্যবহারিক জীবনে অদ্বৈতবাদে ৬টি প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, আগম, অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধি।

ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে অপরোক্ষজ্ঞান লাভ হয় তাহাকে বলে 'প্রত্যক্ষ'। প্রত্যক্ষজ্ঞান অন্তঃকরণের বৃত্তিমূলক জ্ঞান। 'অনুমান' পরোক্ষ জ্ঞান। একটি প্রত্যক্ষ বস্তু হইতে অপর একটি অপ্রত্যক্ষ বস্তুর ব্যাপ্তিমূলক জ্ঞানের নাম 'অনুমান'। যেমন, প্রত্যক্ষ ধূমজ্ঞান হইতে অপ্রত্যক্ষ অগ্নিজ্ঞানের কারণ অনুমান। ইহা ব্যাপ্তিমূলক। 'উপমান' সাদৃশ্যমূলক জ্ঞান। ইহা প্রত্যক্ষ-মূলক নহে। 'আগম' শব্দমূলক জ্ঞান, সেজন্য ইহাকে 'শব্দ'ও বলা হইয়া থাকে। ইহা বৈদিক প্রমাণ অথবা লৌকিক প্রমাণভেদে দ্বিবিধ। উপপাদ্য জ্ঞানের দ্বারা উপপাদক কল্পনাই 'অর্থাপত্তি'। অভাব-বিষয়ক জ্ঞানের কারণই 'অনুপলব্ধি'। ইহাও প্রত্যক্ষমূলক নহে।

জীব

অদ্বৈতবাদীর মতে পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, স্বয়ং সচ্চিদানন্দস্বরূপ, বিভু, এক এবং অদ্বিতীয়। কিন্তু ব্যবহারিকস্তরে জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, এবং এইরূপে অসংখ্য ও বহুরূপী, জীবের জ্ঞাতৃত্বাদি উপাধিসম্ভূত মাত্র; স্বাভাবিক নহে। অনাদি অবিদ্যাপ্রসূত অহং-বোধই 'জীবত্ব'।

জীবের তিন অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি[১]।

'রামানুজের বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ'

রামানুজের মতের নাম 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ'[২]। এই মতে ব্রহ্ম সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব, কিন্তু একমাত্র তত্ত্ব নহেন, কারণ জীব এবং জগৎ ব্রহ্মেরই ন্যায় সত্য। রামানুজ প্রমুখ বৈষ্ণব বৈদান্তিক সত্যতার পরিমাণ ভেদ স্বীকার করেন না। জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে অল্প সত্য নহে, সমান সত্য। কেননা জীব ও জগৎ ব্রহ্মের অংশ, এবং অংশ ও অংশী সমানভাবে সত্য। তবে ব্রহ্মকে সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব বলা হয় কেন?

১ অদ্বৈতবাদের সংক্ষিপ্ত অথচ মনোজ্ঞ আলোচনা মিলিবে—'ভারত সন্ধানে' (নেহেরু: সিগ্‌নেট প্রেস প্রকাশিত), ২০৩-২০৪ পৃষ্ঠায়।

২ দ্রঃ ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা, পৃঃ ২০-২৩; ও History of Indian Philosophy: Vol, III; History of Philosophy—Eastern and Western, Vol I. pp. 305-321.

কারণ অপর দুইটি তত্ত্ব ব্রহ্মের ন্যায় সম্পূর্ণ সমানসত্য হইলেও তাহারা ব্রহ্মাশ্রিত, পরাধীন এবং ব্রহ্মের অন্তর্গত, কিন্তু ব্রহ্মই 'একমাত্র' স্বাধীন সত্তা। অদ্বৈতবাদীর মতেও সত্তার পরিমাণভেদ নাই। কিন্তু তাঁহার সহিত রামানুজ, নিম্বার্ক প্রভৃতির মতের পার্থক্য এই যে, অদ্বৈতবাদী সত্তার পরিমাণ ও প্রকারভেদ কোনটাই গ্রহণ করেন না, 'কারণ' ঐ মতে ব্রহ্মই একমাত্র সৎ, তদ্ভিন্ন অন্য কিছু সৎ নহে। কিন্তু রামানুজাদির মতে সত্তার পরিমাণ ভেদ না থাকিলেও প্রকারভেদ আছে। 'সত্তার' দিক্ হইতে জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। সেজন্য সত্তা প্রকারভেদে ৩টি—ব্রহ্মসত্তা, জীবসত্তা এবং জগৎসত্তা।

ব্রহ্ম

রামানুজমতে ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়। ব্রহ্ম একমাত্র তত্ত্ব না হইলেও তাহার একত্ব এবং অদ্বিতীয়ত্বের হানি ঘটে না। জীব ও জগৎ ব্রহ্মের অন্তর্গত এবং আশ্রিতরূপেই সত্য। ব্রহ্ম নির্বিশেষ নহেন, সবিশেষ। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব কোনো প্রমাণের দ্বারাই স্থাপিত করা যায় না। প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আগম সবিশেষ বস্তুরই অস্তিত্ব প্রমাণ করে। নির্বিশেষ বস্তুর নহে।

প্রত্যক্ষ সর্বদাই সবিশেষ বস্তুবিষয়ক জ্ঞান ; অনুমানও তদ্রূপ। শব্দ, পদ, বাক্য প্রভৃতিও সবিশেষ বস্তুরই নির্দেশক, সেজন্য আগমও নির্বিশেষ বস্তু প্রতিপাদনে অসমর্থ। অতএব ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব অপ্রামাণিক, একথা এ সম্প্রদায় অসম্ভব বলিয়াই মনে করেন।

ব্রহ্ম সগুণ, নির্গুণ নহেন। তিনি অনন্ত, অসংখ্য গুণের আধার। তিনি সকল কল্যাণ গুণের আকর ও সকল হেয় গুণ বর্জিত। 'ব্রহ্ম' শব্দের ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ ধরিলে দেখা যায়, যিনি স্বরূপত এবং গুণত বৃহত্তম তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্মের অসংখ্য গুণের মধ্যে সৎ, চিৎ এবং আনন্দই মুখ্য। সেজন্য অল্পকথায় তাঁহাকে বলা হয় 'সচ্চিদানন্দ'। ব্রহ্ম শুধুই সৎ নহেন, সত্তাবান্‌ও ; শুধুই জ্ঞান নহেন, জ্ঞানবান্‌ও ; শুধুই আনন্দ নহেন, আনন্দবান্‌ও। তাঁহার গুণ-গুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—ভীষণ ও মধুর। তিনি জগতের

উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ। তিনি স্বয়ং জগতের অভিন্ন নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। তাঁহার অসংখ্য গুণ সমূহের মধ্যে চিৎ এবং অচিৎ অন্যতম।

ব্রহ্ম নির্বিকার, কিন্তু সক্রিয়। জীবের দিক্ হইতে তাঁহার দুইটি প্রধান কার্য—সৃষ্টি ও মুক্তি। জীবের প্রয়োজনের জন্যই তিনি কর্মে প্রবৃত্ত হন, নিজের জন্য নহে, কেন না তিনি স্বয়ং 'আপ্তকাম' এবং নিত্যতৃপ্ত। তিনি জগল্লীন হইলেও জগদতিরিক্ত। তিনি 'পুরুষোত্তম'। জগতে যে সকল সর্বশ্রেষ্ঠগুণ পুরুষে দৃষ্ট হয়, তাহারই পরিপূর্ণ, বাধাহীন বিকাশ একমাত্র ব্রহ্মেই; ইহা ভিন্ন 'তিনি' বহু অচিন্ত্য গুণ ও শক্তির আধার বলিয়া 'পুরুষোত্তম'।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মতে ঈশ্বর ও ব্রহ্মে কোনো প্রভেদ নাই। প্রকৃতপক্ষে শংকরের ব্যবহারিক স্তরের ঈশ্বর এবং রামানুজের ব্রহ্ম একই গুণে বিভূষিত। এই মতে 'বিষ্ণু'ই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

চিৎ

জীবাত্মাও ব্রহ্মের ন্যায় জ্ঞানস্বরূপ এবং অজড়। আত্মা যেরূপ দেহেন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন, সেরূপ মন, প্রাণ এবং বুদ্ধি হইতেও পৃথক্ স্বভাববিশিষ্ট। এই সকল জড় বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া আত্মা জীবরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। ইহারা আত্মার উপকরণ মাত্র এবং আত্মারই দ্বারা পরিচালিত। ইহাদের সাহায্যেই আত্মা স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করে। জীব জ্ঞানস্বরূপ হইলেও জ্ঞাতা, অর্থাৎ জ্ঞান জীবের স্বরূপ এবং ধর্ম। জীব কর্তা, নিষ্ক্রিয় নহে। শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধসমূহ জীবের কর্তৃত্ব আশ্রয় করিয়াই সিদ্ধ হয়। জীব যদি অকর্তা, বা কর্মশক্তিহীন হইবে, তবে শাস্ত্র কেন বিধিনিষেধের প্রবর্তন করিয়াছেন? আবার এই কর্তা জীব ভোক্তাও বটে। এইরূপে জ্ঞাতৃত্ব-কর্তৃত্বাদি জীবের সকল অবস্থাতেই থাকে। মুক্ত জীবও কিন্তু জ্ঞাতা, কর্তা এবং ভোক্তা। জন্মাদি শরীরেরই ধর্ম, আত্মার নহে। আত্মা অনাদি, অজড় এবং অমর—দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মনের সহিত সংযুক্ত হইয়া এই আত্মা সংসারী জীবরূপে জন্মগ্রহণ করে এবং কালবশে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

জীবের স্বরূপ

অজ্ঞ ব্যক্তি এই আপাতদৃশ্যমান আত্মাকে জন্মমরণশীল বলিয়া মনে করে; কিন্তু ইহা ভ্রমাত্মক। বস্তুত জীব ব্রহ্মের চিৎশক্তি; ইহা ব্রহ্মেরই তুল্য অনাদি এবং অনন্ত। কিন্তু

জীব-জগৎ নিত্য এবং আদি-অন্ত-রহিত হইলে এই প্রকার সৃষ্টি ও বিলয় কিরূপে সম্ভব? তাহার উত্তরে রামানুজ 'সৎকার্যবাদে'র আলোচনা আনিয়াছেন। সৎকার্যবাদের মতে সৃষ্ট কার্যটি সৃষ্টির পূর্বেও কারণে প্রচ্ছন্ন শক্তিরূপে বর্তমান থাকে—জীব এবং জগৎও সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মের চিৎ এবং অচিৎ গুণরূপে ব্রহ্মেই প্রচ্ছন্ন থাকে; সৃষ্টি কালে প্রপঞ্চিত হইয়া জীব এবং জগতে পরিণত হয়। প্রলয়ে আবার ইহারা ব্রহ্মের গুণরূপেই অবস্থান করে। অতএব জীবজগৎ ব্রহ্মের কার্য হইলেও নিত্য।

জীবের গুণ

জীব রামানুজ মতে অণুপরিমাণ। কিন্তু অণুমাত্র হইলেও ইহার জ্ঞানরূপ ধর্ম বিভু এবং স্বকীয় সর্বশরীরব্যাপী। ইহার সাহায্যেই আত্মা স্বকীয় সর্বশরীরগত সুখ দুঃখ অনুভব করিতে সমর্থ হয়। জীব সংখ্যায় বহু; ইহা কেবল অসংখ্য নহে, অনন্ত। সংসার অনাদি ও অনন্ত বলিয়া জীবও অনাদি ও অনন্ত। বদ্ধ ও মুক্ত ভেদে জীব দুই প্রকার। মুক্ত জীবও বদ্ধমুক্ত এবং নিত্যমুক্ত ভেদে দুই শ্রেণীর।

জীবের পরিমাণ, সংখ্যা এবং প্রকার

সংক্ষেপে রামানুজ মতে, স্বভাবতঃ জীব নিত্য[১] অনাদি ও অনন্ত; ব্রহ্ম পরিণাম, জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা, কর্তা এবং ভোক্তা; পরিমাণে অণু; সংখ্যায় অসংখ্য এবং অনন্ত; প্রকারভেদে বদ্ধ ও মুক্ত।

বদ্ধজীবের ৫টি অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মূর্ছা এবং মরণ। স্বর্গ, নরক এবং অপবর্গ উহার তিনটি 'অদৃষ্ট' বা মরণোত্তর কর্মফল। কর্মী এবং জ্ঞানী ভেদে বদ্ধজীব দ্বিবিধ। পুণ্যাত্মা এবং পাপী ভেদে আবার কর্মী দুই প্রকার।

বদ্ধ জীবের ৫টি অবস্থা, ৩টি অদৃষ্ট

প্রকৃতি, কাল এবং শুদ্ধতত্ত্ব ভেদে 'অচিৎ' তিন শ্রেণীর। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল কারণ 'প্রকৃতি'। ইহাকে অক্ষর, অবিদ্যা, মায়া, তম প্রভৃতি আখ্যায়ও অভিহিত করা হইয়া থাকে। 'প্রকৃতি' ত্রিগুণাত্মিকা। কাল নিরবয়ব ও নিত্য। 'শুদ্ধতত্ত্ব' ত্রিগুণাত্মক নহে, কেবল সত্ত্বগুণাত্মক। 'শুদ্ধতত্ত্ব' ব্রহ্মের ও মুক্তাত্মদেহগণের দিব্যদেহ এবং ব্রহ্মলোকের উপাদান কারণ।

অচিৎ

---

১ বেদান্তদর্শন পৃঃ ২৯-৩০

ব্রহ্মের সহিত জীবজগতের সম্বন্ধ কি প্রকার? অর্থাৎ চিৎ জীব এবং অচিৎ জগতের সহিত ব্রহ্মের কি সম্পর্ক? প্রথমত, চিৎ ও অচিতের পরস্পর সম্বন্ধ ভোক্তৃভোগ্য সম্বন্ধ। দ্বিতীয়ত, জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। জীব অণুমাত্র, ব্রহ্ম বিভু; জগৎ জড়, ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ। কিন্তু ভিন্ন হইয়াও তাহারা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। ব্রহ্ম অংশী, জীবজগৎ অংশ; জীবজগৎ বিশেষণ, ব্রহ্ম বিশেষ্য। ব্রহ্ম আত্মা, জীবজগৎ দেহ।

ব্রহ্ম ও জীবজগৎ

'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রামানুজ শংকরভাষ্যের বর্ণনা দোষ-দুষ্ট বলিয়াছেন। তাঁহার মতে 'ব্রহ্মই জীব' একথা বলা স্ববিরুদ্ধ। সেস্থলে বলা উচিত 'ব্রহ্মই ব্রহ্ম' অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই উপাধিরহিত জীব অথবা ব্রহ্ম। সুতরাং এস্থলেই কেবল আমরা বলিতে পারি—তিনই তুমি অথবা পরব্রহ্মই পরব্রহ্ম। কিন্তু এরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে পুনরুক্তি দোষ ঘটিতে পারে। সেজন্য দুই বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট বস্তুর স্বরূপত অভিন্নতাই এই বাক্যের একমাত্র অর্থ। এইরূপে তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়—পরমাত্মাই জীবাত্মা। সংক্ষেপে (ক) জীবজগৎ ব্রহ্ম হইতে ধর্মত ভিন্ন (খ) ব্রহ্ম আধার বা আশ্রয়, আর জীবজগৎ আধেয় বা আশ্রিত (গ) জীবজগৎ ব্রহ্ম হইতে স্বরূপত অভিন্ন। এজন্যই ব্রহ্ম এবং জীবজগৎ অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ বা অপৃথক্‌সিদ্ধ।[১] ভেদের দিক্ হইতে ব্রহ্ম, চিৎ ও অচিৎ এই তিনটি তত্ত্ব হইলেও অভেদের দিক্ হইতে তত্ত্ব মাত্র একটিই—চিদচিদ্-বিশিষ্ট ব্রহ্ম। এজন্য রামানুজের মতবাদকে বলা হয় 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ'। ইহার অর্থ, বিশিষ্ট বস্তুর অভিন্নত্ব অথবা নানাত্ব বা জীবজগৎবিশিষ্ট অদ্বৈত এক ব্রহ্মই চরম সত্য।

এই মতে জীবজগৎ ব্রহ্মেরই ন্যায় সত্য, দেহও আত্মারই ন্যায় সত্য। ইহা সত্ত্বেও আশ্রয়-আশ্রিত, শাসক-শাসিতের প্রভেদ জ্ঞাপন করার জন্যই ব্রহ্মকে সর্বোচ্চ তত্ত্বরূপে অভিহিত করা হয়। জগৎ সত্য, জীব সত্যতর, ব্রহ্ম সত্যতম এইরূপ ক্রমোচ্চ স্তরভেদ অসংগত হইলেও জগৎ জড়ভোগ্যরূপে নিম্নতম, জীব চেতনভোক্তৃরূপে উচ্চতর এবং ব্রহ্ম সর্বনিয়ন্তা প্রভুরূপে উচ্চতম আর এই স্তরভেদ সম্পূর্ণ সংগত।

১ বেদান্তদর্শন—রমা চৌধুরী, পৃঃ ৩৫

রামানুজ বলিয়াছেন, মোক্ষ জীবের জীবত্বের বিনাশ নহে, ইহা জীবের ক্ষুদ্র 'আমিত্বের' বিনাশ, কিন্তু প্রকৃত 'জীবত্বের' বিকাশ। জীবত্বের বিকাশের অর্থ জীবের স্বরূপ ও গুণের চরমোৎকর্ষ। জীব জ্ঞানস্বরূপ, কিন্তু বদ্ধাবস্থায় তাহার জ্ঞান সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। "মুক্ত জীব পুনরায় তাহার পরিপূর্ণ বিজ্ঞানঘন স্বরূপটি ফিরিয়া পায়। এই-রূপে জীবের স্বাভাবিক ধর্মেরও পরিপূর্ণ বিকাশ ও পরিণতি সম্ভবপর। 'বদ্ধ জীবও জ্ঞাতা, কিন্তু অল্পজ্ঞ; কর্তা, কিন্তু ক্ষুদ্রশক্তি; ভোক্তা কিন্তু দুঃখী। মুক্ত জীবই কেবল জ্ঞাতা ও সর্বজ্ঞ, কর্তা ও সর্বশক্তিমান্, ভোক্তা ও পরিপূর্ণ আনন্দময়।' এইরূপে আত্মস্বরূপ লাভ করিয়া জীব ব্রহ্মস্বরূপ (ব্রহ্মসাদৃশ্য) লাভ করে। অন্যবিষয়ে ব্রহ্মের ন্যায় সচ্চিদানন্দস্বরূপ হইলেও বিভুত্ব এবং জগৎস্রষ্টৃত্বের ক্ষমতা তাহার জন্মে না। এজন্য মুক্তজীবও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, ব্রহ্মাশ্রিত এবং ব্রহ্মশাসিত। সকল জ্ঞানশক্তি এবং আনন্দের আকর হইলেও সে ব্রহ্মেরই সেবক ও ভক্ত।"

মোক্ষ

মুক্তি দুই প্রকার, পূর্বেই বলিয়াছি। শংকরের মতে জীবন্মুক্তি সম্ভবপর; রামানুজ মতে অসম্ভব। ইহার দুইটি কারণ তিনি দিয়াছেন। দেহপাতের পরই জীব মুক্তি লাভ করে—তাহার সূক্ষ্ম দেহও বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সে আর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে না। প্রারব্ধ কর্মের ফলস্বরূপ এই দেহকে বলা হয় "চরম দেহ"। চরমদেহী জীবও বদ্ধজীব। এজন্য বিদেহ মুক্তিই একমাত্র মুক্তি।

বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু ভেদে বদ্ধজীব দুই শ্রেণীর। বুভুক্ষুগণ সকল কর্মে রত হন, মুমুক্ষু সাধনমার্গ অবলম্বন করিয়া মুক্তিলাভে সচেষ্ট হন। সকাম ও নিষ্কাম ভেদে কর্ম দ্বিবিধ। 'সকাম কর্মকে' কখন 'কাম্য কর্মও' বলা হয়। সকাম কর্মের ফল কর্মকারীকে ভোগ করিতেই হয়, এজন্য ইহা জন্মজন্মান্তরের মূলী-ভূত কারণ। কর্ম ও জন্মজন্মান্তরের শেষ নাই, তাই ইহাকে অনাদি সংসারচক্র বলা হয়। কিন্তু নিষ্কাম কর্মের ফলভোগ করিতে হয় না, আর তাহা জন্মজন্মান্তরেরও কারণ নহে। মুমুক্ষু সকাম কর্মকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিলেও কর্মহীন অলস জীবনও তিনি যাপন করেন না, কিন্তু নিষ্কাম কর্মে তিনি সম্পূর্ণ কামনাহীনভাবে প্রবৃত্ত হন।

সাধনপ্রকার

তিনি শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্মে রত হইয়া 'বিবেকাদি সপ্তসাধন' পালন করেন। এরূপ নিষ্কাম কর্ম চিত্তের নির্মলতা সম্পাদন করে, ফলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা মনে উদিত হয় এবং ব্রহ্মজ্ঞানের সহায়ক হয়। এজন্য মুক্তির প্রথম সোপান এই নিষ্কাম কর্ম। ইহার পর মুমুক্ষু তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া সদ্‌গুরুর নিকট হইতে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। কিন্তু কেবল জ্ঞানে মুক্তি আসে না, মুক্তির জন্য ভক্তিরও নিতান্ত আবশ্যক। "রামানুজের মতে ভক্তির অর্থ ধ্যান বা উপাসনা। কিন্তু কেবল ধ্যানেও মুক্তি হয় না, ইহার জন্য চাই ব্রহ্মপ্রসাদ। ব্রহ্মপ্রসাদ লাভ করিলে ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার ঘটে, আর এই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারই মুক্তি।[১] অতএব নিষ্কাম কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি (বা ধ্যান), ব্রহ্ম (ভগবৎ) প্রসাদ, সাক্ষাৎকার, মুক্তি—এগুলিই সাধনের প্রণালী।"

"প্রপত্তিও একটি স্বতন্ত্র সাধনপ্রণালী। ব্রহ্মে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের নাম 'প্রপত্তি'। ভগবানে পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল সাধক নিজের যথাসর্বস্ব ঈশ্বরচরণেই নিবেদন করেন।" প্রপত্তির ছয়টি অঙ্গ। ঈশ্বরে আত্মসমর্পিত ভক্তের যে অন্য কোনো কর্তব্য নাই ইহা মনে হওয়া ভ্রমাত্মক, কারণ তাঁহাকেও ঈশ্বরের অভিপ্রেত কর্মের সাধন এবং তাঁহার অনভিপ্রেত কর্মের বর্জন করিতে হয়। ভক্তি বা উপাসনা ব্রহ্মজ্ঞানের সহায়ক বলিয়া ইহাতে শ্রেণীবিশেষের অধিকার থাকিলেও প্রপত্তিতে অধিকার জাতিধর্মবর্ণনিবিশেষে সকলেরই আছে।

মায়াবাদ খণ্ডিত

রামানুজ শংকরের মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার 'মায়াবাদখণ্ডন' অতি প্রসিদ্ধ। মায়াবাদের বিরুদ্ধে সাতটি আপত্তি দেখান হইয়াছে, উহাকে 'সপ্তানুপপত্তি' বা 'সাতটি অসংলগ্নতা' বলা হইয়াছে। ঐগুলি যথাক্রমে—'আশ্রয়ানুপপত্তি', 'তিরোধানানুপপত্তি', 'অনির্বচনীয়ানুপপত্তি', 'প্রমাণানুপপত্তি', 'স্বরূপানুপপত্তি', 'নিবর্তকানুপপত্তি', 'নিবৃত্ত্যনুপপত্তি'।[২]

---

১ নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূংস্বাম্। কঠ, উপ.

২ দ্রঃ মাধবীয় সর্বদর্শনসংগ্রহ (বংগানুবাদ)—পৃঃ ৯৬-৯৯, রামানুজের এই সপ্তানুপপত্তিকে আবার উপযুক্ত যুক্তিদ্বারা হেত্বাভাস বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন ডাঃ আশুতোষ শাস্ত্রী তাঁহার বেদান্তদর্শনের তৃতীয় খণ্ডে।

নিম্বার্কের মতবাদ[১] অনেক দিক্ দিয়া রামানুজের মতবাদের অনুরূপ।

নিম্বার্কের ভেদাভেদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ

ব্রহ্ম

চিদচিৎ

নিম্বার্কও ব্রহ্ম চিৎ এবং অচিৎ এই তত্ত্বত্রয়বাদি। প্রভেদ এই মাত্র যে, ব্রহ্মকে রামানুজ বলিয়াছেন বিষ্ণু, আর নিম্বার্ক বলিয়াছেন কৃষ্ণ। "নিম্বার্কের মতেও ব্রহ্মের স্বগতভেদ জীবজগৎ ব্রহ্ম নির্বিশেষ নহেন, সবিশেষ, নির্গুণ নহেন, সগুণ, তিনি ভীষণ ও মধুরগুণের আকর; তিনি নিষ্ক্রিয় নহেন, জগতের স্রষ্টা, পালক এবং ধ্বংসকর্তা। তিনি জগতের অভিন্ন নিমিত্ত এবং উপাদানকারণ, জীবজগৎ তাঁহার পরিণাম।" এ সকল বিষয়ে রামানুজ-মতের সহিত তাঁহার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। 'চিৎ এবং অচিৎ সম্বন্ধীয় আলোচনাতেও রামানুজ এবং নিম্বার্ক একমত।'

ব্রহ্মের সহিত জীবজগতের সম্বন্ধ লইয়াই রামানুজের সহিত নিম্বার্কের মতের প্রধান পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। 'নিম্বার্ক-মতে ব্রহ্ম এবং জীবজগৎ স্বরূপত

ব্রহ্ম ও জীবজগৎ

এবং ধর্মত ভিন্নাভিন্ন। ব্রহ্ম কারণ, জীবজগৎ কার্য, ব্রহ্ম শক্তিমান্, জীবজগৎ শক্তি পরস্পর ভিন্নাভিন্ন। কার্য এবং কারণ যেমন পরস্পর ধর্মত এবং স্বরূপত ভিন্নাভিন্ন সেরূপ ব্রহ্ম এবং জীবজগৎও স্বরূপত এবং ধর্মত ভিন্নাভিন্ন। ব্রহ্মকার্যরূপে জীব এবং জগৎ[২] ব্রহ্মস্বরূপ, ব্রহ্মাত্মক। তথাপি ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব, জীবের জীবত্ব এবং জগতের জগত্ত্ব পরস্পর ভিন্ন। ব্রহ্ম ব্রহ্মই, জীব বা জগৎ জগৎই, ব্রহ্মও নহে, জীবও নহে। সুতরাং স্বরূপত ব্রহ্ম ও জীবজগৎ অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন। ব্রহ্ম ও জীবজগৎ পুনরায় ধর্মতও ভিন্নাভিন্ন। জীবজগৎ ব্রহ্মেরই ন্যায় সত্য এবং নিত্য হওয়া সত্ত্বেও ব্রহ্মের সকল গুণ ও কার্য জীবজগতে নাই। আবার জীবজগতের সকল গুণ ও কার্য জীবজগতে নাই। অতএব ভেদ ও অভেদ উভয়ই সমভাবে সত্য, নিত্য, স্বাভাবিক এবং অবিরুদ্ধ।' ভেদ ও অভেদের উক্ত অর্থ গ্রহণ করিলে উহাদের সহাবস্থিতির বাধা ঘটে না। নিম্বার্কের মতবাদকে এজন্য 'স্বাভাবিক ভেদাভেদ বাদ' নামে অভিহিত করা হয়।

১ দ্রঃ ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা, পৃঃ ২৮-৩০ এবং History of Indian Philosophy Vol III; History of Philosophy: Eastern & Western, Vol I. pp. 338-346

"রামানুজের মতের সহিত ইহার পার্থক্য এই যে, রামানুজের মতে ভেদ ও অভেদ উভয়ই সত্য হইলেও সমভাবে সত্য নহে; অভেদই অধিকতর সত্য। জীবজগৎ ধর্মত ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইলেও স্বরূপত অভিন্ন, কিন্তু নিম্বার্কমতে ভেদ ও অভেদ সমভাবেই সত্য—জীবজগৎ ধর্মত এবং স্বরূপত অর্থাৎ উভয় দিক্ হইতেই ব্রহ্ম হইতে ভিন্নাভিন্ন বা দ্বৈতাদ্বৈত। আর এক পার্থক্য এই যে রামানুজ জীবজগৎকে ব্রহ্মের বিশেষণ এবং ব্রহ্মের বিশেষ্য বলিয়াছেন। কিন্তু নিম্বার্কসম্প্রদায়ের মতে এই বিশেষ্যবিশেষণসম্বন্ধ অপরাপর বস্তুর পার্থক্য নির্দেশ করে। চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মের বিশেষণ হইলে তাহারা অন্যান্য বস্তু হইতে ব্রহ্মের প্রভেদ জ্ঞাপন করিবে। কিন্তু ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত তো কিছুই নাই। অতএব উহারা ব্রহ্মের বিশেষণ হইতে পারে না।" নিম্বার্ক বহুবার জীবজগৎকে ব্রহ্মের কার্য ও শক্তিরূপেই উল্লেখ করিয়াছেন, বিশেষণ ও দেহরূপে নহে।

ব্রহ্মস্বরূপলাভ ও আত্মস্বরূপলাভ এই মতে মোক্ষের দুইটি অংগ। নিম্বার্কও জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন না। ব্রহ্মস্বরূপলাভের অর্থ ব্রহ্মের সহিত অভিন্নতালাভ নহে, 'ব্রহ্মসাযুজ্য' লাভ। আত্মস্বরূপত্ব-লাভের অর্থ আত্মার জ্ঞানস্বরূপত্বের পূর্ণ প্রকাশ ও উপলব্ধি এবং তাহার স্বাভাবিক ধর্মেরও পূর্ণ প্রকাশ। আত্মস্বরূপলাভ করিয়া মুক্তজীব ব্রহ্মস্বরূপ-লাভে ব্রহ্মসদৃশ হয়, অর্থাৎ সে ব্রহ্মেরই ন্যায় শুদ্ধ চেতনস্বরূপ এবং অশেষ কল্যাণ-গুণমণ্ডিত হয়, কেবল ব্রহ্মের ন্যায় বিভু ও সৃষ্টিশক্তিমান্ হইতে পারে না। অতএব, মুক্তি বিষয়েও রামানুজ ও নিম্বার্ক সম্পূর্ণ একমত।

মুক্তি

মোক্ষে নিষ্কামকর্মের অত্যাবশ্যকতা নিম্বার্ক স্বীকার করিয়াছেন। শাস্ত্র-নির্দিষ্ট বর্ণাশ্রম ধর্মের নিষ্কামভাবে যথাযথ পালন চিত্তের নির্মলতা সম্পাদন করে এবং জ্ঞানোৎপত্তির সহায়ক হয়। জ্ঞান, ভক্তি ও ধ্যান, প্রপত্তি এবং গুরূপসত্তি বা গুরুতে আত্মসমর্পণ চারিটি সাধন। ব্রহ্মজ্ঞান এবং আত্মজ্ঞান মোক্ষের প্রধান উপায়। জ্ঞানলাভের জন্য সন্ন্যাসগ্রহণ আবশ্যক নহে; সংসারী গৃহস্থও ব্রহ্মজ্ঞানলাভে পূর্ণ অধিকারী। "'ধ্যান' ব্রহ্ম বিষয়ে বা আত্ম বিষয়ে অবিরাম চিন্তা। 'ধ্যান' তিন প্রকার —(ক) জীব-ব্রহ্মের অভেদ ধ্যান (খ) ব্রহ্মের নিয়ন্তৃরূপের ধ্যান (গ) চিদচিদ্-

সাধনাবলী

ভিন্ন ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দরূপের ধ্যান। ভক্তি ধ্যানের স্বাভাবিক ও নিত্য অঙ্গ। ভক্তি উপাসনা নহে, ভগবৎপ্রীতি; ইহা 'প্রেমবিশেষলক্ষণা'। ভক্তি ও ধ্যান জ্ঞানপ্রসূত। পরা ও অপরাভেদে ভক্তি দ্বিবিধা। জ্ঞানমূলক ভক্তিই পরা ভক্তি, কিন্তু কর্মমূলক ভক্তিকে বলে অপরা ভক্তি।" প্রপত্তির কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এবিষয়ে রামানুজ ও নিম্বার্কের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। গুরূপসত্তির অর্থ গুরুতে আত্মসমর্পণ। মুমুক্ষু প্রথমে গুরুতে আত্মসমর্পণ করেন। গুরুই তাঁহাকে ব্রহ্মসকাশে লইয়া যান। গুরুতে পূর্ণ আত্ম-নিবেদনই মুমুক্ষুর কর্তব্য—অন্য কোনও সাধন অভ্যাস করার প্রয়োজন নাই। 'গুরূপসত্তি'-ও মোক্ষের সাক্ষাৎ উপায়। প্রপত্তি এবং গুরূপসত্তিতে সকলেই অধিকারী।

শংকরের মতে সগুণ ব্রহ্ম উপাস্য, নির্গুণ ব্রহ্ম জ্ঞেয়। ব্যবহারিক স্তরে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর জীব হইতে ভিন্ন এবং ঈশ্বর উপাস্য ও জীব উপাসক। কিন্তু পারমার্থিক স্তরে উপাস্য-উপাসক-সম্বন্ধ লুপ্ত হয়। অধিকাংশ জীবই সগুণোপাসনার মধ্য দিয়া ক্রমশ শুদ্ধ-জ্ঞানের স্তরে আরোহণ করে। কিন্তু "রামানুজ এবং নিম্বার্কের মতে উপাস্য-উপাসক-সম্বন্ধ নিত্য সম্বন্ধ। মুক্ত জীবও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং ব্রহ্মের উপাসক। কিন্তু উভয়ের মতে পার্থক্য এই যে, রামানুজ উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধকে বলিয়াছেন শ্রদ্ধামূলক কিন্তু নিম্বার্ক প্রীতিমূলক। শ্রদ্ধা প্রীতির জনক, কিন্তু প্রীতি উপাস্য এবং উপাসকের নিবিড়তম মিলনের সেতু। রামানুজের ভক্তি ঐশ্বর্য-প্রধানা (শ্রদ্ধা-প্রধানা), নিম্বার্কের ভক্তি মাধুর্য-প্রধানা (প্রেমপ্রধানা)। রামানুজের মতবাদ দর্শনমূলক। কিন্তু নিম্বার্কের মত ধর্মমূলক।"[১]

ধর্মতত্ত্ব

"মধ্বের[২] নয়টি প্রধান প্রমেয়—(১) বিষ্ণু (হরি) সর্বোত্তম বস্তু (২) বিষ্ণু

১ দ্রঃ বেদান্ত দর্শন (নিম্বার্ক ভাষ্য)—সন্তদাস ব্রজবিদেহীর ভূমিকা

২ দ্রঃ ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা পৃঃ ২৪-২৫; ও
History of Indian Philosophy Vol IV; History of Philosophy: Eastern & Western Vol I, pp 322—337;
বেদান্তদর্শনের ইতিহাস—প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী।

সর্বশাস্ত্রের একমাত্র প্রতিপাদ্য (৩) জগৎ সত্য (৪) জীব ও জগৎ বিষ্ণু হইতে ভিন্ন (৫) জীব বিষ্ণুর নিত্য সেবক (৬) জীব বদ্ধ ও মুক্তভেদে পরস্পর ভিন্ন (৭) বিষ্ণুর পাদপদ্মলাভ এবং জীবের স্বরূপাভিব্যক্তিই মুক্তি (৮) শুদ্ধাভক্তি মুক্তির সাধন (৯) প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ এই তিনটি প্রমাণ।"

মধ্বের দ্বৈতবাদ

পদার্থ দ্বিবিধ : স্বতন্ত্র এবং পরতন্ত্র। পরতন্ত্র পদার্থ দশ প্রকার :—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, বিশিষ্ট, অংশী, শক্তি, সাদৃশ্য এবং অভাব। চেতন ও অচেতন ভেদে দ্রব্য পুনরায় দ্বিবিধ। ব্রহ্মই একমাত্র স্বাধীন বা স্বতন্ত্র সত্তা, বিষ্ণুই ব্রহ্ম এবং সগুণ—সর্বদোষশূন্য এবং অনন্ত কল্যাণ গুণের আধার। তিনি এক এবং অদ্বিতীয় হওয়া সত্ত্বেও জীব ও জগৎ তাঁহারই ন্যায় নিত্য ও সত্য—কিন্তু তাহারা স্বতন্ত্র নহে, পরতন্ত্র। ব্রহ্মই একমাত্র স্বতন্ত্র সত্তা—তিনি জগদতিরিক্ত হইলেও জীবের অন্তর্যামীরূপে জগল্লীনও।

পদার্থ

ব্রহ্ম

'ব্রহ্ম সক্রিয়, তাঁহার ক্রিয়া আট প্রকার। তিনিই জগতের একমাত্র স্রষ্টা, পালক এবং ধ্বংসকর্তা। কিন্তু তিনি জগতের নিমিত্তকারণ—উপাদানকারণ নহেন। ব্রহ্ম অচেতন প্রকৃতি হইতে জগৎ সৃষ্টি করেন। এস্থলেই অন্যান্য বৈদান্তিকের সহিত মধ্বের মতের পার্থক্য। এই মতেও ব্রহ্মই বিশ্বচরাচরের একমাত্র শাসক; তিনি নিয়ন্তা; জীবজগৎ তাঁহার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। তিনি দিব্যদেহবান্ এবং অনন্তমূর্তিবিশিষ্ট। তাঁহার দেহ সচ্চিদানন্দময়।'

'শংকরের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ ও নির্বিশেষ বলিয়া স্বগতভেদশূন্য; রামানুজ এবং নিম্বার্কের মতে ব্রহ্ম সগুণ ও সবিশেষ বলিয়া স্বগতভেদবান্; কিন্তু মধ্বের মতে ব্রহ্ম সগুণ হইয়াও স্বগতভেদশূন্য।' বিষ্ণুর নিত্য সহচরী লক্ষ্মী; তিনি বিষ্ণু হইতে ভিন্না হইয়াও বিষ্ণুরই আশ্রিতা; তিনি বিষ্ণুর ক্রিয়াশক্তির প্রতীক। এস্থলে লক্ষণীয় এই যে, রামানুজ এবং নিম্বার্ক দার্শনিক আলোচনায় লক্ষ্মী ও রাধাকে কোথাও স্থান দেন নাই; কিন্তু মধ্বের মতবাদে দর্শন ও ধর্মের সংমিশ্রণ সূচিত হয়। ধর্মের দিক্ হইতে উপাস্যা দেবী লক্ষ্মী দর্শনের দিক্ হইতেও জগৎ স্রষ্টার সৃষ্টিশক্তিরূপে পরিগণিত হইয়াছেন।

ব্রহ্মের স্বরূপ

মধ্বের মতেও জীব জ্ঞানস্বরূপ এবং জ্ঞাতা কর্তা, ভোক্তা, অণুপ্রমাণ এবং অসংখ্য। জীব ব্রহ্মেরই অধীন। আনন্দ স্বরূপ হইলে বদ্ধাবস্থায় জীবের আনন্দগুণ আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। জীব প্রত্যেকেই পরস্পরে পরস্পর হইতে ভিন্ন। ইহা ব্রহ্ম হইতেও নিত্য ভিন্ন অথচ ব্রহ্মাশ্রিত। নিত্য, মুক্ত এবং বদ্ধ ভেদে জীব তিন প্রকার। মুক্তির যোগ্য এবং মুক্তির অযোগ্য ভেদে জীবকে আরও দুই প্রকারে ভাগ করা যায়। 'বদ্ধজীব' আবার সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। নিত্য, নিত্যানিত্য এবং অনিত্য ভেদে 'অচিৎ'ও ত্রিবিধ।

চিৎ

অচিৎ

জীব ও জগৎ এই মতে ব্রহ্ম হইতে নিত্যভিন্ন। ব্রহ্ম নিয়ন্তা, জীবজগৎ নিয়ম্য; ব্রহ্ম উপাস্য, জীব উপাসক; অতএব সেব্য এবং সেবক সর্বদাই পরস্পর ভিন্ন। 'এই মতে জীবেশ্বর ভেদ, জড়েশ্বর ভেদ, জীব ভেদ, জড়জীব ভেদ অনাদি এবং অনিত্য। এজন্য মধ্বের মতবাদকে 'দ্বৈতবাদ' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।' এই মতে পদার্থ স্বতন্ত্র এবং অস্বতন্ত্রভেদে দুই প্রকার বলিয়া ইহাকে কখন কখন 'স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদ'ও বলা হইয়া থাকে। কিন্তু মধ্বের এই দ্বৈতবাদ বহুক্ষেত্রেই উপনিষদ্ বাক্যের বিরোধিতা করিয়াছে।

ব্রহ্ম ও জীবজগৎ

ব্রহ্ম এবং জীবের আর জীব এবং জীবের ভেদ নিত্য বলিয়া মুক্ত জীবগণও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং পরস্পর ভিন্ন। মুক্তির অর্থ স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ জীবত্বের বিনাশ নহে, ইহা জীবের পরিপূর্ণ আনন্দময় অবস্থা। এই কালে জীবের স্বাভাবিক আনন্দস্বরূপত্ব পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। মধ্ব 'জীবন্মুক্তি' স্বীকার করেন নাই।

মোক্ষ

এই মতে 'অবিদ্যা'কেই বন্ধের মূলীভূত কারণ বলা হইয়াছে। 'অবিদ্যা' ভাব পদার্থ—অভাব পদার্থ নহে, কারণ ইহা জড় প্রকৃতির কার্যরূপে সক্রিয়। জীবাচ্ছাদিকা এবং পরমাচ্ছাদিকা ভেদে অবিদ্যাও দ্বিবিধা। অবিদ্যাচ্ছন্ন জীব নিজেকে স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়া ভ্রান্তির বশে সকাম কর্মে প্রবৃত্ত হয়; ফলে তাহাকে পুনঃপুনঃ সংসারে প্রত্যাবর্তন অথবা অনন্ত নরকবাস করিতে হয়। ভারতীয়

দর্শনের অন্য কোনও সাম্প্রদায়িক মতবাদে এই অনন্ত নরকবাদ দেখা যায় না। অবিদ্যা বন্ধের কারণ হইলে বিদ্যাই (জ্ঞানই) মুক্তির প্রথম সোপান বলিয়া মানিতে হয়। সকাম কর্ম পরিত্যাগ করিয়া অতএব নিষ্কাম কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন। নিষ্কাম কর্মীর চিত্তে হয় জ্ঞানের আবির্ভাব। 'জ্ঞানে'র অর্থ-স্বতন্ত্র এবং অস্বতন্ত্র পদার্থ দুইটির প্রকৃত স্বরূপের অনুধাবন। এরূপে জ্ঞান হইতেই আসে স্বাভাবিক ঈশ্বরপ্রীতি বা ভগবদ্ভক্তি। ভক্তি ধ্যানের জনক, আর ধ্যানই মুক্তির সাক্ষাৎ উপায়। মুক্তির পক্ষে অত্যাবশ্যক ভগবৎ কৃপা।

সাধন প্রকার

রামানুজাদির ন্যায় এই মতেও কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও ধ্যান এবং ভগবৎ প্রসাদ মুক্তির উপায়। এই মতে জ্ঞানের অর্থ ব্রহ্ম এবং জীবজগতের ভেদ-জ্ঞান। ব্রহ্ম ও জীবের অভেদ জ্ঞান কিন্তু জীবের অনন্ত নরকবাসের কারণ। ক্ষুদ্র জীব সর্বশক্তিমান্ ব্রহ্মের সমতুল্য হইবার স্পর্ধা করিলে অনন্ত নিরয়গামী হয়। রামানুজাদির মতে জীব স্বীয় প্রচেষ্টাবশে ব্রহ্মসমাহিতচিত্ত হইয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মকে দর্শন করে; কিন্তু মধ্বের মতে জীব বায়ুর মধ্যস্থতাতেই ব্রহ্মের সংস্পর্শে আসিয়া থাকে, সাক্ষাৎ নহে।

অনেকে মনে করেন, যেহেতু মধ্ব নরকবাসের কথা প্রচার করেন, অতএব তিনি সম্ভবত খৃষ্টীয় মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন; কিন্তু এই যুক্তি অনৈতিহাসিক বলিয়া অগ্রাহ্য।

বল্লভের মতেও[১] ব্রহ্ম 'একমেবাদ্বিতীয়ম্,' কেননা জীব ও জগৎ ব্রহ্মেরই ন্যায় সত্য হইলেও ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ একাত্মক। সেজন্য ব্রহ্ম নির্বিশেষ-সজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগতভেদরহিত। অপরাপর বৈদান্তিক সম্প্রদায় ব্রহ্মের স্বগতভেদ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু বল্লভের মতে তাঁহার স্বগতভেদও নাই; কারণ জীব ও জগৎ ব্রহ্মের অংশ হইলেও তাঁহার

বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ

১ [দ্রঃ ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা পৃঃ ৩১; ও
History of Indian Philosophy Vol. IV, History of Philosophy Eastern & Western, Vol. I, pp. 347-356;
বেদান্তদর্শনের ইতিহাস—প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী

সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন।[১] ব্রহ্ম একাধারে নির্গুণ এবং সগুণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ এবং শুদ্ধ, সর্বশক্তিমান্ এবং অনন্ত তাঁহার শক্তি ও বিভূতি।

ব্রহ্ম

'সর্ববিরুদ্ধধর্মাশ্রয়ত্ব' তাঁহার ভূষণ। তিনি সক্রিয় জগতের স্রষ্টা, ধারক এবং ধ্বংসকর্তা। তিনি জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ। আধিদৈবিক, অক্ষর এবং অন্তর্যামী ভেদে তাঁহার ত্রিবিধ 'রূপ'।

জীবও ব্রহ্মেরই ন্যায় জ্ঞানস্বরূপ এবং শুদ্ধ জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা, অণু-প্রমাণ এবং হৃদয়চারী। জীব ব্রহ্মের পরিণাম বা কার্য, অংশ এবং ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। শুদ্ধ, সংসারী এবং মুক্ত ভেদে জীব তিন প্রকার।

চিৎ

সংসারী জীব জন্মমরণশীল, কিন্তু মুক্ত জীব সংসার চক্র হইতে মুক্ত এবং পুনর্জন্মরহিত। ব্রহ্মের আনন্দগুণ অপসৃত হইলে ব্রহ্ম জীবে পরিণত হন।

প্রকৃতি ও কালভেদে 'অচিৎ' দুই প্রকার। বল্লভ সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন—সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম ছিলেন একাকী; কিন্তু একাকিত্বের জন্য তাঁহার আনন্দের ব্যাঘাত ঘটিতেছিল। ক্রীড়াই আমাদের কারণ, তাই ক্রীড়ার জন্যই তিনি জীব জগৎ সৃষ্টি করিলেন। বহু হইতে ইচ্ছা করিয়া তিনি স্বয়ং জীব জগৎরূপে পরিণত হইলেন। জীব ও জগৎ

অচিৎ

সেজন্য তাঁহার কার্যমাত্র। অগ্নি হইতে যেরূপে বিস্ফুলিংগ স্ফুরিত হয় সেইরূপ ব্রহ্ম হইতেও জীব এবং জগতের উদ্ভব হয়। সৃষ্টি এবং প্রলয় ব্রহ্মের গুণাবলীর আবির্ভাব এবং তিরোভাব ব্যতীত আর কিছু নহে।

অনন্ত এবং অচিন্ত্যশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্ম স্বীয় শক্তিবলেই জীবজগদ্রূপে আবির্ভূত হন, মায়ার দ্বারা নহে। মায়া ব্রহ্মাশ্রয়ী শক্তি হইতেই পারে না—অতএব ইহা ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত দ্বিতীয় তত্ত্ব, ইহা বলিতেই হইবে। বল্লভের মতে তাই মায়াবাদী অদ্বৈতবেদান্তী প্রকৃতপক্ষে দ্বৈতবাদী।

ব্রহ্ম এবং জীবজগৎ অভিন্ন, কারণ ব্রহ্মই স্বয়ং জীব ও জগদ্রূপে আবির্ভূত হন। কার্য ও কারণ অভিন্ন; সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম সচ্চিৎস্বরূপ জীব সৎস্বরূপ জগৎ

[১] যথা প্রদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিংগাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ ইত্যাদি। মুণ্ডক।

হইতে অভিন্ন ব্রহ্ম স্বয়ংই জীবজগৎ; তত্ত্বমসি, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্যও তাহাই। জীব সত্যই ব্রহ্ম; ব্রহ্মই এক-মাত্র সত্য, কিন্তু তিনি মায়োপহিত নহেন, তিনি শুদ্ধ। তাই বল্লভের মতকে বলে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ। শাংকর মতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জীব-জগৎ অলীক মায়ামাত্র; কিন্তু বল্লভ মতে, ব্রহ্ম একমাত্র সত্য হইলেও জীবজগৎ মিথ্যা নহে। জীবজগৎ ব্রহ্মেরই ন্যায় সত্য এবং ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মাত্মাই। অভিন্নত্ব কেবল দুইটি সত্য বস্তুর মধ্যেই উপলব্ধ হয়—একটি সত্য এবং একটি মিথ্যা বস্তুর ভিতর নহে।

ব্রহ্ম ও জীবজগৎ

বন্ধের কারণ 'অবিদ্যা'। জগৎ সত্য হইলেও উহা যে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, এই ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা। জীবের নিকট জগৎ-প্রপঞ্চ তিনটি আকারে বা রূপে প্রতিভাত হয়:—(ক) মুক্ত জীবের নিকট জগৎ শুদ্ধ, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মরূপেই প্রতিভাত হয়। (খ) শাস্ত্রজ্ঞের নিকট জগৎ ব্রহ্মধর্মী এবং মায়াধর্মী উভয়রূপেই প্রতিভাত হয়। (গ) আর অবিদ্যাচ্ছন্ন জীবের নিকট জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং ভিন্ন—এই উভয় প্রকারেই প্রতীত হয়। মুক্ত জীব ব্রহ্মের সহিত স্বীয় অভিন্নত্ব উপলব্ধি করে এবং আনন্দস্বরূপত্ব লাভ করে। কিন্তু মুক্ত জীবও ব্রহ্মেরই দাস।

মুক্তি

এই মতেও জীবন্মুক্তি স্বীকৃত হয় নাই—বিদেহমুক্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। 'জ্ঞান' ও 'ভক্তি'—এই দুইটিকে মোক্ষের উপায় বলা হইয়াছে। জ্ঞানী ব্রহ্মের নির্গুণ, অক্ষর রূপটিই দেখিতে পান, কিন্তু ভক্ত কৃষ্ণের পরমানন্দরূপ সাক্ষাৎ করেন।

সাধন প্রকার

বল্লভ কৃচ্ছ্র সাধনের বিরোধী ছিলেন, কারণ দেহ ঈশ্বরেরই আবাসস্থল। দেহক্লেশের কারণ তপস্যা, উপবাস প্রভৃতির পরিপালন অত্যন্ত অনুচিত।[১] বিষয়-সুখসম্ভোগপূর্বকই 'কৃষ্ণকে' সেবা করা যায়।

সংক্ষেপে বলা যায় যে বল্লভ শংকরের 'অদ্বৈতবাদ' স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু 'মায়াবাদ' অস্বীকার করিয়াছেন।[২]

---

১ গীতাতেও উপবাসাদির অনৌচিত্য স্থলবিশেষে দেখা যায়।

২ চৈতন্যের 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'বাদ বেদান্তদর্শনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নূতন অবদান; 'দর্শনে বাঙালী' এই অধ্যায়ে তাহার আলোচনা মিলিবে।

নাস্তিক দর্শনসমূহের বিভাগ

॥ ক ॥ চার্বাক দর্শন

এতক্ষণ আমরা 'আস্তিক দর্শনের' কথা বলিতেছিলাম। 'আস্তিক দর্শনের' অর্থ যে দর্শন বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে। এখন বলা হইবে তাঁহাদের কথা যাঁহারা বেদের প্রামাণ্যকে অস্বীকার করেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে লেখা আছে যে একদল দার্শনিক ছিলেন যাঁহারা পঞ্চভূতকেই পরমতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিতেন। 'লোকায়ত' নামটি প্রাচীন। 'অর্থশাস্ত্রে' এই নামটি পাওয়া যায়। 'বুদ্ধঘোষ' লোকায়তের নাম করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা নাকি অপরের মত খণ্ডন করার ব্যাপারে বিশেষ পটু ছিলেন। বৌদ্ধগ্রন্থের নানাস্থানে লোকায়তগণের নাম পাওয়া যায়। 'লোকায়ত' শব্দের অর্থ, যে মত সাধারণ লোকের মধ্যে বহুবিস্তৃত বা বহুল প্রচারিত। ইহার আরও একটি অর্থ এই যে, এই মত অবলম্বন করিলে লোকে উন্নতির দিকে উৎসাহ পাইতে পারে।

লোকায়ত বা চার্বাক দর্শন :—শ্বেতাশ্বতর, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতিতে এই মতের অস্পষ্ট আভাস

'লোকায়ত' শব্দের

এই 'লোকায়ত' মতকে অনেক সময় 'নাস্তিক শাস্ত্র' বলা হয়। 'মনুর' মেধাতিথিভাষ্য পড়িলে দেখা যায় যে তর্কবিদ্যায় পটু বলিয়া ইঁহাদের খ্যাতি ছিল। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে 'পাতঞ্জলভাষ্য' হইতে জানা যায় যে 'ভাগুরি' 'লোকায়ত শাস্ত্রের' একটি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে 'কাত্যায়ন'কৃত বার্তিকে এই ব্যাখ্যাটির নাম বলা হইয়াছে 'বর্ণিকা'। কমলশীল, প্রভাচন্দ্র, জয়ন্ত এবং গুণরত্ন প্রভৃতি মনীষিগণ এই 'লোকায়ত' বা 'চার্বাক দর্শন' হইতে কতকগুলি সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। কমলশীল দুই জাতীয় চার্বাকের কথা বলিয়াছিলেন—'ধূর্ত চার্বাক' ও 'সুশিক্ষিত চার্বাক'। চতুর্দশ শতকের সর্বদর্শনসংগ্রহেও 'চার্বাক দর্শন' সম্বন্ধে বর্ণনা রহিয়াছে।

নাস্তিক শাস্ত্র ; মনুসংহিতার ভাষ্য

পাতঞ্জল ভাষ্য

কাত্যায়নীয় বৃত্তি

কমলশীল, প্রভাচন্দ্র, জয়ন্ত এবং গুণরত্ন প্রভৃতি দ্বারা লোকায়ত দর্শনের

'সর্বদর্শন সংগ্রহ'

লোকায়ত বা চার্বাক দর্শনের ইতিহাস দীর্ঘ নয়[১]—শাখাপ্রশাখায় ইহার কোনো বিস্তৃতি সম্ভবত ছিল না। কিন্তু ইহার প্রসিদ্ধি যে ছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কারণ, আস্তিক দর্শন ইহার মত খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছে। অন্য নাস্তিকেরাও মত খণ্ডন করিয়াছেন, যেমন 'স্যাদ্‌বাদী জৈনগণ'। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, সমাজে লোকায়তদর্শনের বেশ কিছু প্রতিপত্তি ছিল।

এই মতের স্বকীয়তা : ইহার প্রভাব

মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই ভোগের দিকে। চার্বাক দর্শন মানুষের মনে সেই প্রবৃত্তির রসদই জোগাইয়াছে। চার্বাকের নামের ব্যুৎপত্তি সাধনের চেষ্টা হইয়াছে—বোধ হয় এই দর্শন-স্রষ্টা চারু বাকযুক্ত ছিলেন। মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে চার্বাকের যে উল্লেখ দেখা যায়, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু তাঁহার নিজস্ব গ্রন্থ বিশের কিছু পাওয়া যায় না। তাঁহার গুরুদেব বা সম্প্রদায়েরও বিশেষ কোনো বিবরণ মিলে না।

চার্বাক মানুষকে করিয়াছেন দার্শনিক, যুক্তির দ্বারা ভোগমুখী

মহাভারতে আছে তাঁহার উল্লেখ

বিশেষ কোনো গ্রন্থ এসম্বন্ধে পাওয়া যায় না

প্রমাণ' সম্বন্ধে চার্বাকের মতামত কি? চার্বাকের মতে প্রমাণ একটিমাত্র —'প্রত্যক্ষ'। যাহা দেখি না, শুনি না, স্পর্শ করিতে পারি না, যাহার স্বাদ কিংবা গন্ধ পাই না, অর্থাৎ যে বস্তুর জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে হয় না, সে বস্তুর সত্তা বা অস্তিত্ব নাই। ইন্দ্রিয় ভিন্ন সত্য জানিবার উপায় আর কিছুই আমাদের নাই। কেহ কেহ অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের কথা বলেন, কিন্তু 'অনুমান' নির্ভর করে 'ব্যাপ্তি-জ্ঞানের' উপর আর এই ব্যাপ্তি জানিবার তো কোনো উপায়ই আমাদের নাই। 'ব্যাপ্তি' বাহ্য কিংবা আন্তর কোনো প্রকার প্রত্যক্ষেরই অন্তর্গত নয়। সেজন্য প্রকৃত-পক্ষে 'ব্যাপ্তিকে' আমরা জানিতে পারি না। তবে যে

Empirical Philosophy of Mill ?
প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ

অনুমানাদি প্রমাণ প্রত্যক্ষসিদ্ধ নয় বলিয়া অভ্রান্ত নয়, সেজন্য পরিত্যাজ্য

অনুমানকে অস্বীকার করার কারণ

১ ডক্টর দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী ভারতীয় বস্তুবাদের ইতিহাসকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করিয়াছেন। বার্হস্পত্য, লোকায়ত, চার্বাক ও নাস্তিক।

মনে করি জানি, তাহা ভুল। এজন্য অনুমানও অসম্ভব হইয়া পড়ে। তবে মাঝে মাঝে যে অনুমানও সত্যে পরিণত হয়, তাহা আকস্মিক। এজন্যই অনুমানকে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ বলা যায় না।

শব্দাদি প্রমাণ তো অনুমানেরই অন্তর্গত, সেজন্য সহজেই অগ্রাহ্য

অনুমানকেই যদি অস্বীকার করা হয়, তবে শব্দাদি প্রমাণকে অস্বীকার করা তো অত্যন্ত সহজ। কারণ শব্দ, উপমান প্রভৃতি তো সকলে স্বীকার করেন না, আর এগুলিকে যুক্তির সাহায্যে সহজেই অনুমানের অন্তর্গত করা যায়। বৈশেষিক দর্শনে এসম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। অতএব 'প্রত্যক্ষ'ই একমাত্র প্রমাণ এবং সত্য জানিবার একমাত্র উপায়। প্রত্যক্ষগম্য যাহা নয় তাহা সত্য হইতে পারে না।

প্রমেয় সম্বন্ধে চার্বাক

জগৎ আছে—কার্য-কারণ সম্বন্ধ খোঁজার দরকার নাই

প্রমেয় সম্বন্ধে লোকায়ত মত এই যে জগৎ বলিয়া কোনো কিছু নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তাহার মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ অনুসন্ধান করিয়া বাহির না করাই শ্রেয়, কারণ নির্দিষ্ট কোনো আইন বা নিয়মের কথা এখানে উত্থাপন করা সঙ্গত নয়। কেন আগুন গরম, জল ঠাণ্ডা, বাতাসে শীত শীত ভাব থাকে জানার চেষ্টা করা বৃথা, 'স্বভাব' হইতে এসব আপনা-আপনিই হইয়া থাকে।

ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুৎ

দেহই আত্মা

দেহ আর আত্মা

রাজাই পরমেশ্বর

[illegible]বী, জল, তেজ ও মরুৎ—ভূত এই ৪টি। ইহারাই জ্ঞাতব্য। ইহাদের সংমিশ্রণেই দেহের উৎপত্তি হয়। এই সংগে দেহে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়। চৈতন্যযুক্ত দেহই আত্মা। দেহাতিরিক্ত আত্মার সত্তা বা অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ নাই। লোকে অনেক সময় বলে বটে 'আমার দেহ', কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে উহাতে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ হইল। 'আমি কালো', 'আমি রোগা' —এরকম কথাও তো লোকে বলিয়া থাকে। ইহা হইতেই প্রমাণ হয় যে দেহ আর আত্মা একই। লোকসিদ্ধ রাজাই 'পরমেশ্বর'—তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই তো কার্যসিদ্ধি হইল।

মানুষের সুখ ছাড়া এজগতে ভাবিবার আর কিছু নাই, কারণ এই তো 'পুরুষার্থ'। যতদিন বাঁচিবে, সুখে থাকিতে চেষ্টা করিবে; প্রয়োজন বুঝিলে ঋণ করিয়াও ঘৃত পান করিবে, কারণ এই দেহ একবার ভস্মীভূত হওয়ার পর যে তাহার পুনরাগমন হইয়াছে, ইহা তো জানা নাই।[১] ভোগের উপায় ও উপাদান যতগুলি জানা আছে সে সকলের সদ্ব্যবহার করিবে। কোনো কোনো স্থলে হয়ত দুঃখের সম্ভাবনাও থাকিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া কি সুখভোগও করিব না বলিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবে? দুঃখ যাহাতে না পাও, দুঃখকে বর্জন করিয়া যাহাতে সুখ ভোগ করিতে পার, তাহার চেষ্টা করিবে এই যা। চোরে চুরি করিবে বলিয়া কি ভয়েতে বিত্ত সঞ্চয় বাদ দিবে? বাড়ীতে অতিথি আসিতে পারার সম্ভাবনায় কি নিজে খাইবে না?

জাগতিক সুখই পুরুষার্থ

চার্বাকের কতকগুলি মতামত

পরলোক, অপবর্গ ইত্যাদির আলোচনা না করাই ভালো।[২] কারণ এ সকল জিনিস কি, সে সম্বন্ধে সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান কাহারো নাই। বেদ প্রমাণ বলিবে? বেদ তো ধূর্ততায় ভরা। কর্মকাণ্ড করে জ্ঞানকাণ্ডের নিন্দা, আর জ্ঞানকাণ্ডে আছে কর্মকাণ্ডের নিন্দা,—বিশ্বাস কাহাকে করা যায় বলো? ভণ্ড, ধূর্ত এবং নিশাচর এই তিন শ্রেণীর লোক একসংগে মন্ত্রণা করিয়া বেদ সৃষ্টি করিয়াছে।[৩] ইহাদের পদে পদে আছে প্রতারণা, আর পশুবলিই এখানে প্রধান করণীয় কাজ। যজ্ঞে নিহত পশু স্বর্গে যায় বলিয়া ভাণ করা হয়; কিন্তু সেকথা যদি সত্যই হয়, তবে যজমান নিজের পিতাকে হত্যা করিলেই তো

পরলোক প্রভৃতি নাই

বেদ ধূর্ততায় ভরা; ইহাতে আছে প্রতারণা

পশুবধসম্পর্কিত যুক্তি অর্থহীন এবং স্বার্থগন্ধী

১ যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ?

২ ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ॥

৩ ত্রয়ো বেদস্য কর্তারো ভণ্ড-ধূর্ত-নিশাচরাঃ।

অতি সহজে পিতাকে স্বর্গে পাঠাইতে পারিত[১]; এত যাগযজ্ঞের তো কোনো প্রয়োজনই থাকিত না। আর, মৃতের শ্রাদ্ধেই যদি তৃপ্তি হয়, তবে নিবিয়া গিয়াছে যে প্রদীপ তাহাতে তেল ঢালিলে কেন উহা আবার জ্বলিয়া উঠে না? যে বিদেশে যায়, গৃহে তাহার পিণ্ড দিলে কি সে পরিতৃপ্ত হয়? ওপারের লোক এপারের দেওয়া খাবার যদি খাইতে পারে তবে দোতলার লোককে একতলায় খাবার দিলে চলিবে না কেন? বেদের এই সকল ধর্মব্যবস্থা বুদ্ধি-পৌরুষ-হীন ব্রাহ্মণগণ লোককে প্রবঞ্চনা করিয়া নিজেদের জীবিকার্জনের জন্য করিয়াছে।[৩]

ব্রাহ্মণগণ জনগণকে প্রতারণা করিয়া শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছে স্বার্থান্বেষণের জন্য

দেহের সংগেই সব কিছুর শেষ হয়, মৃত্যুর পর তো আর কিছু নাই। সেজন্য মানুষের একমাত্র কর্তব্য হওয়া উচিত জীবনটা কিভাবে সুখে কাটানো যায়, দিবারাত্র তাহারই চিন্তা করা।[৪] চার্বাক দর্শনের ইহাই হইল সাধারণ-ভাবে স্বীকৃত তথ্য। কিন্তু বেদের উপর আক্রমণই লোকায়ত দর্শনের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। বেদের ভাষা এই দর্শনবাদিগণের মতে দুর্বোধ 'জর্ভরী', 'তুর্ফরী' ইত্যাদি অর্থহীন প্রলাপ। বেদের কর্তারা সকলে ভণ্ড এবং মাংসলোলুপ রাক্ষস। বেদের সাহায্যে পৌরুষহীন কপট লোকেরা কোনো প্রকারে নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদন করে। অশ্বমেধযজ্ঞে অশ্লীল আচার আছে ও অশ্লীল ভাষার প্রয়োগ দেখা যায় (শুক্ল-যজুর্বেদ ২৩শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এই সকলের কিঞ্চিৎ

বেদের সমালোচনায় চার্বাক

১ পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গে জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে?

২ মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চেৎ তৃপ্তিকারণম্।
গচ্ছতামিহ জন্তূনাং ব্যর্থং পাথেয়-কল্পনম্॥

৩ অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্মিতা॥

৪ দ্রঃ এই প্রসংগে Monier Williams—Indian Wisdom; ভারতদর্শনসার, পৃঃ ৮৫।

উত্তর দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করি। বেদের ভাষার দুর্বোধ্যতা যজ্ঞের নিকট তো থাকিবেই। জর্ভরী, তুর্ফারী ইত্যাদি শব্দ বেদমন্ত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে একথা যেমন ঠিক, তেমনি ইহাদের যে গূঢ় অর্থ আছে ইহাও ঠিক। বেদের ভাষার উপর অযথা আক্রমণ করিয়া চার্বাক তাঁহার সংস্কৃত জ্ঞানের অভাবই প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বেদকে আক্রমণ করিলেই দার্শনিক হওয়া যায় না। প্রত্যক্ষ ভিন্ন যে অন্য প্রমাণ চার্বাক অস্বীকার করিয়াছেন, সেজন্য তিনি পরবর্তী যুগের আস্তিকদার্শনিকগণের উপহাসাস্পদ হইয়াছেন।

লোকায়তিক মতের সহিত বৈদিক শাস্ত্রগুলির সম্পর্ক কি তাহা উপরে বলিয়াছি। "বৈদিক ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। উত্তর-যুগে যাঁরা এ ঐতিহ্যের বাহক বলে নিজেদের পরিচয় দিলেন তাঁরা লোকায়তিক চিন্তাধারা সম্বন্ধে ঘৃণায়-বিদ্বেষে মুখর এবং লোকায়তিকদের পক্ষ থেকেও বৈদিক যাগ-যজ্ঞের বিরুদ্ধে যে বিদ্রূপ তাও কম তীক্ষ্ণ নয়। উত্তরকালের এই পরিস্থিতি দেখে মনে হয় লোকায়তের সঙ্গে বৈদিক ঐতিহ্যের কোনো সম্পর্কই নেই। কিংবা যা একই কথা, সম্পর্কটা নেহাতই অহিনকুলের মতো।" কিন্তু "সুদূর অতীতে লোকায়তিক চিন্তাধারার সঙ্গে বৈদিক ঐতিহ্যের বিরোধ ছিল কিনা তা একান্তই সন্দেহের কথা। কেননা বৈদিক সাহিত্যের মধ্যেই লোকায়তিক ধ্যানধারণার রাশি রাশি চিহ্ন থেকে গিয়েছে এবং সে-ইতিহাস দেখলে বোঝা যায়—উত্তর-যুগে এ-ঐতিহ্যের বাহকেরা যে-সব ধ্যানধারণাকে ঘৃণার চোখে দেখতে শিখেছিলেন, আদিকালে তাঁদেরই পূর্বপুরুষেরা ওই সব ধ্যানধারণাকেই সত্য বলে মনে করেছেন।"[১]

লোকায়ত মত ও বৈদিক শাস্ত্র

প্রমেয় সম্পর্কিত চার্বাকের উক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তিনি পঞ্চভূতের মধ্যে ব্যোম বা আকাশকে বাদ দিয়াছেন। আকাশ কি সত্যই নাই? রাজাই কি পরমেশ্বর, না দেহই আত্মা?

১ লোকায়ত দর্শন—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৬৯

মানুষের জিজ্ঞাসার উত্তর হিসাবে অর্থাৎ 'দর্শন' হিসাবে চার্বাকমতের বিশেষ মূল্য নাই, যদিও 'লোকায়ত দর্শন' গ্রন্থের লেখক উহাকে নূতন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ভোগাসক্তমন ইহার মধ্যে লালসা চরিতার্থ করিবার একটি যুক্তি খুঁজিয়া পাইয়াছিল। বোধ হয় সেজন্যই ইহা 'লোকপ্রিয়' বা 'লোকায়ত' হইয়াছিল। ধর্ম ও নীতির শাসনের অযথা কঠোরতার বিরুদ্ধে চার্বাক বজ্রগর্জনে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। বিদ্রোহী দর্শন হিসাবে চার্বাক মতের সেজন্য যথেষ্ট মূল্য আছে, কিন্তু দর্শন হিসাবে তাঁহার মতে কোনো উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য নাই। প্রাচীন গ্রীসেও[১] Epicurus প্রভৃতি দার্শনিকদের মুখ হইতে জগৎ এই ধরণের তথ্য শুনিয়াছে। কিন্তু এই জাতীয় দর্শনের ভিতর কোনো হ্রাসবৃদ্ধি নাই—ক্ষয় বা পুষ্টি নাই—ইহাতে না আছে গতি, বিচিত্রতা বা ইতিহাস। বেদান্ত দর্শনের যেমন শাখা-প্রশাখায় বিস্তীর্ণ, নূতন নূতন ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ একটি দীর্ঘ বৈচিত্র্যময় ইতিহাস আছে, একটা পুরাতন জ্ঞানবৃদ্ধ সাহিত্য আছে, চার্বাক দর্শনের তাহা ছিল না, নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না। চার্বাক দর্শনের সারবস্তু কি 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটকে সে সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, 'লোকায়ত'ই একমাত্র শাস্ত্র। এই শাস্ত্রে 'প্রত্যক্ষ'ই একমাত্র প্রমাণ। ক্ষিতি, অপ্, তেজ এবং মরুৎ—এই চারিটি 'ভূত' বা উপাদান। ধনলাভ এবং উপভোগই সর্বপ্রকার জীবনযাপনের লক্ষ্য। বস্তু বা 'matter' চিন্তা করিতে সমর্থ; অপর-জগৎ বা পরলোক বলিয়া কিছু নাই। মৃত্যুতেই সকল জিনিসের বা জীবনের বস্তুর পরিসমাপ্তি।[২] মৃত্যু সম্বন্ধে চার্বাক ও উপনিষদের মত লইয়া 'মহাভারতে' অনেক আলোচনা

দর্শন হিসাবে লোকায়তের মূল্য

'প্রবোধচন্দ্রোদয়'-নাটকে চার্বাকমত

১ দ্রঃ A Critical History of Greek Philosophy—W. T. Stace, pp. 354-360, History of Philosophy : Eastern & Western, Vol. I, pp. 137-138.

২ An Introduction to Classical Sanskrit—G. Sastri, p. 233 ; মৃত্যুর পর যে আর কোনো চৈতন্য বা আত্মা থাকে না এরূপ একটি মত বৃহদারণ্যক উপনিষদেও আছে—নরা অরে প্রেত্যসংজ্ঞা অস্তি ইতি।

হইয়াছে। চার্বাকগণের মতো 'অজিতকেশকম্বলী'ও কোনো যজ্ঞ-দান প্রভৃতি যে পুণ্যকার্য, তাহা মানিতেন না। ইহকাল, পরকাল, কর্মফল ও জন্মান্তরও মানিতেন না। চার্বাকগণের ন্যায় তিনিও বলিতেন যে, পঞ্চভূতাত্মক এই দেহ ছাড়া ইহার অভ্যন্তরে কোনো আত্মা নাই। পণ্ডিত এবং মূর্খ উভয়েই দেহ-নাশের সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হইয়া যায়। এই 'অজিতকেশকম্বলী'র কথা আছে 'দীঘনিকায়ে'—কিন্তু তাহা এস্থলে আমাদের আলোচনার বহির্ভূত।

অজিতকেশকম্বলীর মত

'ছান্দোগ্য উপনিষদে' দেহাত্মবাদী বিরোচনের কথা আছে। রামায়ণে 'জাবালি' ঋষিও চার্বাকমতের প্রচার করিয়াছিলেন। জাবালি বলিয়াছেন যে, শ্রাদ্ধ করিলে যদি পরলোকে আত্মার তৃপ্তি হয় তো লোকে বিদেশে গেলে তাহাদের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করিলে তো তাহাদের তৃপ্তি হইতে পারে। বিদেশে বসিয়া তাহাদের আহার সংগ্রহ করিবার তো তাহা হইলে প্রয়োজনই থাকে না। তপস্যা, যাগ, যজ্ঞ, দক্ষিণা প্রভৃতি সকলই নিরর্থক।

প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে চার্বাকমত

যাঁহারা 'চার্বাক' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা ছাড়াও অন্য অনেকে চার্বাকজাতীয় মত পোষণ করিতেন। 'পুরন্দর' নামে চার্বাকের এক শিষ্য বলিতেন যে, প্রত্যক্ষত যাহা দেখা যায়, তাহাকে অবলম্বন করিয়া যে সকল অনুমান হয় তাহাদের প্রামাণ্য আছে, কিন্তু অপ্রত্যক্ষ বস্তু সম্বন্ধে কোনো অনুমানের দ্বারা সত্য সিদ্ধান্তে আসা যায় না। 'ধূর্ত-চার্বাকগণ' বলিতেন দেহ ছাড়া কোন আত্মা নাই, কিন্তু 'সুশিক্ষিত চার্বাকগণে'র মতে দেহজ ব্যাপারের ফলে একটি রাসায়নিক বিকারের ন্যায় কোনো একটি চৈতন্য উৎপন্ন হইলেও দেহান্ত হইলে তাহার আর কোনো সত্তা থাকে না।

পুরন্দর

ধূর্ত-চার্বাক

" 'লোকায়ত' সংক্রান্ত[১] তথ্য অত্যন্ত বিরল এবং এগুলি একান্তই খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত। লোকায়ত প্রসঙ্গে অনিশ্চয়তার মহাসমুদ্রে একমাত্র যে কথা জোর

১ লোকায়ত দর্শন—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দ্রঃ।

করে বলা যায় তা হলো, লোকায়তিকদের নিজস্ব কোনো রচনাই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কোনো কালে এ-জাতীয় কোনো রচনা একান্তই ছিলো কিনা সে বিষয়েও বিদ্বানেরা একমত নন। রিস্-ডেভিডস্ এ সম্ভাবনাকে সন্দেহ করেন, যদিও গার্বে, তুচি ও দাশগুপ্ত তাঁর বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য উপস্থিত করেছেন। সে সাক্ষ্যের ভিত্তিতে যদিই বা স্বীকার করতে হয় যে এককালে এজাতীয় গ্রন্থ সত্যিই ছিলো তবুও কিন্তু মানতেই হবে যে তা বিলুপ্ত হয়েছে। হয়ত বিপক্ষেরা সেগুলি স্বেচ্ছায় ধ্বংস করেছিলো। এ-অবস্থায় রিস্ ডেভিডস্ যখন দাবি করেন লোকায়তিকদের নিজস্ব কোনো রচনা আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আমাদের পক্ষে বড়ো জোর একটা অস্থায়ী প্রকল্পের উপর নির্ভর করা সম্ভব, তখন তাঁর উক্তি না-মেনে উপায় নেই।"

চার্বাক দর্শন সংক্রান্ত তথ্যের অল্পতা ও অস্তিত্বের অনিশ্চয়তা

"রিস্-ডেভিডস্ একথা লিখেছিলেন ১৮৯৯ সালে। তারপর আজ পর্যন্ত আমাদের অভিজ্ঞতা হলো, ও-জাতীয় কোনো গ্রন্থ আবিষ্কৃত হবার আর কোনো সম্ভাবনাও নেই। অবশ্য ১৯২১ সালে F. W. Thomas 'বৃহস্পতিসূত্র' বলে একটি গ্রন্থ-সংগ্রহ সম্পাদনা ও তর্জমা করে প্রকাশ করেন। ঐতিহ্য অনুসারে বৃহস্পতিই লোকায়ত-মতের প্রবর্তক ; তাই এ-গ্রন্থ বিদ্বান্-মহলে লোকায়ত-সংক্রান্ত পুরোণো কৌতূহলকে নতুন করে নাড়া দিয়েছিলো। কিন্তু গ্রন্থটির আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল, এর চরিত্র মোটেই অকৃত্রিম লোকায়তিক নয়, বরং লোকায়ত-বিরোধিতাই এর প্রধান প্রতিপাদ্য। অধ্যাপক তুচির ভাষায়, গ্রন্থটি স্পষ্টই ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব প্রণোদিত—it bears a clear Brahmanical character. কিন্তু সেই সঙ্গেই তিনি দাবি করলেন, তবুও এই গ্রন্থে লোকায়ত-প্রসঙ্গে এমন কিছু কিছু উদ্ধৃতি পাওয়া যায় যেগুলি সম্ভবত কোনো প্রাচীন কিন্তু বিলুপ্ত গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছিলো এবং সেই বিলুপ্ত গ্রন্থটির চরিত্র ছিলো স্পষ্টই লোকায়তিক—a peculiar lokāyata character."

'বৃহস্পতিসূত্র'

"কিন্তু আসল সমস্যা তো এই নিয়েই···বেলভেলকার ও রানাডে তাই আক্ষেপ করে বলছেন, এ-সম্প্রদায়ের এমনই দুর্ভাগ্য যে একমাত্র বিপক্ষের রচনা থেকেই আমাদের পক্ষে একে বোঝবার চেষ্টা করা সম্ভব।"[১]

চার্বাক দর্শনের নিজস্ব কোন গ্রন্থ আজও পাওয়া যায় নাই

"আমাদের দেশে লোকায়তের প্রভাব যে বিশাল ও গভীর ছিল সে-বিষয়ে নানা প্রমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব। প্রথমত, 'লোকায়ত' নামটির ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ; সাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত, এই অর্থেই নাম 'লোকায়ত'। মনে রাখা প্রয়োজন যে, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং অধ্যাপক কাওয়েল (Cowell) এই অর্থেই 'লোকায়ত' নামটিকে গ্রহণ করেছেন। মাধব নিজেও জানতেন যে, 'লোকেষু আয়তঃ' অর্থেই এর নাম 'লোকায়ত'। কিন্তু নামটির এ-তাৎপর্যকে তিনি হেয়ত্ব-সূচক অর্থেই ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। সাধারণ লোক অর্থ ও কাম ছাড়া আর কিছু বোঝে না বলেই পরলোক অস্বীকার করে চার্বাকমতের অনুগমন করে—এই কারণেই চার্বাকমতের নাম 'লোকায়ত'। গুণরত্ন এবং শঙ্করাচার্যের রচনাতেও জনসাধারণের মধ্যে লোকায়তমতের ব্যাপক ও বিশাল প্রভাবকে এই রকমেরই অবজ্ঞাসূচক অর্থে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা দেখা যায়। গুণরত্ন বলছেন, 'সাধারণ লোক নির্বিচার বলেই এ-মত গ্রহণ করে থাকে'। শঙ্করাচার্য বলছেন, এ-মত প্রাকৃত-জনের পক্ষেই স্বাভাবিক। কিন্তু এ-ধরণের অবজ্ঞাসূচক অর্থ যে নেহাৎই অলীক সে বিষয়ে অনেক প্রমাণ দেওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মহাভারতের বনপর্বে দ্রৌপদীর 'বার্হস্পত্যনীতি' সম্বন্ধে উক্তি। মহাভারতের শান্তিপর্বে চার্বাক-বধের একটি চিত্তাকর্ষক উপাখ্যান আছে।"[২]

ভারতে লোকায়তের গভীর প্রভাব ও জনপ্রিয়তা

"আত্মতত্ত্ব এবং সৃষ্টিতত্ত্ব এই উভয় তত্ত্বের দিক থেকেই লোকায়ত মতের (বা

১ লোকায়ত দর্শন—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ১১-১২।

২ এই দর্শনের আলোচনায় লেখকদ্বয় 'লোকায়ত দর্শন'—(দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা) গ্রন্থের নিকট বিশেষভাবে ঋণী।

প্রাচীনশাস্ত্রোক্ত অসুরমতের—বিষ্ণুপুরাণানুসারে) সঙ্গে তন্ত্রের আশ্চর্য সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লোকায়তের সঙ্গে তান্ত্রিকাদি সম্প্রদায়গুলির যে-অভিন্নতা প্রতিপাদন করবার চেষ্টা করেছেন তার তাৎপর্যের মূল্য অল্প নয়। মাধবাচার্য ও শঙ্করাচার্য লোকায়ত-মত হিসাবে দেহাত্মবাদকেই সনাক্ত করতে চেয়েছেন। শঙ্করের উক্তি হতে মনে হয় যে, বোধ হয় তাঁর সময় পর্যন্ত এই দেহাত্মবাদই লোকায়ত-মতের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচিত হয়েছিল। রিস্-ডেভিড্‌সের মতে কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রেই 'লোকায়ত' এবং 'লোকায়তিক' শব্দের বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু বৌদ্ধ শাস্ত্রের কোথাও উপরোক্ত দেহাত্মবাদই যে লোকায়তিকদের মতবাদ এ-কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি।"[১]

লোকায়ত এবং তন্ত্র

বৌদ্ধ শাস্ত্রে লোকায়তের উল্লেখ

"লোকায়ত হলো ইহলোক-সংক্রান্ত দর্শন; যারা পরলোক মানে না, আত্মা মানে না, ধর্ম মানে না, মোক্ষ মানে না, তাদেরই বলে লোকায়তিক। তারা মনে করে জল মাটি-আগুন-হাওয়া দিয়ে গড়া এই মূর্ত পৃথিবীটাই একমাত্র সত্য, আত্মা বলতে দেহ ছাড়া আর কিছুই বোঝায় না। কথায় বলি বটে আমার দেহ, যেন আমি আর দেহ দুটো আলাদা কিছু। কিন্তু এ হলো নেহাৎই কথার কথা। যেমন কিনা বলা হয় রাহুর মাথা। আসলে রাহু তো আর সত্যিই মাথাটুকু ছাড়া আর কিছুই নয়।"[২]

লোকায়ত ইহলোকের দর্শন

"পণ্ডিত জওহরলাল যাদের বলেছেন 'মূঢ় জনতা', আমরা তাদেরই দর্শনের কথা এতক্ষণ আলোচনা করে এসেছি—লোকায়ত দর্শন বা জনসাধারণের দর্শনের কথা। লোকায়তিকদের বর্ণনায় স্বয়ং 'বুদ্ধঘোষ' বিতণ্ডাবাদী বলে বিশেষণ ব্যবহার করে গিয়েছেন। একথা আমাদের আজ স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের দেশে বস্তুবাদী দর্শন, আর জনসাধারণের দর্শন দুটো আলাদা কথা নয়। প্রাচীন-

লোকায়ত দর্শনই জনগণের দর্শন

১ দ্রঃ লোকায়ত দর্শন—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৫০।

২ ঐ ঐ পৃঃ ৫৪।

গণও বার বার লিখে গেছেন এবং আধুনিক পণ্ডিতরাও স্বীকার করেছেন যে 'লোকায়ত' কথার মানে একটা নয়—জনসাধারণের দর্শন এবং বস্তুবাদী দর্শন দুই-ই।"[১]

জ্ঞান ও কর্মের বিরোধ

বস্তুবাদ বনাম ভাববাদ

চার্বাকমত কেন দর্শন ?

জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের সম্পর্ক লইয়া ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে সুদীর্ঘ আলোচনা হইয়াছিল—সাধারণভাবে দর্শনের একটি মূল সমস্যাকে বুঝিবার জন্য এই তর্কাতর্কির উদ্ভব, আর দর্শনের সেই মূল সমস্যাটি হইল বস্তুবাদ বনাম ভাববাদের সমস্যা:—চেতনা পূর্বে না বস্তুজগৎ পূর্বে, চেতনা প্রাথমিক না বস্তু প্রাথমিক ? আমাদের দেশের দার্শনিক পরিভাষায় সমস্যাটি অনেক সময় চেতনকারণবাদ বনাম অচেতনকারণবাদ হিসাবে দেখা দিয়াছে ; চেতন পদার্থকেই বা চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মকেই পরম সত্য বলিব, না, অচেতন পদার্থকেই পরম সত্য বলা হইবে ?

লোকায়ত শব্দের সত্যকার অর্থ

জনসাধারণের দর্শন আর বস্তুবাদী দর্শন—আমাদের দেশে এই দুইটি কেন দুইটি পৃথক্ নামে পরিচিত হয় নাই জানিতে হইলে দেখা যাইবে যে, "যারা মাটি কামড়ে পড়েছিলো মাটির পৃথিবীকেই তারা মেনেছে সত্যি বলে। লোকায়তিকদের কাছে 'বার্তা' বা চাষবাসের চেয়ে বড়ো বিদ্যা আর কিছুই ছিলো না। আর সেজন্যেই তাদের চেতনায় এই মূর্ত মাটির পৃথিবীই ছিলো সব চেয়ে বড়ো সত্যি। খুব মোটা কথায় বললে বলা যায়, দেশের সাধারণ মানুষ খেটে খাওয়ায় বিশ্বাস হারায়নি। আর তাইজন্যেই ওরা বস্তুবাদী দর্শনকে অমনভাবে আপন করে নিয়েছিলো।" "লোকায়ত মানেও যা, 'বার্তা'কেই একমাত্র বিদ্যা মনে করাও তাই। একই কথা, কৃষকদের কথা। ওরা কাজ করে। ওরা মাটির বুকে ফসল ফলায়। তাই ওদের চেতনার নাম হলো 'লোকায়ত'।"[২]

---

১ লোকায়ত দর্শন—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৬১।

২ ঐ ঐ পৃঃ ৬৩।

"এই তো গেলো লোকায়ত দর্শন সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা। এখন এই দর্শনের গ্রন্থকারদের সম্বন্ধে কিছু কথা বলা দরকার। 'বৃহস্পতির সূত্র' বা 'নীতির' কথা পূর্বেই বলেছি। এখন আর এ বই পাবার উপায় নেই। অনেকে মনে করেন 'বৃহস্পতি' আর 'চার্বাক' খুব সম্ভব একই লোক। মাধবের সর্বদর্শনসংগ্রহের প্রথম অধ্যায়েই চার্বাকদর্শনের শিক্ষাগুলি একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে বর্ণিত আছে। চার্বাকদর্শন সম্পর্কে টুক্‌রো টুক্‌রো অনেক কথা ভারতীয় দর্শনের বিপুল সাহিত্যের অলিতে গলিতে খুঁজে পাওয়া যাবে।" "প্রাচীন শাস্ত্রকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সন্দেহবাদী সঞ্জয়ের, বস্তুবাদী অজিত কেশকম্বলীর (এঁর কথা পূর্বেই কিন্তু বলেছি), নিরাসক্ত পুরাণ কাশ্যপের, অদৃষ্টবাদী মস্করী গোশালের এবং ভূতবাদী ককুড় কাত্যায়নের কথা।"

লোকায়তিক দর্শনের প্রচলিত ও বিলুপ্ত গ্রন্থাদি

প্রাচীন লোকায়তিক শাস্ত্রকারগণ

বস্তুবাদিগণ আবার অনেক শাখায় বিভক্ত ছিলেন—একদল দেহের সঙ্গে আত্মার পার্থক্য স্বীকার করিতেন না, একদল ছিলেন যাঁহারা বাহ্যেন্দ্রিয়কেই মনে করিতেন আত্মা, অপর দল আবার অন্তঃকরণকেই আত্মা বলিয়া মনে করিতেন ইত্যাদি।

লোকায়ত দর্শনের শাখা-প্রশাখা

"লোকায়তের সঙ্গে সাংখ্য ও তন্ত্রের সম্পর্ক নিবিড়। সাংখ্যদর্শনের মূল কথাগুলি সামগ্রিকভাবে ভারতীয় চিন্তাধারাকে কতদূর প্রভাবিত করেছে সেকথা ভারতীয় দর্শনের ছাত্রদের অজানা নেই। 'সূত্রকৃতাঙ্গসূত্র' নামে জৈন পুঁথিতে লোকায়ত-নাস্তিকদের ঠিক পরেই আলোচনা করা হয়েছে সাংখ্যমতের এবং ঐ প্রসঙ্গে ভাষ্যকার শীলাঙ্ক বলেছেন যে লোকায়ত ও সাংখ্যে খুব বেশী তফাৎ নেই। কথাটা উপহাস করার মতো নয়। কারণ আদি ও অকৃত্রিম অবস্থায় সাংখ্যের সঙ্গে অধ্যাত্মবাদের সম্পর্ক যে ছিলোই না, একথা ভারতীয় দর্শনের পাঠকমাত্রই স্বীকার করতে বাধ্য। মূল সাংখ্যের সঙ্গে লোকায়তিকদের ঘনিষ্ঠতার কথা পুরোনো কালেরই আরো কিছু কিছু বইতে স্পষ্টভাবেই পাওয়া যাচ্ছে।"

লোকায়ত ও সাংখ্য

মূল সাংখ্য ও চার্বাক-মতের পার্থক্য ছিল অত্যন্ত অল্প

"হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন যে আজো ভারতবর্ষে লোকায়তিক আর কাপালিকদের প্রভাব খুব প্রবল। আজও এমন অনেক সম্প্রদায় টেঁকে রয়েছে যার অনুগামীরা মনে করেন দেহই হলো একমাত্র সত্য; তাঁদের ধর্মে স্ত্রী-পুরুষের মিলনই একমাত্র অনুষ্ঠান এবং তাঁদের মতে সিদ্ধি নির্ভর করছে এই মিলনের দীর্ঘ-স্থায়িত্বের ওপর। বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও সহজিয়ার মধ্যে এ ধরণের 'মিলন' দেখতে পাওয়া যাবে। এই বৈষ্ণবরা বিষ্ণু বা কৃষ্ণ কাউকে মানে না, বিশ্বাস করে শুধু দেহতে।"[১]

সহজিয়া ও বৈষ্ণব মতে চার্বাকমতের প্রভাব

কুমারিল প্রাভাকরমতের সমালোচনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে এই সম্প্রদায়ের নিকট মীমাংসা লোকায়তীকৃত হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে অন্তত কুমারিলের সময় চার্বাকমত বেশ প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। গীতায় বলা হইয়াছে—অসুরমত বা লোকায়ত মতের বক্তব্য এইরূপ:—অসত্যম-প্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্। অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥ (১৬।৮) বোধ হয় ইহার তাৎপর্য এই যে ঈশ্বরসৃষ্ট অর্থে জগৎ সত্য নহে; কারণ ঈশ্বর নাই। আর জগৎ তো কামোদ্ভূত—স্ত্রীপুরুষের মিলনজাত। এই অর্থে লোকায়তমতের প্রতিই গীতা ইঙ্গিত করিয়াছে বলিয়া মনে হয়; কারণ তন্ত্রেও ইহার প্রতিচ্ছবি পরিদৃষ্ট হয়।

ডক্টর দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী 'ভারতীয় বস্তুবাদের ইতিহাসে'র চতুর্থ পর্যায় অর্থাৎ নাস্তিক পর্যায়ের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে অধঃপাতে যাওয়া কয়েকটি বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য ছিল যৌনশৈথিল্য—এইগুলি ক্রমশ লোকায়ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়। এগুলির মধ্যে একটি ছিল কাপালিক সম্প্রদায়। "অর্থশাস্ত্র প্রণেতা বৃহস্পতির যুগে কাপালিক ছিল একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়; কিন্তু গুণরত্নের সময়ে দেখা যায় লোকায়ত ও কাপালিকদের মধ্যে অভেদ স্বীকৃত হইতেছে। লোকায়ত শব্দটি তখন ঘৃণাসূচক নামে পরিণত হইয়াছে।"

নৈষধচরিতে চার্বাকদর্শন সম্পর্কে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্লোক পাওয়া যায়:—

১। দ্রঃ লোকায়ত দর্শন—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

স্বকৃতে বঃ কথং শ্রদ্ধা স্বরতে চ কথং ন সা।
তৎকর্ম পুরুষঃ কুর্যাৎ যেনান্তে সুখমেধতে ॥
বলাৎ কুরুত পাপানি সন্তু তান্যকৃতানি বঃ।
সর্বান্ বাসকৃতান্ দোষানকৃতান্ মনুরব্রবীৎ ॥
পাপাত্তাপা মুদঃ পুণ্যাৎ পরাসোঃ স্যুরিতি শ্রুতিঃ।
বৈপরীত্যং ধ্রুবং সাক্ষাৎ তদাখ্যাত বলাবলে ॥

নৈষধচরিতে চার্বাকমত

চার্বাকদর্শন সম্পর্কে ডক্টর দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী বলেন :—"The voice of the Carvakas was the voice of revolt……It was an invitation for enjoying the beauties of life unperturbed by the ideas of heaven, hell and God. In the domain of philosophy the questions and doubts raised by the Carvakas set problems for all the other schools, made them think more carefully and saved them from much of dogmatism."[১]

১ History of Philosophy : Eastern and Western, Vol. I, p. 138 ; চার্বাকদর্শন—দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী

॥ খ ॥ জৈনদর্শন[১]

"এস্থলে আমরা জৈনদর্শনকে বৌদ্ধদর্শনের পূর্বে স্থান দিতেছি, কিন্তু আস্তিকদর্শনের নিকট পরাজয়ের ক্রম অনুযায়ী ইহার স্থান হওয়া উচিত পরে। কারণ জৈনধর্ম এবং জৈনদর্শন আজও ভারতে বর্তমান, ভারত হইতে উহাদিগকে নির্বাসিত করা সম্ভব হয় নাই।

সর্বদর্শনসংগ্রহে মাধবাচার্য কিন্তু জৈনদর্শনের আলোচনায় বলিয়াছেন—মুক্তকচ্ছ বা বৌদ্ধগণের এই সকল মত সহ্য করিতে না পারিয়া বিবসনগণ (বা দিগম্বর জৈনগণ) কোনোপ্রকারে স্থায়িত্ব লাভ করিয়া তাহাদের 'ক্ষণিকত্ববাদ' খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছে। এইরূপ বর্ণনার ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয় যে বৌদ্ধদের মতই বোধ হয় পূর্বে প্রচলিত ছিল। কিন্তু মাধবাচার্যের নির্ণীত কালের ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।"[২]

ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মতে—"অনেকে মনে করেন জৈনধর্ম বৌদ্ধ ধর্মেরই একটা অংগ। অনেকে বা ইহাও মনে করেন যে বৌদ্ধ ধর্ম এবং জৈন ধর্ম সমসাময়িক; কিন্তু ইহা সত্য নহে। অতি প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যেও জৈন বা নিগন্থদের উল্লেখ পাওয়া যায়।"[৩]

জৈন ধর্মের পরিপূরকরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল জৈনদর্শন, ইহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। মহাবীরকে যদিও আমরা সাধারণত জৈনধর্মের প্রবর্তক বলিয়া জানি, কিন্তু জৈনদের মতে মহাবীরের পূর্ববর্তী আরও অনেক তীর্থংকর এই ধর্মই জগৎকে দান করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে পার্শ্বনাথই সমধিক প্রসিদ্ধ। কিন্তু পার্শ্বনাথের শিক্ষার লিখিত কোনো বিবরণ আজও পাওয়া যায় নাই।

জৈনদের ধর্ম

১ মাধবীয় সর্বদর্শনসংগ্রহ (বংগানুবাদ), পৃঃ ৫৫-৯০ দ্রঃ।

২ ভারতদর্শনসার, পৃঃ ৯১।

৩ ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা, পৃঃ ৮৭।

সর্বস্বীকৃতমতে মহাবীরের জন্ম হয় খৃঃ পূঃ ৫৯৯ অব্দে, তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনা আজও রহস্যাবৃত; কল্পনা ও তথ্য তাঁহার জীবনীবর্ণনায় এক হইয়া গিয়াছে। তবে মহাবীরের ধর্ম-প্রচারের ফলে বহুলোক যে জৈন ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল তাহা অবিসংবাদিত সত্য।

জৈনদের বিশ্বাসের মূল কথা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা না করিলে জৈন-দর্শনকে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করা কঠিন। প্রথমত, কর্ম ও জন্মান্তরবাদ হিন্দু, বৌদ্ধ এবং জৈন—সকল দর্শনকেই সমভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। জৈনরা বিশ্বাস করেন যে, এই দেহে জন্মলাভ করিবার পূর্বে আমি বা ব্যক্তিবিশেষ আরও অনেক দেহে বাস করিয়াছি বা করিয়াছে। যাঁহারা যোগশক্তি-প্রভাবে পূর্বজন্মের কথা মনে করিতে সক্ষম, তাঁহাদিগকে বলা হয় 'জাতিস্মর'। জৈন তীর্থংকরগণ এই যোগশক্তিতে শক্তিমান্‌। কিন্তু তাঁহারা মনে করিতে সক্ষম হউন বা না হউন, জন্ম ইহার পূর্বেও সকলেরই আরম্ভ হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইতে পারে।[১] ইহাকেই বলা হয় 'জন্মান্তরবাদ'। আর কর্মানুসারে এই সকল জন্ম হইয়া থাকে—সেজন্য তাহার নাম 'কর্মবাদ'। এই 'কর্মবাদ' ও 'জন্মান্তরবাদে' সুপ্রাচীনকাল হইতেই ভারতীয় মন আস্থা স্থাপন করিয়া আসিয়াছে। একটি প্রমাণ দেওয়া হয় যে মানুষে মানুষে যে সকল প্রভেদ দেখা যায় দেহে, মনে ও ভাগ্যে, তাহার একটি সহজ ব্যাখ্যা প্রাক্তন কর্মে বিশ্বাস করিলেই পাওয়া যায়। একই পিতামাতার একই গৃহে জাত সন্তানগণের মধ্যে যে প্রভেদ, তাহারও কারণ হইতে পারে এই 'প্রাক্তন কর্ম'। জৈনদের ইহা একটি প্রধান বিশ্বাস।

জৈনদের দর্শন

কর্ম ও জন্মান্তর

জৈনধর্মের আর একটি বৈশিষ্ট্য অহিংসা। বৌদ্ধগণের অপেক্ষা সূক্ষ্মতর ও ব্যাপকতর অর্থে জৈনগণ 'অহিংসা পরম ধর্ম' এই তত্ত্বকে গ্রহণ করিয়াছে। পরোক্ষ বা অপরোক্ষ, যে কোনো প্রকারেই হউক না কেন, জীবহত্যার নিমিত্ত

১। বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরংতপ॥ গীতা।

হওয়াও যে অধর্ম, এই কথা জৈনগণ অনেক বেশী জোর দিয়া বলিয়াছে।

অহিংসা

"জীবহত্যাকে জৈনগণ এতো বড়ো পাপ মনে করে যে গৌণভাবে জীবহত্যার কারণ হওয়াকেও তাহারা পাপ বলিয়া মনে করিয়াছে। যে হত্যা করে সে ত পাপী বটেই, যাহার জন্য হত্যা করা হয় সেও পাপাক্রান্ত, জৈনদের ধর্মের ইহাই মর্মবাণী।" জৈন-ধর্মের ন্যায় অহিংসাতত্ত্বের এত বিস্তৃত অর্থ পৃথিবীর আর কোনো ধর্মই গ্রহণ করে নাই। সাধারণভাবে জীবে দয়া পুণ্য বলিয়া ঘোষিত হইলেও দৃশ্য অদৃশ্য কীটাণু বধ করাও যে হিংসা এবং পাপ একথা পৃথিবীতে স্পষ্ট করিয়া এক জৈনগণই বলিয়াছে।

শম, দম, সত্য, অস্তেয়, অপরিগ্রহ প্রভৃতির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছে এই জৈনধর্ম। নীতি-ধর্মের প্রতি ইহাদের (জৈনগণের) শ্রদ্ধা হিন্দুদের অপেক্ষা

অন্যান্য ধর্ম

গভীরতর এবং তাহাদের ব্রতচর্যাদি আরও কঠোর। জৈন-ধর্মের আদর্শ যে মহান্ তাহা অনস্বীকার্য। 'সন্ন্যাস' অপেক্ষা উচ্চতর অন্য কোনো আদর্শ ইহাদের নাই।

জৈন সাধুগণের 'ত্যাগের' প্রশ্নটি মহাবীরের দেহত্যাগের অল্পকাল পরেই

ত্যাগ

প্রবল আকার ধারণ করে, ফলে 'শ্বেতাম্বর' ও 'দিগম্বর' এই দুইটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর এই দুইটি প্রধান শাখা ভিন্নও জৈনগণের মধ্যে আরও সম্প্রদায়ভেদ আছে, কিন্তু তাহাদের আলোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

জ্ঞানলাভের উপায়কেই আমরা বলিয়া থাকি 'প্রমাণ'। জৈনদের মতে অধিগমের (বা জ্ঞানলাভের) উপায় দুইটি 'প্রমাণ' ও 'নয়'।[১] 'নয়' প্রমাণ

প্রমাণ ২টি

হইতে ভিন্ন আর একটি উপায়। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভেদে প্রমাণ পুনরায় দ্বিবিধ। 'প্রমাণ'কে জানিবার জন্য জ্ঞানের প্রকারভেদগুলিকেও জানা দরকার। মতি, শ্রুত, অবধি, মনঃপর্যয় এবং কেবল ভেদে জ্ঞান পাঁচ প্রকার। ইহার মধ্যে মতি ও শ্রুত পরোক্ষ প্রমাণ-লভ্য ; অবশিষ্ট তিনটি প্রত্যক্ষলভ্য।

---

১ 'প্রমাণনয়ৈরধিগমঃ' (উমাস্বামী)।

মতি অর্থে স্মৃতি, সংজ্ঞা, অনুমান ইত্যাদি বুঝায়। এককথায় চিন্তাগম্য যে জ্ঞান, যাহাকে 'প্রত্যভিজ্ঞা' বলি, যাহাকে আবার অনুমান বলি, সে সকল কিছুই মতির অন্তর্গত। যেহেতু মতি চিন্তালব্ধজ্ঞান, সেজন্য ইহা পরোক্ষ। ইহার পর শ্রুত। 'শ্রুত' আর আস্তিকগণের 'শ্রুতি' প্রায় একই বস্তু। জৈনগণ বেদকে অস্বীকার করিলেও নিজেদের অঙ্গ বা শাস্ত্রকে অস্বীকার করেন নাই। মহাবীর ও তাঁহার পূর্বসূরী তীর্থংকরগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন সে সকলই জৈনগণ অভ্রান্ত তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ঐগুলি একটি জ্ঞানের উপায়। তাহার নাম 'শ্রুত'। "আবার বিশ্বস্ত ব্যক্তির বাক্য হইতেও জ্ঞান হয়; অতএব অঙ্গপ্রবিষ্ট এবং অঙ্গবাহ্যভেদে শ্রুত দুই প্রকার। এই দুই প্রকার 'শ্রুত'ই পরোক্ষের অন্তর্গত।"[১]

মতি

শ্রুত

অবধি, মনঃপর্যয় এবং কেবলভেদে প্রত্যক্ষ ত্রিবিধ। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ হয় তাহা সকলের মতেই 'প্রত্যক্ষ', কিন্তু মনের সূক্ষ্ম শক্তির সাহায্যে সূক্ষ্ম তত্ত্বও অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন—আস্তিক দর্শনের ভাষায় যাহাকে বলা হয় 'যোগজ প্রত্যক্ষ'। সাধারণ ইন্দ্রিয়লভ্য যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাহার নাম 'অবধি', আর পরের মনের যে প্রত্যক্ষলভ্য জ্ঞান তাহার নাম মনঃপর্যয়। সর্বোচ্চ পরমতত্ত্বের যে সাক্ষাৎ জ্ঞান তাহার নাম 'কেবল'। তিন প্রকার জ্ঞানই 'অপরোক্ষ'।

অবধি

মনঃপর্যয়

কেবল

জৈনদের ভাষায় 'প্রমাণ' ২টি—প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা ৩টি, কারণ 'পরোক্ষ' বলিতে অনুমান ও শ্রুত (শ্রুতি) এই দুইটিই বুঝায়। আস্তিক দর্শন যাহাকে 'শ্রুত' বা 'শ্রুতি' বলিয়াছেন, জৈনদের মতে সেগুলি অপ্রমাণ, কিন্তু তাহাদের শাস্ত্র বা শ্রুত শব্দ-প্রমাণের সামিল।

প্রমাণ ৩টি

লক্ষণীয় এই যে জৈনগণ চার্বাকের মত শুধু ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষকেই 'প্রত্যক্ষ'

১ ভারতদর্শনসার, পৃঃ ১০১।

বলিতেন না, আর অনুমান স্বীকার করিলেও মীমাংসকগণের ন্যায় অর্থাপত্তি, উপমান এবং অনুপলব্ধিকে পৃথক্ প্রমাণ বলিয়া মানিতেন না। প্রত্যক্ষজ জ্ঞানই এই মতে 'মুখ্য' জ্ঞান, আর পরোক্ষ জ্ঞান 'গৌণ'। কেননা পূর্বলব্ধ জ্ঞানের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল পরোক্ষজ্ঞান।

জৈনগণের মতে প্রমাণ

উমাস্বামিন্ বলিয়াছেন যে অধিগম[১] বা সত্যকার জ্ঞানলাভের একটি উপায় 'প্রমাণ', অপরটি 'নয়'। আস্তিকগণের ভাষায় যাহাকে 'ন্যায়' বলা হয় 'নয়' তাহারই মত বস্তু। জ্ঞানলাভ করিয়া আমরা সেই জ্ঞানকে বাক্যাকারে প্রকাশ করি। জ্ঞানের এই প্রকারে বাক্যাকারে প্রকাশ করার পূর্বে আমাদের বিচার করা কর্তব্য কোন্ ভঙ্গীতে বাক্য কথিত হইলে প্রকৃত সত্য প্রকাশিত হয়। এই বাক্যভঙ্গীরই নাম 'নয়'। ইহাও জ্ঞানলাভের একটি উপায়; কারণ যে কোন ভাবে জ্ঞানকে প্রকাশ করিলেই 'অধিগম' হয় না। ভ্রান্তি বা ভ্রম থাকিয়া যাইবে। সেজন্য অধিগমের জন্য প্রমাণের সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়ের কথাও ভাবিতে হইবে।

স্যাদ্বাদ

জৈনগণের মতে যে কোন সত্যকে সাত প্রকারে প্রকাশ করা যায়। সেই জন্য ইহার নাম সপ্তভঙ্গী।[২] জৈনদের সংস্কৃতে এই সাতটি ভঙ্গী এইরূপ:— স্যাদস্তি (হয়ত আছে), স্যান্নাস্তি (হয়ত নাই), স্যাদস্তি নাস্তি (হয়ত আছে, হয়ত নাই), স্যাদবক্তব্যঃ (হয়ত ঠিক বলা যায় না), স্যাদস্তি অবক্তব্যঃ (হয়ত আছে কিন্তু ঠিক বলা যায় না), স্যান্নাস্তি অবক্তব্যঃ (হয়ত নাই, কিন্তু ঠিক বলা যায় না) স্যাদস্তি নাস্তি অবক্তব্যঃ (হয়ত আছে, হয়ত নাই এবং উভয়থাই অবক্তব্য)।[৩] জৈনগণের মতে যে কোন তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এই সাত প্রকার বাক্যভঙ্গীতেই প্রকাশ করা যায়। তাহা না করিলে পূর্ব সত্য প্রকাশ করা হয় না। সকল বস্তুই এক অর্থে আছে তো অন্য অর্থে নাই—এক স্থলে আছে তো অন্য স্থলে

সপ্তভঙ্গী

১ প্রমাণনয়ৈরধিগমঃ।
২ সর্বদর্শনসংগ্রহ (নরনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত বংগানুবাদ) পৃঃ ৮৪—৮৫।
৩ ভারতদর্শনসার, পৃঃ ১০৩।

নাই—সূক্ষ্মতর অর্থে 'অবক্তব্য'। অর্থাৎ নিশ্চিত রূপে কোন কিছু কোন প্রশ্নের উত্তরেই বলা সম্ভব নহে। একটি অনিশ্চয়তা সর্বত্রই রহিয়াছে। এই যে 'সপ্তভঙ্গী নয়', ইহার নাম 'স্যাদ্বাদ'[১]—প্রত্যেকটি বাক্যভঙ্গীরই আরম্ভে স্যাৎ (হইতে পারে) এই কথাটি থাকে বলিয়া এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। এই মতের আর একটি নাম 'অনেকান্তবাদ',[২] কারণ কোন কথাই একান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা ইহার সিদ্ধান্ত নহে।

প্রমাণ ও নয়ের সাহায্যে যে তত্ত্বার্থ জানা যায় তাহা কি প্রকার; আর যে ক্ষেত্রে 'অস্তি-নাস্তি-অবক্তব্যঃ' সর্বদাই প্রযোজ্য, সে স্থলে নিশ্চিত জ্ঞানের কি সম্ভাবনা থাকিতে পারে? এইস্থলে জ্ঞানের আপেক্ষিকতার কথা আসিয়া পড়ে। আমাদের সাধারণ কথোপকথনের ক্ষেত্রে জ্ঞান যে আপেক্ষিক এই সত্য অনেক সময় আমরা ভুলিয়া যাই, কারণ অভ্যাসের ফলেই এইরূপ দাঁড়াইয়া যায়। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে আমাদের জ্ঞানের মধ্যে একটি আপেক্ষিকতা রহিয়াছে। জৈনগণের 'স্যাদ্বাদে' এই আপেক্ষিকতার তত্ত্বটি বেশ প্রকট হইয়াছে। ইহার অগৌণ ফল এই যে কোন কিছুর সম্বন্ধেই নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব হইবে না। আস্তিকগণের শ্রুতিতে বলা হয় ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জৈনদের 'স্যাদ্বাদ' অনুসারে এখানেও সাত প্রকার উক্তি সম্ভব। ইহাতে জ্ঞানে অনিশ্চয়তা আসিয়া পড়ে, কিন্তু জৈনদের দর্শনে ঠিক তাহা ঘটে নাই। স্যাদ্বাদ একটি সতর্কীকরণ মাত্র। কোন একটি উক্তিকে একেবারে অকাট্য সত্য মনে করার পূর্বে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত—জৈনমতে ইহাই বক্তব্য।

প্রমাণ ও নয়

'ঈশ্বর' সম্পর্কে জৈনদের স্থির এবং নিশ্চিত সিদ্ধান্ত যে ঈশ্বর নাই। 'স্যাদ্বাদের' সঙ্গে এইরূপ একটি নিশ্চিত উক্তি পরস্পর বিরোধী বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু জৈনগণ 'অজ্ঞেয়ত্ববাদী' নহেন। জৈনগণের পূর্বে এবং পরে অনেকেই ঈশ্বরকে

প্রমেয় ঈশ্বর

১ সর্বদর্শনসংগ্রহ (বংগানুবাদ—নরনাথ মুখোপাধ্যায়), পৃঃ ৮৫।

২ 'স্যাদিত্যব্যয়মনেকান্তদ্যোতক ম্' [মল্লিষেণ 'অন্যযোগব্যবচ্ছেদিকা'—শ্লোক ৫-এ এই কথা বলিয়াছেন]।

অস্বীকার করিয়াছেন—অতএব যুক্তির অবতারণা এখানে নিরর্থক। ঈশ্বর নাই; ইহার অর্থ—সর্বগ, নিত্য, স্ববশ, বুদ্ধিমান্ জগতের কর্তা পুরুষবিশেষ কেহ নাই।[১] কিন্তু ঈশ্বরের অস্বীকৃতি হইতে ইহাও বুঝায় না যে, সর্বজ্ঞ কেহ নাই বা দেবতা নাই; তীর্থংকরগণ সকলেই সর্বজ্ঞ। আর স্বর্গবাসী বহু জীব আছেন মানুষ যাঁহাদের দেবতা বলিয়া মানে এবং পূজা করে।

আধুনিক চিন্তায় জীব বা আত্মা বলিলে আমরা মানবকেই বুঝি, বাকী সমস্তকেই 'জগৎ' এই সাধারণ আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু এ বিষয়ে জৈনগণের চিন্তাধারা একটু ভিন্ন-প্রকারের। তাঁহাদের মতে, জীব এবং অজীব ভেদে জগৎ দ্বিবিধ। 'জীব' অর্থে জ্ঞাতা আত্মা এবং জীবনধারী প্রাণী উভয়কেই বুঝায়। চেতনা বা বোধশক্তি এবং জ্ঞান—এই উভয়েই জীবের বিশ্লেষণ। 'জীব' জগতের সর্বত্র ছড়াইয়া রহিয়াছে—মানুষের দেহেই সীমাবদ্ধ নহে। 'নিম্ন প্রাণীর' দেহে, উদ্ভিদে, জলে, বায়ুতে সর্বত্রই জীব রহিয়াছে। এই সকল জীবের শ্রেণীবিভাগ নানাভাবে করা হইয়াছে। "(১) জীব সংসারী ও সিদ্ধ হইতে পারে (২) স্ত্রী পুরুষ এবং নপুংসক হইতে পারে (৩) দেবতা, মানব, তির্যক এবং নারকী জীবের আর একটি বিভাগ (৪) এক-ইন্দ্রিয়, দুই-ইন্দ্রিয়, তিন-ইন্দ্রিয়, চার-ইন্দ্রিয় এবং পাঁচ-ইন্দ্রিয়—জীবকে এই ৫ প্রকারেও ভাগ করা হয়। ইহা ভিন্ন (৫) পৃথ্বীকায়, অপ্‌কায়, তেজস্কায়, বায়ুকায় এবং বনস্পতিকায়, অর্থাৎ জীব যেরকম দেহ ধারণ করে, সেই অনুসারে তাহাকে আরও এক প্রকারে বিভক্ত করা চলে।"

জীব ও অজীব

এই সকলের নির্গলিত সিদ্ধান্ত এই যে, জীব জগতের সর্বত্রই আছে—কর্মবশে মাটির দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া দেবদেহ পর্যন্ত আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে।

কর্মবশে জীব একটি তিন-ইন্দ্রিয় দেহ লাভ করিতে পারে, যেমন পিপীলিকার দেহ। চার-ইন্দ্রিয় মাত্র আছে যে সকল প্রাণীর (যেমন মশা, মাছি ইত্যাদিতে), সেখানে জীবের আয়ুষ্কাল ছয় মাসের বেশী হইতে পারে না।

১ "কর্তাস্তি কশ্চিৎ জগতঃ, স চৈকঃ, স সর্বগঃ স স্ববশঃ স নিত্যঃ। ইমাঃ কুহেবাকবিড়ম্বনাঃ স্যুঃ। তেষাং ন যেষামনুশাসকস্ত্বম্।" (অন্যযোগব্যবচ্ছেদিকা ৬)।

এই সকল তত্ত্ব সাধারণ লোকের বোধগম্য নয়, কিন্তু 'কেবলী' বা চূড়ান্ত তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারীর নিকট স্পষ্ট।

জীব সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য এই যে,[১] উহা যখন যে দেহে বাস করে তখন সেই দেহের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ ঐ দেহের আয়তন লাভ করে। ইহার অর্থ এই যে আত্মার বা জীবের বিস্তৃতি ও সংকোচন সম্ভব। অন্যান্য দার্শনিকেরা কিন্তু আত্মাকে এইরূপে কল্পনা করেন নাই। ন্যায়, বেদান্ত ইত্যাদির মতে আত্মা 'অণু' অর্থাৎ 'সূক্ষ্ম'। দেহের সর্বত্র তাহার বিস্তৃতি চন্দনবৎ; সমস্ত দেহ ব্যাপ্ত করিয়া সে অবস্থান করে না। জৈনদের মতে ইহার ঠিক বিপরীত। তাহাদের মতে দেহের অনুপাতে আত্মা ছোটবড় হইয়া থাকে।

অজীব বা জগৎ

'জীব' ভিন্ন বিশ্বের আর সকল বস্তুই 'অজীব'—ধর্ম, অধর্ম, আকাশ এবং পুদ্গল। ইহারা সকলেই দ্রব্য, জীবও দ্রব্য। ইহাদের স্বরূপ সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে ইহারা সকলেই রূপহীন, অবিভাজ্য, নিষ্ক্রিয় এবং জগতের সর্বত্র বর্তমান। জীব এবং ধর্মাদি চারিটি অজীব বিস্তৃতিমান্, ইহারা কায়সম্পন্ন। ইহা ছাড়া আর একটি দ্রব্য আছে। তাহাকে 'কাল' বলা হয়। কালের কায় বা বিস্তৃতি নাই, আছে অসংখ্য অণু। ধর্ম, অধর্ম এবং আকাশের মতো কালও অরূপ—অজীবের মধ্যে 'পুদ্গল'-রূপী। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে 'পুদ্গলে'র অর্থ জড়। ধর্ম প্রভৃতি অজীব, অবিভাজ্য, কিন্তু 'পুদ্গল' অণুতে বিভাজ্য। কর্মবশে এই পুদ্গলের সহিত জড়িত হইলেই জীবের বন্ধ হয়।

'পুদ্গল'

জৈনগণ ৮৪ লক্ষ নরকের বিবরণ দিয়াছেন। প্রত্যেকটি নরকের ক্ষেত্রফল কত যোজন, তাহাও আমাদিগকে বলিয়াছেন। এইসকল নরকবাসিগণের দেহ, চিন্তা, দুঃখ ইত্যাদিরও বর্ণনা করা হইয়াছে।

জীব বা অজীবকে জানিলেই আমাদের সকল তত্ত্ব জানা হইল না। শুধুমাত্র

১ এই দর্শনের আলোচনায় লেখক উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'ভারতদর্শনসারে'র নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী।

এই জ্ঞানেই মোক্ষলাভ হয় না। মোক্ষের জন্য যে সকল তত্ত্ব প্রয়োজন, উমাস্বামীর মতে তাহারা 'সাতটি', কাহারও কাহারও মতে আবার 'নয়টি'। এই সাতটি তত্ত্বের মধ্যে জীব ও অজীব অবশ্যই আছে, উপরন্তু আছে আস্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জরা এবং মোক্ষ। যাঁহারা নয়টি তত্ত্ব স্বীকার করেন তাঁহারা ইহার সহিত পুণ্য এবং পাপ—এই দুটিও যোগ করিয়া লন। যাঁহাদের মতে সংখ্যা সাতটি, তাঁহারা পুণ্য এবং পাপকে 'আস্রব' এবং 'বন্ধের' অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকেন।

সপ্ত বা নব তত্ত্ব

জৈনগণের পাপপুণ্যের সূক্ষ্মতর বিচার বাস্তবিকই অভিনব। পাপপুণ্য সর্বদাই একটি আর একটির বিপরীত নহে—কোন ক্ষেত্রে উভয়ে পৃথক, কোন ক্ষেত্রে একটি আর একটির বিপরীত। হিংসা পাপ, অহিংসা পুণ্য; সত্য পুণ্য, অসত্য পাপ। এই সকল ক্ষেত্রে একটি আর একটির বিপরীত। কিন্তু কতকগুলি ক্রিয়া আছে যাহা না করিলে পাপ হয় না, কিন্তু করিলে পুণ্য হয়। যেমন অন্ন, বস্ত্র, পানীয় ইত্যাদির দান। পুণ্যের মধ্যে অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ও ব্রহ্মচর্যের স্থান অতি উচ্চে।

শুভ এবং অশুভ কর্ম জীবকে যখন আশ্রয় করে তখনই তাহার 'বন্ধ' হয়।[1] এই শুভাশুভ কর্ম যে উপায়ে জীবে আশ্রয় লাভ করে তাহার নাম 'আস্রব'। নানারূপে কর্ম জীবকে বদ্ধ করিতে পারে সেজন্য আস্রবও নানা প্রকারের। যেমন পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের জন্য জীবের বিষয়াসক্তির উদ্রেক হয়। বিষয়বাসনা বা লোভ জীবকে 'পুদ্‌গল' বা জড়ের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া ফেলে। ক্রোধ প্রভৃতি রিপুও এক প্রকারের আস্রব। অসূয়া বা পরনিন্দাও আস্রব।

বন্ধ

আস্রব

আস্রবের মাধ্যমে কর্ম জীবেতে প্রবিষ্ট হয়। 'সম্বর' দ্বারা এই প্রকার কর্ম-প্রবেশ রুদ্ধ হয়। কি কি উপায়ে কর্মপ্রবেশ রুদ্ধ করা সম্ভব, তাহাদেরও সংখ্যা এবং প্রকৃতি জৈনদর্শনে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।[2] ইহাদের সংখ্যা

[1] শুভাশুভফলৈরেবং মুচ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ ॥ গীতা।

[2] ভারতদর্শনসার, পৃঃ ১১৩।

পঞ্চাশেরও উপর। 'বন্ধ' আসে তখনই যখন পূর্বোক্ত 'সম্বর' দ্বারা জীব কর্মকে রুদ্ধ করিতে পারে না। জৈনমতে এই বন্ধের অর্থ পুদ্‌গলের সহিত জীবের সম্পর্ক। বন্ধেরও প্রকারভেদ স্বীকৃত হইয়াছে।

সম্বর

কর্মকে তো সহজে নিবৃত্ত করা যায় না, কারণ কোনো না কোনো প্রকারে জীব কর্ম দ্বারা বদ্ধ হইয়া যায়ই। সেজন্য সম্বরের পরও একটি ধর্মের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, যাহার দ্বারা অজ্ঞাতসারে প্রবিষ্ট বা পূর্ব-সঞ্চিত কর্ম হইতে জীব সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। ইহাকে বলে 'নির্জরা' বা তপস্যা অর্থাৎ কৃচ্ছ্র সাধন। এই 'নির্জরা' আবার বাহ্য এবং আভ্যন্তরভেদে দুই প্রকার। উপবাসাদি কায়িক ক্লেশ 'বাহ্য নির্জরা'; আর অনুশোচনা প্রায়শ্চিত্তাদি 'আভ্যন্তর নির্জরা'। সম্বর দ্বারা কর্ম রুদ্ধ এবং নির্জরা দ্বারা কর্ম ক্ষীণ হইলে মোক্ষ আসিবে। মুক্ত আত্মাকে জৈনগণ 'সিদ্ধ'ও বলিয়া থাকেন। 'জৈনমতে সিদ্ধ পুরুষ অসীম ও অনন্ত শান্তিতে নিজের পৃথক্ সত্তা রক্ষা করিয়া দ্বন্দ্বাতীত অবস্থায় অনন্তকাল নিঃশ্রেয়স ভোগ করিবেন।'

নির্জরা

পূর্বোক্ত সাতটি তত্ত্বের সম্যক্ জ্ঞান এবং তাহাদের প্রতি সম্যক্ শ্রদ্ধা মোক্ষলাভের উপায়। ইহার সহিত 'চারিত্র'ও প্রয়োজন। উমাস্বামীর মতে 'সম্যক্‌দর্শনজ্ঞানচারিত্রাণি মোক্ষমার্গঃ'। জীবনে তত্ত্বগুলির যথাযথ অনুসরণের নামই চারিত্র। জৈনগণ জ্ঞান এবং বিশ্বাসের কথা বলিলেও চারিত্রের উপর, অনুষ্ঠানের উপর জোর দিয়াছেন।[১]

চারিত্র

ডঃ রাধাকৃষ্ণনের ভাষায়, "Jainism offers us an empirical classification of things in the universe, and so argues for a plurality of spirits···. As a matter of fact the pluralistic universe in Jainism is only a relative point of view, and not an ultimate truth."

---

[১] জৈনদর্শনের সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য দ্রঃ ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা, পৃঃ ৯১—১০৯; Indian Philosophy—Radhakrishnan (Vol. I, pp. 334—340).

॥ গ ॥ বৌদ্ধ দর্শন

"আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৫৬০ শতকে নেপালের দক্ষিণে কপিলাবস্তুর অন্তর্গত লুম্বিনী গ্রামে শাক্য বংশে গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়।[১] তাঁহার পিতার নাম ছিল শুদ্ধোদন এবং মাতার নাম মহামায়া। নানা বিদ্যায় তিনি পারদর্শী হইলে তাঁহার পিতা তাঁহার সহিত গোপার বিবাহ দেন এবং তাঁহাকে নানাভাবে বিষয়ের প্রতি আসক্ত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এক সময় বৃদ্ধ, রোগাতুর, মৃত এবং একজন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। এই সময় তাঁহার বয়স ছিল ২৯ বৎসর। প্রথমে তিনি 'রাজগৃহে' যান, তারপর যান 'উরুবেলায়' এবং ৫ জন তপস্বীর সঙ্গে তপস্যা আরম্ভ করেন। ছয় বৎসর কঠোর তপস্যার পর গৌতম সহসা অনুভব করেন যে কেবল শুষ্ক তপস্যার দ্বারা সত্য লাভ করা সম্ভব নয়। ইহার পর অনেকটা সাধারণভাবে জীবন যাপন করিয়া নিরন্তর ধ্যানমগ্ন হইয়া তিনি পরম জ্ঞানলাভ করেন। তিনি বোঝেন যে, যে জ্ঞান তিনি লাভ করিয়াছেন, তাহার দ্বারাই সকলের দুঃখ নিবৃত্ত হইবে। তারপর দীর্ঘকাল নানাস্থানে পর্যটন করিয়া আশী বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। দেহত্যাগের সময় তিনি ধ্যাননিরত হইয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অবস্থার মধ্য দিয়া অবশেষে নির্বাণ লাভ করেন। ইহাই প্রসিদ্ধ 'মহাপরিনির্বাণ'।"[২] বুদ্ধের বচন অবলম্বনে এশিয়ার নানাদেশে গড়িয়া উঠিয়াছে বিরাট বৌদ্ধ সাহিত্য, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধ সাহিত্য একরূপ সম্পূর্ণভাবেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বুদ্ধ নিজে কোন গ্রন্থ লিখিয়া যান নাই, কিন্তু তাঁহার পরবর্তী কালে শিষ্যগণ তাঁহার উপদেশগুলি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। এই উপদেশগুলি তিন ভাগে

বুদ্ধের জীবন

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ

বুদ্ধের নিজের কোন গ্রন্থ নাই

---

১ Gautama Buddha by Charles A. Kincaid in the "Great Men of India" (The Home Library Club edition), pp. 415-427.

২। দ্রঃ বৈভাষিক দর্শন—অনন্তকুমার ভট্টাচার্য ন্যায়তর্কতীর্থ প্রণীত. পৃঃ [১/]।

বিভক্ত এবং উহারা পালি ভাষায় লিখিত। ইহাদিগকে বলা হইয়াছে 'সুত্ত-পিটক', 'বিনয়পিটক' এবং 'অভিধম্মপিটক'। 'দীঘনিকায়', 'মাজ্‌ঝিম নিকায়', 'সংযুত্ত নিকায়', 'অঙ্গুত্তর নিকায়', এবং 'খুদ্দক নিকায়'—এই পাঁচটি গ্রন্থ লইয়া রচিত 'সুত্তপিটক'। পঠ্যান, ধম্মসঙ্গানি, ধাতুকথা, পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি, বিভঙ্গ, যমক এবং কথাবত্থু লইয়া 'অভিধম্ম-পিটক'। বিনয়পিটকে প্রধানত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নিয়ম ও অনুশাসন প্রভৃতি উপদিষ্ট রহিয়াছে। পালি ভাষায় লিখিত এই সকল গ্রন্থরাজির মধ্যে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের যে অংশটি যে ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাকে বলা হয় 'স্থবিরবাদ' বা 'থেরবাদ।' এই সকল পালি গ্রন্থের বহু টীকাটিপ্পনী হইয়াছে এবং এই থেরবাদ অবলম্বন করিয়া অনেক প্রকরণ-গ্রন্থও লেখা হইয়াছে। কিন্তু বোধ হয় খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের 'বিসুদ্ধি-মগ্‌গের' লেখক 'বুদ্ধ-ঘোষের' পর থেরবাদ মতে আর বেশী গ্রন্থ ভারতবর্ষে লেখা হয় নাই।

পিটকত্রয়

সুত্তপিটক

অভিধম্মপিটক

বিনয়পিটক

স্থবিরবাদ বা থেরবাদ

এই থেরবাদ-বৌদ্ধধর্ম নানা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছিল।[১] বুদ্ধ-বচনের যথার্থ অর্থ কি, ইহা লইয়া বৌদ্ধ পণ্ডিতদের বহু মতভেদ উপস্থিত হয় এবং খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে অশোকের সময়[২] সংশয় সমাধানের জন্য তৃতীয়বার বৌদ্ধ পণ্ডিতদের পরিষদ ডাকা হয়, পরে খৃষ্টীয় প্রথম শতকে মহারাজ কণিষ্কের সময়ে[৩] আর একটি পরিষদ আহ্বান করা হয়। বোধ হয় খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকেই বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে অনেক মতভেদ হইয়াছিল, কারণ 'মহাসঙ্ঘিক' নামে এক বৌদ্ধ-সম্প্রদায় থেরবাদী সম্প্রদায় হইতে পৃথক্ হইয়া যায়। এই সম্প্রদায়ের লোকেরাই পরবর্তী যুগে 'মহাযান সম্প্রদায়' নামে খ্যাত হয়। খৃঃ পূঃ প্রথম শতকের পূর্ব

বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি

১ বিশেষ আলোচনার জন্য দ্রঃ 'History of Indian Philosophy', Vol. I. S. N. Das Gupta.

২ বৈভাষিক দর্শন [পৃঃ ।/॰]

৩ বৈভাষিক দর্শন [পৃঃ ।/॰-।৵॰]

হইতেই 'মহাযান সূত্র' নামে কতকগুলি গ্রন্থ লিখিত* হইতে আরম্ভ হয় এবং আনুমানিক খৃষ্টীয় চতুর্থ পঞ্চম শতক পর্যন্ত এই সকল সূত্র লিখিত হইতেছিল। ইহাদিগকে বলে 'বৈপুল্য সূত্র'। ইহার অনেকগুলিই খৃষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে চীনা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

মহা স হত্য সংস্কৃতে লিখিত

সমস্ত মহাযান সাহিত্যই সংস্কৃতে লিখিত। আমরা যেহেতু সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করিতেছি, সেজন্ত 'মহাযান বৌদ্ধ সাহিত্যই' এক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য।

পূর্বেই বলিয়াছি, বুদ্ধের তিরোভাবের অল্প দিন পরেই 'হীনযান' ও 'মহাযান' নামক দুইটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। হীনযান উত্তর ভারতে, আর মহাযান দক্ষিণে এবং চীনে, তিব্বতে ও সিংহলে ছড়াইয়া পড়ে। উভয়ের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে হীনযানের মতে মানুষের পক্ষে মানুষের নিজের মুক্তির চিন্তাই যথেষ্ট, কিন্তু মহাযানের মতে জগতের মুক্তিই আসল কাম্য।

হীনযান ও মহাযান মতের পার্থক্য

হীনযানের গন্তব্য ছোটো, মহাযানের লক্ষ্য বৃহৎ। নাম দুইটির এই অর্থ হইতে মনে হয়, উহা মহাযানিকদেরই সৃষ্টি; কারণ সাধারণ গৃহীত অর্থে মহাযানের শ্রেষ্ঠত্বই সূচিত হয়।

মহাযানের একটা বিশেষত্ব এই যে ইহাতে বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, প্রত্যেক বুদ্ধ প্রভৃতির কল্পনা কতকটা ঈশ্বরের ও দেবদেবীর স্থান পূরণ করে; আর ব্যক্তির উদ্ধারের অপেক্ষা সমস্ত জীব ও জগতের উদ্ধার কাম্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া উহা সহজেই একটা আন্তর্জাতিক স্থান অধিকার করে। হীনযান ও মহাযানের প্রভেদ মূলত ধর্মাচারের প্রভেদ, দর্শনের নয়।

মহাযানের বিশেষত্ব

বৌদ্ধগণ বহু শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল। ইহাদের অনেকগুলি পরস্পর পরস্পরের আচারের পার্থক্যের উপর নির্ভর করে। কিন্তু বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার এবং মাধ্যমিক—এই চারিটি শাখার পরস্পরের পার্থক্য দার্শনিক মতের পার্থক্যের উপর নির্ভর করে। তন্মধ্যে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক দুইটি

মতই সর্বাস্তিবাদ হইয়া উঠিয়াছে। "বৈভাষিকগণ বলেন যে, সকল বস্তুই অর্থাৎ বাহ্য বস্তু এবং অন্তরে যাহা অনুভব করা হয়—উহারা যে ভাবে প্রত্যক্ষীকৃত হয়, সে ভাবেই উহারা সত্য, কিন্তু সৌত্রান্তিকের মতে বাহ্য বস্তুর সত্তা আমরা সেই সেই বাহ্য বস্তুর জ্ঞান হইতেই প্রমাণ করিয়া থাকি। ঘটের সত্তা এজন্যই মানি, কারণ ঘট সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হয়, কাজেই বাহ্য বস্তুর সত্তা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বলিয়া মনে হইলে তাহা বাহ্য বস্তুর জ্ঞান হইতে অনুমান করা হয় মাত্র। ঘট সম্বন্ধে যখন জ্ঞান জন্মিতেছে তখন মানিতেই হইবে যে ঘট বলিয়া কোনো বস্তু অর্থাৎ ঘট জ্ঞানের অনুরূপ কোনো বস্তু বাহিরে আছেই। কারণ যদি সেরূপ কোনো বস্তু না থাকিত তো ঘটের জ্ঞান হইত কেমন করিয়া? যোগাচারীর মতে বাহ্য বস্তুই নাই। আমাদের মনেরই সংস্কারবশত নানারূপ জ্ঞান উঠিতেছে এবং লয় পাইতেছে। এই জ্ঞানকে বস্তু বলিয়া মনে করা ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নয়। মাধ্যমিক মত বা 'শূন্যবাদের' ইহাই তাৎপর্য যে, জাগতিক ব্যাপার সম্বন্ধে এবং আমাদের মনের নানা অনুভব সম্বন্ধে আমাদের যাহা কিছু মনে হয় তাহা সমস্তই কেবল প্রতীতি মাত্র; তাহার কোনো সত্তা নাই। তাহা সৎও নয়, অসৎও নয়। তাহা উভয়ের মধ্যপদবর্তী অর্থাৎ তাহা কেবল প্রতীতিমাত্র, প্রতিভাস মাত্র। প্রতিভাস ভিন্ন তাহাদের আর কোনো অস্তিত্বই নাই।[১]

বৈভাষিক মতবাদ

সৌত্রান্তিক মত

যোগাচার মত

মাধ্যমিক মত

পরবর্তীকালে আস্তিকমতাবলম্বী দার্শনিকেরা যখন বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তখন এই পূর্বোক্ত ৪টি মতের কোনো না কোনো মতকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের তর্কযুক্তি তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যে সর্বাস্তিবাদে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকগণের উৎপত্তি, সেই সর্বাস্তিবাদের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বসুবন্ধুকৃত 'অভিধর্মকোশ।' এই গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় শ্লোকের আকারে লিখিত।

বসুবন্ধুর 'অভিধর্মকোশ'

১ এই দর্শন সম্পর্কে লেখক ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা'র নিকট ঋণী।

হিউএন্‌সাঙ্‌ অষ্টম শতকে চীনা ভাষায় ইহার একটি অনুবাদ করেন। অভিধর্মকোশের মূলগ্রন্থ এখন প্রায় হারাইয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। এইখানি বৌদ্ধশাস্ত্রের অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

মহাযান সম্প্রদায় থেরবাদী বৌদ্ধদের হীনযান বলিয়া থাকেন। পঞ্চম শতকে বসুবন্ধুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা অসঙ্গ তাঁহার মহাযান সূত্রালংকারে বলিয়াছিলেন

মহাযান মত

যে, হীনযানীদের এই হীনযানভুক্ত বলা হয় কারণ তাঁহারা কেবলমাত্র নিজেদের নির্বাণের জন্যই উন্মুখ থাকেন, কিন্তু মহাযানীরা সকল প্রাণীর নির্বাণের জন্য উন্মুখ হইয়া থাকেন। সর্বপ্রাণীর দুঃখ নিবৃত্তি এবং নির্বাণ না হওয়া পর্যন্ত মহাযানীরা সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। হীনযানের মতে সকল বস্তুই ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু মহাযানের মতে সকল বস্তুই যে ক্ষণস্থায়ী, শুধু তাহাই নহে—তাহারা নিঃসত্ত্ব অর্থাৎ তাহাদের বাস্তবিকই কোনো সত্তা নাই। তাহারা কেবল প্রতীতি, কেবল প্রাতিভাস মাত্র। রজ্জুতে যেমন আমাদের সর্পভ্রম হয়, সেইরূপ সমস্ত জগৎ কেবলমাত্র প্রতীতিভ্রম। রজ্জু-সর্প স্থলে তবু তো রজ্জুর একটি সত্তা আছে, কিন্তু এই জগৎ-ভ্রমের অন্তরালে

অদ্বৈতবেদান্ত ও বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ

তাহার অধিষ্ঠানস্বরূপ কোনো সত্তা নাই। এইখানেই অদ্বৈত বেদান্তীদের সহিত বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদীর পার্থক্য। অদ্বৈত বেদান্তী বলেন যে, সকল ভ্রমের অন্তরালে তাহাদের অধিষ্ঠানস্বরূপ একটি সত্য বস্তু আছে। কিন্তু বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বলেন যে, এই জগতে যাহা আমরা দেখি, তাহা সমস্তই ভ্রম। তাহার অন্তরালে এমন কিছু নাই, যাহাকে আমরা সত্য বলিতে পারি। মরীচিকা যেমন শুধুই জলভ্রম, তাহার অন্তরালে যেমন কোনোও সত্য নাই, এই জগৎও তেমনি নানারূপে আমাদের চক্ষুর বিভ্রম জন্মাইতেছে। ইহার অন্তরালে কোনো কিছু সত্য বস্তু নাই। অনেকের মতে, নাগার্জুনই[১] প্রথম সমস্ত জগৎ-প্রপঞ্চ যে নিঃসত্ত্ব এবং শূন্যতামাত্র এই মত প্রচার করেন। কিন্তু এই

'মহাযানসূত্র'

ধারণা ভ্রান্তিমূলক। কারণ অধিকাংশ মহাযানসূত্রের মধ্যেই এই মতটি প্রচারিত হইয়াছে। অনেক যুক্তিতর্কের

---

[১] নাগার্জুনের আবির্ভাবকাল খৃষ্টীয় ১ম শতক।

সাহায্যে নাগার্জুন যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন, মহাযানসূত্রে[১] তাহাই বিনা তর্ক-যুক্তিতে সহজ সরল রূপে সিদ্ধান্ত হিসাবে গৃহীত হইয়াছে।

মহাযান শাস্ত্র[২] 'শূন্যবাদ' এবং 'বিজ্ঞানবাদ' এই দুই ভাগে বিভক্ত। বিজ্ঞানবাদ অর্থে এই কথাই বোঝায় যে জ্ঞান ছাড়া কোন জ্ঞেয় বস্তু নাই। যাহা কিছু জ্ঞেয় বলিয়া মনে হয় তাহা সমস্তই জ্ঞানের আকার মাত্র। সমস্ত প্রতীতিই স্বপ্নের ন্যায় 'কেবল ভ্রম'। 'শূন্যবাদীরা' এই ভ্রম যে একান্ত অনির্বাচ্য, কোন প্রকার লক্ষণের দ্বারাই যে ইহাদের বুঝা অসম্ভব —এই অংশেই বিশেষ ভাবে জোর দিয়াছেন।

বিজ্ঞানবাদ

শূন্যবাদ

'লঙ্কাবতারসূত্র' হইতেই সম্ভবত বিজ্ঞানবাদের আরম্ভ। 'শ্রদ্ধোৎপাদ-সূত্রে' অশ্বঘোষ বিজ্ঞানবাদের বিবরণ দিয়াছেন। বসুবন্ধু প্রথমে ছিলেন সর্বাস্তিবাদী, সেই জন্য তিনি প্রথমে লেখেন অভিধর্মকোষ, কিন্তু পরে জ্যেষ্ঠ অসঙ্গের উপদেশানুসারে 'বিজ্ঞানবাদ' মত গ্রহণ করেন। অসঙ্গ অনেক গ্রন্থই লিখিয়াছেন—তাহাদের মধ্যে 'যোগাচার-ভূমিশাস্ত্র'ই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। সম্ভবত এই নামানুসারেই আস্তিক দার্শনিকদের মধ্যে বিজ্ঞানবাদকে বলা হইত 'যোগাচারমত'। নাগার্জুন তাঁহার 'মাধ্যমিক-সূত্রে' প্রথম যুক্তিতর্ক-সহকারে 'শূন্যবাদ' প্রচার করেন, পরে আর্যদেব, চন্দ্রকীর্তি প্রভৃতি লেখকগণ তাঁহার গ্রন্থের উপর টীকা লেখেন। ষষ্ঠ শতকের চন্দ্রকীর্তির পর 'শূন্যবাদে'র উপর আর কোনো বিশিষ্ট গ্রন্থ লেখা হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না। অষ্টম শতকে কুমারিল ইহা খণ্ডন করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার পর শূন্যবাদীদের সহিত আস্তিকমতাবলম্বী দার্শনিকগণের বিশেষ কোন বিরোধের প্রমাণ মিলে না। বিনা বিচারেই আচার্য শংকর শূন্যবাদীর মত অবহেলার বস্তু বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।

বৌদ্ধদর্শনের বিভিন্ন গ্রন্থ

---

১ দ্রঃ 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা'র বুদ্ধের উক্তি।

২ দ্রঃ 'Some Mahayana Principles from Buddhism' (A Pelican Book) by Christmas Humphreys, pp 143-157.

সাধারণ ভাবে সমস্ত বৌদ্ধদর্শনে দুইটি মাত্র প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে—'প্রত্যক্ষ' ও 'অনুমান'। বৌদ্ধেরা বেদকে অস্বীকার করিয়াছেন—'শ্রুত'কে মানেন নাই। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের স্বরূপ কি—কখন উহার জ্ঞান হয়, আর কখন ভ্রম হয়, উহাদের ভিত্তি কি—ইত্যাকার অনেক প্রশ্নই দর্শনে উঠিয়াছে—বৌদ্ধদর্শনেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। এই সকল বিচারে ধর্মকীর্তির 'ন্যায়বিন্দু' একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। বৌদ্ধদের মতে প্রত্যক্ষ ৪ প্রকার—ইন্দ্রিয়জ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, আত্মসংবেদন ও যোগজ্ঞান। ইন্দ্রিয়সাহায্যে লব্ধ যে জ্ঞান তাহাই প্রত্যক্ষ এবং সকলের অভিমত। কিন্তু ইন্দ্রিয় একটা জিনিস দেখিলে বা স্পর্শ করিলে আর একটা জিনিসের জ্ঞানও মনে হইতে পারে। উহাও এক প্রকার প্রত্যক্ষই, কিন্তু এই প্রত্যক্ষজ জ্ঞান ইন্দ্রিয়জ নহে, 'মনোজ' অর্থাৎ মনোবিজ্ঞান। আবার নিজের সুখদুঃখের জ্ঞানও প্রত্যক্ষ, অথচ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান নয়; এই জ্ঞানের সংগে জ্ঞাতা আত্মাকেও জানিতে পারে বলিয়া ইহার নাম 'আত্মসংবেদন'। ইহা ছাড়া যোগীরা যে অনেক অতীন্দ্রিয় বস্তু প্রত্যক্ষ করেন তাহা প্রসিদ্ধ; যোগীরাই শুধু উহা লাভ করিয়া থাকেন বলিয়া ঐ প্রকার প্রত্যক্ষের নাম 'যোগিপ্রত্যক্ষ'। প্রত্যক্ষ জ্ঞান এই ৪ প্রকারের—জ্ঞানান্তরের অপেক্ষা ইহারা রাখে না।

প্রমাণ :—
দুইটি

প্রত্যক্ষ :—
৪ প্রকার

'স্বার্থ' এবং 'পরার্থ' ভেদে অনুমান দুই প্রকার। ধূম দেখিয়া আমি যখন উত্তাপের কল্পনা করি তখন সে অনুমান আমার নিজের জন্য হয়, পরকে বুঝাইবার জন্য নয়। ইহাকেই বলে 'স্বার্থানুমান'। আবার যে যুক্তিতে অগ্নির অস্তিত্ব জানা গিয়াছে তাহাই যখন বাক্যে প্রকাশ করিয়া পরকে বুঝানোর চেষ্টা করা হয়, তখন ঐ প্রকার অনুমানের নাম 'পরার্থানুমান'। উভয়ের পার্থক্য এই যে স্বার্থানুমানে জানা হয় নিজের, আর পরার্থানুমানে জানানো হয় পরকে। 'তর্কে' বা 'বাদে' পরার্থানুমানের ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু বাক্য ও পদ

অনুমান :—
২ প্রকার

বাদী ও প্রতিবাদীর একার্থেই ব্যবহার করা চাই। উভয়ের একটা সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হওয়ার পর তর্ক অন্য সিদ্ধান্তে অগ্রসর হইতে পারে না।

'প্রমাণ' ভিন্ন 'প্রমেয়ের' জ্ঞান অসম্ভব। কিন্তু প্রমাণের অভাব হইলেই প্রমেয় থাকে না, এমন নহে। আমি দেখিতে পাইতেছি না বলিয়া আমার জানা হইতেছে না, কিন্তু অদৃষ্ট বস্তু তো থাকিতে পারে। অনুমানের সময়ও এইরূপ বুঝিতে হইবে। আমি জানিতেছি না কারণ আমার অনুমান হইতেছে না, তাই বলিয়া অনুমেয় বস্তু নাই—একথা বলিতে পারি না। "এই সকল আলোচনায় বৌদ্ধরা যাহা বলিয়াছে তাহা আধুনিক শ্রেষ্ঠ চিন্তার সহিত অনায়াসেই তুলিত হইতে পারে"।[১] আমরা এস্থলে 'বৈভাষিক দর্শনে'র মতানুসারে প্রমাণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি—"আর সৌত্রান্তিক[২] প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলি প্রমেয়াংশে বৈভাষিক মতেরই অনুবর্তন করিয়াছে এবং নিজ নিজ সিদ্ধান্তানুযায়ী কোনও কোনও পদার্থ অস্বীকার করিয়াছে অথবা বিজ্ঞানাতিরিক্ত প্রমেয়গুলির অপারমার্থিকত্ব অথবা বিজ্ঞানের কল্পিতত্ব স্বীকার করিয়াছে। সৌত্রান্তিকগণ বৈভাষিক-সম্মত প্রমেয়গুলির মধ্যে আকাশ, প্রতিসংখ্যানিরোধ এবং অপ্রতি-সংখ্যানিরোধ এইগুলির দ্রব্যসত্তা অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা প্রমেয় মাত্রের ক্ষণিকত্বে চরম বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন। যোগাচার বা বিজ্ঞান-বাদিগণ একমাত্র বিজ্ঞানেরই দ্রব্যসত্তা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা বৈভাষিক সম্মত অন্যান্য প্রমেয়গুলিকে অপারমার্থিক বা প্রজ্ঞপ্তিসৎ বলিয়াছেন। অতএব জগতের ব্যাখ্যায় তাঁহারাও বৈভাষিক মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন। শূন্য-বাদিগণ কোন পদার্থেরই দ্রব্যসত্তা স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা অতিরিক্ত বিতণ্ডাপ্রিয় হইলেও জগদ্ব্যাপারে বৈভাষিক মতেরই সমর্থন করিয়াছেন।"

প্রমেয়

বৈভাষিক-সম্মত প্রমাণ

১ দ্রঃ 'ভারতদর্শনসার'।

২ দ্রঃ 'বৈভাষিকদর্শন' (অনন্ত তর্কতীর্থ)—ভূমিকা।

প্রসিদ্ধি অনুসারে বৌদ্ধমত চারি ভাগে বিভক্ত[১]—বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার এবং মাধ্যমিক। ইহাদের মধ্যে বৈভাষিকবাদই মূল। এই বাদেরই অভিমত পদার্থগুলির আংশিক খণ্ডনে অন্যান্য মতগুলির উদ্ভব হইয়াছে। অভিধর্মের অনুসরণ করিয়াই বৈভাষিকগণ নিজেদের মতানুযায়ী ধর্ম বা পদার্থসমূহের উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা করিয়াছেন। যাহা অনাস্রব প্রজ্ঞা তাহাকেই প্রধানত অভিধর্ম বলা হয়। এই প্রজ্ঞালাভের সহায়ক 'জ্ঞানপ্রস্থান', 'প্রকরণপাদ', 'বিজ্ঞানকায়', 'ধর্মস্কন্ধ', 'প্রজ্ঞপ্তিশাস্ত্র', 'ধাতুকায়' এবং 'সঙ্গীতিপর্যায়'কেও 'অভিধর্ম' নামে আখ্যা দেওয়া হয়। এই গ্রন্থগুলি সকলেই সংস্কৃত ভাষায় রচিত। পূর্বোক্ত অভিধর্ম-শাস্ত্রের মূল গ্রন্থ বর্তমানে দুর্লভ। কিন্তু ঐ গ্রন্থের অর্থ লইয়া দার্শনিকপ্রবর বসুবন্ধু 'অভিধর্মকোশ' নামে একখানি সংগ্রহগ্রন্থ রচনা করেন। বর্তমান প্রবন্ধে বৈভাষিক মতের যে আলোচনা করা হইবে তাহা ঐ অভিধর্মকোশের অনুযায়ী।

বৌদ্ধ মতের চারিটি ভাগ

অভিধর্মই বৈভাষিক মতবাদের মূল

বসুবন্ধুর অভিধর্মকোশ

বৈভাষিকগণ 'সর্বাস্তিবাদী' নামে প্রসিদ্ধ। পৃথিবী, অপ্ প্রভৃতি বাহ্যবস্তু এবং চিত্ত, চৈত্তাত্মক আভ্যন্তর বস্তু, এই ২ প্রকার বস্তুর বা ধর্মের যাঁহারা অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদেরই বলা হয় সর্বাস্তিবাদি-দার্শনিক।[২] (সর্বাস্তিবাদ এবং সর্বাস্তিত্ববাদ কথা দুইটি একই অর্থে ব্যবহৃত, কারণ ঐ দুইটিই চলিয়া আসিতেছে।) এই সর্বাস্তিবাদিগণ আবার ২ সম্প্রদায়ে বিভক্ত—বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক। সাধারণত 'সর্বাস্তিবাদ' বলিতে বৈভাষিক এবং সৌত্রান্তিক এই ২টি মতকেই বুঝাইয়া থাকে।

বৈভাষিকগণকেই সর্বাস্তিবাদী বলা হয়

সর্বাস্তিবাদের প্রকৃত অর্থ বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক মতবাদ

কিন্তু 'সর্বাস্তিবাদ' কথাটির মধ্যে আরও একটি গূঢ় অর্থ নিহিত আছে।

১ দ্রঃ বৈভাষিক দর্শন—অনন্ত তর্কতীর্থ, ভূমিকা।

২ 'বেদান্তদর্শন' ২, ২, ১৮ (শারীরকভাষ্য)।

বাহ্য ও আভ্যন্তর এই ২ প্রকার 'স্কন্ধ' বা সমুদায় স্বীকার করা সত্ত্বেও সৌত্রান্তিকগণ বৌদ্ধসমাজে সর্বাস্তিবাদী আখ্যায় প্রসিদ্ধ হইতে পারেন নাই। উঁহাদের নাম 'ক্ষণিকবাদী'। যাঁহারা ধর্মমাত্রেরই অতীত, অনাগত এবং বর্তমান এই ত্রিকালের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহারাই 'সর্বাস্তিবাদী বা সর্বাস্তিত্ববাদী' বলিয়া প্রসিদ্ধ।[১]

সৌত্রান্তিকগণ কিন্তু সর্বাস্তিবাদী আখ্যায় প্রসিদ্ধ নহেন

বৌদ্ধদের 'ঈশ্বর' বলিয়া কিছু নাই—সেজন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমেয় বস্তুর বিচার আমরা ঐ দর্শনে পাই না। বৌদ্ধগণ শুধু জীব বা আত্মা এবং জগতের কথাই আলোচনা করিয়াছেন; এই আলোচনা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে হইয়াছে এবং সূক্ষ্মভাবে হইয়াছে বলিয়া মতভেদও সম্ভবপর হইয়াছে। বুদ্ধ নিজে দার্শনিক গবেষণা অপেক্ষা উচ্চ চরিত্র গঠনেরই সমধিক পক্ষপাতী ছিলেন, সেজন্য তিনি বহুবার সূক্ষ্ম দার্শনিক প্রশ্নের উত্তর অনাবশ্যক বোধে দেন নাই। জগৎ নিত্য না অনিত্য, আত্মার পরলোক আছে কিনা, এসব প্রশ্নের আলোচনা বুদ্ধ নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করিয়াছেন।

বৌদ্ধদর্শনে ঈশ্বর অস্বীকৃত

জীব ও জগতের আলোচনা আছে

আমরা জানি বা দেখি যে জগতে একটি প্রবাহ আছে এবং যতদূর জানা গিয়াছে উহা 'অনাদি' এবং 'অনন্ত'। জীবনে বাল্যের পর কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য ও মৃত্যু পরপর আসে। ক্ষুদ্র কীটাণুর জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া বিশাল বিশ্বের চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা প্রভৃতি সকল স্থলেই রহিয়াছে একটি প্রবাহ—ঘটনার পর ঘটনার এক বিরাট পরম্পরা, একটি অপরিমেয় পরিবর্তনের স্রোত। বৌদ্ধদের মতে ইহার ভিতর কিছুই নিত্য নাই, সবই ক্ষণিকের লীলামাত্র।

জগৎপ্রবাহ বৌদ্ধমতে অনিত্য

১ সর্বাস্তিবাদ এবং বিশদভাবে বৈভাষিক মতবাদ জানিবার জন্য দ্রঃ 'বৈভাষিকদর্শন'—অনন্তকুমার ভট্টাচার্য ন্যায়তর্কতীর্থ প্রণীত।

দ্বিতীয়ত, এই ক্ষণিক বস্তুপ্রবাহের মধ্যে যখন যাহ তাহার পূর্বে আগত ঘটনাস্রোতের ফল কারণ ব্যতিরেকে উৎপন্ন হইতে পারে না—প্রত্যেকেরই কারণ আছে এবং এই কারণ স্রোতের পূর্বেই বর্তমান ছিল। সুতরাং সমস্ত কিছুরই আবির্ভাব বা 'সমুৎপাদ' পূর্ব আবির্ভূত ঘটনা হইতে উদ্ভূত—উহা হইতে 'প্রতীত্য' আসিয়া উৎপন্ন হয়। এই মতবাদের নাম 'প্রতীত্যসমুৎপাদ'। এই মতানুযায়ী ঈশ্বর-কর্তৃত্ব, ব্রহ্ম-স্রষ্টৃত্ব, আরম্ভবাদ ইত্যাদি মত পরিহৃত হয়।

ইহার পক্ষে যুক্তি

প্রতীত্যসমুৎপাদ

জৈনদের 'স্যাদ্বাদের' ন্যায় বৌদ্ধদের এই 'প্রতীত্যসমুৎপাদবাদ' উহাদের দর্শনকে একটি বিশিষ্ট আকার দান করিয়াছে। 'স্বয়ংসিদ্ধ বা 'স্বয়ম্ভূ'-কিছু নাই—এইটি স্বীকার করিয়া আমরা যেখান হইতেই আমাদের চিন্তা শুরু করি না কেন, একটি কার্যকারণের প্রবাহে আমাদের পড়িতেই হইবে। কিন্তু, আরম্ভ করা ..চিত কোথায়? জগতে যদি একমাত্র সত্য কিছু থাকে তবে সেটি বৌদ্ধদের মতে 'দুঃখ'। 'সর্বং দুঃখং দুঃখম্'। জীবনে রোগ, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি সহজ দৃষ্টান্ত। এই সকল এবং আরও শত শত দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে দুঃখ জগতে রহিয়াছে। এই দুঃখের একটা কারণও নিশ্চিতই আছে। এইভাবে আরম্ভ হয় বৌদ্ধদর্শনের স্রোত। এই স্রোতে 'দুঃখবাদ' সর্বত্র পরিস্ফুট রহিয়াছে।

প্রতীত্যসমুৎপাদবাদের গুরুত্ব

বৌদ্ধদর্শনে দুঃখবাদ

এই দুঃখের কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া বৌদ্ধদর্শন কর্মবাদকেই স্বীকার করিয়াছে—মানুষ যে কাজ করে তাহা একটি জাগতিক ব্যাপার, অন্যান্য ঐহিক ব্যাপারের ন্যায় ইহারও উৎপত্তি হয়, ইহারও ফল আছে আর সেই ফল বা কার্য, উৎপন্ন হইবার পর ইহারও বিলয় হয়। কর্মের চক্র হইতে আসে বন্ধন বা 'বন্ধ' আর 'বন্ধ' হইতে জন্মে দুঃখ। কিন্তু এই 'বন্ধ' কাহার হয়? সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে আত্মারই বন্ধন হয়। জৈনদের মতেও তাহাই। ইহার অর্থ এই যে, দেহের অতিরিক্ত আত্মা বলিয়া একটি পদার্থ আছে এবং এই

কর্মবাদ স্বীকৃত হইয়াছে

দেহের পর দেহান্তরে সে গমন করে। কিন্তু বৌদ্ধদের মতে দেহের অতিরিক্ত কোন আত্মা নাই,—যাহাকে আমরা আত্মা বলি, তাহাও একটা প্রবাহ মাত্রই[১]। অনুভূতির পর অনুভূতি, সুখের পর দুঃখ, বাসনার পর বাসনা এইভাবে একটি প্রবাহ চলিতেছে। নদীর স্রোত বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত জল যেমন একটু 'পঙ্কিল' থাকেই তেমনি এই স্রোতও রুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত দুঃখ থাকেই। যাহারা নিষ্কৃতি চায়, তাহাদের চেষ্টা হওয়া উচিত এই প্রবাহকে বন্ধ করা।

দেহাতিরিক্ত কোন আত্মা নাই, আত্মা একটি প্রবাহ মাত্র

বাসনাকে নির্মূল করিতে পারিলেই এই প্রবাহ থামিয়া যায়। ইহার জন্য প্রয়োজন যথার্থ জ্ঞানের। এই বোধের আত্মা নামক কোন স্থির পদার্থ নাই এবং এই সংগেই জানা বা বুঝা প্রয়োজন, আত্মার আবেষ্টক জগৎটি কি বস্তু।

বাসনাকে নির্মূল করিলেই জ্ঞানলাভ হয়

বৌদ্ধদের মতে সমস্ত শরীরে পঞ্চস্কন্ধ[২] ব্যতিরিক্ত অন্য কোন আত্মা নাই। এ কথাটি একটু বিশদভাবে বুঝাইয়া বলা দরকার। মল্লিনাথ মাঘকাব্যের টীকায় বলিয়াছেন :—"রূপ-বেদনা-বিজ্ঞান-সংজ্ঞা-সংস্কারাঃ পঞ্চস্কন্ধাঃ। তত্র বিষয়প্রপঞ্চো রূপস্কন্ধঃ, তজ্-জ্ঞানপ্রপঞ্চো বেদনাস্কন্ধঃ, আলয়বিজ্ঞানসন্তানো বিজ্ঞান-স্কন্ধঃ, নামপ্রপঞ্চঃ সংজ্ঞাস্কন্ধঃ, বাসনাপ্রপঞ্চঃ সংস্কারস্কন্ধঃ। এবং পঞ্চধা পরিবর্তমানো জ্ঞানসন্তান এব আত্মা ইতি বৌদ্ধাঃ। ["রূপস্কন্ধকে বলা হয় the phenomenal world, বিজ্ঞানস্কন্ধের অর্থ the stream of consciousnes, বেদনাস্কন্ধ বা the stream of the feelings of pleasure and pain, সংজ্ঞাস্কন্ধ বা the stream of cognitions leading to nomenclature of the objects perceived এবং সংস্কারস্কন্ধ বা the faculty of impression leading to the formation of ideas and experience.]

পঞ্চস্কন্ধ—এসম্বন্ধে মল্লিনাথ

১ 'সর্বকাযশরীরেষু মুক্তাঙ্গস্কন্ধপঞ্চকম্।
সৌগতানামিবাত্মান্যো নাস্তি মন্ত্রো মহীভৃতাম্॥'
'শিশুপালবধ' ২।২৮।

২ বৈভাষিকদর্শন পৃঃ ৬২ ; এই ৫টি স্কন্ধ যে মালিকা বা পরম্পরাসূত্রে গ্রথিত তাহাকে অনেক সময় 'বিনিসূতোর মালা' বলা হইয়াছে—History of Philosophy : Eastern & Western Vol. I, pp. 162

'জগৎ' কি বস্তু? একটা বিচিত্র, বহুধা-প্রতিভাত আবেষ্টনের মধ্যে আমরা বাস করি এবং এইটিকেই আমরা 'জগৎ' বলিয়া জানি। কিন্তু জগতের জ্ঞান কি আমরা ঠিকমত লাভ করি? কত বাহ্যবস্তু রহিয়াছে—সাধারণত আমরা তাহাদিগকে সত্য বলিয়াই মানি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা কি সত্য? এইস্থলে বৌদ্ধদর্শন চারিটি শাখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। তাহার দুইটি হীনযানের আর দুইটি মহাযানের অন্তর্গত। প্রশ্ন এই যে,—বাহ্য জগৎকে আমরা কতোটুকু জানি? কেহ কেহ বলেন,—উহা যেমন, ঠিক আমরা সেরূপেই উহাকে জানি, আবার কাহারও কাহারও মতে আমাদের এই বোধ প্রত্যক্ষলব্ধ নহে, অনুমানগম্য। আমাদের ইন্দ্রিয়নিচয়ে বাহ্যবস্তু সকল যে ক্রিয়া করে, তদ্দ্বারা আমরা ঐ সব বস্তুর অনুমান করিয়া লই। সকল বাহ্যপদার্থকেই এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে আমরা অনুমানের সাহায্যেই জানিতে পারি। এই বাহ্য ও আভ্যন্তর বস্তুকে স্বীকার করে বলিয়াই সর্বাস্তিবাদিগণের স্বীকৃত বস্তু 'স্বলক্ষণ' অর্থাৎ প্রত্যেক অনুভূতির বিষয় পৃথক্ এবং একক কোন জাতির অন্তর্গত নহে। প্রত্যেক বস্তুই কোন একটি মুহূর্তে একটি ক্ষণিক পদার্থমাত্র, চিরস্থায়ী কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত নহে। সেজন্যই বলা হয় যে প্রত্যেকের নিজের লক্ষণই লক্ষণ বা 'স্বলক্ষণ'।

জগতের স্বরূপ

সর্বাস্তিবাদীর স্বীকৃত 'স্বলক্ষণ'

আবার ইহাও বলা হয় যে, বাহ্য জগতের অস্তিত্ব নাই, উহা অলীক কেবল আমাদের বিজ্ঞানপ্রসূত সৃষ্টি মাত্র। আমাদের চিন্তা হইতে ইহার উদ্ভব। ইহাকেই বলে 'বিজ্ঞানবাদ' এবং এই শাখার মতবাদেরই নাম 'যোগাচার'। এই মতানুসারে—আমাদের জ্ঞাত 'জগৎ' অলীক, কিন্তু জ্ঞাতা 'আত্মা' সত্য। এই জ্ঞাতা ঊর্ণনাভের তন্তুবয়নের ন্যায় স্বকীয় চিন্তা দ্বারা নিজের চতুর্দিকে একটা কাল্পনিক বিশ্বের সৃষ্টি করে।[১]

বিজ্ঞানবাদ: যোগাচার ইহা হইতেই উদ্ভূত

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, জগৎ যদি কেবল কাল্পনিক প্রবাহমাত্রই হয়, তবে

১। দ্রঃ ভারতদর্শনসার, পৃঃ ১৩৩।

আত্মাকে স্থায়ী মনে করিবারই বা কি যুক্তি থাকিতে পারে? অতএব সকলই শূন্য, জগৎ নাই, আত্মা নাই, আছে শুধু একটা অলীকতা—ভিতরে বাহিরে সর্বত্র একটা বিরাট মিথ্যা ইন্দ্রজাল। এই ইন্দ্রজালকেই আমরা সত্য বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকি। যাঁহারা এই মত পোষণ করিতেন তাহাদিগকে বলা হইত 'মাধ্যমিক'। যোগাচার, ও 'মাধ্যমিক' শাখা মহাযানের, আর বৈভাষিক ও 'সৌত্রান্তিক' শাখা হীনযানের অন্তর্গত।

জগৎ অলীক

মাধ্যমিক মত

এই সকল মতবাদকে একত্র করিয়া মধ্বাচার্য 'সর্বদর্শন-সংগ্রহে' তাহাদের বলিয়াছেন 'ভাবনাচতুষ্টয়'—সমস্তই ক্ষণিক, সমস্তই দুঃখময়, সমস্তই স্বলক্ষণ এবং সমস্তই শূন্য : ভাবনা এই চতুর্বিধ। বৈভাষিক প্রভৃতি চারিটি মতবাদেরই মূল উৎস বুদ্ধের বাণী। কিন্তু এক এক শাখা উহার এক একটি দিকের উপর মনোযোগ দিয়াছে বেশী।

'ভাবনাচতুষ্টয়'ই বৌদ্ধ দর্শনের ৪টি মতবাদ

"এই চারিটি দার্শনিক ধারার বিবরণ হইতে দেখা যাইবে যে, বৌদ্ধদর্শনে 'প্রমাণ' আছে, কিন্তু 'প্রমেয়' নাই। জীব, জগৎ ও ঈশ্বর কোনটিই সত্য নয়। ঈশ্বর তো নাই-ই; মহাযানিকেরা কেবল 'বোধিসত্ত্ব' স্বীকার করিয়াছে অথবা বুদ্ধকেই 'ঈশ্বর' করিয়া লইয়াছে। জীব ও জগতের ভাগ্যে স্থিরত্ব ও স্থায়িত্ব নাই। বৌদ্ধদর্শনে প্রবল, তীব্র চিন্তা আছে, কিন্তু শেষ ফল 'শূন্য'[১]। উগ্র নৈতিক আকাঙ্ক্ষা আছে, সমাপ্তি 'নির্বাণ'। বৈচিত্র্য ও দুর্গাঢ়তা যথেষ্ট আছে, কিন্তু মানবাত্মার আশ্রয় কিছুই নাই। এককথায় বৌদ্ধদর্শনের সার বলিতে হইলে ইহাই আমাদিগকে বলিতে হয়।[২]"

বৌদ্ধ মত সম্বন্ধে উপরে যে আলোচনা করা হইল উহা অতি সংক্ষিপ্ত। কিন্তু বিশদ বিবরণ না দিলে এই মত সম্বন্ধে অনেক কথাই অস্পষ্ট থাকিয়া যায়। সেজন্য এ সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয়ের বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন মনে হয়।

---

১ দ্রঃ History of Philosophy; Eastern & Western, Vol, I. p 186.

২ ভারতদর্শনসার, পৃঃ ১৩৪।

গৌতমের মনে প্রথম প্রশ্নই ছিল এই যে, দুঃখকে কেমন করিয়া একেবারে ধ্বংস করা যায়। এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মনে হইল যে, কি না হইলে দুঃখ, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু হয় না; ইহার উত্তরে তাঁহার মনে হইল যে জন্ম না হইলে দুঃখ ব্যাধি প্রভৃতি কিছুই হইতে পারে না। কারণ যে জন্মে, তারই তো ব্যাধি দুঃখ হয়। পূর্বজন্মে সঞ্চিত কর্ম অর্থাৎ "ভব" না থাকিলে জন্ম হয় না। কোন বিষয়ে যদি বাসনা না জাগে তো লোকে কর্ম করে না। এই বাসনার নামই 'উপাদান'। তৃষ্ণা না থাকিলে এই কর্মপ্রবৃত্তি বা বাসনা জন্মে না। সুখদুঃখের অনুভব বা বেদনা না থাকিলে তৃষ্ণার উদ্ভব হয় না। 'ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ' ব্যতীত সুখদুঃখ বোধ হয় না এবং 'ইন্দ্রিয়' বা 'আয়তন' না থাকিলে ইন্দ্রিয়-স্পর্শ ঘটিতে পারে না। দেহ এবং মন না থাকিলে ইন্দ্রিয় থাকিতে পারে না, দেহ এবং মনকে একত্রে বলে 'নাম-রূপ'। বিজ্ঞান না থাকিলে আবার 'নাম-রূপ' হইতে পারে না, কারণ ইন্দ্রিয়ের মূল্যই 'জ্ঞান'। ইন্দ্রিয়শক্তি জ্ঞানেরই অন্তর্বর্তী। এই 'জ্ঞান' বা 'বিজ্ঞান' দেহ না হইলে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে না, সেইজন্য ইহার সহিত অনুস্যূত থাকে দেহ। আবার বিজ্ঞান ব জ্ঞান বলিয়া একটা পদার্থ নাই। অনেকগুলি প্রক্রিয়া পরস্পর সম্মিলিত হইয়া বিজ্ঞানকে উৎপন্ন করে। এই পরস্পর মিলনধর্মী প্রক্রিয়াগুলিকে বলে 'সংখার'। 'সংখার' না থাকিলে বিজ্ঞান হয় না। আবার 'অবিদ্যা' বা 'মিথ্যাজ্ঞান' না থাকিলে সংখারগুলি উৎপন্ন হইতে পারে না। এই বারটি পরস্পর কার্যকারণরূপে মিলিত হইয়া যেন চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছে এবং ইহাতেই জন্মমৃত্যুর সংসার-যাত্রা চলিতেছে। এইজন্যই ইহাকে বলে 'ভবচক্র'।[১]

পূর্বজন্ম

বাসনা-উপাদান

নাম-রূপ

সংখার

ভবচক্র

উপরে যাহা বলা হইল তাহা একটু অনুধাবন করিলেই দেখা যাইবে যে, বৌদ্ধমতে কার্যকারণ-সম্বন্ধ অন্যমত হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই মতে উপাদান

১ পৃঃ ১১৫—১১৬। ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা

কারণ, নিমিত্ত কারণ বা সহকারী কারণ প্রভৃতি কারণের বিভাগ স্বীকার করা হয় না, যাহা থাকিলে বা যাহা ঘটিলে, যাহা থাকে বা যাহা ঘটে, তাহাকেই তাহার 'কারণ' বলা হয়। ইহা ঘটিলে উহা ঘটিবে, এইটুকুই মাত্র কারণ-কার্যের সম্পর্ক। ইহাকেই আমরা পূর্বে প্রতীত্যসমুৎপাদ বলিয়াছি।১

কার্যকারণ-সম্বন্ধ

নৈয়ায়িকগণ সত্তাকে একটি 'জাতি' বলিয়া মনে করেন। অদ্বৈতবেদান্তী 'সচ্চিদানন্দ' এই তিনকেই এক 'সৎ'-স্বরূপ বলিয়া মনে করেন। জৈনদের মতে, সকল বস্তুই কোন অংশে ধ্রুব, সৎ, কোন অংশে পরিবর্তনীয়, আবার কোন অংশে নিরন্তর উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু বৌদ্ধেরা বলেন যে, যাহা কিছু কোন প্রয়োজন সিদ্ধি করে, কিংবা কোন কার্য করিতে সক্ষম, তাহাই 'সৎ' বা আছে। ইহাকেই বলা হয় 'অর্থ-ক্রিয়া-কারিত্ব নিয়ম'। এক ক্ষণে যে ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, সেই ক্ষণের ক্রিয়ানুসারে একটি বস্তু স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এক ক্ষণে যে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, দ্বিতীয় ক্ষণে সেই ক্রিয়াটিই আবার নিষ্পন্ন হইতে পারে না। সেইজন্য প্রথম ক্ষণের ক্রিয়া অনুযায়ী যে বস্তু আছে বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, দ্বিতীয় ক্ষণে সেই বস্তুটিই যে আছে তাহা বলা যায় না। দ্বিতীয় ক্ষণে আর একটি ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। সেই ক্রিয়ার অনুযায়ী দ্বিতীয় ক্ষণে আর একটি বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। একই বস্তু যদি দুই ক্ষণে থাকিত তবে সেই দুই ক্ষণেই সে একই কার্য করিত। যেহেতু দুই ক্ষণে দুইটি কার্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন, সেইজন্য, ইহা বলা যায় না যে, একটি বস্তুই দুই ক্ষণে আছে। কারণ, একই কার্য দুই ক্ষণে সম্পন্ন করা যায় না। ইহাকে বলে বৌদ্ধক্ষণভঙ্গবাদ।

বৌদ্ধদর্শনে 'সত্তার' অর্থ

ক্ষণভঙ্গবাদ

অদ্বৈত-বেদান্তীরা সাংখ্য, যোগ এবং মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনে স্থায়ী আত্মা স্বীকার করেন না। এই জন্য তাঁহাদের দর্শনকে 'নৈরাত্ম্য-দর্শন' বলে। আমরা পূর্বে বৌদ্ধধর্মস্থ 'পঞ্চস্কন্ধে'র উল্লেখ করিয়াছি এখানে সে বিষয়ে বক্তব্য এই যে, উহার রূপস্কন্ধের সহিত বর্তমান

নৈরাত্ম্য দর্শন

১ ঐ পৃঃ ১৩৭—১৪২।

যুগের ইউরোপীয় neo-realism-এর সাদৃশ্য অতি সুস্পষ্ট। যে রূপরসাদি বাহিরে, জ্ঞানকালে তাহাই আমাদের অন্তরে। এক অবস্থায় যাহা বহিস্থরূপে থাকে, তাহাই অন্য অবস্থায় রূপবোধের আকারে প্রকাশ পায়। আর একটি জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, অন্য শাস্ত্রে 'চেতনা' বলিতে জ্ঞান বুঝায়, কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রে 'চেতনা' বলিতে কর্মশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়া (volition) বুঝায়। ইন্দ্রিয়স্পর্শ হইতে আরম্ভ করিয়া 'পঞ্চস্কন্ধে'র ব্যাপার বিজ্ঞানে আসিয়া সমাপ্ত হয়। বৌদ্ধ 'বিজ্ঞান' শব্দ বুঝিতে এইজন্যই আমাদের কঠিন লাগে যে, বিজ্ঞানকে আমরা অনেক সময় একটা প্রকাশমাত্র বলিয়া বুঝি, কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রে রূপের ন্যায় 'বিজ্ঞান'ও একটা ধাতু, বস্তু বা পদার্থ। সংস্কারের অভ্যন্তরে যে ব্যাপার রহিয়াছে তাহাই 'চেতনা' বা 'volition', অর্থাৎ 'ইচ্ছাশক্তি'।

রূপস্কন্ধ ও neo-realism

চেতনা বা volition

বিজ্ঞান একটি বস্তু

অবিদ্যা, তৃষ্ণা ও কর্ম—ইহাই দুঃখের মূল। মূলীভূত কারণ 'অবিদ্যা', কারণ অবিদ্যার ফলেই পরম্পরাক্রমে আসে তৃষ্ণা ও উপাদান এবং তাহা হইতেই কর্ম উৎপন্ন হয়, আর কর্ম হইতেই জন্ম এবং জন্মমরণাদি দুঃখ ঘটে। এইজন্য সাধকের প্রধান কর্তব্য তৃষ্ণা-নিবৃত্তি। এই তৃষ্ণা-নিবৃত্তির জন্য এবং অবিদ্যা-নিবৃত্তির জন্য সাধককে দেখিতে হয় যেন রাগদ্বেষাদি আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিতে না পারে এবং যাহাতে যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া অবিদ্যা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এই তৃষ্ণাজালকে দূর করিবার জন্য[১] আমাদের 'আশ্রয়' করিতে হয় শীল (চরিত্র), সমাধি এবং প্রজ্ঞা।

দুঃখের মূল কারণ অবিদ্যা

বিশুদ্ধ 'শীল' (বা চরিত্র) আহরণ করিতে হইলে মানসিক, বাচিক ও কায়িক সংযমের আবশ্যক। এই সংযম, প্রথমত, চেতনা-সংযম বা ইচ্ছা-সংযমের দ্বারা হয়। দ্বিতীয়ত, মনোবৃত্তি বা চেতসিক সংযমের দ্বারা হয় এবং

১ এই মত বুদ্ধজন্মের বহু পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। উপনিষদে এবং গীতায় বহুস্থলে এই মত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

তৃতীয়ত, মনঃসংযম ও চতুর্থত, বাক্য এবং দেহের সংযমের দ্বারা হয়। 'সংযম' পাঁচ প্রকার—এই পাঁচটি সংযমের দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে সমাধিমার্গে প্রবেশলাভ সম্ভবপর হয়। এই সমাধিমার্গে প্রবেশ করিবার জন্য সর্বপ্রকার বিষয়ভোগের প্রতি যাহাতে একান্ত বৈরাগ্য আসে সেভাবে মনকে প্রস্তুত করিতে হয়। সংসারে সকল বস্তুই যে পরিণামে দুঃখকর—এই প্রকার চিন্তাদ্বারা সাংসারিক সমস্ত বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করা প্রয়োজন। শ্বাসপ্রশ্বাস-নিয়ন্ত্রণের দ্বারা মনঃসংযম যাহাতে সহজে ঘটিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এবং উপেক্ষা-ভাবনার দ্বারা চিত্তকে বিশুদ্ধ করিতে হয়। এইগুলিকে একত্রে বলে 'ব্রহ্মবিহার'। এইরূপে সম্পূর্ণভাবে চিত্ত প্রস্তুত হইলে ধ্যান অবলম্বন করিতে হয়। ক্রমশ স্থূল বিষয় হইতে সূক্ষ্ম বিষয়ে ধ্যান করিতে করিতে চরম ধ্যানে উপনীত হওয়া যায়। এই 'চতুর্থ' বা চরম ধ্যানে সুখ, দুঃখ এবং রাগ-দ্বেষের মূল পর্যন্ত উৎপাটিত হয় এবং পরিণামে একান্তভাবে 'নির্বাণ' লাভ করা যায়। 'নির্বাণে' সর্বদুঃখের নিবৃত্তি এবং নির্বাণলাভের পর জন্মান্তর ঘটে না।

শীল-চরিত্র

সংযম

ব্রহ্মবিহার

চরম ধ্যানেই নির্বাণ লাভ ঘটে

এই নির্বাণে যে ঠিক কি অবস্থা হয় সে সম্বন্ধে বৌদ্ধ লেখকগণের মধ্যে এবং ব্যাখ্যাতৃগণের মধ্যে অনেক মতভেদ দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন যে, 'নির্বাণ' একটি আনন্দময় অবস্থা। কেহ কেহ বলেন, ইহা সম্পূর্ণ ধ্বংস। বস্তুত, এই অবস্থার কথা ভাষায় বিবৃত করা যায় না। তবে এরূপ বলা যাইতে পারে যে, নির্বাণে জীবনধারার দীপটি একেবারে নির্বাপিত হয়, এবং সর্ব দুঃখ, সুখ, সর্ব জ্ঞান সমূলে বিনষ্ট হয়।[১]

নির্বাণ: ইহার স্বরূপ সম্বন্ধে মতভেদ

উপরে সাধারণভাবে বৌদ্ধদর্শনের কয়েকটি কথা বলা হইল। এস্থলে সংক্ষেপে বিভিন্ন মতের আলোচনা করা হইতেছে। নাগার্জুনের মাধ্যমিক

১ বৌদ্ধদর্শনের ইতিহাসের জন্য দ্রঃ 'ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা', পৃঃ ১২৬—১৩৬।

মতে প্রধান বক্তব্যই এই যে, কোন কিছু সম্বন্ধে কোন কিছুই বলা যায় না—কোন কিছু বলা যায় না বলিয়াই সেগুলি 'সৎ' বলাও চলে না, সমস্তই 'প্রতীতি মাত্র'। এই পৃথিবীর পরিদৃশ্যমান সমস্তই কেবল দৃশ্যের পর দৃশ্য, চিত্রের পর চিত্র, ইহাদের পশ্চাতে কোন তত্ত্ব বা সত্য নাই। এইজন্য নাগার্জুনের যুক্তিপদ্ধতি 'বিতণ্ডামূলক' অর্থাৎ তিনি কোন পক্ষকেই সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করেন না। তবে অপরে যে কেহ যে কোন মত স্থাপন করুন না কেন, তিনি সেই মত খণ্ডন করিতে প্রস্তুত। তাঁহার পূর্ববর্তী বৌদ্ধগণ বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়া আসিয়াছিলেন, নাগার্জুন প্রায় তাহার সমস্তগুলিকেই খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। "ইহাতে মনে হয় যে তাঁহার পূর্বে আস্তিক দর্শনের মতগুলি দার্শনিকভাবে গড়িয়া ওঠে নাই। কারণ সেই সমস্ত মত যদি তখন গড়িয়া উঠিত, তবে নাগার্জুন বৌদ্ধদর্শনের মতগুলিকেই খণ্ডন করিতে কেন চেষ্টা করিবেন?"

মাধ্যমিক মত

আধুনিক কালে ইউরোপীয় মনীষী Bradley (তাঁহার 'Appearance and Reality' গ্রন্থে) নাগার্জুনের পদ্ধতিতে—দ্রব্য, গুণ, সম্বন্ধ, দিক্, কাল, আত্মা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পদার্থগুলি যে কেবল প্রতীতিমাত্র, তাহাদের যে কোন লক্ষণ বা নির্বচন করা যায় না—তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

নাগার্জুনের প্রতীতি এবং Bradley-র Appearance

গুণ বা দ্রব্য বলিতে আমরা যাহা বুঝি সেগুলিকে বৌদ্ধদর্শনে বলিত 'ধর্ম'। বিজ্ঞানবাদিগণের মতে সমস্ত ধর্মই মনঃকল্পিত। বাহিরের জগৎ বলিয়া কিছু নাই এবং তাহার মধ্যে যে নিরন্তর প্রবাহ চলিতেছে বলিয়া মনে করি, তাহাও নাই। সমস্ত বহির্জগৎ আমাদেরই কল্পনায় নির্মিত হইয়া আমাদিগকেই বিমুগ্ধ করিতেছে। আমাদের জ্ঞানে দুইটি স্বতন্ত্র বৃত্তি পাই—একটিতে আমরা সমস্ত দৃশ্য বস্তুর সৃষ্টি করি, ইহাকে বলি 'খ্যাতি-বিজ্ঞান', এবং অপরটিতে তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করি, ইহাকে বলে 'বস্তু-প্রতিবিকল্প বিজ্ঞান'। ইহারা উভয়ে পরস্পরকে নিয়ন্ত্রিত করে। অনাদিকাল হইতে এই প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। আমাদের অন্তরস্থ বাসনা হইতেই এই সৃষ্টি চলিয়াছে। এই সৃষ্টির কোন স্বতন্ত্র স্বভাব নাই। ইহা নিঃস্বভাব, মায়া মাত্র। আমাদের

চিত্ত হইতেই নিরন্তর নানা প্রতীতির উদ্ভব ঘটিতেছে ; কিন্তু যে চিত্ত হইতে ইহা উৎপন্ন হইতেছে এবং যে চিত্ত জ্ঞাতা-জ্ঞেয়রূপে আপন জ্ঞানকে বিভক্ত করিতেছে তাহার কোন সত্তা নাই, কোন ধ্বংসও নাই। তাহা 'উৎপাদ-স্থিতি-ভঙ্গ-বিবর্জিত'। ইহাকে বলে 'আলয়-বিজ্ঞান'। 'লঙ্কাবতারসূত্রে' এই শ্রেণীর বিজ্ঞানবাদ প্রচারিত হইয়াছে। বিজ্ঞানবাদের প্রচারক এবং সমর্থক 'অশ্বঘোষ' উপনিষদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, আবার লঙ্কাবতারের মত যেন নাগার্জুনের মতের দ্বারা প্রভাবিত বলিয়াও মনে হয়। কিন্তু মাধ্যমিক মতই হউক আর বিজ্ঞানবাদই হউক, কেহই আমাদের ব্যবহারিক জ্ঞানকে যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারে নাই এবং অবিদ্যার সহিত চরম সত্যের সম্পর্ক কি তাহারও ব্যাখ্যা দিতে পারে নাই। চরম সত্যই যদি না থাকে, তবে অবিদ্যাই বা আসে কোথা হইতে?

বিজ্ঞানবাদ

পরবর্তী যুগে বিজ্ঞানবাদের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন 'মৈত্রেয়' 'অসঙ্গ' এবং 'বসুবন্ধু'। ইঁহাদের মতে বাহিরের জগতের কোন সত্তা নাই। কেবল একটিই মাত্র পারমার্থিকভাবে সত্য। সেই একটি চিন্ময় রূপ হইতে একদিকে যেমন আমরা আমাদিগকে জ্ঞাতা ও ভোক্তা বলিয়া মনে করি, অপরদিকে তেমনই বাহিরের জগতের সত্তাও স্বীকার করি। সমস্তই চিত্তের কল্পনামাত্র।[১]

বিজ্ঞানবাদীর মতে যে দুইটি বস্তু একই সময়ে উপলব্ধ বা জ্ঞাত হয় তাহারা বিভিন্ন নহে, জ্ঞানের বিষয় যেমন 'ঘট' ও সেই বিষয়ের জ্ঞান যেমন 'ঘটজ্ঞান'—এই উভয়কেই একই সময়ে লাভ করা যায়। কলস এবং কলসের জ্ঞান ভিন্ন নহে—সমস্তই জ্ঞানের আকার মাত্র। বসুবন্ধুর 'আলয়-বিজ্ঞানকে' আমরা কিয়ৎপরিমাণে সাংখ্যের কারণ-বুদ্ধির সহিত তুলনা করিতে পারি। একই 'কারণবুদ্ধি' যেমন বিভক্ত হইয়া নানা ব্যক্তির মধ্যে সেই সেইরূপে কার্য করে, তেমনই একই 'আলয়-বিজ্ঞান' নানা ব্যক্তির মধ্যে নানা সন্তান-ধারায় প্রকাশিত হয়। বসুবন্ধুর মতে আলয়বিজ্ঞান একটি সচ্চিদানন্দের উপর প্রতিষ্ঠিত।

বিজ্ঞানবাদের আলয়-বিজ্ঞান ও সাংখ্যের কারণবুদ্ধি

১ বিজ্ঞানবাদের বিশেষ আলোচনার জন্য দ্রঃ 'ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা', পৃঃ ১৪৪—১৪৭।

এই সচ্চিদানন্দস্বরূপ বস্তুকে আলয়-বিজ্ঞান-রূপে না দেখিলে জাগতিক নানা অনুভবের ব্যাখ্যা করা অসম্ভব হয়। এইরূপে সচ্চিদানন্দ বস্তুগুলিকে যদি মানিতেই হয় তবে অদ্বৈত বেদান্তের সহিত ইহার পার্থক্য অতি অল্পই ঘটে। পরবর্তী কালে শংকর যে অদ্বৈত বেদান্তের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, মূলত তাহা বসুবন্ধুর মতেরই একটা নূতন সংস্করণ বলিয়া ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মনে করেন।

বসুবন্ধু ও শংকরাচার্য

খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে 'ধর্মকীর্তি' তাঁহার 'ন্যায়বিন্দু' লেখেন এবং খৃষ্টীয় নবম শতকে 'ধর্মোত্তর' ইহার টীকা লেখেন; এই গ্রন্থটি সৌত্রান্তিকগণের তত্ত্ব-গ্রন্থ। এই গ্রন্থে সম্যক্ জ্ঞান ও যথার্থ জ্ঞানের লক্ষণ দিতে যাইয়া ইহারা বলেন যে, যে জ্ঞান না হইলে আমরা যাহা চাই তাহা পাইতে পারি না, তাহাকেই সম্যক্ জ্ঞান বলা হয়। যখন আমাদের কোন জ্ঞান হয় এবং সেই জ্ঞান অনুসারে কার্য করিয়া আমরা ফললাভ করি, তখন তাহাকেই আমরা 'সম্যক্ জ্ঞান' বলিয়া থাকি। জ্ঞান অনুসারেই আমাদের প্রবৃত্তি ঘটে। এই প্রবৃত্তি অনুসারে প্রবৃত্ত হইয়া যেরূপ জ্ঞানে উপলব্ধি করিয়াছি, সেইরূপ বস্তুই যদি বাহিরে লাভ করি তাহা হইলেই বুঝিতে পারি যে আমাদের জ্ঞানটি যথার্থ, এবং বস্তুলাভ করা মাত্রই জ্ঞানের কার্যের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সৌত্রান্তিক মতবাদ

যে স্থলে জ্ঞান অনুসারে বস্তু লাভ করা সম্ভবপর হয় না, সেস্থলে সেই জ্ঞানটিকে মিথ্যা বলিতে হয়। যেমন 'শুক্তিতে রজতভ্রম'। যাহা দেখিলাম, তাহা পাইলাম না, কিন্তু সকল দার্শনিকই বলেন যে সমস্ত বস্তুই ক্ষণিক, ফলে যে মুহূর্তে আমরা কোন বস্তু দেখি, সেই বস্তু সেই মুহূর্তেই ধ্বংস হইয়া যায়। ফলত, যে বস্তুটিকে আমরা দেখি তাহাকে আমরা পাইতে পারিনা। কিন্তু যে বস্তুটিকে দেখি তাহারই প্রতিক্ষণে উৎপন্ন তৎসদৃশ যে সন্তানধারা চলিতে থাকে তাহারই একটিকে লাভ করিতে পারি।[১]

বৌদ্ধমত ও Heraclitus

১ প্রসিদ্ধ দার্শনিক Heraclitus বলিয়াছেন, "One cannot bathe in the same water of a flowing stream twice".

কোন্ বস্তু কোন্ জাতীয়, কি নাম, কি তাহার গুণ ইত্যাদি সেই বস্তুটির প্রত্যক্ষের প্রথম মুহূর্তে আমরা কিছুই জানিতে পারি না। এইগুলিকে জানার নাম 'কল্পনা'; পরমুহূর্তে সেই কল্পনা অস্ফুট জ্ঞানের সহিত সংযুক্ত হয়। কল্পনার সহিত অস্ফুট জ্ঞানের এই সংযোগের নাম 'অভিলাষ'। এ সমস্তই আমাদের মানসিক ক্রিয়া—এগুলি বস্তুজাত নহে। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়স্বরূপের দ্বারা বস্তু সম্বন্ধে যাহা পাওয়া যায় তাহাই পাওয়া যায়, ফলে তাহা যে কি তাহা বলা যায় না। সেইজন্য প্রথম মুহূর্তের সেই জ্ঞানকে বলা হয় '**স্বলক্ষণ**'। Kant-এর মতের সহিত এই মতের সাদৃশ্য আছে। এই জ্ঞানেরই যথার্থ প্রামাণ্য।

সৌত্রান্তিকগণের স্বলক্ষণ ও Kant-এর মত

বৌদ্ধ দর্শনে কোন বস্তু যে স্থায়ী, তাহা স্বীকার করা হয় না। কোন বস্তুই ক্ষণের অধিক কাল অবস্থান করিতে পারে না, সেইজন্য বৌদ্ধ দর্শনে কোন আত্মাও স্বীকৃত হয় না, ঈশ্বরও এস্থলে অস্বীকৃত। এই দর্শনে অবয়ব বা part স্বীকৃত হয়, কিন্তু অবয়বী বা whole স্বীকৃত হয় না, সমবায়-সম্বন্ধ অস্বীকৃত, জাতি বা class-concept অস্বীকৃত। অবয়বী অস্বীকৃত বলিয়াই অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ মিলিয়া একটা স্বতন্ত্র অখণ্ড বস্তু হয়, ইহাও মানা হয় না। নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, দুই বা ততোধিক খণ্ড বা ভাগ যখন সমবায় সম্বন্ধে একত্রিত হয়, তখন একটি অবয়বী বা whole-এর সৃষ্টি হয়। সমবায় সম্বন্ধ স্বীকৃত হয় না বলিয়া বৌদ্ধগণ অবয়বী বলিয়া কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। যাহা অবয়বী বলিয়া আমাদের নিকট প্রতিভাত হয় তাহা কেবল সেইরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র, কিন্তু তাহার কোন স্বতন্ত্র বস্তুসত্তা নাই।

সকল বস্তুই ক্ষণ-বিধ্বংসী

ন্যায় ও বৌদ্ধ মত

রূপ, বেদনা প্রভৃতি 'স্কন্ধ'গুলি যেমন প্রকাশ পাইতেছে তেমনি পর মুহূর্তে ধ্বংস হইতেছে। প্রতি ধ্বংস হইতে তাহারই শক্তিতে আবার পরক্ষণে নূতন পঞ্চস্কন্ধ প্রতিভাত হইতেছে। এমনি করিয়া পূর্বক্ষণে বিনষ্ট পঞ্চস্কন্ধের বলে

সমগ্র জীবন পঞ্চ-স্কন্ধেরই উৎপত্তি এবং ধ্বংসের লীলামাত্র

'নূতন পঞ্চস্কন্ধের' উদয় হইতেছে। এমনি করিয়া 'ক্ষণ হইতে ক্ষণান্তরে পঞ্চস্কন্ধ সমষ্টিরূপ আত্মার ধারা প্রতিক্ষণে বিনষ্ট হইয়া প্রতিক্ষণে উৎপন্ন হইতেছে। "আমাদের সমস্ত জীবন ভরিয়া এই পঞ্চ স্কন্ধেরই নূতন নূতন উদয় ও নূতন নূতন ধ্বংস আবার নূতন নূতন উদয়ধারা ক্রমে চলিয়াছে। একটি ক্ষণের প্রদীপশিখা হইতে যেমন পরক্ষণের প্রদীপশিখা জন্ম লাভ করে, তেমনি প্রতিক্ষণের পঞ্চ স্কন্ধের ধ্বংসের সংগে পরক্ষণের পঞ্চস্কন্ধের উদয় হয়। এমনি করিয়া সমস্ত জীবৎকাল ব্যাপ্ত করিয়া পঞ্চস্কন্ধের নিরন্তর উৎপত্তি এবং বিনাশের ধারা চলিয়াছে, মৃত্যুতে এই ধারারই একটি নূতন দেহে নূতন প্রকাশ।"[১]

স্থায়ী আত্মার অভাবে ইহাদের উৎপত্তি এবং বিনাশ ঘটে

এইভাবে দেখিলে সহজেই বুঝা যায় যে স্থায়ী আত্মা না স্বীকার করিলেও জন্ম হইতে জন্মান্তরে পঞ্চস্কন্ধের বিনাশ এবং উৎপত্তি সহজেই স্বীকার করা যায়। তৃষ্ণা এবং কর্ম বিনষ্ট হইলে এই ধারাস্রোত বন্ধ হইয়া যায়; ইহাকেই বলে 'নির্বাণ'। ধারারূপে দর্শন ব্যতীত কোন কিছুরই কোন স্বরূপ নাই বলিয়া বিজ্ঞানবাদে এবং শূন্যবাদে সকল বস্তুকে বলা হইয়াছে 'নিঃস্বভাব'।

সকল বস্তুই নিঃস্বভাব

বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, এই ধর্ম যে দর্শনের উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে, তাহার যুক্তি-তর্ক অত্যন্ত সূক্ষ্ম। সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা সহসা বুঝিয়া আয়ত্ত করা দুঃসাধ্য। বৌদ্ধ দর্শনের দার্শনিক মার্গ হইতে পরবর্তী কালে বৌদ্ধতন্ত্রগুলির আবির্ভাব হয়।[২] মহাযান বৌদ্ধ-সিদ্ধান্ত, অদ্বৈতমত এবং যোগশাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া এই তন্ত্রগুলি লিখিত হয়।

১ দ্র: 'ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা'।

২ বৌদ্ধতন্ত্রের ইতিহাসের জন্য দ্র: 'ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা', পৃঃ ১৬১-১৬৭।

॥ অন্যান্য সাম্প্রদায়িক দর্শন ॥

ভারতীয় দর্শনের প্রধান শাখাগুলির আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু মাধবের 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' আরও কয়েকটি দর্শনের নাম এবং আলোচনা দেখা যায়। এস্থলে আমরা সংক্ষেপে মাধবোক্ত বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দর্শনের আলোচনা করিব।

পূর্ণপ্রজ্ঞ

পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন :—এই দর্শনের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহার প্রবর্তক আনন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ—ইনি দ্বৈতবাদী প্রসিদ্ধ মধ্বাচার্য।[১] রামানুজদর্শনের ন্যায় এই দর্শনে স্বীকৃত যে, জীব অণু-পরিমাণ,—মধ্যম পরিমাণও নহে, বিভুও নহে; মোক্ষকালে জীব পরমাত্মার দাসরূপে অবস্থান করে।

নকুলীশ পাশুপত

নকুলীশ পাশুপত দর্শন[২] :—বৈষ্ণবমতে অরুচিবশত মাহেশ্বরগণ পাশুপত শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহারা বলেন যে বৈষ্ণব মত দাসত্বেরই নামান্তর। সেই মতে জীব সর্বদাই ঈশ্বরের অধীন। মাহেশ্বরগণ মোক্ষে পরমেশ্বরের ঐশ্বর্যই কামনা করেন। নিরতিশয় ঐশ্বর্যকে বলে 'পারমৈশ্বর্য'। বৈষ্ণবমতে যুক্তি-যুক্ত মোক্ষ সিদ্ধি হইতে পারে না। মোক্ষ অবস্থায় দাস্য-ভাব যুক্তিবিরুদ্ধ। মাহেশ্বরগণ অনুমান করেন যে, সেবক কখনও মুক্ত হইতে পারে না, কেননা সে সর্বদাই অধীন এবং বদ্ধজীবের ন্যায় তাহার 'পারমৈশ্বর্য' নাই। যুক্তিযুক্ত মোক্ষ অবস্থায় মুক্ত জীবের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে; ফলে মুক্ত অবস্থায় জীব পরমেশ্বরের তুল্য গুণযুক্ত এবং সমুদয় দুঃখবীজরহিত হওয়ায় সে তখন পরমেশ্বরের

মোক্ষ সম্পর্কে বৈষ্ণব ও মাহেশ্বর মত

মোক্ষ-পারমৈশ্বর্য

১ বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যায় মধ্বের দ্বৈতবাদ অংশ দ্রষ্টব্য।

২ "নকুলীশ পাশুপত মত ঈশ্বরকে একান্ত স্বতন্ত্র বলিয়া মানিয়াছেন কর্ম এবং কর্মফলকে অপেক্ষা না করিয়াই ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়া থাকেন। চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে এবং ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিসম্পন্ন হইলে, ঈশ্বর মুক্তি বিধান করেন।" (ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা, পৃঃ ১৬৯)

ন্যায়ই হয়। এই প্রকারের মোক্ষই পাশুপত-শাস্ত্রের আলোচনায় লাভ করা যায়।

পাশুপত নাম হইল কেন?

পশু বা জীবগণের পতি মহেশ্বর। তাঁহার দ্বারা কথিত শাস্ত্রের নাম 'পাশুপত শাস্ত্র'। ব্রহ্ম হইতে স্থাবর পর্যন্ত সমস্তই দেবদেব মহাদেবের পশু বলিয়া কথিত হয়। তাহারা সকলেই মহাদেবের অপেক্ষা অপকৃষ্ট।

ইহার আলোচ্য বিষয়-বস্তু

এই দর্শনে মুক্তজীবগণের স্বাতন্ত্র্য, গুরুর স্বরূপ, লাভাদি নয়টি গণ, পঞ্চবিধ লাভ, পঞ্চবিধ মন, পঞ্চবিধ উপায়, পঞ্চবিধ দেশ, পঞ্চবিধ অবস্থা, পঞ্চবিধ বিশুদ্ধি, পঞ্চবিধ দীক্ষাকারী, পঞ্চবিধ বল, তিন প্রকার বৃত্তি, বিবিধ দুঃখান্ত, পঞ্চবিধ দৃক্‌শক্তি, ত্রিবিধ ক্রিয়াশক্তি, ত্রিবিধ কার্য, দ্বিবিধ বিদ্যা, দ্বিবিধ কলা, দ্বিবিধ পশু, কারণ ঈশ্বর, যোগ দ্বিবিধ, বিধি দ্বিবিধ, চর্যা দ্বিবিধ, ব্রতরূপ চর্যা, হসিতাদি ছয়টি অঙ্গ, দ্বাররূপ চর্যা, সমাসের স্বরূপ, বিস্তরের স্বরূপ, বিভাগের স্বরূপ, নিরপেক্ষ ঈশ্বরের কারণত্ব, কর্মের উপযোগ, যথাযথ তত্ত্বনিশ্চয় হইতে মোক্ষলাভ ইত্যাদির আলোচনা করা হইয়াছে।[1]

শৈব দর্শন

শৈবদর্শন[2] ঃ—এই দর্শনবাদ দাক্ষিণাত্যে বিশেষত তামিল দেশে বিশেষভাবে প্রচলিত। কেহ কেহ বলেন এই মতবাদ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে প্রথম প্রবর্তিত হয়। শৈবগণ 'সেশ্বরসাংখ্যের' সহিত অনেক বিষয়ে একমত। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর, পুরুষ ও জড়জগৎ অনাদি কাল হইতেই পৃথক্ সত্তা বিশিষ্ট এবং এই দর্শনের উদ্দেশ্য পুরুষকে জড় হইতে পৃথক্ করিয়া ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের সহিত মিলিত করা। এই দর্শনে শিবই ঈশ্বর এবং তিনটি পৃথক্ তত্ত্বের পরস্পর সম্বন্ধ পশু-স্বামী, পশু ও তাহার বন্ধনরজ্জু ইত্যাদি দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝান হইয়াছে।

শৈবমত ও যোগদর্শন

ঈশ্বর, জীব এবং জড় জগৎ

১ বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রঃ সর্বদর্শনসংগ্রহ (বংগানুবাদ) পৃঃ ১৬১—১৭৪।

২ "...বীরশৈব মতের শৈবদর্শন শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্ম মানিয়া অনেকটা রামানুজের মতই অবলম্বন করিয়াছে।" (ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা'—পৃঃ ১৬৯)।

পাশুপত ও শৈব-মতের পার্থক্য

এই দর্শনে মোক্ষসাধনীভূত জ্ঞান বিষয়ক পতি, পশু ও পাশ পদার্থ তিনটির স্বরূপ নির্ণয় করা প্রয়োজন। মুক্তাত্মদিগের যদিও শিবত্ব আছে কিন্তু তাহারা পরমেশ্বরের অধীন বলিয়া তাহাদের স্বাতন্ত্র্য নাই। নকুলীশ পাশুপতদর্শনে মুক্তাত্মগণের কোনরূপ পরতন্ত্রতা নাই বলা আছে, কিন্তু এই দর্শনে তাহাদের পরতন্ত্রতা স্বীকৃত।

ইহার আলোচ্য বিষয়

এই দর্শনের আলোচ্য—তিনটি মূল পদার্থ। বিদ্যাদি পাদচতুষ্টয়, পতির স্বরূপ, অনুমানের দ্বারা ঈশ্বরাস্তিত্ব সিদ্ধি, দেহাদি পদার্থের কার্যত্ব, ঈশ্বরের কর্তৃত্ব জীবকর্মাদি সাপেক্ষ, কর্মাদি সাপেক্ষে ঈশ্বরের কারণত্ব, স্বাতন্ত্র্যের অর্থ, ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব, ঈশ্বরের প্রাকৃত শরীর নাই, ঈশ্বরের কৃত্য, শিব শব্দের অর্থ, পশু শব্দের অর্থ, পশু তিন প্রকার, বিজ্ঞান-কেবল বা বিজ্ঞানাকলের স্বরূপ, প্রলয়কেবল বা প্রলয়াকলের স্বরূপ, সকলের স্বরূপ, আট প্রকার বিদ্যেশ্বর, পুর্যষ্টক, দ্বিবিধ সকল, ১১৮ প্রকার মন্ত্রেশ্বরগণ, চতুর্বিধ পার, প্রাবৃতীশ, বল, কর্ম, মায়া ইত্যাদি।[১]

প্রত্যভিজ্ঞা

পর এবং অপর সিদ্ধি

প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন[২] :—অভিজ্ঞাশব্দের সহিত প্রতি উপসর্গ যোগ করিয়া 'প্রত্যভিজ্ঞা' পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। 'প্রতি' উপসর্গের অর্থ পুনরায়। দুইটি কারণে অভিজ্ঞান উপস্থিত হয় :—(১) অনুভবের জন্য, (২) স্মৃতির জন্য। আমি ঈশ্বর, অপর কিছুই নহে—এই প্রকার যে সাক্ষাৎকার তাহাকে বলে 'প্রত্যভিজ্ঞা'। এই প্রত্যভিজ্ঞামাত্রেই 'পর' এবং 'অপর সিদ্ধি' লাভ ঘটে। পর সিদ্ধি মুক্তি এবং অপর সিদ্ধি অভ্যুদয়, দেবলোক প্রাপ্তি ইত্যাদি। সাক্ষাৎকারের তারতম্য-বশত সিদ্ধিরও তারতম্য ঘটে। এই সম্প্রদায়ভুক্ত লোক কাশ্মীর দেশে দেখিতে পাওয়া যায়।

---

১ বিশদ আলোচনার জন্য দ্রঃ সর্বদর্শন সংগ্রহ (বংগানুবাদ) পৃঃ ১৭৫—১৯২। আরও দ্রঃ History of Indian Philosophy, Eastern and Western, Vol. I, pp.369—380.

২ "কাশ্মীরের প্রত্যভিজ্ঞা খৃষ্টীয় সপ্তম, অষ্টম, শতাব্দী হইতেই প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই দর্শনে প্রধান প্রতিপাদ্য ঈশ্বরজ্ঞান এবং ইচ্ছার স্বরূপ। এই জগৎ তাঁহারই শক্তিতে, তাঁহারই প্রতিবিম্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছে এবং আমরা সকলে তাঁহারই প্রতিবিম্ব স্বরূপ। আমরা যে তিনিই এবং তিনিই যে আমরা ইহা চিনিতে পারিলেই মুক্তি। প্রত্যভিজ্ঞা অর্থ চেনা"—ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা, পৃঃ ১৬৮।

এই শাস্ত্রে কি কি আছে তাহা শাস্ত্রজ্ঞগণ এইরূপে বিবৃত করিয়াছেন[১]— 'সূত্র' অর্থাৎ সংক্ষেপে অর্থবোধন, 'বৃত্তি' অর্থাৎ তাহার অন্বয়ার্থ কথন, 'বিবৃতি' অর্থাৎ পদান্তরের দ্বারা অর্থবোধন ও তাহার 'লঘ্বী' অর্থাৎ প্রাপক। 'বিমর্শিনী' শব্দের অর্থ অধিক বিচার এবং তাহাও বৃহৎভাবে এবং অবৃহৎভাবে হইতে পারে, সেইজন্য উভয় ভাবেই বলা হইয়াছে। এই প্রকরণ ও বিবরণ-পঞ্চকে ক্রমে ক্রমে প্রত্যভিজ্ঞা শাস্ত্রার্থ কথিত হইয়াছে।[২]

ইহার আলোচ্য

শাস্ত্রারম্ভের প্রথম সূত্রে বলা হইয়াছে যে, মহেশ্বরের দাসত্ব কথঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইয়া এবং লোকের উপকার ইচ্ছা করিয়া সমস্ত সম্পৎ প্রাপ্তির হেতু এই 'প্রত্যভিজ্ঞা' শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে। এই দর্শনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে, যেমন, প্রত্যভিজ্ঞার উদয় হইলেই মোক্ষলাভ হয়, প্রত্যভিজ্ঞা শাস্ত্রের অন্যান্য গ্রন্থের কথা, 'কথঞ্চিৎ আসাদ্য' ইত্যাদি প্রথম সূত্রের অর্থ, প্রত্যভিজ্ঞার স্বরূপ, বিমর্শের স্বরূপ, ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্রের দ্বারাই জগৎ নির্মিত হইয়াছে, প্রত্যভিজ্ঞার উপযোগ, অর্থক্রিয়ার দ্বৈবিধ্য, কামিনীদৃষ্টান্ত ইত্যাদি।[৩]

রসেশ্বর দর্শন :—রসেশ্বর দর্শনের আলোচনা অতি চমৎকার। 'রস' শব্দের সংস্কৃতে একাধিক অর্থ দেখা যায়, পারদও ইহার একটি অর্থ। এই অর্থে 'রস' শব্দ হইতে 'রসায়ন' শব্দ আসিয়াছে। পারদ শোধিত ও জারিত হইয়া ঔষধে ব্যবহৃত হয়। এই শ্বেতশুভ্র তরল ধাতুটি মহাদেবের দেহনিঃসৃত বলিয়া কোন কোন পুরাণে বলা আছে। রস মহাদেবের দেহনিঃসৃত-এই যুক্তিতে মহাদেবকে 'রসেশ্বর' আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু রসেশ্বর দর্শনে মহাদেবের কথা বড় নহে, পারদের প্রশংসাই বেশী। পারদের অর্থ বলা হইয়াছে 'পার-দ'

রসেশ্বর

রস-পারদ

১ 'সূত্রং বৃত্তিবিবৃতির্লঘ্বী বৃহতীত্যুভে বিমর্শিন্যৌ।
প্রকরণবিবরণপঞ্চকমিতি শাস্ত্রং প্রত্যভিজ্ঞায়াঃ ॥'

২ দ্রঃ Abhinavagupta : An Historical and Philosophical Study by K. C. Pandey ; Hist. of Philosophy. Eastern and Western, Vol. I, pp. 381—391.

৩ দ্রঃ সর্বদর্শনসংগ্রহ (বঙ্গানুবাদ)—পৃঃ ১৯৩—২০৬ ; বেদান্তদর্শনের ইতিহাস ১ম খণ্ড—পৃঃ ৩৬৪—৩৭০।

অর্থাৎ যাহা সংসারের দুঃখসমুদ্র অতিক্রম করিতে সহায়তা করে তাহাই 'পারদ'। এই পারদকে যথারীতি ব্যবহার করিলে শ্বাস-কাশ ইত্যাদি জটিল রোগের নিরাময় ঘটে, দেহ সুস্থ হয়, আয়ু দীর্ঘতর হয় এবং মুক্তিও সেজন্য সুলভ হয়।[১] 'রসো বৈ সঃ' ইত্যাদি উপনিষদ্‌বাক্যেও ইহার সমর্থন দেখা যায়।

পার-দ=পারদ

কেন এরূপ অদ্ভুত দর্শনের আলোচনা করা হইল সে সম্বন্ধে মাধব বলিয়াছেন—কোনো কোনো মাহেশ্বরগণ জীবের পরমেশ্বরতাদাত্ম্য স্বীকার করিয়াও বলেন যে, সর্বদর্শন-সম্মত জীবন্মুক্তি এই ক্ষয়শীল দেহের স্থায়িত্বের উপরেই নির্ভর করে। শরীর অপটু হইলে, শরীর নষ্ট হইলে জীবন্মুক্তিত্ব পাইবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। অতএব শারীরিক ক্ষমতা রক্ষা করিয়া মুক্তিলাভের জন্য পারদ নামক রসের গুণকীর্তন এই দর্শনে করা হইয়াছে। এই দর্শনের বক্তব্য[২] :—পারদরসের স্বরূপ, রস এবং অভ্রকের স্বরূপ, দ্বিবিধ কর্মযোগ, মূর্ছিত পারদের স্বরূপ, মৃত পারদের স্বরূপ, বদ্ধ পারদেব স্বরূপ, পারদের অষ্টাদশ সংস্কার, দেহবেধ, জীবিত অবস্থায় মুক্তি, দেহের নিত্যত্বসাধন, পারদরস সেবনের দ্বারা জরা ও মরণরাহিত্য সাধন, লিঙ্গদর্শনের ন্যায় পারদদর্শনের মাহাত্ম্য প্রভৃতি।

ইহার বিশেষত্ব

ইহার আলোচ্য

পাণিনি দর্শন :—'পদ'মাত্রেই বিশেষ্য বা বিশেষণবাচক শব্দ বা ধাতু ও প্রত্যয় ঘটিত। শব্দ বা ধাতুকে বলে 'প্রকৃতি'। কোন্ পদের কি প্রকৃতিভাগ ও কি প্রত্যয়ভাগ তাহা কি করিয়া জানা যায়, জিজ্ঞাসা করিলে, পতঞ্জলিকৃত মহাভাষ্য যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা এই প্রশ্নে বিভ্রান্ত হইবেন না। 'ব্যাকরণশাস্ত্র'ই প্রকৃতি

পাণিনীয় দর্শন

১ "Whatever promoted longevity, strength, health and vitality was called rasayana...the term rasayana came almost exclusively to be applied to the employment of mercury and other metals in medicine and it also meant alchemy." (History of Philosophy: Eastern and Western, Vol. I pp. 463, 464)।

২ দ্রঃ সর্বদর্শনসংগ্রহ (বঙ্গানুবাদ) পৃঃ ২০৭—২১৮।

এবং প্রত্যয়ের বিভাগ প্রতিপাদন করে—ইহা প্রসিদ্ধ। পাতঞ্জলমহাভাষ্যের প্রথম সূত্রই হইতেছে 'অথ শব্দানুশাসনম্'। এই সূত্রে 'অথ' শব্দটি অধিকার অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'অধিকার' শব্দের অর্থ প্রস্তাব বা প্রারম্ভ। 'শব্দানুশাসন' শব্দে পাণিনিপ্রণীত ব্যাকরণশাস্ত্রকেই বলা হইয়াছে মনে হয়। কিন্তু 'শব্দানুশাসন' শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় সন্দেহ হয়, এই প্রস্তাব কি প্রধানত শব্দানুশাসনের? (কিন্তু) এরূপ সন্দেহের কোনো কারণ নাই, কেননা প্রথমেই 'অথ' শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় ইহাই বুঝায় যে, বিষয়ান্তর পরিত্যাগ করিয়া কিসের প্রস্তাব তাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে। শব্দের অন্তর্ভুক্ত প্রকৃতি-প্রত্যয়-বিভাগ দেখাইয়া তাহাদের যথার্থ অর্থগ্রহণের নাম 'শব্দানুশাসন'। ব্যাকরণজ্ঞান না থাকিলে শব্দার্থজ্ঞান হওয়া অসম্ভব।

ব্যাকরণ প্রকৃতি-প্রত্যয়ের নিয়ামক শাস্ত্র

'শব্দানুশাসন' শব্দটির প্রকৃত অর্থ কি?

ব্যাকরণ শব্দানু-শাসনের শাস্ত্র

'শব্দানুশাসন'—এই বাক্যের শব্দগত যে অর্থ তাহা গ্রহণ করিলে ব্যাকরণের বেদাঙ্গত্ব প্রতিপাদনরূপ প্রয়োজন সাধিত হয়। শব্দসংস্কার অর্থাৎ শব্দের গঠনপ্রণালী, ইহার প্রকৃতি ও প্রত্যয় জ্ঞান দ্বারা সংস্কৃত শব্দপ্রয়োগই ব্যাকরণশাস্ত্রের মুখ্য প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। সংস্কারযোগ্য শব্দের সংস্কারই ব্যাকরণশাস্ত্রের প্রয়োজন। ব্যাকরণ-জ্ঞান ব্যতিরেকে বেদবাক্যও আয়ত্ত করা যায় না, কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে যে, ছয়টি বেদাঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণকেই বা এত বেশী প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে কেন? তাহার কারণ, ষড়ঙ্গের মধ্যে 'ব্যাকরণই' প্রধান। বাক্যার্থজ্ঞানের কারণীভূত পদ ও পদার্থজ্ঞান ব্যাকরণের অধীন বলিয়া ব্যাকরণ প্রধান। প্রধানকে যত্ন করিলে ফলবান হওয়া যায়, অর্থাৎ বাক্যার্থজ্ঞান হয়। তাই বলা হইয়াছে যে, বেদই ব্রহ্ম। ষড়ঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণ বেদের নিকটতম অঙ্গ। ব্যাকরণশাস্ত্রালোচনা দ্বারা বেদবাক্যের অর্থাববোধ ঘটে। ইহা তপস্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ তপস্যা। 'ব্যাকরণ'কে

ব্যাকরণ বেদাঙ্গ

ব্যাকরণই বেদাঙ্গ-গুলির মধ্যে প্রধান

বেদ অর্থাৎ ব্রহ্মের নিকটতম অঙ্গ ব্যাকরণ

পণ্ডিতগণও বেদের প্রথম অঙ্গ বলিয়া থাকেন। ইহা হইতেই বুঝা যায়, ব্যাকরণশাস্ত্রের সাক্ষাৎ প্রয়োজন 'শব্দের অনুশাসন', তাহার পর পরম্পরাক্রমে 'বেদরক্ষাদি'ও প্রয়োজন। রক্ষা, উহ, আগম, লঘু, অসন্দেহাদিও প্রয়োজনের মধ্যেই গণ্য।'[১]

বেদরক্ষা ব্যাকরণের গৌণ প্রয়োজন

'সাধু' শব্দের প্রয়োগবশতঃ অভ্যুদয় বা উন্নতি লাভ ঘটে। এজন্যই কাত্যায়ন বলিয়াছেন যে, বেদবাক্যের অর্থজ্ঞানপূর্বক যে তাহার প্রয়োগ করে তাহার অভ্যুদয় ঘটে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল জ্ঞানপূর্বক অনুষ্ঠিত হইলেই লাভ করা যায়"। এই সম্যক্ জ্ঞান ব্যাকরণশাস্ত্র জ্ঞানের দ্বারাই হয়। আবার ইহাও বলা হইয়াছে যে, একটিমাত্র শব্দ সম্যক্‌ভাবে জ্ঞাত হইয়া উপযুক্তভাবে প্রযুক্ত হইলে স্বর্গে এবং ইহলোকে কাম্যফল প্রদান করে।[২]

শব্দজ্ঞানের সার্থকতা

প্রশ্ন হইতে পারে যে 'শব্দ' তো অচেতন—তাহার এরূপ সামর্থ্য কি করিয়া থাকিতে পারে? কিন্তু এরূপ মনে করার কোনো কারণ নাই, কেননা শ্রুতি নিজেই শব্দকে মহান্ দেবতার ন্যায় বীর্যশীল বলিয়াছেন। শব্দকে 'বৃষভ'রূপে দেখান হইয়াছে। "এই বৃষভের চারিটি শৃঙ্গ, তিনটি পদ, দুইটি মস্তক, সাতটি হস্ত এবং ইনি তিন প্রকারে বদ্ধ হইয়া শব্দ করিতেছেন।"[৩] এই যে মহান্ দেবতা, ইনি মর্ত্য জীবের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পাতঞ্জলমহাভাষ্যে শব্দের মহান্ দেবতা পরব্রহ্মের সহিত তুলিত হইয়াছেন। ব্যাকরণশাস্ত্রজ জ্ঞানের সহিত বেদশব্দ প্রযুক্ত হইলে পাপের ক্ষয় হয় এবং পুরুষ অহঙ্কারাদি গ্রন্থিসকল ছিন্ন করিয়া শব্দব্রহ্মের সহিত সংসৃষ্ট হয়।

এই শব্দই শ্রুতির 'বৃষভ'

শব্দই ব্রহ্ম

জগতের নিদানস্বরূপ নিত্য নিরবয়ব 'স্ফোটাখ্য' শব্দই ব্রহ্ম—ইহা ভর্তৃহরি বলিয়াছেন। তাঁহার মতে আদ্যন্তরহিত শব্দরূপ ব্রহ্ম অক্ষর অর্থাৎ অনিমিত্তক ও বিকারশূন্য। সেই শব্দ-ব্রহ্মের অর্থরূপে প্রকাশিত জগৎ তাঁহা হইতেই বিবর্তিত হইয়াছে।

ভর্তৃহরির মতে স্ফোটাখ্য শব্দই ব্রহ্ম

---

১ দ্রঃ 'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস' ১ম খণ্ড—গুরুপদ হালদার।

২ 'একঃ শব্দঃ সম্যগ্ জ্ঞাতঃ সুপ্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে চ কামধুগ ভবতি'—মহাভাষ্যে।

৩ 'চত্বা'রি শৃঙ্গা ত্রয়োঽস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্তহস্তাসো অস্য। ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি" ইত্যাদি।

নৈয়ায়িকমতে স্ফোটাত্মক শব্দ যে নিত্য তাহা অস্বীকৃত, কারণ তাহার কোনো প্রমাণ নাই। সেই আপত্তি এস্থলে খণ্ডিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষই ইহার প্রমাণ। বর্ণের একত্র বা পৃথক্‌ভাবে বাচকত্ব না থাকায়, যাহার জন্য পদটি হইতে অর্থপ্রতিপত্তি ঘটে, তাহাই 'স্ফোট'; বিদ্বান্‌গণের মতে—বর্ণ হইতে অতিরিক্ত অথচ বর্ণগুলি যাহা প্রকাশ করিতে চায় তাহাই নিত্য শব্দ 'স্ফোট'। নৈয়ায়িকগণ শব্দকে অনিত্য বলেন; কিন্তু পদের লক্ষ্য যে বিষয় তাহাই শব্দ—উচ্চারিতপদ শব্দ নহে, এবং এই শব্দ 'নিত্যস্ফোট'। "অতএব বর্ণগুলির দ্বারা যাহা স্ফুটিত অর্থাৎ প্রকাশিত হয়, অথবা যাহা হইতে বর্ণগুলি দ্বারা প্রকাশ্য বিষয়টি স্ফুট হয় অর্থাৎ প্রকাশিত হয়—এই অর্থে বর্ণগুলি স্ফোট অর্থাৎ প্রকাশক—ইহাই স্ফোটশব্দের বাক্যগত অর্থ।"[১] তাই পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"গৌ-পদে 'শব্দ' কাহাকে বলে? না, এই পদ উচ্চারণ করিলে যে গলকম্বল, লাঙ্গুল, ককুদ্, ক্ষুর ও শৃঙ্গ বিশিষ্ট একটি প্রাণীর সংজ্ঞা উপস্থিত হয় তাহাই 'শব্দ'। কৈয়ট বলিয়াছেন, বৈয়াকরণগণ পদের বর্ণ ব্যতিরিক্ত প্রকাশকত্ব আছে বলেন। বর্ণগুলির যদি বাচকত্ব বা প্রকাশকত্ব থাকে তাহা হইলে প্রথম বর্ণ হইতে অর্থসমাগম হওয়ায় দ্বিতীয় এবং পরবর্তী বর্ণের উচ্চারণ আর আবশ্যক হইত না। অতএব নাদ অর্থাৎ বর্ণগুলির উচ্চারণধ্বনি দ্বারা অভিব্যক্ত যে অর্থ তাহাই 'স্ফোট' শব্দ-বাচ্য।[২]

ন্যায়মত ব্যাকরণে খণ্ডিত

স্ফোট কি?

বর্ণের উচ্চারণধ্বনি দ্বারা অভিব্যক্ত যে অর্থ তাহাই স্ফোট

এখানে আপত্তি করা হইয়াছে যে, এই স্ফোটেরও অর্থ-প্রকাশকত্ব ঘটিতে পারে না। ইহার অর্থ-প্রকাশকত্ব দুইটি বিকল্পের দ্বারা ব্যাহত হয়:—এই স্ফোট যে অর্থ প্রকাশ করায় তাহা নিজে অভিব্যক্ত হইয়া, না অনভিব্যক্ত হইয়া?

১ এই দর্শনের আলোচনার জন্য লেখক 'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস' ১ম খণ্ড (গুরুপদ হালদার) এবং Philosophy of Sanskrit Grammar—P. Chakravarti-র নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী।

২ দ্রঃ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস ১ম খণ্ড—গুরুপদ হালদার, পৃঃ ১১—১৩।

শেষটি হইতে পারে না। 'স্ফোট নিত্য' বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে; স্ফোটের নিমিত্তই আমাদের অর্থ-প্রত্যয় ঘটে। কাজেই স্ফোট নিত্য হইলে আমাদের অর্থপ্রতিপত্তির বিলম্ব হইবার কোনো কারণ থাকে না, কিন্তু তাহা তো হয় না। পদ উচ্চারণ ধ্বনি ভিন্ন হয় না। এই দোষ পরিহারের জন্য যদি স্ফোটের অনভিব্যক্তত্ব স্বীকার করা যায় এবং প্রথম পক্ষ অনুযায়ী অভিব্যক্ত হইয়া স্ফোট অর্থ প্রত্যয় করায়, ইহা যদি বলা যায়, তাহা হইলে, একটি প্রশ্ন স্বতই আসে,—উচ্চারিত বর্ণ-গুলি কি প্রত্যেকে অর্থপ্রকাশ করে, না একত্রিত হইয়া করে? এই পক্ষ সমর্থনে উচ্চারিত বর্ণের স্ফোটকত্ব স্বীকার করিলে পাণিনিদর্শনবাদিগণের যে আপত্তি, উচ্চারিত বর্ণগুলির বাচকত্ব নাই,—এই মত প্রত্যাহার করিতে হইবে।

স্ফোট সম্পর্কে আপত্তি খণ্ডিত

এই আপত্তি নিম্নপ্রকারে খণ্ডিত হইয়াছে। স্ফোটকল্পনার বিরুদ্ধে যে আপত্তি করা হইয়াছে তাহা নিমজ্জমান ব্যক্তির কাশকুশ অবলম্বনের ন্যায়। পূর্বে যে বিকল্প দুইটির কল্পনা করা হইয়াছে, তাহারা অসম্ভব। বর্ণমাত্রেই পদ প্রত্যয়ের অবলম্বন হইতে পারে না, কারণ পুষ্পমাল্য পুষ্প ও সূত্র দিয়াই প্রস্তুত হয়। সূত্র মালা হইতে অভিন্ন। সূত্ররূপ নিমিত্ত কারণ ব্যতিরেকে যেমন মালা হইতে পারে না, সেরূপ পরস্পর-বিলক্ষণ বর্ণসমূহের মধ্যে পুষ্পমালাস্থিত পুষ্পসমূহে অনুগত সূত্রের ন্যায় তাহাদের মধ্যে অনুগত কোন পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় না, কাজেই এ অবস্থায় পদপ্রত্যয়ও বর্ণমাত্র হইতে পারে না। আবার, পদস্থ বর্ণসমূহ পদপ্রত্যয়ের অবলম্বন যদি বলা হয়, তাহার বিরুদ্ধে যুক্তি এই যে, বর্ণসকল উচ্চারিত হইয়াই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তাহাদের সমূহ-ভাবও অসম্ভব। বর্ণসকল সমূহভাবে অনুভূত হয় না, কারণ, উচ্চারিত হইয়াই উহারা বিনষ্ট হইয়া যায়। অভিব্যক্তিপক্ষেও বর্ণগুলিকে ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্ত হইতে হইবে। পদস্থ সমুদায় বর্ণগুলির একত্র অভিব্যক্তি অসম্ভব। ইহা দ্বারা বর্ণের সমূহত্ব হইতে পারে না,—ইহাই স্থির হইল।

বর্ণগুলির একটি কাল্পনিক সমূহত্ব কল্পনা করাও যাইতে পারে না, কারণ তাহা ন্যায়বিরুদ্ধ। সমূহকল্পনা অন্যোন্যাশ্রয়দোষে পুষ্ট হওয়ায় অন্যায্য।

অতএব বর্ণগুলির বাচকত্ব অসম্ভব বলিয়া 'স্ফোটাখ্য শব্দ' স্বীকার করিতেই হইবে। বৈয়াকরণদের এই 'স্ফোটাখ্য শব্দই' বিষয় প্রত্যক্ষ করায়। পদস্থ বর্ণগুলি পরপর ধ্বনিত হয়। অভিব্যঞ্জকরূপ প্রথম বর্ণের উচ্চারণ ধ্বনি 'স্ফোটাখ্য' শব্দকে অস্ফুটভাবে ব্যক্ত করে। পর পর বর্ণের উচ্চারণ ধ্বনির দ্বারা 'স্ফোটাখ্য' শব্দ ক্রমে ক্রমে স্ফুটতর এবং স্ফুটতম হয়। যেমন, বেদ একবারমাত্র অধ্যয়ন করিলে তাহাকে অবধারণ করা যায় না—তাহা পুনঃ পুনঃ পাঠাভ্যাস দ্বারাই সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট হয়; অথবা যেমন, একটি রত্নকে একবারমাত্র দেখিলেই তাহার দোষগুণ বুঝা যায় না, তাহাকে বার বার পরীক্ষা করিয়া তবে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করা যায়। এ সম্বন্ধে প্রামাণিক উক্তি :—পদস্থ বর্ণগুলির উচ্চারণ স্ফোটাখ্য শব্দের বীজস্বরূপ। এই বর্ণগুলি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত উচ্চারিত হইয়া সেই বীজ যখন পরিপক হয় তখন আমাদের বুদ্ধি স্ফোটাখ্য শব্দকে বুঝিতে পারে। স্ফোটাখ্য শব্দ হইতেই অর্থাববোধ হয়। বর্ণগুলির অর্থ-প্রকাশকত্ব নাই; স্ফোটাখ্য শব্দেরই অর্থপ্রকাশকত্ব থাকায় আপত্তিকারিগণের নিরবয়ব অর্থপ্রত্যায়ক শব্দতত্ত্বই স্ফোটাখ্য—ইহাই বুঝিতে হইবে। 'মহাভাষ্যে' জাতিবিষয়ক বিচারের সময় এই স্ফোটের বিষয় সম্যক্‌-রূপে বিবৃত হইয়াছে।

'স্ফোটাখ্য' শব্দ অনস্বীকার্য

নিরবয়ব অর্থপ্রত্যায়ক শব্দতত্ত্বই 'স্ফোট'

পাণিনি শব্দ ও অর্থ এবং তাহাদের সম্বন্ধ সৃষ্টি করিয়াছেন, অথবা তাহার স্মরণ করিয়াছেন মাত্র—ইহার সমাধানে বার্ত্তিক নিযুক্ত। শব্দ ও অর্থ এবং তাহাদের সম্বন্ধ যদি নিত্য হয় তো তাহা জ্ঞাপন করাই পাণিনির প্রবৃত্তি,—ইহাই বার্ত্তিকের অর্থ। বার্ত্তিককার বলিয়াছেন যে, শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ নিত্য এবং ইহার অনুরূপ শব্দের-ও নিত্যত্ব সাধিত হয়। কিন্তু, শব্দ নিত্য হইতে পারে, যদি শব্দের অর্থ নিত্য স্ফোটরূপ শব্দের প্রকাশকত্ব হিসাবেই হয়, কিন্তু বর্ণধ্বনি হিসাবে হয় না। এইরূপে স্ফোটের নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়।

শব্দ স্ফোটরূপেই নিত্য

ইহার পর, বাজপ্যায়ন এবং ব্যাড়িপ্রবর্তিত মতদ্বয়ের বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। বাজপ্যায়ন জাতিপদার্থবাদী এবং ব্যাড়ি ব্যক্তিপদার্থবাদী। বাজপ্যায়নের

মতে গবাদি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য সমবেত 'জাতি' প্রকাশ করে। দ্রব্যপদার্থ-বাদী ব্যাড়ির মতে, শব্দ দ্রব্য-প্রকাশক বলিয়া দ্রব্যকে প্রকাশ করায়, তাহা জাতিকে প্রকাশ করায় না। আচার্য পাণিনি এই উভয় মতই স্বীকার করেন। যেমন, জাতি-পদার্থ স্বীকার করিয়া তাঁহার সূত্র—'জাত্যাখ্যায়ামেকস্মিন্ বহুবচনমন্যতরস্যাম্' ; আবার দ্রব্যপদার্থ স্বীকার করিয়া তাঁহার সূত্র—'সরূপাণামেকশেষ এক-বিভক্তৌ'। ব্যাকরণ সর্বপার্ষদ্ বলিয়া, ইহা দুইটি মত স্বীকার করিলেও কোনো বিরোধ উপস্থিত হয় না। জাতিপক্ষে গোত্বাদি জাতির ব্রহ্মসত্তা এবং ব্যক্তিপক্ষে অসত্যভূত দ্রব্য-উপাধি দ্বারা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিপাদন করা হয় ; অর্থাৎ উভয় মতেই শব্দের অর্থ অদ্বয় সত্য পরমব্রহ্মতত্ত্ব।

বাজপ্যায়ন এবং ব্যাড়ির মত

পাণিনি জাতি এবং ব্যক্তি এই উভয় পদার্থবাদী

ব্রহ্মতত্ত্বই সমুদায় শব্দের 'বাচ্য' অর্থ ; আর ইহার 'বাচক' স্ফোটরূপশব্দ—অর্থাৎ 'বাচ্য' ও 'বাচক' উভয়ের অস্তিত্ব থাকায় দ্বৈতবুদ্ধি আসিয়া পড়ে। অদ্বৈতবুদ্ধি প্রকাশের নিমিত্ত বলা হইয়াছে যে, সেই ব্রহ্মসত্তাই সর্বশব্দের বাচ্য। ইহার বাচক স্ফোটরূপ শব্দ হইতে ইহা পৃথক নহে। এইরূপ বাচ্য ও বাচক অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে যে সম্বন্ধবোধ, তাহা কল্পনার জন্যই প্রতিভাত হয়। যেমন জীব ও পরমাত্মা পরমার্থত এক হইলেও কল্পনাবশে ব্যবহার-দশায় তাহাদের মধ্যে নিয়ম্য ও নিয়ামক ভাবরূপ সম্বন্ধ প্রতিভাত হয়, সেইরূপই বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ।

ব্রহ্মতত্ত্বই বাচ্য : স্ফোট বাচক

উভয়ে অদ্বয়

ব্রহ্মতত্ত্বই শব্দসমূহের একমাত্র বিষয়—ব্যবহারকালে তাহা আমাদের নিকট বহু আকারে প্রতীত হয়। ইহা সেই সেই বস্তুনিষ্ঠ পরিকল্পিত উপাধি সকলের বহুলতার জন্যই হয়। এই উপাধি কল্পনা—যাহার জন্য ভেদ প্রতীত হয়—অবিদ্যা-কল্পিত। একমাত্র ব্রহ্মবস্তুই সত্য পদার্থ। যিনি এই কূটস্থ সচ্চিদানন্দ অনন্ত আনন্দময় পরব্রহ্মকে জীবচৈতন্য হইতে অভিন্ন বলিয়া জানেন এবং যিনি অবিদ্যামুক্ত, তিনি ব্রহ্মাত্মাতেই অবস্থান করেন॥ উহাই 'নিঃশ্রেয়স' অর্থাৎ

উপাধির কল্পনা অবিদ্যা-প্রসূত

মুক্তিলাভ। শব্দব্রহ্মে যাহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মে সেই ব্রহ্মত্ব লাভ করে। 'শব্দব্রহ্ম' শব্দের অর্থ 'বেদ'। এইরূপে ব্যাকরণ শাস্ত্রের মোক্ষসাধনত্ব সিদ্ধ হইল। ব্যাকরণজ্ঞান ভিন্ন বেদবাক্যের অর্থ গ্রহণ অসম্ভব। বাক্যপদীয়ে ভর্তৃহরি সেজন্য বলিয়াছেন যে,—ব্যাকরণ-শাস্ত্র অপবর্গের দ্বারস্বরূপ। বৈদ্যশাস্ত্র যেমন শারীরিক মলের চিকিৎসা করে সেরূপ ব্যাকরণ বাক্যগত দোষের চিকিৎসা করে; অর্থাৎ ব্যাকরণজ্ঞান থাকিলে অশুদ্ধ বাক্য-প্রয়োগের সম্ভাবনা থাকে না। ব্যাকরণ সমুদায় বিদ্যাকে পবিত্র করে। এজন্য ইহা বিদ্যাসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

অবিদ্যামুক্তি-নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তি

'ব্যাকরণ অপবর্গের দ্বার' (ভর্তৃহরি)

মোক্ষলাভের সোপানের পর্বগুলির মধ্যে প্রথম পদবিন্যাসের স্থান 'ব্যাকরণ'। মোক্ষেচ্ছু ব্যক্তিগণের নিকট ইহা সরল রাজপথের ন্যায়। পরম পুরুষার্থ সাধনের নিমিত্ত ব্যাকরণ পাঠ আবশ্যক।[১]

জ্ঞানার্থ দৃশ্ ধাতুনিষ্পন্ন দর্শন শব্দের অর্থ হইতেছে—জ্ঞানের কারণ বা দ্বার। দর্শন শব্দের অর্থ এরূপ হইলে ব্যাকরণ যে শব্দ-বিষয়ক জ্ঞানের কারণ তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকে না। সেজন্য ভর্তৃহরি বলিয়াছেন—ব্যাকরণ অধিবিদ্যা। অতএব ব্যাকরণকে দর্শন বলা অসঙ্গত নহে। কারণ, দর্শনের ভর্তৃহরিকৃত উপরিউক্ত লক্ষণ উহাতে চরিতার্থ হইয়াছে। আস্তিক ও নাস্তিক ভেদে দর্শন দ্বিবিধ। ব্যাকরণ আস্তিক দর্শন। ইহাতে বেদের প্রাধান্য কখনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ইহার সাহায্যে শব্দজ্ঞান হইলে শব্দব্রহ্ম অধিগত হন।

ব্যাকরণ কেন দর্শন?

ব্যাকরণ আস্তিক দর্শন

বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা এবং তাহার দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় নিরূপণ করা—এই দুইটিই আস্তিক দর্শনের প্রধান লক্ষণ। ব্যাকরণে উক্ত লক্ষণ দুইটিই বর্তমান। ব্যাকরণকে সেজন্য দর্শনশাস্ত্র বলা কোনমতেই অসঙ্গত নহে, কারণ সর্ব-দর্শনসংগ্রহে স্বয়ং মাধবাচার্যও বলিয়াছেন—'পাণিনিদর্শনম্'।

আস্তিক দর্শনের প্রধান লক্ষণ

১ বাক্যপদীয় ১।১৪

দর্শনশাস্ত্র স্মৃতি হইলেও বেদের উপাংগ মধ্যে পরিগণিত, কিন্তু ব্যাকরণ বেদের অঙ্গ। ব্যাকরণ আবার সাধারণ অঙ্গ নহে, মন্ত্রার্থপ্রত্যয়ের উপকারক বলিয়া ইহা বেদের মুখস্বরূপ। শিক্ষায় বলা হইয়াছে—"শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।" পতঞ্জলিও এজন্য বলিয়াছেন—'প্রধানং ষট্‌স্বঙ্গেষু ব্যাকরণম্।' ছান্দোগ্য উপনিষদে আবার ব্যাকরণকে বেদের বেদ বলা হইয়াছে।[১]

ব্যাকরণ বেদাঙ্গ কিন্তু দর্শন উপাঙ্গ

ব্যাকরণের সহিত দর্শনের প্রকৃত সম্বন্ধ কোথায় সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইবে।[২]

---

১ ছা. উ. ৭।১

২ দ্র: 'ব্যাকরণ, তন্ত্র প্রভৃতির সহিত দর্শনের সম্বন্ধ'; অনেকে 'জনিকর্তুঃ প্রকৃতিঃ' এবং 'ভুবঃ প্রভবঃ'—পাণিনিকৃত এই দুইটি সূত্রের যথাক্রমে প্রথমটির সাংখ্যমতে এবং দ্বিতীয়টির বেদান্তমতে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। দর্শনের সহিত ব্যাকরণের সম্বন্ধ কোথায় এই জাতীয় ব্যাকরণসূত্রেও তাহার পরিচয় মিলিবে।

ব্যাকরণ, তন্ত্র প্রভৃতির সহিত দর্শনের সম্বন্ধ

ব্যাকরণের সহিত দর্শনের প্রকৃত সম্বন্ধ বা যোগসূত্র কি তাহাই এস্থলে আলোচ্য।[১] পূর্বে আমরা দেখাইয়াছি—ব্যাকরণকে কেন দর্শন বলা হয় বা মাধব সর্বদর্শনসংগ্রহে কেন ব্যাকরণকে 'পাণিনিদর্শন' বলিয়াছেন। 'ব্যাকরণ' শব্দবিদ্যা বা শব্দশাস্ত্র। মীমাংসকগণ শব্দকে একটি পৃথক্ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন। শব্দ তাঁহাদের মতে নিত্য, নৈয়ায়িকগণের মতে তৃতীয়ক্ষণ-বিধ্বংসী, বৈয়াকরণগণের মতে শব্দ স্ফোটাকারে নিত্য, কূটস্থ এবং ব্রহ্মস্বরূপ, মধ্বাদি দ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণ ইহাকে নিত্য, আচার্য শংকর প্রভৃতি অনিত্য বলিয়াছেন। ন্যায়-বৈশেষিকের 'শব্দখণ্ডে' শব্দের প্রকৃতি, প্রত্যয়, জাতিশক্তি, ব্যক্তিশক্তি ইত্যাদির আলোচনা আছে। শব্দখণ্ডে এই আলোচনার কোন সম্ভাবনাই থাকিত না যদি শব্দশাস্ত্র ব্যাকরণ না থাকিত। শব্দ যখন প্রমাণ, তখন সেই শব্দাশ্রয়ী যে শাস্ত্র তাহাও বিশেষ প্রয়োজনীয়।

ব্যাকরণ' ও দর্শন

শব্দ

শব্দখণ্ডের আলোচনার মূল শব্দশাস্ত্র ব্যাকরণ

দ্বিতীয়তঃ, বাক্যপদীয়ে শব্দকে বলা হইয়াছে ব্রহ্ম। শ্রুতিও যে শব্দকে 'শব্দায়মান বৃষভ' বলিয়াছেন তাহা পূর্বেই দেখাইয়াছি। এই শব্দব্রহ্মকে জানিয়া একমাত্র শব্দশাস্ত্র ব্যাকরণের সম্যক্ পঠনপাঠনের দ্বারা নিঃশ্রেয়স লাভ করা যায়। এই হিসাবেও ব্যাকরণ দর্শনই, কারণ ইহার তত্ত্ব জানিলে 'নিঃশ্রেয়স' লাভ হয়। 'স্ফোট' শব্দব্রহ্মের বাচক বা দ্যোতক; তবুও ইহা শব্দব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, কারণ ইহা আমাদের কল্পনাজনিত শব্দব্রহ্ম আরোপিত উপাধি ভিন্ন আর কিছু নহে। অতএব, 'স্ফোটব্যঙ্গ শব্দব্রহ্ম'ই এই দর্শনের মুখ্য আলোচ্য বিষয়।

ব্যাকরণের তত্ত্ব জানিলে নিঃশ্রেয়স লাভ হয়

১ এই বিষয়ক আলোচনার জন্য লেখকগণ দার্শনিকপ্রবর অধ্যাপক গোপীনাথ ভট্টাচার্যের নিকট অশেষভাবে ঋণী।

শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই বস্তুবোধ কেন হয় তাহার মূল কারণ অনুসন্ধান করিলেই 'স্ফোট' আসিয়া পড়ে। বৈয়াকরণগণ যোগীদের ন্যায় 'স্ফোটবাদী' কিন্তু শাস্ত্রান্তরে 'স্ফোট' স্বীকৃত নহে। সেজন্যই শুনা যায়—শব্দব্রহ্মই তাহাদের প্রকৃতির ন্যায় পরিণামী; কিন্তু শব্দব্রহ্মের সহিত পরব্রহ্মের সম্বন্ধ অনুক্তসিদ্ধ। আত্মার জৈবভাব হয় বলিয়া উহা কি পরিণামী? শব্দব্রহ্মকেও এসম্বন্ধে জীবাত্মার ন্যায় বুঝিতে হইবে। সাংখ্যেই বলা হইয়াছে—"উপাধির্ভিদ্যতে ন তু তদ্বান্।" সুতরাং উপাধির অপগমে স্বয়ংপ্রভ সদ্বস্তু কখনও মলিন থাকিতে পারে না বা অসৎ হইতেও পারে না। স্ফোটের দুইটি ভাগ আছে—'স্থূল' এবং 'সূক্ষ্ম'। স্থূলের নাম 'বৈকৃতধ্বনি' এবং সূক্ষ্মের নাম 'প্রাকৃতধ্বনি।' সহোপলম্ভ নিয়মের ন্যায় এই দুইটি পদার্থ শ্রোতার নিকট একাকার বলিয়া উপপন্ন হওয়ায় নানা তর্কবিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। যোগদর্শনে 'স্ফোট' স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু সাংখ্য উহার স্বীকারে পরাঙ্মুখ। তবুও, স্ফোট ব্রহ্মস্বরূপ এবং প্রকৃতিপুরুষ ব্যতিরেকে ব্রহ্মতত্ত্বে উহার কোনও বিবক্ষা না থাকায় 'যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ' এই ন্যায় বশতঃ সাংখ্যাচার্যদের যুক্তিও অনাদৃত হইয়াছে।

যোগ দর্শনেও ব্যাকরণ দর্শনের স্ফোট স্বীকৃত হইয়াছে; সাংখ্য অস্বীকার করিয়াছে

পাশ্চাত্ত্য সম্প্রদায় সাধারণতঃ উপমানের দ্বারা পদার্থস্বরূপ জানিবার ইচ্ছা করেন। স্ফোট কিন্তু ব্রহ্মত্বহেতু কেবল অনুভবসিদ্ধ। সুতরাং স্ফোটই স্ফোটের উপমা। কবিগুরু বাল্মীকি লিখিয়াছেন—'গগনং গগনাকারং সাগরঃ সাগরোপমঃ।' গগনাদির ন্যায় স্ফোটকেও উপমেয় ধরিলে জগতে উপমান পাওয়া যাইবে না।[১] এইজন্য তাঁহাকে 'অনুপম' বা 'স্বোপম' বলা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। ঐশী নিয়মবশতঃ স্ফোট অনেকের নিকট দুরধিগম্য হইলেও তাহাতে স্ফোটের দোষ নাই।

স্ফোট অনুপম বা স্বোপম

নৈয়ায়িকগণ আবার বর্ণবাদের সঙ্গে স্ফোটবাদও ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা পূর্বেই দেখাইয়াছি। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে সংকেত বলেই যখন পদার্থ-

১ দ্রঃ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস, ১ম খণ্ড।

প্রতীতি সম্ভবপর, তখন স্ফোটকল্পনা নিষ্প্রয়োজন। আমরা বলি—সংকেত দ্বারা অর্থ-প্রতীতি স্বীকার করিলে চিত্তবৃত্তির একপ্রকার নিষ্ঠা লাভ হয় সত্য, কিন্তু চিত্তবৃত্তি কেন উদ্রিক্ত হইল সে সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। নৈয়ায়িকগণও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের ন্যায় শব্দের কেবল বৈকৃতধ্বনি লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহার প্রাকৃতধ্বনি স্ফোটাত্মক শব্দ 'ব্রহ্ম' বলিয়া ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে পারে না এবং ন্যায় পদ্ধতিও অতীন্দ্রিয় বিষয়ের সমাধানে পর্যাপ্ত নহে। সেজন্য এই প্রসংগে ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

ন্যায় স্ফোটবাদকে ত্যাগ করিয়াছে

বৈকৃতধ্বনি মীমাংসাসিদ্ধান্তের পরিপন্থী বলিয়া স্ফোটখণ্ডনে মীমাংসকগণ বদ্ধপরিকর। সেজন্য, বর্ণবাদনিরাসের পর প্রতিপাদিত হইয়াছে যে পূর্বমীমাংসায় স্ফোটনিরসনের সূত্রগুলি বৈকৃতধ্বনির বাধক হইলেও প্রাকৃতধ্বনির সাধকরূপে গণ্য।

মীমাংসা স্ফোটবাদকে খণ্ডন করিয়াছে

কাত্যায়ন বলিয়াছেন—'লক্ষ্য এবং লক্ষণ লইয়াই ব্যাকরণ।' ইহার ব্যাখ্যায় পতঞ্জলি বলেন যে, 'লক্ষ্য' হইতেছে শব্দ আর 'লক্ষণ' সূত্র। সূত্র দ্বারাই শব্দগুলি ব্যুৎপত্তিসহকারে প্রতিপাদিত হয় বলিয়া শব্দ এবং সূত্রের প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক ভাবই সম্বন্ধ। শব্দজ্ঞানই ব্যাকরণের প্রয়োজন। শব্দসমূহ বৈদিক ও লৌকিক ভেদে দ্বিবিধ। শব্দ ব্যাকরণের অভিধেয় এবং শব্দের সহিত ব্যাকরণের ব্যুৎপাদ্য-ব্যুৎপাদকভাবই সম্বন্ধ।[১]

লক্ষ্য এবং লক্ষণই ব্যাকরণ

হিন্দু ও বৌদ্ধ যোগমতের মধ্যে একটি সুন্দর সংগতি ছিল। কিন্তু পরবর্তী বৌদ্ধ ও হিন্দুমতে যখন নানা দেবদেবীর কল্পনা হইল, তখন সাংখ্য ও অদ্বৈত মতকে মিশাইয়া ও তাহার সহিত যোগের উপায়কে সংযুক্ত করিয়া একটি নূতন রকমের সাধনাপদ্ধতি প্রবর্তিত হইল। ইহাই সাধারণত 'তন্ত্র' নামে অভিহিত[২]। 'তন্' ধাতুর অর্থ বিস্তার, এজন্য সাধারণভাবে তন্ত্র বলিতে

১ দ্রঃ ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস (১ম খণ্ড) এবং সর্বদর্শনসংগ্রহ (বঙ্গানুবাদ)—'পাণিনিদর্শন'।

২ দ্রঃ 'ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা' ও 'তন্ত্রকথা'—চিন্তাহরণ চক্রবর্তী (লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা)

'বিস্তৃতি-সাহিত্য' বোঝায়। এই হিসাবেই ইহা মন্ত্র বা সূত্র হইতে ভিন্ন। এজন্য চিকিৎসাতন্ত্র, জ্যোতিষতন্ত্র ইত্যাদি স্থলেও 'তন্ত্র' শব্দের উল্লেখ হইয়াছে। বাংলা দেশে যে 'তন্ত্র' প্রচলিত আছে তাহা প্রধানত শক্তি উপাসনার তন্ত্র। বহুপূর্ব হইতেই শক্তি যে বাক্য-রূপে, জগদ্রূপে আপনাকে নিয়ত পরিবর্তিত করিতেছেন, সেই মতটি ব্যাকরণ-শাস্ত্রে, বিশেষত ভর্তৃহরির বাক্যপদীয়ে প্রচলিত ছিল। 'মায়া'কে ব্রহ্মের শক্তি বলা হইত। এই মতটি বৈষ্ণব তন্ত্রের মধ্যে এবং বৈষ্ণব দর্শনে ঈশ্বর ও তাঁহার শক্তিরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অনেক পুরাণে 'প্রকৃতি'কে মায়ার স্বরূপ বলা হইয়াছে। প্রকৃতির যেমন পরিণাম জগৎ, মায়ার পরিণামেও তেমনি জগৎ। তাই 'প্রকৃতি' এবং 'মায়া' একই। এই প্রকৃতিই শক্তিরূপিণী এবং সেজন্যই দেবী পার্বতীর সহিত অভিন্ন। কালী, তারা প্রভৃতিও সেই পার্বতীরই রূপ। মায়া যেমন ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া আছে এবং মায়া প্রকাশের বিষয় যেমন ব্রহ্ম, তেমনি শিবকে অবলম্বন করিয়া আছেন শক্তি। শিব শক্তির সম্মিলনে ঘটিয়াছে এই সৃষ্টি। এই মতের সহিত একদিকে প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি এবং অপর দিকে নানারূপ পূজার্চনা যুক্ত হইলেই নিরাকার মনোভাব হইতে যেমন মনের মধ্যে অর্থ উদিত হয় এবং পরিশেষে সেই অর্থ বাক্যাকারে পরিণত হয়, তেমনি শিবশক্তির নিরাকার স্বরূপ হইতে এই আকারময় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপ উপমা হইতে সংস্কৃতে বর্ণমালার প্রত্যেকটি অক্ষর একটি শক্তির ব্যঞ্জক বলিয়া মনে করা হইত। ইহার সহিত আবার যুক্ত হইল একটা নূতন ধরণের দেহতত্ত্ব; কল্পনা করা হইল যে মেরু-দণ্ডের নিম্ন হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তক পর্যন্ত ছয়টি 'নাড়ীচক্র' আছে। এই প্রত্যেক চক্রে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ শক্তি আমাদের নানাপ্রকার মনোবৃত্তির, রাগদ্বেষাদির উৎপাদিকা এবং সেই সেই বিশেষ শক্তির প্রতীক স্বরূপে বর্ণমালার এক একটি অক্ষর বীজমন্ত্র-

তন্ত্র ও দর্শন

মায়া = ব্রহ্মের শক্তি = প্রকৃতি

প্রকৃতি = দেবী

শিব + শক্তি = সৃষ্টি

নিরাকার হইতে আকারবান্ জগতের উৎপত্তি

অক্ষর শক্তিরই প্রতীক

দেহচক্র

রূপে গৃহীত হইল। সেই সেই নাড়ীচক্রে চিত্তকে সমাহিত করিলে নিজের মধ্যে যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহার দ্বারা (সেই সেই নাড়ীচক্রের দ্বারা) নিয়ন্ত্রিত বিবিধ শক্তিকে জয় করা যায়। এমনি করিয়া ছয়টি চক্রের বিবিধ শক্তি জয় করিলে আমরা আত্মজয়ী হইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারি—তন্ত্রের শিক্ষা মোটামুটি ইহাই।

বীজমন্ত্র

ছয়টি চক্রের বিবিধ শক্তি লাভ = তন্ত্রের মুক্তি

উপনিষদে আছে যে প্রণয়িনীকে আলিংগন করার আনন্দের তুল্য ব্রহ্ম-প্রাপ্তির আনন্দ। আনন্দ হইতেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় ঘটিতেছে। এই সকল বাক্যের অর্থকে নানাপ্রকারে অবলম্বন করিয়া এই মতাবলম্বী সাধকগণ আপন মত প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেম। ইন্দ্রিয় লালসা-বর্জিত স্ত্রী-পুরুষের প্রেমই যে চরম প্রাপ্তির সহায়ক এই প্রকার মতও বৈষ্ণব সাহিত্যে দেখা যায়। কৃষ্ণ ও রাধার প্রেম এই প্রেমের আদর্শ। এই প্রেমে দ্বৈতবোধ থাকে না—স্ত্রী-পুরুষ-বোধ বিনষ্ট হয়; উভয়ে মিলিয়া একটি অখণ্ড রসাস্বাদকে প্রকাশিত করে।

অপার্থিব প্রেম দেহজ সম্পর্কশূন্য

শাক্ততন্ত্রগুলি অধিকাংশই অদ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

তন্ত্রের প্রক্রিয়া ও অনুষ্ঠানগুলির সহিত যোগদর্শনের যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। যোগদর্শনে যাহা দর্শনসম্মত উপায়ে বিশ্লেষিত হইয়াছে, তন্ত্রে তাহার অধিকাংশই সাধারণ প্রণালীর আঙ্গিকরূপে আলোচিত হইয়াছে। প্রক্রিয়া এবং অনুষ্ঠান ভিন্ন আরও এক দিক্ দিয়া তন্ত্রের সহিত ভারতীয় দর্শনের নিগূঢ় যোগ লক্ষিত হয়, তাহা হইতেছে শব্দের চারিটি অবস্থার আলোচনায়। ব্যাকরণ এবং তন্ত্র উভয়েই বলিয়াছে যে পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা এবং বৈখরীভেদে শব্দের অবস্থা ৪টি। তন্মধ্যস্থিত শব্দের নাদব্রহ্ম[১] রূপে অভি-ব্যক্তির মূলে রহিয়াছে এই ৪টি অবস্থা—তন্ত্রোক্ত শব্দ সম্পর্কে এই আলোচনা

কৃত্য :—
প্রক্রিয়া ও অনুষ্ঠান

শব্দের ৪টি অবস্থা

১ "In nada however, the elements of Siva and Sakti are of equal strength......" History of Philosophy : Eastern and Western, Vol. I, p. 413.

দর্শনশাস্ত্রে বিশ্লেষিত হইয়া অভিনবরূপ ধারণ করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন শাক্ত আগমগুলির মধ্যে এবং শারদাতিলকে[১] এমন অনেক বীজ নিহিত আছে যাহার নিপুণ আলোচনায় দেখা যায় যে তন্ত্রের সহিত দর্শনশাস্ত্রের যোগ অতি নিবিড়।[২]

তন্ত্রের metaphysics

১ "The great sound which comes into being when the bindu splits itself is known as Sabda-Brahman, as Saradatilaka (I. 11-12) and Prapancha-Sara (I. 44) observe." History of Philosophy: Eastern and Western, Vol. 1, p. 413.

২ দ্রঃ এই গ্রন্থের 'তন্ত্রশাস্ত্র' অধ্যায় এবং 'Shakta Philosophy'—Gopinath Kaviraj.

ভারতীয় আস্তিক দর্শনগুলির মূলগত ঐক্য[1]

সংস্কৃতে 'দর্শন' বলিতে মোক্ষশাস্ত্রকে বুঝায়। এ অর্থে দর্শন আর ইংরেজীর 'ফিলসফি' যে ঠিক একার্থবাচক নহে, তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। ভারতের ছয়টি আস্তিক দর্শনেরই মূল উদ্দেশ্য জীবের 'মোক্ষ' লাভ; অবশ্য সেই অবস্থাতে বিভিন্ন দর্শনে নিঃশ্রেয়স, মোক্ষ, মুক্তি, কৈবল্য, অপবর্গ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। পথ সকলের ভিন্ন হইলেও উদ্দেশ্য সকলের একই। সমস্ত আস্তিক দর্শনই আত্মার অস্তিত্বে এবং পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসশীল এবং বেদের প্রামাণ্য সকলেই স্বীকার করিয়াছে। 'মীমাংসা' দুইটি আবার সম্পূর্ণভাবেই শ্রুতিনির্ভরশীল।

আস্তিক দর্শনের সাধারণ ঐক্য

জৈমিনির মতে,—উপনিষদ্ ব্রহ্মসূত্রের ভিত্তি। এই মতে বেদোক্ত যাগ-যজ্ঞাদি কর্মদ্বারাই জীবের 'কাম্য' (বা স্বর্গসুখ) লাভ হয় এবং তাহাই 'পরম পুরুষার্থ' মুক্তি ও অমৃত এবং তাহার অতিরিক্ত অন্য কোন মোক্ষ নাই। জৈমিনির মতে ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকৃত হইয়াছে, কেননা বেদোক্ত কর্মসমূহ আপনি ফল প্রসব করিয়া থাকে। ব্রহ্মসূত্রে বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদির ফল স্বীকৃত হইয়াছে এবং ঈশ্বর বা ব্রহ্মই যে সেই কর্মের ফলদান করেন, তাহাও বলা হইয়াছে। কিন্তু এই মতে, ব্রহ্মজ্ঞানলাভ না করা পর্যন্ত জীবের মোক্ষলাভ ঘটে না, অর্থাৎ জীব জন্মমরণ-চক্রের অতীত হইতে পারে না। ন্যায়, বৈশেষিক এবং যোগ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, কিন্তু শ্রুতিনির্ভরশীল নহে। সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী।

'মোক্ষে'র ভিন্ন ভিন্ন অর্থ

'ঈশ্বর'

'আস্তিক' শব্দের অর্থ মনুর মতে 'বেদনিন্দক'। ঈশ্বরে বিশ্বাস না করিলেই

---

১ এই বিষয়ক আলোচনার জন্য লেখকগণ 'মায়াবাদ' (প্রমথনাথ শর্মা রচিত) হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছেন।

যে লোকে 'নাস্তিক' হয়, এমতটি সাধারণ্যে প্রচলিত থাকিলেও দর্শনের ক্ষেত্রে তাহা প্রযোজ্য নহে। 'সাংখ্য' বেদকে অস্বীকার করে নাই, তবে বেদোক্ত কাম্যকর্মাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা জীব যে স্বর্গসুখ লাভ করে, তাহা অনিত্য বলিয়াই ইহার ধারণা। যাগযজ্ঞে হিংসা রহিয়াছে এবং হিংসাত্মক কর্ম কখনও আত্যন্তিক সুখ উৎপন্ন করে না—ইহাই সাংখ্যের অভিমত। যোগদর্শনেও পার্থিব এবং স্বর্গাদি সুখভোগের কামনাকেই উচ্চস্তরের সাধনা বলা হইয়াছে।

আস্তিক বলিতে কি বুঝায়?

সাংখ্য কেন আস্তিক দর্শন?

ন্যায়, বৈশেষিক, যোগ, পূর্ব এবং উত্তর মীমাংসাকে সংযমকে অত্যুন্নত স্থান দেওয়া হইয়াছে। ন্যায়-মতে—রাগ, দ্বেষ এবং মোহ সমূলে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা সকলেরই করা উচিত। বৈশেষিকমতে—তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য নিষ্কাম কর্মের অনুশীলন প্রয়োজন। যোগমত তো সংযমের ভিত্তির উপরেই স্থাপিত। শাংকরমতে শমদমাদি সাধনসম্পদ্ ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর গুণাবলী। ইহাও প্রকারান্তরে সংযমই। সাংখ্যে কিন্তু কোন সংযমের উল্লেখ দেখা যায় না—'তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ'—সাংখ্যের একমাত্র বক্তব্য।

সংযম

ন্যায় এবং বৈশেষিকের মতে জীবাত্মা অনেক। সাংখ্য এবং যোগও জীবাত্মাকে বহু বলিয়াই মনে করে। পূর্বমীমাংসামতেও জীবাত্মা অনেক, কেবল ব্রহ্মসূত্রের মতে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। জীবাত্মার কোন পৃথক্ সত্তা না থাকায় বহুত্বও নাই। ন্যায়মতে আত্মা অনুমানগম্য; মীমাংসা দুইটি আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে গিয়া শ্রুতিবাক্যের অবতারণা করিয়াছে—কারণ শ্রুতিপ্রামাণ্যে তাহারা দৃঢ়বিশ্বাসী।

জীবাত্মা

আত্মা

কার্যভিন্ন ন্যায়মতে কারণ হয় না; সাংখ্যও তাহাই বলিয়াছে।[১] কিন্তু সাংখ্যমতে কার্য এবং কারণ বস্তুত অভিন্ন—কারণে যাহা রহিয়াছে তাহাই

---

১ দ্রঃ মায়াবাদ—প্রমথনাথ শর্মা।

কার্যরূপে প্রকাশিত হয়। ইহাকে বলা হয় সৎকার্যবাদ[১]। আর ন্যায়মতে কার্য ও কারণ ভিন্ন, অভিন্ন নহে। ন্যায় অসৎকার্যবাদে বিশ্বাসী, অর্থাৎ, উৎপন্ন হইবার পূর্বে কার্য একেবারেই 'অসৎ'—তাহার কোন সত্তাই থাকে না, উৎপন্ন হইয়া তবে কার্য 'সৎ' হয়।[২]

কার্যকারণ-সম্বন্ধ

ন্যায়মতে ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা, নিমিত্ত কারণ মাত্র; পরমাণু-পুঞ্জ হইতে তিনি জগতের সৃষ্টি করেন। এই পরমাণুবাদ বৈশেষিকের মূল ভিত্তি; ন্যায়ও ইহাকে স্বীকার করিয়াছে। সাংখ্যের মতে ঈশ্বর প্রমাণের অভাবে অসিদ্ধ। প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগই জগৎ সৃষ্টির মূলে। বাদরায়ণ মতে ব্রহ্ম হইতেই জগৎসৃষ্টি—কিন্তু ব্রহ্ম নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ, কেবল নিমিত্ত কারণ নহেন।

ঈশ্বর স্রষ্টা না, ব্রহ্ম স্রষ্টা?

প্রমাণ প্রমেয়াদি ষোড়শ-পদার্থের জ্ঞানলাভেই নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তি ঘটে—ইহাই ন্যায়ের বক্তব্য। বৈশেষিকমতে, দ্রব্যগুণাদি ষট্‌পদার্থের বক্তব্য। (মতান্তরে সপ্তপদার্থের) জ্ঞানেই নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। সাংখ্যমতে প্রকৃতিপুরুষাদি পঞ্চবিংশতত্ত্বের জ্ঞানই 'মোক্ষ'। যোগমতে চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধেই আসে 'কৈবল্য'। পূর্ব-মীমাংসার মতে যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে ঘটে 'স্বর্গসুখ'—উহাই মীমাংসার মোক্ষ। আর বেদান্তে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলেই জীবের 'মুক্তি' ঘটে।

প্রমাণ প্রমেয়ের জ্ঞান

প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ—ন্যায় এই প্রমাণচতুষ্টয়বাদী। বৈশেষিকমতে প্রমাণ দুইটি—প্রত্যক্ষ এবং অনুমান। উপমান ও শব্দ এই মতে অনুমানেরই অন্তর্গত। সাংখ্য এবং যোগমতে প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ এই তিনপ্রকার প্রমাণ। উপমান এই মতে অনুমানের অন্তর্ভুক্ত।

প্রমাণ

এই ছয়টি দর্শনের মধ্যে কোন্‌টি পূর্বে এবং কোনটি পরে রচিত হইয়াছিল

১ দ্রঃ মায়াবাদ—প্রমথনাথ শর্মা পৃঃ ১৩—২৭।

২ মায়াবাদ, পৃঃ ৪—১৩।

বলা অত্যন্ত দুরূহ। এবিষয়ে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসা দুরূহ। 'ব্রহ্মসূত্রে' বহুস্থলে জৈমিনির উল্লেখ দেখা যায়—সাংখ্য, যোগ এবং বৈশেষিকমতেও এই সন্দেহ খণ্ডিত হইয়াছে। সাংখ্যের ও ব্রহ্মসূত্রের বক্তব্যের বিরুদ্ধে যুক্তি রহিয়াছে এবং বৈশেষিকমতের প্রতি কটাক্ষপাত আছে। জৈমিনিও বাদরায়ণের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। যোগ সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব স্বীকার করিয়াছে। ন্যায়দর্শনে যোগের উল্লেখ আছে, সাংখ্যের প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে।

ইহাদের রচনাকালের পৌর্বাপর্য

এই সকল দেখিয়া মনে হয় আমাদের সকল আস্তিক দর্শনগুলিই প্রাক্-বৌদ্ধযুগে রচিত হইয়াছিল। ইহাদের রচনাকাল সম্বন্ধে অধ্যাপক গোপীনাথ ভট্টাচার্য বলেন[১] :—"সাংখ্য সম্ভবত ভারতের আস্তিক দর্শনগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। সর্বাপেক্ষা অর্বাচীন ন্যায়। ইহার কারণ ন্যায় দর্শনে প্রায় সকল দর্শনেরই মতের বিচার দেখা যায়; কিন্তু সাংখ্যে অন্য কোনো দর্শনের যুক্তির অবতারণা বা বিচার বিশ্লেষণ দেখা যায় না। বেদান্ত ও মীমাংসা সম্ভবত সমসাময়িক, এবং উভয়েই সাংখ্য এবং ন্যায় রচনাকালের মধ্যবর্তী সময়ে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। জৈমিনি এবং বাদরায়ণ উভয়ের প্রণীত দর্শনে উভয়কে উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া উঁহাদের রচনাকাল নির্ণয় করা কঠিন। বৈশেষিকের প্রমাণ সম্পর্কিত আলোচনা সহজতম এবং মাত্র ২টি প্রমাণ স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও মনে হয় বৈশেষিক সাংখ্য অপেক্ষা অর্বাচীন ; কারণ, বৈশেষিকেও অন্যান্য দর্শনগ্রন্থ বা মতের প্রতি কটাক্ষ আছে। যোগ দর্শন যে কোন্ সময় রচিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে কিছুই নিশ্চিত করিয়া বলা সম্ভব নহে।"

রচনাকাল সম্বন্ধে অধ্যাপক গোপীনাথ ভট্টাচার্য

প্রচলিত একটি কারিকায় বলা আছে যে, কপিল, কণাদ, গোতম, পতঞ্জলি, জৈমিনি এবং ব্যাস যথাক্রমে ভারতের ছয়টি আস্তিক দর্শনের প্রণেতা।[২] এই

১ লেখকের সহিত মৌখিক আলোচনায় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ভট্টাচার্য যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন উপরের উক্তি তাহারই বাণীরূপ।

২ কপিলস্য কণাদস্য গোতমস্য পতঞ্জলেঃ। জৈমিনের্ব্যাসদেবস্য দর্শনানি ষড়েব হি॥

কারিকানুসারে দর্শনগুলির পৌর্বাপর্য নির্ণয়ের কোনো ইঙ্গিত আছে কিনা ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক তাহার বিচার করিবেন।

হিন্দু দর্শনগুলির কয়েকটি বিষয়ে ঐকমত্য[১] দেখা যায়, যেগুলি সংক্ষেপে:— (ক) আত্মা অবিনশ্বর (খ) এই বিচিত্র বিশ্বের মূলীভূত কারণ অবিনশ্বর (গ) জন্মান্তরবাদ ও কর্মবিপাক মোক্ষের পূর্ব পর্যন্ত সকল-প্রকার জীবকেই ভোগ করিতে হয় (ঘ) আত্মার দেহাশ্রয়ই সুখদুঃখের কারণ (ঙ) মুক্তিই চরম উদ্দেশ্য; মুক্তির পথপ্রদর্শনই দর্শনের লক্ষ্য। কার্যের সহিত কারণের সম্বন্ধ কি নির্ণয় করিতে গিয়া হিন্দু দর্শনে প্রধানত তিনটি বিভিন্ন মত স্থাপিত হইয়াছে— তাহারা আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ এবং বিবর্তবাদ নামে বিখ্যাত। ন্যায় ও বৈশেষিক আরম্ভবাদী দর্শন; সাংখ্য এবং যোগ পরিমাণবাদী, আর শংকর মতে বেদান্ত পরিণামবাদী।

হিন্দু দর্শনে সাধারণ ঐক্য

ভারতীয় দর্শনগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য কি জানা প্রয়োজন।[২] এগুলির প্রত্যেকটিতেই পুরুষার্থ লাভ কিরূপে করা যাইতে পারে তাহার আলোচনা আছে—অর্থাৎ প্রত্যেক দর্শনেই 'practical motive'-এর স্পর্শ পাওয়া যায়। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে আলোচনা অল্পবিস্তর প্রত্যেকেরই আছে। এই দার্শনিক আলোচনা কেবল বুদ্ধিকেন্দ্রিকই নহে, জীবনকেন্দ্রিক। কিন্তু বাস্তব বিষয়ের আলোচনা আছে বলিয়াই যে ইহাতে পরলোক, পরমাত্মা ইত্যাদি ও ধর্মের নিখুঁত আলোচনা নাই তাহা তো বলা যায় না। দর্শনের আবির্ভাব হয় তখনই, যখন মানব মনে গতানুগতিক জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে একটা অসন্তোষ বা প্রতিক্রিয়ার উদয় হয়। মানব মন যখন বুঝিতে পারে যে তাহার আদ্যন্ত অব্যক্ত, সে কেবল ব্যক্তমধ্য, তখন তাহার অশান্ত মন সমাধানের অন্বেষণোন্মুখী হয়। ভারতীয় দর্শনকে অনেক সময় নিরাশাবাদী বা pessi-

ভারতীয় দর্শনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য (ক) Practical motive

(খ) reaction against the existing order of things

১ দ্রঃ 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস'—ভৌমিক।

২ An Introduction to Indian Philosophy—Datta and Chatterjee দ্রঃ।

mistic') বলা হইয়া থাকে ; কিন্তু সত্যই ভারতীয় দর্শন জগৎকে কেবল নৈরাশ্য ও হতাশার বাণীই শোনায় নাই। ভারতীয় দর্শনের কোনো শাখাই জীবনকে একটা ট্র্যাজেডিতে পরিণত করে নাই। ভারতীয় নাটকেও যে আমরা সাধারণত ট্র্যাজেডি স্বীকার করি নাই—ইহাও লক্ষণীয় বিষয়। তাই বলা হয় যে, "If Indian philosophy points relentlessly to the miseries that we suffer through short-sightedness, it also discovers a message of hope....Pessimism in the Indian systems is only initial and not final."[১] ভারতীয় দর্শন যে নিরাশাবাদী নহে তাহার একটি প্রমাণ এই যে, ইহা সকল সময়েই বিশ্বের একটি শাশ্বত দুর্লঙ্ঘ্য নৈতিক নিয়মে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে, যাহাকে আমরা 'spiritualism' বলিতে পারি। একমাত্র 'চার্বাক দর্শন' ইহাতে অনাস্থা প্রকাশ করিয়াছে। ঋগ্বেদে এই অলঙ্ঘ্য নিয়মকে বলা হইয়াছে 'ঋত'। সেই 'ঋতে'রই বিভিন্ন প্রকার ভেদ দেখি ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখায়। মীমাংসায় ইহা 'অপূর্ব', ন্যায়বৈশেষিকে ইহা 'অদৃষ্ট', সকল শাখাতেই ইহা 'কর্মরূপে' স্বীকৃত হইয়াছে। এই কর্মবাদে বিশ্বাসী ভারতীয় দর্শন কখনই 'pessimistic' হইতে পারে না, এজন্যই ইহা আদর্শবাদী। জন্মান্তরে, এমন কি ইহজন্মেও, লোকে সুকৃত কর্মের ফলে মোক্ষের পথে অগ্রসর হইতে পারে।

(গ) ইহা pessimistic নয়, optimistic, তাহার প্রমাণ সংস্কৃত নাটক

ঋত

ভারতীয় দর্শন আদর্শবাদী

ভারতীয় দর্শনে নিখিল বিশ্ব যেন একটি বিরাট নৈতিক রঙ্গমঞ্চরূপে গণিত হইয়াছে।[২] এই যে ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট জীবের পাঞ্চভৌতিক দেহ—এই দেহ প্রকৃতিসৃষ্ট এবং কর্মানুযায়ী জীব পাপ পুণ্যের ফলভোগ করিবার জন্য দেহধারণ করে। নিয়তির অলঙ্ঘ্য নিয়মকে কেহই বাধা দিতে পারে না—বিশ্বনিয়ন্তার শাসনে জীবকে কর্মফল ভোগ করিতে দেহধারণ করিতে হইবেই—যতদিন না সে কর্মবন্ধ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। 'বন্ধে'র কারণ 'অবিদ্যা' বা 'ignorance; সেজন্য 'তত্ত্বজ্ঞান'

তত্ত্বজ্ঞান

১ An Introduction to Indian Philosophy—p.16.

২ তুলনীয় :—"All the world's a stage"—Shakespeare.

(knowledge) মুক্তির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। 'বন্ধে'র অর্থ জীবের জন্ম মরণ রূপ চক্রে বারংবার আবর্তন এবং দুঃখ ভোগ। জৈন, বৌদ্ধ, সাংখ্য এবং অদ্বৈতবেদান্তীর মতে এই মুক্তি ইহ জীবনেও লাভ করা যাইতে পারে—যাহাকে 'জীবন্মুক্তি' বলা হয়।

কিন্তু শুধু শাস্ত্রজ প্রজ্ঞাই মোক্ষ লাভের সহায়ক বা সোপান নহে—মনন এবং নিদিধ্যাসনও অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। শ্রবণের ফলে যাহা মানসক্ষেত্রে উপ্ত হইয়াছে, তাহাকে গভীরভাবে অনুশীলন করিয়া তত্ত্ব লাভার্থে গভীর ধ্যানে সমাহিত হইতে পরিলেই আসে 'মুক্তি' বা 'নির্বাণ'।

শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন

ভারতীয় দর্শনগুলির আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যদিও আস্তিক এবং নাস্তিক দর্শনে এবং আস্তিক দর্শনগুলির নিজেদের মধ্যেও মতের নানা পার্থক্য রহিয়াছে, তবু একটি বিষয়ে চার্বাক ভিন্ন আর সকলেই প্রায় একমত। সমস্ত দর্শনেরই ছিল একটি অখণ্ড উদ্দেশ্য—কেবল এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মতভেদের কারণ দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য। অনেকে মনে করিতেন—একান্তভাবে এবং অত্যন্তভাবে দুঃখ দূর করাই 'দর্শনশাস্ত্রে'র উদ্দেশ্য; অর্থাৎ 'দর্শনশাস্ত্রে'র লক্ষ্য সেই উপায়ে দুঃখ দূর করা—যাহাতে পুনরায় দুঃখ যন্ত্রণা আর কখনও সহ্য না করিতে হয়।

সকলেরই এক উদ্দেশ্য, কেবল দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য

বৌদ্ধ, সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক এবং মীমাংসার মতে—এইভাবে সম্পূর্ণরূপে সমূলে দুঃখ উৎপাটনের জন্যই দর্শনের প্রয়োজন। অদ্বৈতবাদীর মতে, উপনিষদের বাক্য অনুসরণ করিয়া জ্ঞানপূর্বক যথার্থ পরমার্থ সত্যকে উপলব্ধি করিলে সমস্ত ভ্রম অপগত হয় এবং পরমানন্দ স্বরূপে বিশ্রাম লাভ করা যায়। জৈনমতে, মুক্তি হইলে, আমাদের যে যথার্থ স্বরূপ (অর্থাৎ আমরা যে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত দর্শন, অনন্তবীর্য-সম্পন্ন সুখ স্বরূপ) তাহা আমরা উপলব্ধি করিয়া জাগতিক সমস্ত অন্বেষণ এবং দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করি। বৈষ্ণব-মতে, কোনো না কোনো ভাবে ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্য বা পৃথকত্ব স্বীকৃত

দুঃখের বিনাশই লক্ষ্য—কিরূপে তাহা হয় তাহার সম্বন্ধে দর্শন-গুলির মত

হইয়াছে। শ্রীভগবান্‌ই আমাদের কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত করেন—তাঁহার সান্নিধ্যেই আমরা বিমল আনন্দ অনুভব করিয়া থাকি। নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিক মতে কর্মবন্ধন হইতে মুক্তি পাইলে আমাদের আত্মা স্ব-স্বভাবে একেবারে নির্গুণ অবস্থায় থাকে। মুক্ত আত্মার কোনো জ্ঞান নাই, কোনো সুখদুঃখবোধ নাই, কর্ম নাই, ইচ্ছা নাই। সাংখ্য-যোগ মতে আত্মা চৈতন্য স্বরূপ; সুখ দুঃখ প্রকৃতির ধর্ম, বুদ্ধির ধর্ম[১]। মুক্ত অবস্থায় পুরুষের সহিত প্রকৃতির বা বুদ্ধির সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। 'কৈবল্য' অবস্থায় পুরুষ কেবল চিৎ স্বরূপে অবস্থান করেন। তাঁহার কোনো সুখদুঃখবোধ থাকে না, কর্ম থাকে না, ইচ্ছা থাকে না। আবার বৌদ্ধদের মতে, আত্মা বা পুরুষ বলিয়া যাহা মনে হয়, তাহা ভ্রম মাত্র। অবিদ্যা, তৃষ্ণা, কর্ম প্রভৃতির ফলে আমাদের ভিতরে উৎপন্ন হয় নানা চিত্ত বৃত্তি এবং বাহিরের জগতের রূপ রস প্রভৃতি উৎপন্ন হয়; উহাতে আমাদের মনে হয় যেন আমাদের মধ্যে কোনো একটা আত্মা রহিয়াছে। যখন অবিদ্যাদি বিনষ্ট হয় তখন এই আত্মার বা আমিত্ববোধের অবলুপ্তি ঘটে, আর এই আমিত্বকে অবলম্বন করিয়া যে সকল 'প্রতীতি' হইয়াছিল তাহারাও বিনষ্ট হয়। জন্মজন্মান্তরের যে প্রতীতির ধারা প্রদীপ শিখার ন্যায় অবিরাম জ্বলিতেছিল তাহার বিরতি ঘটে। ইহাই 'নির্বাণ'। আবার কোনো কোনো মতে, জগতের মূলতত্ত্ব সচ্চিদানন্দ স্বরূপ—সেই সচ্চিদানন্দ হইতে অবিদ্যা প্রভৃতি স্বতন্ত্র ব্যক্তিধারা উৎপাদিত করে—কিন্তু ইহাদের কোনো একটি ধারার নির্বাণ হইলে সেই ধারাটি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

বৈষ্ণবেরা কিন্তু শুধু তত্ত্বজ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ হয় বলিয়া স্বীকার করেন না। ঈশ্বরের কৃপা বা করুণা না হইলে মুক্তি আসে না। এই করুণা পাইতে হইলে চাই 'শরণাগতি' বা 'প্রপত্তি'। বৈষ্ণব এবং শৈবগণ স্বীকার করেন যে ঈশ্বর স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন; তিনি কর্ম এবং কর্মের নিয়মের বাধ্য নহেন। তিনি অনন্ত শক্তিমান্‌।

চার্বাক্‌ ভিন্ন সকল দর্শনেই স্বীকৃত হইয়াছে যে কর্ম করিলেই তাহার ফল

১ দ্রঃ ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা—পৃঃ ১১২।

ভোগ করিতে হয়। অনাদিকাল হইতেই আমরা নানা প্রকার কর্ম করিয়া আসিতেছি—পূর্বজন্মের সঞ্চিত কর্মফল ভোগ করিবার জন্য আমাদিগকে দেহ ধারণ করিতে হয়। দেহের আয়ু থাকে ততদিন যতদিন পর্যন্ত আমাদের কর্মক্ষয় না ঘটে। কিন্তু কেবল মনুষ্য দেহেই আমরা কর্ম সঞ্চয় করিয়া থাকি—অন্যান্য ইতর যোনির দেহে কেবল সুখদুঃখানুভবই হইয়া থাকে। এই দেহে কোনো কর্মের দায়িত্ব থাকে না। কর্ম দুই প্রকার—'প্রারব্ধ' এবং 'অনারব্ধ'।

কর্মবাদ

অনেক দার্শনিকের মতে, শুধু কর্মমাত্রেই কর্মের ফলভোগ করিতে হয় না। ক্লেশ আছে বলিয়াই আমাদেব কৃতকর্মের ফলভোগ করিতে হয়। রাগ, দ্বেষ, অহংকার এবং নিজের জন্য মমতা এগুলিকে বলে 'ক্লেশ'। এই ক্লেশের জন্যই আমরা কর্ম করিয়া থাকি এবং ক্লেশ আছে বলিয়াই কর্মফল ভোগ করিয়া থাকি। রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিলেই চিত্ত বিশুদ্ধি ঘটিতে পারে। চিত্ত বিশুদ্ধি না ঘটিলে যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় না। সেজন্য শুধু দার্শনিক জ্ঞান দ্বারা যে মুক্তি হয় না, ইহা প্রায় সকলেই বলিয়াছেন। আর সকল দর্শনেরই উদ্দেশ্য কর্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করা।

অতএব বলা যাইতে পারে—মোক্ষ ও মোক্ষের উপায় স্বরূপ জ্ঞান, ইহাই ভারতীয় দর্শনের প্রধান আলোচ্য। আর এই জ্ঞান প্রাসঙ্গিক মাত্র। ভারতের দর্শনের ইহাই সীমা।[১] দর্শনগুলি সকল ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন 'প্রস্থান' বা পথমাত্র; পরস্পর বিবদমান শাস্ত্র মাত্র নহে। মধুসূদন সরস্বতী অনেকটা এই প্রকার মতে আস্থাবান্ ছিলেন।

মোক্ষ এবং মোক্ষের সাধনোপায় ভারতীয় দর্শনের প্রধান আলোচ্য

'হিন্দু সাধনা' তথা ভারতীয় সাধনা বা দার্শনিক উপলব্ধি সম্পর্কে ডাঃ নলিনীকান্ত ব্রহ্ম বলিয়াছেন—"In summing up the main points...we find that a direct experience of the Divine, an immediate felt contact with the Absolute, either in the respect of Energy, or of love, or of bliss, or of pure Consciousness (cit), or of pure Being (sat) is regarded as the goal of all spiritual discipline, and in this respect Hinduism is essentially a mystical religion."[২]

হিন্দু সাধনার রহস্য

১ ভারতদর্শনসার, পৃঃ ৩০১।

২ Philosophy of Hindu Sadhana, p. 54.

ষড়্‌দর্শন ও গীতা

আমাদের দেশের প্রধান দর্শন ছয়টি; ইহাদের প্রত্যেকটিরই ভিত্তি 'দুঃখবাদ'। সকল দর্শনকারের মতেই সংসার দুঃখের আলয়। সংসারে যতটুকু সুখ আছে, তাহা যে শুধু ক্ষণস্থায়ী, এমন নহে; তাহা দুঃখের পূর্বরূপমাত্র। সে সুখে জীব কখনও সন্তুষ্ট হইতে পারে না। তাই, সে দুঃখনাশের জন্য নানা উপায় অন্বেষণ করে। কিন্তু জীব যে উপায়ই অবলম্বন করুক না কেন, তাহার দ্বারা সে সংসারদুঃখের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে না। অথচ দুঃখ নাশ জীবের একান্ত ঈপ্সিত, দুঃখহানিই জীবের পরম 'পুরুষার্থ'। সেই দুঃখহানির প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবনের জন্যই দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন। অতএব, দর্শনের আরম্ভ 'দুঃখবাদে' এবং দর্শনের সমাপ্তি দুঃখনাশে।

ষড়্‌দর্শনের বক্তব্য

গীতার আলোচনাতেও দেখা যায় যে, গীতাও 'দুঃখবাদে'র সমর্থন করিয়াছে। গীতার মতেও সংসার ক্ষণভঙ্গুর এবং দুঃখের আলয়। গীতাতেও দুঃখনাশের উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু, দর্শনোক্ত উপায়ের সহিত গীতোক্ত উপায়ের তুলনামূলক আলোচনা করিলে একটি মূল প্রভেদ দৃষ্ট হয়, সেটি হইতেছে 'গীতায় ঈশ্বরবাদ'। দুঃখহানির উদ্দেশ্যে গীতায় যে সকল ভিন্ন ভিন্ন পন্থা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের সকলেরই কেন্দ্রস্থানে 'ঈশ্বর'।

ষড়্‌দর্শন ও গীতা

কিন্তু ষড়্‌দর্শনের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, অসাধারণ মৌলিকতা সত্ত্বেও তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে কি যেন একটি অসম্পূর্ণতা থাকিয়া গিয়াছে—গীতা কিন্তু ঐ সকল দর্শনশাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য বস্তুকে অঙ্গীকার করিয়া লইয়া একটি অপূর্ব সমন্বয় সাধন করিয়াছে। এই সমন্বয়-সাধনের মূলে রহিয়াছে গীতার মুখ্য বিষয় 'ঈশ্বরবাদ'।

---

১ এই অংশের আলোচনার জন্য লেখকগণ শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'গীতায় ঈশ্বরবাদ' নামক গ্রন্থ হইতে যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়াছেন।

ন্যায়-বৈশেষিকের মতে সংসার দুঃখময়। সুখও দুঃখানুষক্ত। অতএব গৌণসুখকেও দুঃখ বলিয়া গণ্য করা উচিত; জন্মিলেই দুঃখ। যদি দুঃখের নাশ করিতে হয় তবে জন্মের বারণ করিতে হইবে।···মিথ্যা জ্ঞানের উচ্ছেদ সাধন করিতে না পারিলে দুঃখ নিবৃত্তির উপায় হইবে না।[১] ন্যায়-দর্শনোক্ত ষোড়শ পদার্থের ('ঈশ্বর' তাহাদের বহির্ভূত) প্রকৃষ্ট জ্ঞান অর্জন করিতে সমর্থ হইলেই জীব অত্যন্ত দুঃখের অধিকার অতিক্রম করিয়া মোক্ষলাভ করে ইহাই ন্যায়-প্রদর্শিত মুক্তিপথ। গীতার অনুমোদিত পথ হইতে ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। 'ঈশ্বর'কে বাদ দিয়া মুক্তি-পথে একপদও অগ্রসর হওয়া অসম্ভব—ইহাই গীতার ঘোষণা। এজন্যই সমগ্র গীতার কোথাও ন্যায়দর্শনের কোনো ইঙ্গিত মিলে না।

ন্যায় ও গীতা

বৈশেষিকের মতেও 'নিঃশ্রেয়স' লাভের উপায় 'তত্ত্বজ্ঞান'। বৈশেষিকের উদ্দেশ্য জীবকে ঐ তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী করা। কিরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলে নিঃশ্রেয়স লাভ হয়? বৈশেষিকের মতে—দ্রব্যাদি ছয় পদার্থের সাধর্ম্য এবং বৈধর্ম্যজনিত তত্ত্বজ্ঞান। বৈশেষিক 'ঈশ্বর' অস্বীকার করে নাই। বরং বহুর বিচার প্রসঙ্গে ইঙ্গিতে ঈশ্বরের উল্লেখই করা হইয়াছে। ক্ষিতি, অপ্ প্রভৃতি যখন কার্য, তখন অবশ্যই ইহাদের একজন কর্তা আছেন; তিনিই 'ঈশ্বর'। ইহা ভিন্ন বৈশেষিকসূত্রে আর কোথাও ঈশ্বরের প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না। নব্য বৈশেষিকগণ গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, ঈশ্বরে জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ন, ইত্যাদি ৮টি গুণের সমাবেশ আছে। 'প্রশস্ত-পাদের মতে তত্ত্বজ্ঞান ঈশ্বরপ্রেরণাজনিত ধর্ম হইতে উৎপন্ন হয়।' পরমাণুবাদের প্রসঙ্গেও 'প্রশস্তপাদ' ঈশ্বরের অবতারণা করিয়াছেন।

বৈশেষিক ও গীতা

যাহা হউক, বৈশেষিক দর্শনেও ঈশ্বরের স্থান মুখ্য নহে, অতিশয় গৌণই। এজন্যই গীতায় বৈশেষিক সম্পর্কে কোনো উল্লেখই দেখা যায় না।

মীমাংসাদর্শনের মতে বেদের কর্মকাণ্ডই সার্থক, জ্ঞানকাণ্ড নিরর্থক। অতএব, এই মতে উপনিষদের সমস্ত সার সত্যের উপদেশ 'অর্থবাদ' মাত্র। মীমাংসক বলেন, বেদে যে আত্মার তত্ত্বজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য

১ গীতায় ঈশ্বরবাদ—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ ৯-১০

দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়া জীবকে অদৃষ্টফল স্বর্গাদির সাধন যাগকর্মে প্রবর্তিত করা। মীমাংসার মতে 'বেদ' নিত্য, অভ্রান্ত এবং অপৌরুষেয়। বেদ জীবের হিতার্থে ধর্মের প্রতিপাদন করিয়াছেন। 'ধর্ম' অর্থে যাগযজ্ঞ বুঝায়। স্বর্গকামনায় যাগ করিবে এইরূপ উপদেশ দ্বারা বেদ জীবকে প্রেরণা দান করেন। স্বর্গ সুখধাম; সেখানে দুঃখের লেশমাত্র নাই; সেখানে চাহিলেই সুখলাভ করা যায়। যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গলাভ হয়। আর যজ্ঞের ফল অপূর্ব; যজ্ঞের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায়। এইমতে বেদ পঞ্চবিধ—বিধি, মন্ত্র, নামধেয়, নিষেধ, অর্থবাদ।

মীমাংসা ও গীতা

ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা হয় বটে, কিন্তু যজ্ঞই মুখ্য। দেবতা গৌণমাত্র, 'প্রযোজক' নহে। কারণ 'দেবতা' মন্ত্রাত্মক। মীমাংসকগণ নিরীশ্বরবাদী—বেদ যে ঈশ্বর-বাক্য, তাহা ইঁহারা স্বীকার করেন না। ফলকথা, মীমাংসাদর্শনের কোথাও ঈশ্বরের কোনও প্রসঙ্গ নাই। জ্ঞানবাদীরা কিন্তু এই প্রকার কর্মকাণ্ডের বিরোধী। তাঁহারা বলেন যে কর্মের দ্বারা শ্রেয়োলাভ অসম্ভব, প্রেয়োলাভ হইতে পারে। একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমর হওয়া যায়। যাহারা কর্মানুষ্ঠানকেই শ্রেয়োলাভের উপায় মনে করে তাহারা মোহান্ধ। কর্মফল স্থায়ী নহে। কর্ম দ্বারা যে অমরত্বলাভ তাহা চিরস্থায়ী নহে, ক্ষণস্থায়ী। কর্মের আর একটি প্রধান অসুবিধা এই যে, উহা বন্ধের কারণ। অতএব জ্ঞানবাদীর মতে সর্বকর্মত্যাগই প্রকৃষ্ট পন্থা।

কিন্তু, কর্মানুষ্ঠান এবং কর্মসন্ন্যাসের এই মতান্তরের স্থলে, গীতার মত এই যে, কর্মশক্তি মোক্ষলাভের প্রতিবন্ধক। বেদের বিষয় সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনগুণ লইয়া; কিন্তু সাধক ত্রিগুণাতীত হইবেন।[১] কর্মবাদী মীমাংসকগণকে ইঙ্গিত করিয়া গীতা নিন্দা করিয়াছেন।[২] কর্মীর পুণ্য ক্ষীণ হইলে তাহাকে পুনরায় মর্তে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, গীতা ইহা স্পষ্টভাষায় আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছে। 'কর্ম' যে 'বন্ধে'র কারণ, সে কথাও গীতা বারবার বলিয়াছে। গীতার মতে, দেবতোদ্দেশে যজ্ঞের অনুষ্ঠান শ্রেয়ের

১ গীতা, ২।৪৫।

২ ঐ ২।৪২-৪৪।

পথ উন্মুক্ত করে না—কারণ, উহাতে দেবতাকেই লাভ করা যায়, ব্রহ্মকে নহে। ব্রহ্মলোক হইতেও জীবের পতন আছে, অক্ষর পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিলে আর পুনর্জন্ম ঘটে না। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, গীতা কি তাহা হইলে যজ্ঞানুষ্ঠানের বিরোধী? উত্তরে বলা যায় যে, গীতা সকাম যজ্ঞের বিরোধী, কিন্তু সকল যজ্ঞের বিরোধী নহে। যজ্ঞের প্রশংসাও গীতাতে আছে; যজ্ঞের শেষ-ভোজীর পক্ষে সনাতন ব্রহ্মলাভ সহজসাধ্য বলা হইয়াছে। স্বর্গাদিলাভের জন্য সকাম যজ্ঞের অনুষ্ঠান নিন্দনীয়, কিন্তু দেবতাগণের পোষণের জন্য এবং সংসার যাত্রা নির্বাহের জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান জীবের অবশ্য করণীয়।

সাংখ্য ও গীতা

অন্যান্য দর্শনের ন্যায় সাংখ্যদর্শনের আরম্ভও 'দুঃখবাদে'। জগতে চিরদিন জীবকে দুঃখের আঘাত সহিতে হয়। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক ভেদে সেই দুঃখ তিন প্রকার। যতদিন শরীর ক্ষয় না হয়, ততদিন এই দুঃখের আক্রমণ থাকিবেই। এই ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি সকলেরই কাম্য। কিন্তু সাময়িক নিবৃত্তিতে বিশেষ লাভ নাই। অতএব, দুঃখ নিবৃত্তি ঐকান্তিক এবং আত্যন্তিক হওয়া প্রয়োজন। ইহাই জীবের পুরুষার্থ। কিন্তু, লৌকিক উপায়ে এই দুঃখের নিবৃত্তি অসম্ভব। দুঃখনিবৃত্তির একটি উপায় বেদে দেখা যায়; তাহা এই যে, বেদোক্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান। কিন্তু, উহা নানাকারণে সমীচীন উপায় নহে। এজন্য সাংখ্যাচার্যগণের মতে লৌকিক এবং বৈদিক কোনো উপায়ই পর্যাপ্ত নহে। দুঃখনিবৃত্তির একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায় 'জ্ঞান'। এই জ্ঞান প্রকৃতি এবং পুরুষের বিবেক বা জ্ঞান।

গীতা এবং সাংখ্য উভয়ের মতেই—অসতের উৎপত্তি নাই, সতের বিনাশ নাই। 'প্রকৃতি-পুরুষই' নিত্য এবং অনাদি; আর সকলই প্রকৃতি হইতে সম্ভূত এবং অনিত্য। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিক এবং গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা। 'সাংখ্য' ঈশ্বর স্বীকার করে নাই। 'প্রবচন সূত্রে' স্পষ্টই ঈশ্বরের প্রতিষেধ করা হইয়াছে। প্রকৃতির পরিণামে ঈশ্বরের যে কিছুমাত্র সম্পর্ক আছে, সাংখ্যাচার্যগণ তাহা স্বীকার করেন নাই।

সাংখ্যের পুরুষ এবং গীতার আত্মা সমস্বভাববান্। উভয়েই নির্গুণ এবং

নির্লেপ। সাংখ্যমতে, প্রকৃতির গুণের দ্বারাই সমস্ত কর্ম নিষ্পন্ন হয়, পুরুষ অকর্তা, উদাসীন সাক্ষিমাত্র। গীতাও তাহাই বলিয়াছে: তবে একথাও গীতায় আছে 'প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ'।

'সাংখ্য'মতে অচেতন হইলেও প্রকৃতিকে সচেতন বলিয়া মনে হয় এবং বস্তুত কর্তা না হইলেও পুরুষকে কর্তা বলিয়া মনে হয়, কারণ, সৃষ্টিকালে পুরুষের গুণ প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতির গুণ পুরুষে উপচরিত হয়। গীতার মতেও, পুরুষ প্রকৃতিতে অবস্থিত থাকিয়া প্রকৃতিসম্ভূত গুণ ভোগ করেন।

গীতার সহিত সাংখ্যের অনৈক্য এস্থলে আলোচ্য। সাংখ্যমতে, 'পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বে'র বিচার এবং প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক হইতে আসে 'অপবর্গ'। গীতাও জ্ঞানের সমান পবিত্র জগতে আর কোনো বস্তুকেই দেখে নাই; তবে সে 'জ্ঞানে'র অর্থ 'পরা বিদ্যা', যাহাকে জানিয়া সেই পর অক্ষরকে লাভ করা যায়। তত্ত্বজ্ঞানীকে ভক্ত হইতেই হইবে। বহুজন্মের সাধনার ফলে ভক্ত যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইয়া জগতের সর্বত্র ভগবানের সত্তা প্রত্যক্ষ করেন এবং শেষে ভগবানকে লাভ করেন। গীতা পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করে নাই। এক সূর্য যেমন সমস্ত লোক প্রকাশিত করে, তেমনি এক পুরুষ সমস্ত প্রকৃতিকে প্রকাশ করেন। 'ঈশ্বর' সর্বব্যাপী, অপরিচ্ছিন্ন এবং অবিভক্ত; উপাধিভেদে তাঁহাকে বহু বলিয়া মনে হয়। ঈশ্বর অনন্ত, সর্বগত, স্থির, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য এবং নির্বিকার; এই উক্তিতে গীতা সাংখ্যের ষড়্ভাব-বিকারবর্জিত পুরুষের গুণাবলী আত্মাতে প্রয়োজিত করিয়াছে।[১]

প্রকৃতির পরিণাম যে স্বতঃসিদ্ধ, গীতা তাহা স্বীকার করে নাই। প্রকৃতির যে পরিণাম হয়, তাহা পুরুষের অধিষ্ঠান-জন্য, কারণ, 'ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।' ঈশ্বরের অধিষ্ঠানই প্রকৃতির সৃষ্টিরূপে পরিণামের যথার্থ কারণ। প্রলয়ে ঐ অধিষ্ঠান অপসৃত হয়, সেইজন্য 'প্রকৃতি' তখন সাম্যাবস্থায় থাকে। সৃষ্টির প্রাক্কালে ঈশ্বর প্রকৃতিকে 'ঈক্ষণ' করেন। ফলে, সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিয়া প্রকৃতির পরিণাম আরব্ধ হয়। ইহাই গীতাতে প্রকৃতির

১ দ্রঃ ভারতের অধ্যাত্মবাদ—নলিনীকান্ত ব্রহ্ম।

গর্ভাধান।[১] অব্যক্ত সূক্ষ্ম মূর্তিতে ঈশ্বর সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন। সাংখ্যের মতে, কিন্তু ঈশ্বরকে সিদ্ধ করিবার কোনো প্রমাণ নাই। ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্তা হইতে পারেন না, কারণ তাঁহার কোনোরূপ ক্রিয়া বা ব্যাপার নাই। সাংখ্যাচার্যগণ এই প্রকার নানারূপ যুক্তির অবতারণা করিয়া ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। সাংখ্যে 'কৈবল্য'-লাভের যে উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার সহিত ঈশ্বরের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। অথচ গীতায় ঈশ্বরই একমাত্র জ্ঞেয়। গীতার মতে সাংখ্যোক্ত পুরুষ এবং প্রকৃতি ভগবানের দুইটি 'aspect' (দিক্) মাত্র। ভগবানের দুইটি প্রকৃতি—পরা ও অপরা। 'পরা প্রকৃতি'ই সাংখ্যোক্ত পুরুষ, আর 'অপরা প্রকৃতি' সাংখ্যোক্ত প্রধান। কিন্তু, গীতার মতে, ইহা চরম তত্ত্ব নহে; চরম তত্ত্ব সেই অক্ষর পুরুষ, যাহার পরে আর কোনো কিছুই নাই। সূত্রে যেমন মণিগণ গ্রথিত থাকে, পরম-পুরুষে নিখিল বিশ্ব সেইরূপে গ্রথিত থাকে। গীতার মতে, পুরুষ-প্রকৃতি ঈশ্বরপরতন্ত্র, স্বতন্ত্র নহে। জড়বর্গের উপাদান ঈশ্বরের অপরা প্রকৃতি, আর জীবরূপী পুরুষ তাঁহার পরা প্রকৃতি। গীতা এক স্থলে প্রকৃতিকে 'পর পুরুষ' এবং পুরুষকে 'অক্ষর পুরুষ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। 'ঈশ্বর' (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং) কিন্তু ক্ষরের অতীত এবং অক্ষরেরও উত্তম, পুরুষোত্তম।[২]

এজন্য বলা যায় যে, গীতার মতে—প্রকৃতি এবং পুরুষ চরম দ্বৈত নহে। উভয়ে পরমাত্মারই বিভাবমাত্র।

পাতঞ্জল ও গীতা

'যোগসূত্র'কার পতঞ্জলি সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বের উপর আর একটি তত্ত্বের কথা বলিয়াছেন। সে তত্ত্ব ঈশ্বর। ঈশ্বর সাংখ্যোক্ত পুরুষ নহেন, তিনি পুরুষবিশেষ। ঈশ্বরের লক্ষণ সম্বন্ধে পতঞ্জলি বলিয়াছেন:—যে পুরুষবিশেষ ক্লেশ কর্ম বিপাক এবং আশয়ের সম্পর্কশূন্য, তিনিই ঈশ্বর। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞানাকর, তিনি ব্রহ্মাদি পূর্বাচার্যগণেরও গুরু, ত্রিকালাতীত।

পাতঞ্জলদর্শনে তত্ত্বালোচনা মুখ্য বিষয় নহে—মুখ্য বিষয় যোগ। প্রকৃতি-

১ গীতা ১৪।৩-৪।

২ গীতা ১৫।১৩—১৮।

পুরুষের নিশ্চল ভেদ-জ্ঞানই মোক্ষলাভের অদ্বিতীয় পন্থা। এই জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় 'যোগ' বা চিত্তবৃত্তি নিরোধ। চিত্তের অবস্থা পাঁচটি—ইহাদের মধ্যে চতুর্থ ও পঞ্চম অবস্থার একাগ্র ও নিরুদ্ধ চিত্তই যোগের উপযোগী।

অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা প্রথমত চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিতে হয়, পরে অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা যথাক্রমে দৃঢ়তা ও পরাকাষ্ঠা লাভ হইলে যোগীর সমাধিলাভ আসন্নতম হয়। ঈশ্বরপ্রণিধানও আসন্নতম সমাধিলাভের অন্যতম উপায়। ঈশ্বরপ্রণিধানের ফলে ব্যাধি, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য প্রভৃতি চিত্ত-বিক্ষেপরূপ অন্তরায়সমূহ দূরীভূত হয় এবং পুরুষের স্বরূপ দর্শন হয়।

চিত্তবৃত্তির একতান-প্রবাহের নাম ধ্যান। এই ধ্যান পরিপক্ব হইয়া যখন ধ্যেয়াকারে পরিণত হয়, চিত্তবৃত্তি থাকিয়াও না থাকার ন্যায় ভাসমান হয়, সেই অবস্থার নাম 'সমাধি'। 'সমাধি' আবার 'সম্প্রজ্ঞাত' এবং 'অসম্প্রজ্ঞাত'-ভেদে দুই প্রকার। একাগ্র চিত্তের যোগ 'সম্প্রজ্ঞাত', নিরুদ্ধ চিত্তের যোগ 'অসম্প্রজ্ঞাত'।

গীতা পতঞ্জলির উপদিষ্ট যোগ প্রণালীর অনুমোদন করিয়াছেন। এমনকি, যোগীকে তপস্বী, জ্ঞানী এবং কর্মীর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ে ধ্যানযোগের সবিস্তার উপদেশ আছে। তাহার আলোচনা করিলে মনে হয় যে, ভগবান্ পতঞ্জলি-প্রদর্শিত 'অষ্টাঙ্গযোগে'র সাধারণতঃ অনুমোদন করিয়াছেন।[১]

পাতঞ্জলমতে, যোগের চরম অবস্থায় পুরুষের 'স্বরূপে অবস্থান' ঘটে। পতঞ্জলি বলেন, পুরুষ চিৎস্বরূপ; এই মতে, তিনি আনন্দঘন নহেন; অতএব, পাতঞ্জলোক্ত মুক্তি সুখদুঃখের অতীত কৈবল্য অবস্থা। ইহাতে দুঃখের নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু সুখের প্রাপ্তি ঘটে না। গীতা কিন্তু যোগের ফল অন্যভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। গীতার মতে, যে অবস্থায় বুদ্ধিবেদ্য, অতীন্দ্রিয়, নিরতিশয় সুখের উপলব্ধি হয়, যে অবস্থায় অবস্থান করিলে তত্ত্ব হইতে বিচ্যুতি ঘটে না, এবং যে অবস্থায় উপস্থিত হইলে গুরুতর দুঃখও বিচলিত করিতে পারে না,

---

১ গীতা ৬।১০-১৪, ৬।২৪-২৬, ৫।২৭-২৮।

দুঃখের সংস্পর্শশূন্য সেই অবস্থার নাম যোগ। নির্বেদশূন্য চিত্তে সেই যোগ নিশ্চয়ের সহিত অভ্যাস করা উচিত।'[১]

গীতার মতে, যোগের অবস্থায় নিরতিশয় সুখলাভ ঘটে। যোগসিদ্ধ হইলে এই সুখ আরও ঘনীভূত হইয়া ব্রহ্মানন্দে পরিণত হয়। ব্রহ্মে সমাধি লাভ করিয়া যোগী অক্ষয় সুখ লাভ করেন। পাতঞ্জল মতে জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন; যোগের যে চরম অবস্থা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি, তাহাতে আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে মাত্র, ঈশ্বরলাভ হয় না। গীতার মতে, যোগের দ্বারা ভগবানের সঙ্গ বা সাক্ষাৎলাভ হয়।

পাতঞ্জল মতে, যোগের অর্থ প্রকৃতিপুরুষবিয়োগ বা বিবেক-সংযোগ নহে। এই মতে, যোগশব্দে ঈশ্বরের সহিত জীবের সংযোগ বুঝায় না, বুঝায় চিত্ত-নিরোধের ব্যাপার মাত্র। গীতা যোগীকে মনঃসংযম করিয়া চিত্ত ঈশ্বরে নিহিত করিতে উপদেশ দিয়াছেন। গীতার মতে,—যোগের ফলে যে শান্তিলাভ করা যায়, তাহা ভগবানে স্থিতির ফল।

যোগদর্শনের মতে ঈশ্বর-প্রণিধানের অর্থ ঈশ্বরে চিত্তের আধান নহে—ঈশ্বরে কর্মার্পণমাত্র। ঈশ্বরপ্রণিধানের উপদেশ দিয়া পতঞ্জলি যোগীকে কর্ম-সন্ন্যাস করিবার উপদেশ দিয়াছেন, যোগীকে ভগবানের ধ্যান করিতে বলেন নাই। ইহাই গীতোক্ত কর্মযোগ। গীতার মতে তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী, যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ভগবানে চিত্ত সংযুক্ত করিয়া তাঁহাকে ভজনা করেন। যোগী যদি দেহত্যাগের সময় ওঁকাররূপ ব্রহ্মমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভগবানকে 'স্মরণ'-করিয়া দেহত্যাগ করেন, তবেই তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন। এইজন্য গীতাতে বলা হইয়াছে—

> "মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদযাজী মাং নমস্কুরু।
> মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ।" (৯।৩৪)

বেদান্ত ও

বেদান্তদর্শনের অদ্বৈতমতে, ব্রহ্মই একমাত্র সৎ বস্তু; আর সমস্তই অসৎ, অবস্তু। কেবল একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মই আছেন, আর কোনো কিছু নাই। অতএব এ-মতে, জগৎ অসত্য, কাল্পনিক মায়ার বিজৃম্ভণ মাত্র। বিশিষ্টাদ্বৈত মতে জগৎ সত্য বস্তু। জগৎ ব্রহ্মপরতন্ত্র

১ গীতা, ৬।২১-২৩

বটে, জগৎ ব্রহ্মের অধীন, ব্রহ্মের প্রকার মাত্র; কিন্তু জগৎ মিথ্যা, কাল্পনিক নহে। জগৎ প্রকৃতির পরিণামে গঠিত, বিকারজনিত বাস্তব পদার্থ।

গীতার মতে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণই সর্বভূতের সনাতন বীজ। এই অক্ষয় বীজ হইতে জগতের উৎপত্তি—ইহার দ্বারা স্থিতি এবং ইহাতেই লয় হইতেছে। তিনিই জগতের নিধান—আধার ও আশ্রয়। প্রলয়ের অবসানে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত জগতের আবির্ভাব হয়; এবং সৃষ্টির অবসানে ব্যক্ত জগতের অব্যক্ত প্রকৃতিতে তিরোভাব ঘটে। ভূতসমূহ বারংবার উৎপন্ন হইয়া রাত্রিসমাগমে পরাধীনভাবে বিলীন এবং বিলীন থাকিয়া দিবাসমাগমে পুনরায় উদ্ভূত হয়। কল্পান্তে সমস্ত ভূত ভগবানের প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয়। আবার সৃষ্টিকালে তিনি তাহাদিগকে উৎপাদন করেন। এই সমস্ত অবশ প্রকৃতির বশতাপন্ন ভূতগ্রামকে ভগবান স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া বারবার সৃষ্টি করেন।

গীতার এই সকল বচনের কোথাও জগতের মিথ্যাত্বের উপদেশ মিলে না। জগৎ যে কাল্পনিক পদার্থ, বিজ্ঞানের বিজৃম্ভণমাত্র কোথাও এরূপ ইঙ্গিত দেখা যায় না। বরং সতের অভাব হয় না এবং অসতের ভাব হয় না—এই সকল স্থলে গীতা সাংখ্যমতানুযায়ী পরিণামবাদেরই সমর্থন করিয়াছেন। জগতের সত্য মিথ্যা সম্বন্ধে গীতা প্রধানত বিশিষ্টাদ্বৈতমতের অনুযায়ী পরিণামবাদেরই অনুমোদন করিয়াছেন—অদ্বৈতমতোক্ত বিবর্তবাদের সমাদর করেন নাই।

অদ্বৈতমতে জীবই ব্রহ্ম—জীব নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সত্যস্বভাব, বিভু ও সর্বব্যাপী; সচ্চিদানন্দ; এক এবং অদ্বিতীয় বস্তু। জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপত অভিন্ন; কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতমতে জীব ও ব্রহ্ম স্বতন্ত্র বস্তু, জীব ব্রহ্মের বিপরীত। জীব দুঃখাধীন, ব্রহ্ম ক্লেশলেশবিহীন। ব্রহ্ম বিভু, জীব অণু-পরিমাণ, প্রতি শরীরে বিভিন্ন। এই মতানৈক্যস্থলে গীতা দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৭-২৪ শ্লোকে আত্মার অবিনাশিতা বুঝাইয়াছে। এস্থলে জীবকে বলা হইয়াছে অজ, পুরাণ, নিত্য, সনাতন, অবিনাশী, স্থাণু, অচল, শাশ্বত, অবিকারী, সর্বগত অপ্রমেয়, অব্যক্ত এবং অচিন্ত্য। এ সকলগুলিই ব্রহ্মের লক্ষণ। অতএব ব্রহ্মের লক্ষণ দ্বারা জীবকে লক্ষিত করিয়া ভগবান্ জীব-ব্রহ্মের ঐক্যই উপদেশ করিয়াছেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ জীবকে নিজের অংশ বলিয়াছেন ; কিন্তু ভগবান্ যে নিরবয়ব, তাঁহার অংশ বস্তুত সম্ভবপর নহে। তবে উপাধির অবচ্ছেদ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার অংশ কল্পনা করা যাইতে পারে। ভগবান্ই যে দেহে দেহীরূপে অবস্থিত, ইহা গীতার মধ্যেই দেখা যায় (১৩৷২৩)। গীতা যে ভাবে আত্মার নির্লেপত্বের উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতেও মনে হয় যে, আত্মার ব্রহ্ম-স্বরূপতাই গীতার অভিপ্রেত। আত্মা যে বহু নহেন, এক,—গীতা সে কথাও বলিয়াছেন।[১]

১ দ্রঃ গীতায় ঈশ্বরবাদ—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

ভারতীয় দর্শনে বাঙালী

সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় ভারতীয় দর্শনেও বাঙালীর দান বড়ো কম নহে। বাঙালীর মনীষা সকল বস্তুর এমন প্রকার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছে যে বিদ্যার এমন কোনো বিভাগ নাই যেখানে বাঙালী হস্তক্ষেপ করে নাই—আর দর্শনের ন্যায় জটিল এবং বন্ধুর ক্ষেত্রেও বাঙালীর মনীষার বিচিত্ররূপ দেখিলে বিস্মিত হওয়া স্বাভাবিক।

বাঙালীর মনীষা

সাংখ্যদর্শনকার কপিল সম্ভবত বাঙালী ছিলেন; কিন্তু প্রমাণাভাবে এ বিষয়ে বিশেষ কিছু জোর করিয়া বলা যায় না। কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গাহিয়াছেন—

কপিল

"জ্ঞানের নিধান আদি বিদ্বান্ কপিল সাংখ্যকার।
এই বাংলার মাটিতে গাঁথিল সূত্রে হীরকহার॥"[১]

কিন্তু ইহার ঐতিহাসিকতা গবেষকগণের আলোচনার বিষয়। সাংখ্যের অন্যান্য গ্রন্থ বাংলাদেশে রচিত হয় নাই বলিলেই হয়।

ন্যায় এবং বৈশেষিকের ক্ষেত্রে বাঙালীর অবদান চিরস্মরণীয়। বেদান্ত এবং পূর্বমীমাংসার আলোচনাতেও বাঙালীর প্রতিভা অপূর্ব নৈপুণ্য দেখাইয়াছে। যোগের নব্যমতে ব্যাখ্যাও এই বাংলার বক্ষেই প্রথম দেখা গিয়াছিল। বৌদ্ধদর্শন সম্ভূত সহজিয়া মতও অনেকটা দর্শনের পর্যায়ে আসিয়াছে—উহা হইতে আবার বৌদ্ধতন্ত্রগুলির সৃষ্টি হইয়াছে। তান্ত্রিক বা আগমানুগ দর্শন বাঙালীর নিজস্ব সৃষ্টি বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। শৈব এবং শাক্ত মতেও বাঙালীর যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। বিশেষতঃ ভারতীয় দর্শন সাহিত্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন এক অপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে। এজন্য সংক্ষেপে ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে বাঙালীর অবদান অবশ্য আলোচ্য বিষয়।[২]

প্রায় সকল দর্শনেই বাঙালীর নৈপুণ্য দেখা যায়

১। 'আমরা' কবিতায়। গঙ্গাসাগরের 'কপিলাশ্রম' এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাও এরূপ কল্পনার কারণ হইতে পারে।

২। দ্রঃ ভারতদর্শনসার।

ন্যায় এবং বৈশেষিকে বাঙালীর অবদান চিরস্মরণীয়। নব্যন্যায় তো একমাত্র বাঙালীরই সৃষ্টি। ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শনের টীকাকারগণের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বাঙালী। দ্বিজেন্দ্রলাল গাহিয়াছেন—"ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি।" সত্যেন্দ্রনাথ এই রঘুমণির সম্বন্ধেই লিখিয়াছেন—

নব্যন্যায়

"কিশোর বয়সে পক্ষধবের পক্ষশাতন করি।
বাঙালীর ছেলে ফিরে এল দেশে যশের মুকুট পরি॥"

রঘুমণি
রঘুনাথ শিরোমণি

একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে যে বাঙলাদেশে সর্বপ্রথম বাসুদেব সার্বভৌমই ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা করেন। রঘুনাথ শিরোমণি প্রথমে তাঁহারই শিষ্য ছিলেন। কিন্তু একথা ঠিক সত্য নহে। বাসুদেব সার্বভৌমের পূর্বেও বাঙলাদেশে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা চলিত। পূর্বকালেও বাঙলাদেশে প্রাচীন ন্যায়-বৈশেষিক গ্রন্থগুলির বিশেষ চর্চা হইয়াছে।

খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ বাঙালী মীমাংসক শ্রীধরভট্ট ন্যায়-বৈশেষিক শাস্ত্রেও অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন—সর্বদেশে প্রসিদ্ধ প্রশস্তপাদ ভাষ্য-টীকা 'ন্যায়কন্দলী' তাঁহার অক্ষয় কীর্তি। 'খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য'কার মহানৈয়ায়িক শ্রীহর্ষও[১] গৌড়ীয় দার্শনিক ছিলেন বলিয়া রাজশেখর সূরী উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীহর্ষের গৌড়দেশে জন্ম সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও 'ন্যায়কন্দলী'কার শ্রীধরভট্ট যে গৌড় দেশীয় প্রাচীন মহাদার্শনিক, একথা নির্বিবাদ সত্য।

শ্রীধরভট্ট খ্রী: ১০ম শতাব্দী

শ্রীহর্ষ

বাঙলাদেশে দক্ষিণরাঢ়স্থ 'ভূরিসৃষ্টি' নামে একটি সুপ্রসিদ্ধ গ্রাম ছিল—এই ভূরিসৃষ্টির মহাপণ্ডিত ছিলেন শ্রীধরভট্ট।[২] তাঁহার পর একাদশ শতাব্দীতে মহামীমাংসক ভবদেব ভট্ট বহুশ্রুত পণ্ডিত আবির্ভূত হন। ন্যায়শাস্ত্রে বিশিষ্ট পাণ্ডিত্য ব্যতীত ভবদেবের ন্যায়

ভবদেব ভট্ট :

১ দ্রঃ ভারতদর্শনসার।

২ বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, ১ম ভাগ, পৃঃ ৩, ৭।

শ্রীধর ষড়্দর্শনে ব্যুৎপন্ন ছিলেন; বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শন ভিন্ন বেদান্ত এবং পূর্বমীমাংসা দর্শন সম্বন্ধেও তিনি গ্রন্থাদি লিখিয়াছেন। সাংখ্যযোগদর্শনেও তাঁহার ব্যুৎপত্তির প্রমাণ মিলে।

মীমাংসক হওয়া সুকঠিন। দ্বাদশ শতাব্দীতে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সময়েও বাঙলাদেশে হলায়ুধ প্রভৃতি মীমাংসক এবং অনেক নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। সেন-রাজত্বের অবসানে মুসলমান রাজ্যারম্ভেও বাঙলাদেশে বহু মীমাংসক এবং ন্যায়শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত আবির্ভূত হন। ব্রাহ্মণকুলপ্রদীপ দিবাকরভট্টের পুত্র কুল্লূকভট্ট মীমাংসা, ন্যায় এবং ভাস্করীয় বেদান্তে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কুল্লূকের পর রাজা গণেশের সভাপণ্ডিত রায়মুকুট বৃহস্পতি অসাধারণ শাব্দিক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার 'স্মৃতি-কণ্ঠহার' নামে স্মৃতিনিবন্ধও বিদ্যমান আছে।

হলায়ুধ

কুল্লূকভট্ট

রায়মুকুট বৃহস্পতি

ফলত, পূর্বকালেও বাঙলাদেশে ন্যায়শাস্ত্রের যে বিশেষ চর্চা হইয়াছিল, তাহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। আর বাঙলাদেশের কোনো কোনো পণ্ডিত দেশান্তরবাসী হইয়া মিথিলার নব্যন্যায় গ্রন্থেরও অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদি করিয়াছিলেন বুঝা যায়। কিন্তু তখনও নবদ্বীপে নব্যন্যায়ের সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

"বাঙলাদেশে নব্যন্যায় চর্চার ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে নবদ্বীপ বিদ্যাসমাজেরই ইতিহাস।"[১] নবদ্বীপের এই গৌরব শিরোমণির সময় হইতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও তাহার মূলোৎপত্তি ঘটিয়াছিল বহু পূর্বে এবং বহু মনীষীর দীর্ঘ সাধনার ফলে তাহা সিদ্ধ হইয়াছিল। এই বিদ্যাসমাজের আদি পণ্ডিতের নাম ছিল রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ এবং তিনিই কুসুমাঞ্জলির 'রামভদ্রী'র টীকাকার বলিয়া কাহারও কাহারও মত।

নবদ্বীপ

রামচন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশ

প্রবাদ আছে যে, পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র বাসুদেব সার্বভৌম চারিখণ্ড চিন্তামণি ও কুসুমাঞ্জলির কারিকাংশ কণ্ঠস্থ করিয়া আনিয়া নবদ্বীপে 'সর্বপ্রথম' ন্যায়

১ এই সম্পর্কিত আলোচনার জন্য লেখকগণ 'বঙ্গদেশে নব্যন্যায় চর্চা' গ্রন্থের নিকট সর্বতোভাবে ঋণী।

শাস্ত্রের চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় এই প্রবাদ ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। বাসুদেবের গ্রন্থের নাম আবার সার্বভৌমনিরুক্তিই নহে, ইহাও জানা গিয়াছে। তাঁহার দুইটি গ্রন্থ মাত্র পাওয়া যায়—তত্ত্বচিন্তামণির অনুমানখণ্ডের আদ্যন্ত খণ্ডিত টীকা এবং বেদান্তপ্রকরণ 'অদ্বৈতমকরন্দে'র টীকা। রঘুনাথ শিরোমণি 'অনুমান দীধিতি'র বহুস্থলে সার্বভৌম মত উদ্ধৃত করিয়া প্রায়ই খণ্ডন করিয়াছেন। বাসুদেব একাধারে নৈয়ায়িক এবং অদ্বৈত বৈদান্তিক ছিলেন। এই হিসাবে তাঁহাকে মধুসূদন সরস্বতীর পূর্বসূরী বলা যাইতে পারে। তিনি নিজে ষড়্দর্শনেও বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। নরহরি বিশারদ অপর একজন প্রসিদ্ধ বাঙালী বৈদান্তিক। নব্যন্যায়ের যুগে সম্ভবত তাঁহার দার্শনিক রচনাবলী বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

বাসুদেব সার্বভৌম

বাসুদেব মধুসূদন সরস্বতীর পূর্বসূরী

নরহরি বিশারদ

শ্রীনাথ ভট্টাচার্য চক্রবর্তী অনুমানখণ্ড এবং প্রত্যক্ষখণ্ডের টীকা রচনা করেন। বিষ্ণুদাস বিদ্যাবাচস্পতি ছিলেন সনাতন গোস্বামীর গুরুদেব—তিনি তত্ত্বচিন্তামণির একজন টীকাকার। পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর ষড়্দর্শনে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি অর্জন করিয়া নব্যন্যায়াদি নানা শাস্ত্রের বিদ্যাসাগরী টীকা রচনা করেন।

শ্রীনাথ ভট্টাচার্য

বিষ্ণুদাস বিদ্যাবাচস্পতি

পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর

শ্রাদ্ধবিবেকের শেষে ম.ম. শূলপাণি মীমাংসাদর্শনে নিজের অসামান্য পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং নব্যস্মৃতির প্রবর্তক এই মহামহোপাধ্যায় ন্যায়দর্শনেও কৃতবিদ্য ও গ্রন্থকার ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

শূলপাণি

কাশীনাথ বিদ্যানিবাস নব্যন্যায়ের আকরগ্রন্থ তত্ত্বচিন্তামণির টীকা রচনা করিয়া অমর হইয়া আছেন। তাঁহার প্রণীত টীকার নাম 'তত্ত্বচিন্তামণি-বিবেচন'। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গঙ্গেশ তত্ত্বচিন্তামণি রচনা করিয়াছিলেন। পরবর্তী ৫০০ বৎসরের মধ্যে ভারতের নানাস্থানে অগণিত নব্যন্যায়ের গ্রন্থ রচিত হইলেও দুইজন মাত্র

কাশীনাথ বিদ্যানিবাস

মহানৈয়ায়িক নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—পক্ষধর মিশ্র ও রঘুনাথ শিরোমণি। তন্মধ্যে পক্ষধর মিশ্রের সম্প্রদায় দীর্ঘকাল বিলুপ্ত হইয়াছে এবং বর্তমানে একমাত্র শিরোমণির সম্প্রদায়ই সমগ্র ভারতবর্ষে বাঙালী প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে।"[১]

'শিরোমণি'র সর্বপ্রথম রচনা 'প্রত্যক্ষমণিদীধিতি'। এ গ্রন্থে শিরোমণির রচনাশৈলী সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। দ্বিতীয় রচনা 'অনুমানদীধিতি' এবং উহাই শিরোমণির সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। প্রথম গ্রন্থে রঘুনাথ 'তত্ত্বচিন্তামণির' প্রামাণ্যবাদ এবং তৎপরবর্তী প্রকরণ অন্যথাখ্যাতিবাদ পর্যন্ত আলোচনা করিয়াছেন—অর্থাৎ মূল প্রত্যক্ষখণ্ডের অতি সামান্য অংশই তিনি উহাতে আলোচনা করিয়াছেন। দ্বিতীয়টিতে গ্রন্থকার হেত্বাভাসের বাধপ্রকরণ পর্যন্ত আলোচনা করিয়াছেন। ঈশ্বরবাদের একটিমাত্র পংক্তি ব্যাখ্যা করিয়াই এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে।

রঘুনাথ শিরোমণি

নৈয়ায়িকসমাজে প্রবাদ এই যে শিরোমণি শব্দখণ্ডের উপর টীকা করেন নাই। কয়েকজন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতও অনুরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু রঘুনাথ প্রণীত 'শব্দমণিদীধিতি'ই প্রমাণ করিয়াছে যে এই ধারণা কতদূর ভ্রান্ত। শিরোমণির অপরাপর দার্শনিক গ্রন্থ :—'নঞ্‌বাদ', 'পদার্থখণ্ডন', 'দ্রব্যকিরণাবলীপ্রকাশ-দীধিতি', 'গুণকিরণাবলীপ্রকাশদীধিতি', 'আত্মতত্ত্ব-বিবেকদীধিতি', 'ন্যায়লীলাবতীপ্রকাশদীধিতি' ইত্যাদি। তাঁহার আবির্ভাবকাল ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে নহে।[২]

ইঁহার রচনাবলী

আবির্ভাবকাল
খ্রীঃ ১৫০০ অব্দ

"বিগত সহস্র বৎসর মধ্যে বাঙলাদেশে রঘুনাথ শিরোমণির ন্যায় ভাগ্যবান্ মহাপণ্ডিত আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। কারণ, তাঁহার প্রধান গ্রন্থ .'অনুমানদীধিতি' অদ্য ৪০০ বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষের সর্বত্র··· ভারতীয় দর্শনের উচ্চতম বিদ্যায়তনসমূহে দুরূহতম আকরগ্রন্থরূপে প্রতিভাশালী ছাত্রের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা পরিমাপ করিয়া আসিতেছে।"[৩]

১ বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান পৃঃ ৭৯।
২ বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান পৃঃ ১০১।
৩ ঐ পৃঃ ১০২।

শিরোমণির আবির্ভাবের পর বাঙলাদেশে পূর্বতন ও সমকালীন যে সকল 'মণিটীকা' রচিত হইয়াছিল, 'দীধিতি'র প্রচার কালে তাহাদের পঠনপাঠন নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া যায়। জানকীনাথের পুত্র রামভদ্র সার্বভৌম, বিদ্যানিবাসের পুত্র রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি এবং বিশ্বনাথ পঞ্চানন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন গৌড়ীয় গোষ্ঠীর যাবতীয় অধ্যাপক শিরোমণির গ্রন্থের অধ্যাপনা ও টীকা রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

রামচন্দ্র সার্বভৌম, রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি, বিশ্বনাথ পঞ্চানন

"শিরোমণির নব্যন্যায়ের গ্রন্থগুলির উপর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই যে অসংখ্য টীকা টিপ্পনী লেখা হইয়াছিল, মধ্যযুগে বাঙালী প্রতিভার তাহাই বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।" টীকাকারগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ:—হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য, কৃষ্ণদাস সার্বভৌম, রামচন্দ্র সার্বভৌম, শ্রীরাম তর্কালঙ্কার, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, গুণানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কালঙ্কার, গোবিন্দ ভট্টাচার্য চক্রবর্তী, গোপীকান্ত ন্যায়ালংকার, রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ, রামগোপাল সিদ্ধান্ত পঞ্চানন, গদাধর ভট্টাচার্য চক্রবর্তী, নারায়ণ সার্বভৌম, রামনাথ তর্কবাচস্পতি, রূপনারায়ণ, মহেশ্বর ভট্টাচার্য।

অন্যান্য লেখকগণ

গদাধর ভট্টাচার্যের সময় নবদ্বীপের নব্যন্যায়চর্চা উন্নতির উচ্চতম শিখরে উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার পরবর্তী যুগে জয়দেব তর্কালংকার, শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম, বিশ্বনাথ ন্যায়ালংকার, শিবরাম বাচস্পতি, জয়কৃষ্ণ তর্কাচার্য, শঙ্কর তর্কবাগীশ ইত্যাদি অসংখ্য পণ্ডিত নব্যন্যায়ের আলোচনা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করিয়া অসামান্য ধীমত্তার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।[১] জগদীশ তর্কালংকার যে রামভদ্রের ছাত্র, বর্তমানে তাহা অবিসংবাদিত। জগদীশ ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই গ্রন্থ রচনা করেন, পরে নহে। নবদ্বীপের জগদীশ রচিত দীধিতির টীকা প্রচারলাভ করিলে নব্যন্যায়ের অনুমান খণ্ডের উপর বিরাট সাহিত্য ক্রমশ লুপ্ত হইয়া যায়। জগদীশ নিজেই বলিয়াছেন—দীধিতির নিগূঢ় ভাব শত বৎসরের অগণিত

গদাধর ভট্টাচার্য

১: বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান।

মহানৈয়ায়িকের প্রয়াসেও অপ্রকাশিত থাকিয়া আজ জগদীশের যত্নে উদ্‌ঘাটিত হইল।

তিনি বহু গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছিলেন :—প্রত্যক্ষময়ূখ, অনুমানময়ূখ, উপমানময়ূখ, শব্দময়ূখ, প্রত্যক্ষদীধিতিটীকা, অনুমানদীধিতিটীকা, লীলাবতী-দীধিতিটীকা, দ্রব্যসূক্তি, গুণসূক্তি, শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, তর্কামৃত, ন্যায়াদর্শ প্রভৃতি।

অধ্যাপক জীবনের সর্বোচ্চ সম্মান 'জগদ্‌গুরু' আখ্যা লাভে। নবদ্বীপে অনেক মহামহোপাধ্যায় ছিলেন, কিন্তু জগদ্‌গুরু খুব কমই ছিলেন। জগদীশ জগদ্‌গুরু ছিলেন বলিয়া প্রমাণ আছে। অর্থাৎ তিনি নবদ্বীপে প্রধান নৈয়ায়িকের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[১]

বেদান্তদর্শনেও বাঙালীর প্রতিভার যথেষ্ট স্ফুরণ দেখা যায়। বিখ্যাত বৈদান্তিক চিৎসুখাচার্যের গুরুদেব আচার্য জ্ঞানোত্তম ছিলেন গৌড় দেশীয় আচার্যগণের শীর্ষ-স্থানীয়। চিৎসুখ মাধবাচার্যের পূর্ববর্তী। গঙ্গেশ অদ্বৈতমত আক্রমণ করিলে প্রতিআক্রমণাথে চিৎসুখ ন্যায়ের যুক্তিশ্রেণী ভেদ করিয়া অদ্বৈতবেদান্তের বিজয়বৈজয়ন্তী সুস্থাপিত করেন।

আচার্য জ্ঞানোত্তম (বেদান্তে)

শ্রীচৈতন্যদেব চৈতন্য সম্প্রদায় বা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের প্রবর্তক।[২] তিনি কেবল এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তকই নহেন, তিনি ইহার উপাস্যও বটেন। চৈতন্যদেব যে মত প্রবর্তন করেন, সে সম্বন্ধে তিনি নিজে কোনো গ্রন্থ লিখিয়া যান নাই। অন্যান্য মত বা ধর্মপ্রবর্তকগণের সকলেরই গ্রন্থাদি আছে, কেবল চৈতন্যদেবের কোন গ্রন্থ নাই; নিত্যানন্দেরও কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। সম্ভবত চৈতন্য, নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈতাচার্য কোন গ্রন্থই লিখিয়া যান নাই। অতএব চৈতন্যের মতবাদ তাঁহার স্বকৃত গ্রন্থ অথবা সহকারিগণের গ্রন্থ হইতে জানা

শ্রীচৈতন্যদেব (অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ ; বেদান্তে)

১ দ্রঃ বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ১৬৫-১৭২।

২ History of Philosophy : Eastern and Western. Vol. I, pp. 358-367.

দুষ্কর। চৈতন্যের সাক্ষাৎ শিষ্য রূপ ও সনাতন গোস্বামীদ্বয়ের রচিত গ্রন্থই তাঁহার মতের উপাদান। রূপ ও সনাতনের[১] পর তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীবগোস্বামী দার্শনিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। এই তিনজন আচার্য 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' প্রপঞ্চিত করিয়াছেন, কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের কোনও ভাষ্যাদি বা বেদান্তের কোনোও প্রকরণ-গ্রন্থ রচনা করেন নাই।[২]

রূপ, সনাতন এবং জীব গোস্বামী

শ্রীরূপ, সনাতন এবং জীবগোস্বামীর গ্রন্থাদি গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে প্রামাণিক গ্রন্থ। ইঁহাদের রচিত গ্রন্থই উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়া বলদেব বিদ্যাভূষণ স্বীয় 'গোবিন্দভাষ্য' রচনা করিয়াছেন। 'অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ' মধ্ব ও নিম্বার্কমতের মিলনে বা মিশ্রণে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে যে বিশেষত্ব আছে তাহা অবশ্যই নিজস্ব। বল্লভাচার্যের পুষ্টিমার্গ গৌড়ীয়মতকে প্রভাবিত করিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। শ্রীচৈতন্যদেব শেষ জীবনে মধুরভাবের ভাবুক হইয়াছিলেন। বোধ হয় বল্লভীয় মত হইতেই মধুরভাব শ্রীচৈতন্যের মতে স্থান পাইয়াছিল।[৩] এ বিষয়ে অন্য কারণও আছে—কারণ, বল্লভ ও চৈতন্য উভয়েই সমকালিক।

বলদেব বিদ্যাভূষণ

গৌড়ীয় মতে বল্লভের প্রভাব

আচার্য মধুসূদন সরস্বতী বাঙালী এবং আকুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন। তিনি ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। মধুসূদন বাঙলাদেশের অলংকারস্বরূপ—কৈশোরে তিনি ন্যায়দর্শন অধ্যয়ন করিয়া কৃতী হন। লোকপ্রবাদ এইরূপ যে তিনি ন্যায়দর্শন অধ্যয়ন করিয়া কাশীতে গমন করেন। সেখানকার পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার সহিত বিচারে পরাজিত হন। কাশীতে মধুসূদন বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর প্রভাবে দণ্ড্যাশ্রম-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। মধুসূদনের প্রভাবপ্রতিপত্তিতে অদ্বৈতবাদ প্রবল হইতে প্রবলতর হয়।

মধুসূদন সরস্বতী

মধুসূদন ব্যাসরাজ স্বামীর 'ন্যায়ামৃত' নামক প্রবন্ধ খণ্ডন করেন। তাঁহার

১ দ্রঃ Vaisnava Faith and Movement, pp. 108-118.

২ দ্রঃ বেদান্তদর্শনের ইতিহাস, পৃঃ ৬৮০।

৩ দ্রঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবরসের অলৌকিকত্ব—উমা রায়।

বিষ্ণুভক্তি সর্বত্রই প্রকট। তাঁহার রচিত গীতার ব্যাখ্যায় তিনি সর্বত্রই বিষ্ণুর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। "হৃদয়ের উদারতায়, ভক্তির প্রবলতায় এবং জ্ঞানের গভীরতায় মধুসূদনের গ্রন্থরাজি পরিপূর্ণ। জীবনের সাধনার সহিত মিলাইয়া যে গ্রন্থ রচিত হয় তাহা প্রাণস্পর্শী হইবেই।"[১] মধুসূদনের বিখ্যাত গ্রন্থ:—'সিদ্ধান্তবিন্দু', 'সংক্ষেপ-শারীরকের ব্যাখ্যা', 'অদ্বৈতসিদ্ধি', 'অদ্বৈতরত্নরক্ষণ', 'বেদান্তকল্পলতিকা', 'প্রস্থানভেদ' ইত্যাদি। আচার্য মধুসূদন অদ্বৈতবাদী এবং আচার্য শংকরের মতানুবর্তী ছিলেন। তিনি ষড়্‌দর্শনে অদ্বিতীয় পণ্ডিত—তাঁহার দার্শনিক বিচার অতুলনীয়। এরূপ সূক্ষ্মদর্শিতা, বিচারপটুতা এবং কৌশল অতি বিরল। পূর্বতন প্রধান প্রধান আচার্যগণের অনুসরণ করিয়া ইনি আচার্য শংকরের মত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। পূর্বতন আচার্যগণকে অনুসরণ করিলেও তাঁহার গ্রন্থে মৌলিকতা সর্বত্র সুপরিস্ফুট—শাস্ত্রবেত্তারূপেও তিনি অগ্রণী।

মধুসূদনের রচনাবলী

ন্যায় ও বেদান্তের সমন্বয়

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ছিলেন বাঙালী—তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন গৌড়ীয় মতের ভাষ্যকার বলদেব বিদ্যাভূষণ। বিশ্বনাথ ছিলেন নিম্বার্ক মতাবলম্বী—তাঁহার মত ছিল 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ'। আচার্য বিশ্বনাথ এবং বলদেব বিদ্যাভূষণের তিরোভাবের পর ঐরূপ প্রতিভা-সম্পন্ন পণ্ডিত আর বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে গৌরবান্বিত করেন নাই।[১]

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

বলদেব বিদ্যাভূষণ[২] রূপ, সনাতন এবং জীবগোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া স্বীয় ভাষ্য রচনা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের গ্রন্থ হইতেই 'অচিন্ত্যভেদা-ভেদবাদের' আস্বাদ পাইয়াছেন। তাঁহাদের গ্রন্থই বলদেবের গোবিন্দভাষ্যের মূল উপাদান। বাঙলা দেশেই তাঁহার জন্ম। শেষ জীবনে ইনি বৃন্দাবনে যাইয়া বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মসূত্রের উপর ইনি 'গোবিন্দভাষ্য' প্রণয়ন করেন।

বলদেব বিদ্যাভূষণ

১ দ্রঃ বেদান্তদর্শনের ইতিহাস।

২ Vaisnava Faith and Movement, pp. 16-18.

শ্রীচৈতন্য মাধ্ব-ভাষ্যকেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের ভাষ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন—এজন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের কোনও সাম্প্রদায়িক ভাষ্য ছিল না। গোবিন্দের স্বপ্নদত্ত আদেশে বলদেব 'গোবিন্দভাষ্য' রচনা করেন বলিয়া প্রবাদ আছে। ইঁহার আরও কয়েকটি উৎকৃষ্ট রচনা পাওয়া যায়; তাহাদের মধ্যে 'সিদ্ধান্তরত্ন' বা 'ভাষ্যপাঠক', 'প্রমেয়-রত্নাবলী,' 'বেদান্ত-স্যমন্তক,' 'গীতা-ভাষ্য' এবং 'দশোপনিষদ্‌ভাষ্য'ই প্রসিদ্ধ।

'গোবিন্দভাষ্য'

অন্যান্য রচনাবলী

চৈতন্যসম্প্রদায়ের মতে শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তসূত্রের ভাষ্য। এরূপ ভাষ্য থাকাতে ভাষ্যান্তরের প্রয়োজন নাই দেখিয়া চৈতন্যদেব স্বয়ং বেদান্তসূত্রের কোনও ভাষ্য রচনা করেন নাই, তবে মাধ্বভাষ্যকেই তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের ভাষ্য বলিয়া প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কেবল মাধ্ববাখ্যায় যে যে অংশ শ্রীমদ্ভাগবতের আপাতবিরোধী বলিয়া মনে হয়, চৈতন্য সেই সেই অংশের ব্যাখ্যা করেন বলিয়া প্রবাদ। কিন্তু লিখিত কিছু পাওয়া যায় না বলিয়া বলদেব ঐ ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র ভাষ্যরূপে প্রকাশ করেন।

চৈতন্যকৃত কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না

চৈতন্যের মতবাদ সত্যসত্যই মধ্বমতের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। কেবল মধ্বের মত নহে, পরন্তু নিম্বার্ক মতের প্রভাবও শ্রীচৈতন্যের মতে পাওয়া যায়। 'জীব' অণু ও সেবক, আর 'ভগবান্' সেব্য, 'জগৎ' সত্য, এ সকল বিষয়ে শ্রীচৈতন্যের মত মধ্বমতের অনুবর্তী। 'ভেদাভেদবাদ' নিম্বার্কমতের 'দ্বৈতাদ্বৈতের' অনুরূপ। নিম্বার্কের 'অচিন্ত্যশক্তি'ই চৈতন্যমতে অচিন্ত্যশক্তিরূপে প্রকট। 'মধ্বমতের' সূত্রব্যাখ্যাও বলদেব অঙ্গীকার করিয়াছেন।

চৈতন্যের মতে মধ্ব ও নিম্বার্ক মতের প্রভাব

মধ্বমতে 'ব্রহ্ম' সগুণ, সবিশেষ। গৌড়ীয় মতেও ব্রহ্ম সগুণ সবিশেষ। মধ্বমতে 'জগৎ' ব্রহ্মের পরিণাম, ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ। গৌড়ীয় মতেও জগৎ ব্রহ্মেরই পরিণাম। ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ। মধ্বমতে 'জীব' ও 'ব্রহ্ম' চিরভিন্ন। মুক্ত অবস্থায়ও জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন থাকে।

মধ্ব মত ও গৌড়ীয় মত : ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ

বলদেবের মতেও 'জীব' এবং 'ব্রহ্ম' ভিন্ন, তবে গুণ এবং গুণিভাবে অভিন্ন এবং ভিন্ন, সে অর্থে সমস্ত জীবজগৎ ব্রহ্মেতে লয় পায়।

সাধন সম্বন্ধে মধ্বের সহিত বলদেবের মতের পার্থক্য আছে। উপাসনা এবং ভক্তি সম্বন্ধে উভয়ে একমত। কিন্তু মধ্বমতে কেবল সেব্য-সেবক ভাবের স্ফূর্তি আছে। বলদেবের মতে সাম্য ব্যতীত আরও চারিটি ভাবের স্থান আছে। সেগুলি যথাক্রমে শান্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই মতে তত্ত্ব ৫টি—ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম। রামানুজের মতে কিন্তু তত্ত্ব তিনটি—চিৎ, অচিৎ এবং পুরুষোত্তম।

সাধনপ্রণালী

তত্ত্ব ৫টি

বলদেবের মতে প্রমেয় ৯টি:—(ক) শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরতম বস্তু (খ) তিনি নিখিল শাস্ত্রবেদ্য (গ) বিশ্ব সত্য (ঘ) তদ্‌গতভেদও সত্য (ঙ) জীবমাত্রই শ্রীহরির দাস (চ) জীবের সাধনগত তারতম্য অবশ্য স্বীকার্য (ছ) শ্রীকৃষ্ণের চরণ লাভই মুক্তি, মুক্তির তারতম্য আছে (জ) নির্গুণ হরি ভজনরূপ অপরোক্ষজ্ঞান, বা ভক্তিই মুক্তির হেতু (ঝ) প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ—এই ৩টি প্রমাণ।[১]

প্রমেয় ৯টি

বাংলার বেদান্তে সাংখ্যের প্রভাব এক সময় বেশ প্রবল হইয়াছিল। জীব গোস্বামীর প্রশংসা করিতে গিয়া বলদেব বিদ্যাভূষণ বলিয়াছেন—'সাংখ্যরূপ পঙ্কে, কুতর্করূপ ধূলিতে এবং বেদান্তের বিবর্তবাদের গর্তে পড়িয়া যাহার জ্যোতি লুপ্ত হইয়াছিল, সেই মহেশ্বর কৃষ্ণকে 'জীব' বাক্‌সুধাধারা শুদ্ধ করিয়াছেন।" এই স্তুতি হইতেই বুঝা যায় যে, সাংখ্যপঙ্ক দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সাংখ্যের প্রভাবের আর একটি বড় প্রমাণ এই যে, প্রায় ঐ সময়েই 'বিজ্ঞানভিক্ষু' নামক একজন গৌড়ীয় সন্ন্যাসী 'বেদান্তসূত্র' এবং 'সাংখ্যপ্রবচনসূত্র'—এই উভয় গ্রন্থেরই এক বিপুল ভাষ্য রচনা করেন। সাংখ্য এবং বেদান্তের মধ্যে সমন্বয় সাধনই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বলিয়াছেন যে, বেদান্তসূত্র সাংখ্যমতের উপর যে আক্রমণ করিয়াছেন তাহা অসৎ-সাংখ্য

বাংলার বেদান্তে সাংখ্যের প্রভাব

বিজ্ঞানভিক্ষু

[১] Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal by S. K. De, pp. 171-313.

বা অসম্যক্-জ্ঞাত-সাংখ্য ; কিন্তু প্রকৃত সাংখ্য বেদান্তের বিরুদ্ধ কথা বলে না। বেদান্তের 'ব্রহ্মকে' সাংখ্য ঠিক অস্বীকার করে নাই, আর সাংখ্যের প্রকৃতিও বেদান্তবিরুদ্ধ নয় ; কেননা ব্রহ্মের শক্তিরূপে প্রকৃতির কথা শ্রুতিও বলিয়াছে।

বৌদ্ধ দর্শনে শ্রীজ্ঞান, অতীশ, দীপঙ্কর[১] ও আচার্য শীলভদ্রের দান অবিস্মরণীয়। ইহারা সকলেই যে বাঙালী ছিলেন ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

১ 'বাঙালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর।
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালী দীপঙ্কর —সত্যেন্দ্রনাথ সেন

পাশ্চাত্য ও ভারতীয় দর্শন

দর্শনের রূপ নির্ণয়ে পাশ্চাত্ত্যদেশে এবং ভারতে যে মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার কারণ মোটের উপর তিনটি :—রুচিবৈচিত্র্য, কালভেদ এবং দেশভেদ।

দর্শনের রূপ সম্বন্ধে ভারত ও প্রতীচ্যের মত : ভেদের কারণ তিনটি

সকল দেশের সমস্যা, সৌন্দর্যবোধ এবং মূল্যবোধ এক নহে। 'ভারতবর্ষ আর গ্রীসের দর্শনের যদি তুলনা করি—এমন কি, উভয় দেশের সমসাময়িক দর্শনেরও যদি তুলনা করি, তবে দেখা যাইবে, উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ রহিয়াছে।'[১] মোক্ষের আলোচনা ভারতীয় দর্শনে যতখানি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, গ্রীকদর্শনে ততটা নহে; আবার গ্রীকদর্শনে রাষ্ট্রের প্রাধান্য যেমন, ভারতীয় দর্শনে সেরূপ কিছুই নাই।

কালভেদে ও মানবসমাজের পরিবর্তনের ও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দর্শনেরও রূপ যুগে যুগে পরিবর্তিত হইতে থাকে, ইহা সর্বজনস্বীকৃত। রুচিভেদেও যে

দর্শনের কতকগুলি সাধারণ স্বীকৃত সত্য

দর্শনের রূপের বিবর্তন ঘটে তাহার প্রমাণ—সকল দার্শনিকেরই চিন্তার বিষয় এক নহে। কাহারও মতে জগতের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর, কাহারও মতে জগতের উদ্ভব ঘটিয়াছে জড় পরমাণু হইতে, কাহারও মতে আত্মা অবিনশ্বর, কাহারও বা মতে আত্মার অস্তিত্বই অস্বীকৃত। কিন্তু তবুও সকল দেশের সকল যুগের দর্শনের কতকগুলি সাধারণ সত্য থাকে যাহার দ্বারা তাহার রূপ নির্ণয় করা কঠিন নহে। এস্থলে সেই প্রকারের আলোচনাই করা হইবে।

দর্শনের মূল তত্ত্বগুলি মানুষ জানিতে চাহিয়াছে জীবনের তাগিদে বা প্রয়োজনে। প্রথমে জীবনের প্রয়োজনেই উদ্ভব হইয়াছিল দর্শনের, যেমন গ্রীসে সক্রেটিসের সময় ইহার অবস্থা যে প্রকার ছিল, তাহাতে ইহাই মনে হয়।

দর্শনের উদ্ভবের কারণ

ধর্মা-ধর্ম, নীতি-অনীতি, দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় প্রভৃতি জৈবিক প্রয়োজনের আলোচনা হইতেই গ্রীসে দর্শনের উদ্ভব হইয়াছে। ভারতীয় দর্শনেও এই দুঃখলোপের প্রয়োজন প্রবল

---

১ 'দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি', পৃঃ ৪।

ভাবেই অনুভূত হইয়াছিল, সেজন্য সকল প্রকার দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভের প্রচেষ্টায় ভারত তাহার চিন্তাকে সমাহিত করিয়াছিল।

দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের জন্য এবং সিদ্ধান্তের বৈপরীত্যের জন্য দার্শনিকদের দর্শনগুলি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। প্রাচীন ভারতে আস্তিক ও নাস্তিক দর্শনের মধ্যে মতভেদের যে কি গভীর বৈষম্য ছিল তাহা পূর্বেই বিশদ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই আস্তিক ও নাস্তিক দর্শনের প্রভেদ শুধু বেদের উপর বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের দ্বারা নির্ণীত হইত। য়ুরোপেও এই প্রকার আস্তিক ও নাস্তিকের প্রভেদ দর্শনের চিন্তা-রাজির মধ্যে রহিয়াছে—কিন্তু সেখানে উহা বেদে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে পরলোকে বিশ্বাস, বিশেষ করিয়া ঈশ্বরে আস্থা স্থাপন বা অস্থাপনের উপর। ঈশ্বরকে অস্বীকার করিয়া জীবজগৎ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে তাহাই সেস্থলে নাস্তিক দর্শন; ঈশ্বরকে স্বীকার করায় বাকীগুলি হইয়াছে আস্তিক।

দর্শনের শ্রেণীভেদের কারণ

সংক্ষেপে এবং মোটের উপর দর্শনের মূল বিচার্য বিষয় তিনটি :—(১) জগৎ (২) জীব ও (৩) ভগবান্। সমগ্র মানুষের সমগ্রভাবে বিচার দর্শনের কাজ। জগতের উৎপত্তি এবং স্বরূপ, বিশেষত তাহার সত্যতা প্রভৃতি গভীরতর মূলগত প্রশ্ন দর্শনের আলোচ্য। দর্শন পুনরায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যুক্তি এবং প্রমাণের সাহায্যে বিচার করিয়া থাকে। এগুলি ভিন্ন দর্শন আরও একটি কঠিন বিষয়ের আলোচনা করে, যে আলোচনা জ্ঞানের মূলীভূত বিষয়; তাহা হইতেছে—কিভাবে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার ভিত্তি কি, কোন্‌টি প্রকৃত জ্ঞান, কোন্‌টি ছলনা—এ সকলই দর্শনের বিচার্য। অতএব দর্শন জ্ঞান এবং জ্ঞেয় উভয়কেই জানিতে চায়।

দর্শনের মুল বিচার্য তিনটি বিষয়

জগতের উৎপত্তি এবং অস্তিত্ব সম্বন্ধে গ্রীক ও ভারতীয় দর্শনে নানাপ্রকার আলোচনা আছে। গ্রীকগণ প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে জগতের স্রষ্টা দেবতা, জরামরণমুক্ত বিশেষ প্রাণী অতিমানব। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানব জানিতে চাহিয়াছে—কি সেই আদিম উপাদান যাহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এই বিশ্বচরাচর। এই উপাদান সম্পর্কে প্রশ্নের প্রথম উদয় হয়

থালেসের মনে। থালেস জলকে জগৎসৃষ্টির আদিম উপাদান বলিয়াছিলেন, কিন্তু অ্যানেকজিম্যাণ্ডারের মতে জগতের এ উপাদান জল নহে; অসীম একটি পদার্থ (the unlimited)—পরিদৃশ্যমান জগতের সকল বস্তুই কিন্তু সীমাবদ্ধ, সশেষ, সারম্ভ এবং ধ্বংসযুক্ত। অ্যানেক্‌জামেনিসের মতে মরুৎই জগতের আদিম পদার্থ। মরুৎই নানারূপে জগৎ সৃষ্টি নিজের পরিবর্তনের মাধ্যমে সাধন করে। একটি অঘনীকরণ, অপরটি ঘনীকরণ এই দুইটি প্রক্রিয়া। পিথাগোরাসের মতে কিন্তু জগৎ সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে সংখ্যা—জগতের সকল বস্তুরই রহিয়াছে পরিমিতি এবং একটা ক্রম (order)। সংখ্যা দ্বারা জগতের সকল বস্তুই নিয়মিত; তাই তাহার মধ্যে রহিয়াছে সঙ্গতি, শৃঙ্খলা। পিথাগোরীয় সম্প্রদায় জগৎ সৃষ্টির মূলে অসীম এবং সসীম দুই-এরই অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। মৌলিক সসীম পদার্থটি তেজ, আর অসীম পদার্থটি মরুৎ। জগতের সৃষ্টি এবং বিনাশের ধারাটিকে সহজবোধ্য করার জন্য পিথাগোরীয়গণ অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে একের অস্তিত্বকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করেন। একাকে দ্বিধাবিভক্ত করিলেই হয় দুই।

জগতের উৎপত্তি এবং অস্তিত্ব সম্পর্কে গ্রীক মত

গ্রীকগণ বহুদেবতাবাদী ছিলেন; কিন্তু থালেস প্রভৃতি দার্শনিকদের আলোচনায় গ্রীক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হয়। তাঁহাদের মূল বক্তব্য এই যে "শুধু যে জগতের মূলে কখনো বহুত্ব থাকতে পারে না, তা নয়; জগতের গতির পরিচালক যে শক্তি তার আধারও কখনো সংখ্যায় বহু হতে পারে না। যে জিনিষ থেকেই জগৎ সৃষ্ট হোক না কেন, তা হবে এক। যেই হোক না কেন জগতের পরিচালক, সে হবে এক।"[১]

বহুত্বের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

জেনোফেনিস বহুদেববাদের বিরুদ্ধে একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। যিনি প্রকৃত ঈশ্বর, যিনি জগৎ-স্রষ্টা এবং অশেষ শক্তিসম্পন্ন তিনি এক এবং অদ্বিতীয়, তিনি অসীম—তাঁহার আরম্ভ নাই, শেষ নাই, সৃষ্টি নাই, ধ্বংস নাই, পরিবর্তন নাই, তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। জেনোফেনিসের এই সত্তার নাম ঈশ্বর। কিন্তু অপর এক দার্শনিক

জেনোফেনিসের একেশ্বরবাদ

---

১ গ্রীক দর্শন—শুভব্রত রায় চৌধুরী, পৃঃ ৮

ইহার নাম দেন 'সৎ'। সৎই আমাদের সত্যের পথ প্রদর্শন করে। সতেরই অস্তিত্ব আছে, অসতের সত্তা নাই। ব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাপ্ত করিয়া আছে এই সৎ। যাহা অসৎ, তাহা আমাদের চিন্তার অবিষয়ীভূত। সৎ কালাতীত এবং চিরন্তন। সৎ একক এবং অবহু।

জেনো পরবর্তীকালে দেখাইলেন যে বহুত্বের ধারণা অযৌক্তিক। অনেকগুলি 'একের' সমষ্টিই 'বহু'। এক যে সে স্বয়ংপূর্ণ, অবিভাজ্য, পরিধিবিহীন। কিন্তু কতকগুলি পরিধিহীন 'এক' একস্থলে একত্রিত হইলেই ত আর সেই 'বহু'র সৃষ্টি হয় না, যাহার পরিধি অবশ্যই আছে। হেরাক্লিটাসের পূর্ববর্তী দার্শনিকদের মতে গতিই আদিম পদার্থ এবং আদিম পদার্থই গতি। এই গতিরূপী আদিম পদার্থের নাম অগ্নি বা তেজ।

জেনো

হেরাক্লিটাস

পূর্ববর্তী জনৈক গ্রীক দার্শনিক যেমন গতিকে বাদ দিয়াছিলেন, তেমনি স্থিতিকে বাদ দিলেন হেরাক্লিটাস। কিন্তু তত্ত্বত ইহারা উভয়েই সত্য, কারণ এই উভয়কে লইয়াই জগৎ। উভয়েব মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানই অতঃপর প্রকৃত দর্শনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে এম্পিডক্লিস, ডিমক্রিটাস এবং আনেক্জাগোরাস ব্রতী হন। এম্পিডক্লিসের মতে মূলপদার্থ সংখ্যায় ৪টি—ক্ষিতি, অপ্, তেজ এবং মরুৎ। ইহারা প্রত্যেকেই স্বতোভিন্ন। ইহাদের মধ্যে গুণগত বৈষম্য গভীর; একটি অপরটিতে কদাচ রূপান্তরিত হইতে পারে না। এম্পিডক্লিস প্রেম ও ঘৃণা নামে দুইটি বহিঃশক্তির কল্পনা করিলেন। ইহারাই এই পদার্থগুলির মধ্যে গতিবেগ আনয়ন করে।

এম্পিডক্লিস

গতিবাদ ও স্থিতিবাদের সহিত পরমাণুবাদিগণের যে মতবাদ সৃষ্ট হইল তাহা এম্পিডক্লিসের মতের বিরোধী। লুসিপাস এই পরমাণুবাদের স্রষ্টা, কিন্তু ডিমক্রিটাসের মাধ্যমে এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। পরমাণুবাদী দার্শনিক একক অসঙ্গ সৎকে বিশ্লেষণ করিয়া অসংখ্য নিত্য পরমাণুর আবিষ্কার করিলেন। ক্ষিতি, অপ্, তেজ এবং মরুৎ এই চারিটি পদার্থকে বিশ্লেষিত করিলে আরও খণ্ড খণ্ড করা যায়; অতএব ক্ষিত্যাদি যথার্থ মূল পদার্থ হইতে পারে না। চরমতম সূক্ষ্ম অবিভাজ্য

ডিমক্রিটাস

পদার্থ যাহা তাহাই পরমাণু (atom)। পরমাণুই প্রকৃত আদিম পদার্থ। ডিমক্রিটাস আরও প্রকাশ করিলেন যে পরমাণুসমূহের মধ্যে গুণগত কোনো বৈষম্য নাই—গুণ-হিসাবে ইহারা সকলেই সমজাতিভুক্ত। আছে কেবল পরিমাণগত অনৈক্য; প্রভেদ কেবল আকারে, আয়তনে এবং ওজনে।

আনেক্‌জাগোরাস

আনেক্‌জাগোরাস বৈচিত্র্যময় জগতের উপাদানগুলির নাম দেন বীজ বা মূল। জগতে যত বস্তু আছে, বীজও আছে ঠিক ততগুলি। আনেক্‌জাগোরাসের মতে বীজে যে কেবল গুণগত বৈষম্য আছে তাহাই নহে, ঐ বৈষম্যই বীজের বৈশিষ্ট্য। এই মূল বীজগুলির সংমিশ্রণ হইতেই দ্রব্যাদি সৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহাদের সৃষ্টি করে একটি বহিঃশক্তি যাহার নাম মন। মূল বীজ সংখ্যায় অসংখ্য এবং নিশ্চল মনই তাহাদের দেয় সৃষ্টির প্রেরণা। এই সুন্দর বৈচিত্র্যময় শৃঙ্খলাবদ্ধ জগতের মূলে এক বিরাট মানসশক্তি রহিয়াছে। এই মানসশক্তির স্বরূপ কি সে বিষয়ে আনেক্‌জাগোরাসের কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিল বলিয়া মনে হয় না। মন অর্থে যদিও পরবর্তী যুগে বিদেহী চিদাত্মক সত্তাকেই বোঝানো হইয়াছে, কিন্তু সেযুগের মনের বর্ণনায় তাহার সন্ধান আমরা পাই না।

সোফিস্টগণ

ইহার পর আসে সোফিস্টদের মতবাদ। সোফিস্টদের নিকট মানবই চরম সত্য এবং এই মানবের ব্যবহারিক জীবনের উন্নতি বিধানই ইহাদের মতে একমাত্র কর্তব্য বা লক্ষ্য। মানুষের মধ্যে তাঁহারা দুইটি মানবীয় সত্তার আবিষ্কার করিলেন—একটি বিশ্বজনীন মানুষ, আর একটি ব্যক্তিগত মানুষ। বিশ্বজনীন মানুষের সত্তা প্রজ্ঞাময়—এই মানুষের মধ্যে আছে এক বিরাটত্ব, এক ঐক্য যাহা সকল ভেদাভেদের বহু ঊর্ধ্বে। সোফিস্টদের নিকট তাই এই বিশ্বজনীন মানবই জ্ঞেয়রূপে প্রতিভাত হইল।

সক্রেটিসও এক হিসাবে এই পথেরই পথিক। তাঁহার মতে শ্রেয়কে লাভ করিতে হইলে মানবকে দেখিতে ও বিচার করিতে হইবে তাহার বিশ্বজনীন রূপে। মানবের ব্যষ্টিগত রূপের প্রকৃত অর্থ নিহিত থাকে বিশ্বজনীন রূপের মধ্যে; বিশ্বজনীন রূপের মধ্যে থাকে একটি সামান্য-প্রত্যয়। প্রজ্ঞাই

আমাদিগকে যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী করে। জ্ঞানই পুণ্য[১]—সক্রেটিস এই বাণীই জগৎকে শোনাইয়াছেন। ভারতীয় দর্শনেও আত্মানাত্মবিবেকতত্ত্বের মধ্যে এই তথ্যই পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রকৃত আত্মজ্ঞানীই যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী—তাঁহার নিকট "অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়ঃ"। আত্মজ্ঞানের অধিকারীই কল্যাণ এবং আনন্দলাভেরও অধিকারী—সক্রেটিস ইহাই বলিয়া গিয়াছেন।

সক্রেটিস

সক্রেটিসের পরবর্তী গ্রীক দার্শনিকগণ তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়েন। সিনিক সম্প্রদায়ের মতে সুখভোগের কামনা, বাসনা, দৈনন্দিন জীবনে খ্যাতি ও অর্থলাভের মোহ মন হইতে বিদূরিত করিয়া বৈরাগ্যকে আশ্রয় করিতে না পারিলে জীবনে প্রকৃত সুখ আসিবে না। পুণ্যের অর্থ তাঁহাদের মতে সুকঠিন বৈরাগ্য—কামনাবাসনাকে সবল হস্তে দমন করাই পুণ্য। আমাদের শংকরাচার্যও জগৎকে এই বাণীই দিয়া গিয়াছেন।

সিনিক সম্প্রদায়ের মত

সিরেনাইক সম্প্রদায়ের মতে কিন্তু সুখ ভোগেই আছে পুণ্য, পুণ্যের মধ্যে রহিয়াছে আনন্দ। আমাদের লোকায়ত দর্শনের মূলকথাও ইহাই। সুখসম্ভোগ লোকায়তিকগণের নিকট প্রকৃত আনন্দ। কিন্তু সিরেনাইকগণ "এই সুখসম্ভোগ লাভে বিচারবুদ্ধি খাটাবার কথা বলেছেন; বিচারবুদ্ধির বন্ধন অস্বীকার করে যে সুখ লাভ করা যায় তার পরিণতি দুঃখ বেদনা অশান্তি।"[২] মেগারিক সম্প্রদায়ের মতে জ্ঞানের অর্থ কল্যাণের জ্ঞান— ঐ জ্ঞানার্জনেই পুণ্য আসে। সৎ ও কল্যাণ অভিন্ন। নির্বিকার চিত্তে এই তত্ত্বজ্ঞানলাভের চেষ্টা করাই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য। আমাদের দর্শন এই তত্ত্বটিকে রূপ দিয়াছে 'সচ্চিদানন্দে'র মধ্যে।

সিরেনাইক সম্প্রদায়

মেগারিক সম্প্রদায়

ইহার পর আসিল প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের যুগ। প্লেটোর মতে দর্শনের প্রধান জ্ঞাতব্য সেই জ্ঞান যাহা মানুষের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিয়া চিত্তে সত্যের জ্যোতি বিচ্ছুরিত করিতে পারে। সেই প্রকৃত জ্ঞানের স্বরূপ এবং

১ তুলনীয়—ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।—গীতা।

২ গ্রীক দর্শন, পৃঃ ২৫

তাহার বিষয়বস্তুর মধ্যে নিহিত প্লেটোর সকল বক্তব্যের মূল কথা। তাঁহার মতে এই পরিবর্তনশীল জগৎ শাশ্বত জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। সক্রেটিস-পরিকল্পিত একটি সামান্য-প্রত্যয়কে না জানিলে শাশ্বত সত্যকে জানা অসম্ভব। এই প্রত্যয় কিন্তু মানসিক; মন ভিন্ন ইহার অস্তিত্ব সম্ভব কিনা বলা কঠিন। কিন্তু রূপহীন, দেশকালনিরবচ্ছিন্ন, স্বয়ংসম্পূর্ণ যে বস্তু বা তত্ত্ব তাহাকে তো এজাতীয় সামান্য প্রত্যয়ের দ্বারা জানা অসম্ভব। ইহার অস্তিত্ব ভৌতিক নহে, তাত্ত্বিক। ভৌতিক অস্তিত্ব অবশ্য দেশকালাবচ্ছিন্ন। প্লেটোর মতে "পৃথিবীতে যাহা কিছু আমরা দেখি শুনি জানি, তা এই প্রত্যয়ের 'ছাপ, প্রত্যয়ের অনুলিপি মাত্র।… সমস্ত প্রত্যয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রত্যয় যা তার নাম…good। শিবম্ বলতে যা বোঝায় এই গুড্-ও অনেকটা তাই বোঝায়।…মনে হয় শিবম্ এবং ঈশ্বর তাঁর (প্লেটোর) কাছে একই ছিল।"[১]

প্লেটো

শ্রেয় লাভের উপায় সম্বন্ধে প্লেটো বলেন যে, "শৌর্যের (Spirit) সহায়তায় তৃষ্ণার (Appetite) কোলাহলকে থামিয়ে বিবেকরূপী (Reason) আত্মা যখন কামনাবাসনার বন্ধনমুক্ত হয়ে তাত্ত্বিক জগতের প্রত্যয়ের ধ্যানে আপনাকে ডুবিয়ে ফেলতে পারে, তখনই তার জীবনের চির অভীপ্সিত শ্রেয় দেখা দেয় সকল পূর্ণতা নিয়ে।"[২] ভারতীয় দর্শনের মূল কথা এবং সাধনার সহিত এই তত্ত্বের কি কোনো পার্থক্য আছে? আমাদের দেশও তো এই কথাই বলিয়া আসিয়াছেন। 'তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ'—এই তত্ত্বজ্ঞানের জন্য যে যোগাভ্যাস করিতে হয় তাহাই প্লেটোর প্রদর্শিত পথ।

প্লেটোর প্রত্যয়বাদ (Theory of Ideas) কিন্তু প্রাত্যহিক কর্মময় জগৎকে ব্যাখ্যা করিতে পারে নাই। প্রত্যয়ের জগৎই সেখানে চরমতম সত্যরূপে দেখা দিয়াছে। কিন্তু অ্যারিস্টট্‌ল্ জানাইলেন যে পৃথিবীর একটা বাস্তব সত্তা যে আছে তাহা অনস্বীকার্য; জগতের প্রত্যেকটি বস্তুই সত্য; তাহারা শুধু প্রত্যয়ের প্রতিবিম্ব নহে।

প্লেটোর প্রত্যয়বাদ

---

১ গ্রীক দর্শন, পৃঃ ৩০—৩১

২ ঐ পৃঃ ৩২

প্লেটোর প্রত্যয়বাদকে সমালোচনা করিতে যাইয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল অ্যারিস্টট্‌লের দার্শনিক মতবাদ। জগতের প্রতিটি নির্দিষ্ট বস্তুকেই তিনি সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ব্যষ্টিরূপের মধ্যে সার্বজনীন-রূপেরই প্রতিরূপ দেখা যায়। প্রত্যেক বস্তুর দুইটি রূপ থাকে—একটি ভৌতিক বা material; অপরটি formal (pertaining to form)। এই form এবং matter-এর সম্মিলনে কোনো বস্তুর উদ্ভব ঘটে।

অ্যারিস্টট্‌ল্

অ্যারিস্টট্‌লের মতে কোনো বস্তুর সৃষ্টির মূলে চারি প্রকারের কারণ থাকেঃ—(১) উপাদান কারণ (material cause); (২) প্রকারক কারণ (formal cause); (৩) নিমিত্ত কারণ (efficient cause) এবং (৪) উদ্দেশ্যগত কারণ (final cause)। এই চারি প্রকারের কারণের মধ্যে প্রথম দুই প্রকারই প্রকৃত কারণ।

ঈশ্বরকে অ্যারিস্টট্‌ল্ বলিয়াছেন 'বিশুদ্ধ রূপ' বা Pure Form—জগতের অবিরাম চলা স্তব্ধ হইয়া যায় তাঁহার মধ্যেই। ঈশ্বর চিন্ময়, অজড়, উপাদান-বিহীন, সত্তাময়, অনন্ত। ঈশ্বরের "অস্তিত্ব তাত্ত্বিক, উপাদান ও গুণগতরূপের সম্মিলনে সৃষ্ট বস্তুর ভৌতিক অস্তিত্ব নয়।"[১]

ঈশ্বরের মধ্যেই প্রজ্ঞার পূর্ণ প্রকাশ—ঈশ্বরই জগতের অন্তর্নিহিত গুণগত রূপ; ঈশ্বর অচঞ্চল, স্বয়ংপূর্ণ। মাধ্বীয় দর্শনের পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনের আলোচনায় অ্যারিস্টট্‌লের এই মতবাদের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়।

পরবর্তী যুগে স্টোয়িক সম্প্রদায়ের মতে ঘোষিত হইল যে জড় পদার্থময় জগতের "নিজস্ব কোনো সত্তা নাই, কোনো স্বগত অর্থ নাই"—পরম সত্যের স্বরূপ চিন্ময়, প্রজ্ঞাই তাহাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ। এপিকিউরিয়ান্‌দের মতে চিন্ময় পরম সত্য ভিত্তিহীন—জড় জগৎই একমাত্র সত্য। পরমাণুর সম্মিলনেই জগতের সৃষ্টি—শ্রেয়ের উপলব্ধি ঘটে সুখসম্ভোগে। এপিকিউরিয়ান মতবাদ জগৎসৃষ্টির দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে আমাদের ন্যায়-বৈশেষিকের মতের মতো। স্কেপ্‌টিকদের মতে কিন্তু পরম সত্য অবিজ্ঞেয়, অনির্ণেয়। মানব

স্টোয়িকগণ

এপিকিউরীয় মতবাদ

১ গ্রীক দর্শন, পৃঃ ৩৮।

মনের শাশ্বত প্রশ্ন, জগতের সৃষ্টিরহস্যাদি সম্পর্কে সমস্যার সমাধান কোনো দিনই ঠিকমত হইবে না ; সত্য ত্রিকালাবাধিত নহে। আজ যাহা সত্য কাল তাহা মিথ্যা বলিয়া স্থিরীকৃত হইতে পারে। অতএব চির-সত্য বলিয়া কিছু নাই ; ইহাই তত্ত্ব। নিওপ্লেটোনিজ্‌ম্ পরবর্তীকালে ঘোষণা করিল যে সত্যকে প্রজ্ঞার দ্বারা জানা যায় না, জানিতে হয় বোধির (Intuition) সাহায্যে।

স্কেপ্‌টিক মত

নিওপ্লেটোনিজ্‌ম্

আধুনিক পাশ্চাত্ত্যের দর্শনের জন্মদাতা ডেকার্ট। তিনি দর্শনকে চরম নিশ্চয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। 'সকল সংশয়' সন্দেহের অতীত আমাদের মন। সংশয় চিন্তার একটি ক্রিয়া মাত্র —জগতের সকল কিছুর সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা যাইতে পারে, কিন্তু জ্ঞাতার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা চলে না। স্পিনোজা বেদান্তের কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—তিনি বলেন 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।'[১] 'ব্রহ্ম, যার নাম তিনি দিয়েছেন প্রেমগত জ্ঞান, তার মধ্যেই ব্রহ্মের বিকাশ, বেদান্তে যেমন বলা হয়—সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্।'[২] লাইব্‌নিৎসের মতে জ্ঞাতার প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষের আভাস মাত্র, প্রকৃত প্রত্যক্ষ নহে। জগৎ 'অসংখ্য চিৎপরমাণুর লীলা।' লকের প্রধান বক্তব্য—ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বহির্জগতের অস্তিত্ব লাভ করা যায় না। ইন্দ্রিয় সংবেদনই জ্ঞানের একমাত্র উৎস। ইন্দ্রিয় সংবেদন মানস ব্যাপার—বাহ্যিক কিছু নহে।

ডেকার্ট আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দর্শনের জনক

লাইব্‌নিৎস্

লক্

কাণ্টের মতে জ্ঞানের মূল উৎস নিছক বুদ্ধিও নয়, নিছক ইন্দ্রিয় সংবেদনও নয়। এ-দুয়ের সার্থক সংশ্লেষণ। এই মতে আমাদের জ্ঞাত পদার্থগুলির রূপ, ক্রিয়া ইত্যাদির অনেকাংশই আমাদের মানস সৃষ্টি, জ্ঞাতার বুদ্ধিনির্মিত এই বিশ্বপ্রকৃতি। এই জগতের অতীত বস্তুর আসল স্বরূপ আবিষ্কার করা আমাদের সাধ্যাতীত। কাণ্ট দ্বৈতবাদী দার্শনিক

কাণ্ট

১ আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শন, পৃ: ৬
২ ঐ ঐ

—একদিকে মানব মন, অপরদিকে চির-অজ্ঞাত বস্তুসত্তা।[১] ইহারা অত্যন্ত ভিন্ন।

ফিক্‌টের মতে কাণ্টের এই মতবাদ অলীক ধারণা ভিন্ন আর কিছু নহে। যাহা অবিজ্ঞেয় তাহা অস্বীকার্য। মন যে নির্মাতা তাহার যুক্তি এই যে মানব মন নিজেই জ্ঞানের উপকরণ সৃষ্টি করিয়া তাহাকে জানিতে আরম্ভ করে। ফিক্‌টে অদ্বৈতবাদী। শেলিং-এর মতে ব্যক্তির মন সসীম—অসীম এবং পরম সত্তা কেবল ব্রহ্ম মন।

ফিক্‌টে

হেগেলের মতে ব্রহ্ম সগুণ। 'পরম সত্তা ব্রহ্ম মন সন্দেহ নেই ; কিন্তু এ ব্রহ্মের মধ্যে বিদবিদ্ জগতের স্থান অবিসংবাদিত। বস্তুত, এই বিদবিদ্ জগতের মধ্যে দিয়েই তাঁর বিকাশ। নিজের চারপাশে স্বেচ্ছাগণ্ডী রচনা করা তাঁর লীলা নয়—তাঁর লীলা হল সীমার মধ্যে অসীম সত্তাকে প্রকাশ করা।....হেগেলের ব্রহ্মবাদ...সর্বগ্রাসী ব্রহ্মবাদ।'[২] অতএব বলা যাইতে পারে "গ্রীক দর্শনের যেমন চূড়ান্ত পরিণতি অ্যারিষ্টটলে, আধুনিক দর্শনের ঠিক তেমনি হেগেলে। দর্শনের ইতিহাস হেগেলেই সমাপ্ত।"[৩]

হেগেল

ইংরেজ দার্শনিক ব্রাডলি সাম্প্রতিক ব্রহ্মবাদিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার মতে জগতের অস্তিত্ব মিথ্যা নহে, শূন্য নহে, অলীক নহে, পরম সত্তাই ইহার উৎস, আশ্রয়স্থল। 'পরম সত্তা ছন্দোবদ্ধ', এক এবং 'অদ্বিতীয়'। "তার বাইরে কিছু নেই ; প্রতিভাসেরও স্থান তারই মধ্যে, যদিও প্রতিভাস সেখানে রূপান্তরিত। এই অদ্বিতীয় ছন্দোময় সত্তাই ব্রাডলির ব্রহ্ম।[৪]

ব্রাডলি

হেগেলের মতে ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ বা বুদ্ধিস্বরূপ ; ব্রাডলির মতে ব্রহ্ম বুদ্ধিরও উচ্চস্তরে, যাহাকে তিনি 'Sentient Experience' বলিয়াছেন।

জগৎ, জীব এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে ভারতীয় দর্শনের বক্তব্য পূর্বেই দেখাইয়াছি।

১ আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শন পৃঃ ৯
২ ঐ পৃঃ ১০
৩ ঐ পৃঃ ১২
৪ ঐ পৃঃ ১৬

এস্থলে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের মতও সংক্ষেপে বলা হইল। উপরের আলোচনা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে স্বাধীনভাবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে দর্শনের আলোচনা হইলেও দর্শনের মূল সমস্যা সম্পর্কে প্রশ্ন ও তাহার সমাধান উভয়েই দিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং উহাদের মধ্যে অনেক বিষয়েই আশ্চর্য রকমের মিল দেখা যায়। পার্থক্য বা প্রভেদ যে কিছু কিছু নাই তাহা বলিতেছি না—অনেক স্থলে বেশী পরিমাণেই আছে, তবুও 'Great men think alike' কথাটি ভাবিয়া দেখিবার মত এবং দর্শনের আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবেই প্রযোজ্য।

দর্শনের মূল সম্পর্কে প্রশ্ন ও সমাধান প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়বিধ দর্শনই করিয়াছে

ফল কথা এই যে সত্য "'দুর্দর্শং গূঢমনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্' —আর এই দুর্দর্শ গুহাহিত সত্যকে লাভ করিবার পথ—'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'—শাণিত ক্ষুরের অগ্রভাগের ন্যায় দুর্গম এই সত্য দর্শনের পথ। এই দুর্দর্শত্ব—এই দুর্গত্বের ভিতর দিয়া প্রোজ্জ্বল গুহাহিত সত্যের মহিমা।"[১]

পাশ্চাত্ত্য এবং ভারতীয় দর্শনের তুলনামূলক আলোচনায় নিম্নলিখিত উপাদানগুলি পাওয়া যায় :—

(ক) চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনের সহিত Epicurean দর্শনের এবং Aristippusএর মতবাদের সম্পর্ক সুগভীর।[২]

(খ) জৈনদের ব্রহ্মৈকান্তবাদ এবং ক্ষণিকৈকান্তবাদের সহিত Parmenides এবং Heraclitus-এর মতের অংশবিশেষে সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়।[৩]

(গ) বুদ্ধ এবং অ্যারিস্টট্‌ল্ উভয়েই একটি পরম সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাহা এই যে, জীবন যাপন করিতে হইলে মধ্যপন্থা অবলম্বনই শ্রেষ্ঠ উপায়।[৪]

---

১ ভারতীয় সাধনার ঐক্য, পৃ: ৪

২ দ্র: History of Philosophy : Eastern & Western, Vol. I, pp. 137-138.

৩ ঐ ঐ ঐ 140

৪ ঐ ঐ ঐ 158

(ঘ) ভারতীয় syllogism (পঞ্চাবয়ব-ন্যায়)-এর সহিত Aristotleএর Syllogism (ত্র্যবয়ব-ন্যায়)-এর কতকগুলি সাদৃশ্য আছে। তবে ভারতীয় Syllogismএ উপনয়ের ন্যায় Aristotleএর Syllogismএ কোন অংশ পাওয়া যায় না।[১]

(ঙ) ভারতীয় তর্কশাস্ত্রে ৫টি হেত্বাভাস এবং ছল, জাতি, নিগ্রহস্থান প্রভৃতি তর্কদোষ দেখা যায়। Aristotle এর মতেও fallacy দুই প্রকার— 'in dictione' 'এবং' 'extra dictionem'।[২]

(চ) ভারতীয় ন্যায়-বৈশেষিক মতবাদে পরমাণুপুঞ্জ হইতে জগতের উৎপত্তি নির্দিষ্ট হইয়াছে ; কিন্তু "It is not a mechanistic or materialistic theory like the atomism of Western Science and Philosophy."[৩]

(ছ) ন্যায়-বৈশেষিকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব শাস্ত্রাদির সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কার্যকারণসম্বন্ধাত্মক অনুমান, অদৃষ্টবাদ এবং শাস্ত্র-প্রামাণ্য হইতেও ঈশ্বরের সত্তা প্রমাণিত হইয়াছে। ন্যায়-বৈশেষিকের ঈশ্বর সম্পর্কিত এই মতবাদে পাশ্চাত্ত্য দর্শনস্থ ঈশ্বরের সত্তা সম্পর্কে "Causal and teleological" প্রমাণের সমন্বয় দেখা যায়। জগতের প্রথম কারণ ঈশ্বর একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান পুরুষ—ন্যায়-বৈশেষিক মতের এই অংশের সহিত Paul Janet, Hermann Lotze এবং James Martineauর মত হুবহু মিলিয়া গিয়াছে। কিন্তু "While these Western theists believe that God is the cause not only of the *order* of things in the world but also of the *existence* of those things with their materials, the Nyaya-Vaisesikas make God the cause of the order of *nature* and not of the existence of its ultimate constituents."[৪]

১ History of Philosophy, Eastern and Western, Vol. I. pp. 222-223
২ ঐ ঐ ঐ 422
৩ ঐ ঐ ঐ 227
৪ ঐ ঐ ঐ 229.

(জ) রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সহিত কাণ্টের মতবাদের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। রামানুজের মতবাদে তত্ত্ব, চিদচিৎ, হিত এবং পুরুষার্থের আলোচনা আছে। কাণ্টও জানিতে চাহিয়াছেন—'কি আমি জানিতে পারি? কি আমার করা উচিত? কিসের আশা আমি করিতে পারি?' ইত্যাদি। কিন্তু রামানুজের বিশিষ্টবাদে সন্দেহের অবকাশ নাই,—ইহাতে অধ্যাত্মতত্ত্ব, নৈতিক নিয়মাবলী ও ধর্মের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে।[১]

(ঝ) ভাস্করের ভেদাভেদবাদের সহিত Plotinus, Spinoza, Hegel এবং Bosanquet-এর অদ্বৈতবাদের সাদৃশ্য রামানুজের বিশিষ্টবাদ অপেক্ষা গভীরতর। তবে "Plotinus comes nearest to Ramanuja amongst the philosophers of the West specializing in mystic ecstasy."[২]

(ঞ) বৈষ্ণব দার্শনিকগণের মুক্তি সম্পর্কিত মতবাদের সহিত খ্রীষ্টধর্মোক্ত মুক্তি বা মোক্ষের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু "the Vaisnavite theory has a universality of appeal which is missed in the Christian doctrines."[৩]

(ট) মধ্বের পুষ্টিমার্গের সহিত Augustine-এর "doctrine of election"-এর ঐক্য আছে।

(ঠ) বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের সহিত Berkeley-র দর্শনের মিল আছে (অবশ্য Berkeley-র দর্শনে লেখক ঈশ্বরকে যে স্থান দিয়াছেন, তাহাকে বাদ দিয়া এই বিচার করিতে হইবে)।[৪]

(ড) অনুত্তর (ultimate) একাধারে বিশ্বোত্তীর্ণ এবং বিশ্বময়—কাশ্মীরে প্রচলিত শৈবদর্শনের এই মতবাদের সহিত পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক Plotinus-এর মতের ঐক্য দেখা যায়। কাশ্মীরীয় শৈবদর্শনের স্বাতন্ত্র্যবাদের সহিত Schopenhauer-এর 'voluntarism'-এর যথেষ্ট মিল দেখা যায়। কিন্তু Schopenhauer-এর মতের সহিত এই মতের প্রধান পার্থক্য এই যে তিনি Will বা ইচ্ছাকে অচেতন বলিয়াছেন, কিন্তু শৈবদার্শনিকগণ ইচ্ছাকে মনের একটি দিক্ হিসাবে দেখিয়াছেন।[৫]

---

১ History of Philosophy, Eastern & Western, Vol. 1, p. 306
২ ঐ ঐ 310
৩ ঐ ঐ 318
৪ ঐ ঐ 385
৫ ঐ ঐ 389.

তর্কশাস্ত্র—প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে[১]

আধ্যাত্মিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে গভীর আগ্রহ এবং বাদবিতণ্ডা ও শাস্ত্রালোচনার জন্য তর্ক প্রভৃতির আলোচনা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে ভারতবর্ষ তাহার নিজস্ব তর্কশাস্ত্র নিজেই সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিল। আর ইহাতে আশ্চর্য হইবারও বিশেষ কিছু নাই। ন্যায়-সূত্রই যে ভারতের তর্কশাস্ত্রের প্রাচীনতম গ্রন্থ তাহা পূর্বেই দেখাইয়াছি। তর্ক কিন্তু কেবল এই একটি শাখাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না—হিন্দু, বৌদ্ধ এবং জৈন, সকলেই ইহাকে সমভাবে আশ্রয় করিয়াছিল।

ভারতীয় তর্কশাস্ত্র ভারতের নিজস্ব সৃষ্ট

ভারতীয় চিন্তাধারার একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় এই শাস্ত্রে আলোচিত হইয়াছে—তাহা হইতেছে প্রমাণের আলোচনা। নব্য নৈয়ায়িকগণ প্রমাণ-চতুষ্টয়বাদী: প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ, এই চারিটি প্রমাণ। বেদান্ত ইহার উপর অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধি যোগ করিয়াছে। এই ছয়টি প্রমাণ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত এবং overlappingও কিছুটা বটে আর বৌদ্ধগণ সাধারণ ভাবে সবপ্রকার জ্ঞানকে দুইটি প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন—উহারা প্রত্যক্ষ এবং অনুমান। জৈনগণ প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শ্রুতিকে (revelation) স্বীকার করিয়াছেন। চার্বাক প্রভৃতি লোকায়ত দর্শনবাদিগণ একমাত্র প্রত্যক্ষকেই স্বীকার করিয়াছেন; অনুমানকে অস্বীকার করিয়াছেন এই বলিয়া যে অনুমান কোন ব্যাপারে জিজ্ঞাসুকে নিঃসন্দিগ্ধ করিতে পারে না।

প্রমাণ

সম্ভবত অনুমানের প্রণালীর আলোচনা করিতে যাইয়াই প্রকৃত তর্কশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখাধ্যায়ীর সৃষ্টি হইয়াছিল। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনা প্রসংগেই হেত্বাভাস বা দুষ্ট হেতুগুলির শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছিল এবং তাহাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণও চলিয়াছিল। এইগুলির মধ্যে ক্লাসিক্যাল তর্কশাস্ত্র বা ইউরোপীয় তর্কশাস্ত্রের প্রধান প্রধান fallacy বা হেত্বাভাসগুলি ভারতীয়

অনুমানের প্রণালীর আলোচনা

১ দ্রঃ History of Indian Logic—S. C. Vidyabhusana.

দার্শনিকগণ স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন ; সেগুলি যেমন reductio ad absurdum বা অর্থ প্রসংগ, circular argument (চক্র), infinite regression (অনবস্থা), dilemma (অন্যোন্যাশ্রয়) এবং ignoratio elenchi (আত্মাশ্রয়)।[১]

নির্ভুল অনুমানের সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, "A correct inference was established by syllogism of which the Indian form (পঞ্চাবয়ব) was somewhat more cumbrous than the Aristotelian.[২]" ভারতীয় পঞ্চাবয়বের অবয়বগুলির কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ভারতীয় syllogismএর তৃতীয় term অ্যারিস্টটলের syllogism-এর major premise, আর ভারতীয়ের প্রথমটি অ্যারিস্টটলের conclusion। ভারতীয় Syllogismএর ইংরাজী করিয়া নিম্নরূপে দেখান যাইতে পারে :—

Aristotelian syllogism ও ভারতীয় পঞ্চাবয়ব অনুমান

(1) There is fire on the mountain,

(2) as there is smoke above it,

(3) and where there is smoke there is firo, as, for example, in a kitchen ;

(4) Such is the case with the mountain,

(5) and therefore, there is fire on it.

অ্যারিস্টটলের syllogism ঐ উদাহরণের নিম্নরূপ হইবে :—

(1) Where there is smoke there is fire (major)

(2) There is smoke (above the mountain) (minor)

(3) There is fire (on the mountain) (conclusion)

---

১ 'The Wonder that was India', p. 501.

২ অনুপলব্ধি (Non-observation), ভ্রমপ্রত্যক্ষ (Malobservation), অবৈধব্যাপ্তিগ্রহ (Illicit Generalisation), কারণাভাস (Fallacy of Causation), কাকতালীয় ন্যায় (post hoc, ergo propter hoc), অসংগতোপমা (False Analogy), চক্রকদোষ (Petitio Principii), অর্থান্তর দোষ বা আত্মাশ্রয় (Ignoratio Elenchi) ইত্যাকার অনেক হেত্বাভাসের আলোচনা ভারতীয় দর্শনে আছে।

অতএব বলা যায় যে ভারতীয় syllogism য়ুরোপীয় syllogismএর কাঠামোর বিপরীত সজ্জা মাত্র—ইহাতে প্রথম এবং দ্বিতীয় বাক্যে (অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা এবং হেতুর মাধ্যমে) যুক্তি প্রদর্শিত হয়, তৃতীয়ে সাধারণ সত্য এবং উদাহরণ দেওয়া হয় (দৃষ্টান্ত) এবং পরিশেষে প্রথম দুইটি বাক্যেরই একরূপ পুনরাবৃত্তি মাত্র করা হয়। ভারতীয় অনুমানে 'দৃষ্টান্ত' একটি অপরিহার্য অংগ এবং যুক্তিকে ইহা দৃঢ়ীভূত করে বলিয়া মনে করা হইত। Bashamএর মতে "Evidently this elaborate system of syllogism is the outcome of much practical experience in discussion." বৌদ্ধগণও ত্র্যবয়ব বা তিনটি অবয়ব বিশিষ্ট syllogism স্বীকার করিয়াছেন, চতুর্থ এবং পঞ্চম অবয়বকে তাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয়ের পুনরাবৃত্তি বলিয়াই মনে করিয়াছেন।

সাধারণীকরণের ভিত্তিকে (যেমন, যত্রযত্র ধূমস্তত্র তত্র বহ্নিঃ)—যে ভিত্তির উপর সকল অনুমানই প্রতিষ্ঠিত—মনে করা হইত ব্যাপ্তির ধর্ম। ব্যাপ্তি অর্থে পাশ্চাত্ত্য তর্কশাস্ত্রের universal concomitanceকে বোঝায়

ব্যাপ্তি universal concomitance

ব্যাপ্তির এই ধর্মের প্রকৃতি এবং উৎপত্তি সম্বন্ধে ভারতে বহুল আলোচনা হইয়া গিয়াছে, এবং ইহার আলোচনা (পরবর্তী কালে) universals এবং particularsএর মতবাদের পথ প্রশস্ত করিয়াছে। এ গ্রন্থের পক্ষে তাহার আলোচনা স্থানাভাববশত অসম্ভব।

জৈনদর্শনের অনুমানের আলোচনার উল্লেখ না করিলে ভারতীয় তর্কশাস্ত্রের আলোচনা অসমাপ্তই থাকিয়া যাইবে। জৈনগণ এবং নাস্তিক দার্শনিকগণের মধ্যে কেহ কেহ য়ুরোপীয় তর্কশাস্ত্রে যাহাকে Excluded Middle বলা হয়—তাহাকে অস্বীকার করিয়াছেন।

জৈনদর্শনে অনুমানের আলোচনা

জৈনদের মতে শুধু ভাব এবং অভাবই মাত্র সম্ভাব্য পদার্থ নহে; কিন্তু সাতটি সম্ভাবনা আছে। জৈনদের সপ্তভঙ্গীনয় বা স্যাদ্বাদকে ইংরাজী তর্কশাস্ত্রের ভাষায় seven aspects of predication বলা যায়। ঐ সপ্তভঙ্গীনয়ের ইংরাজী দৃষ্টান্তের রূপ :—

সপ্তভঙ্গী নয় বা স্যাদ্বাদ

(1) That an object, say a knife, exists as a knife.

(2) That it is not something else, say a fork (But it exists as a knife and does not exist as a fork)

(3) That in one aspect it is and in another it is not

(4) It is indescribable ; (its ultimate essence is unknown to us....it is inexpressible)

(5) It is, but its nature is otherwise and indescribable

(6) It is not, but its nature is indescribable.

(7) It both is and is not, but its nature is indescribable.

স্যাদ্বাদের ন্যায় জৈনগণ নয়বাদ নামে আর একপ্রকার বিধেয়ীকরণের পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। নয়বাদকে বলা হয় 'the theory of standpoints or ways of approaching an object of observation or study'.

নয়বাদ

এইগুলির প্রথম তিনটি দ্রব্যের সহিত সংশ্লিষ্ট (দ্রব্যার্থিক), শেষের চারিটি পর্যায়ার্থিক। ঐ নয়বাদের সাতটি নয়ের নাম যথাক্রমে নৈগম, সংগ্রহ, ব্যবহার, ঋজুসূত্র, শব্দ, সমভিরূঢ় এবং এবম্ভূত। কোনো কোনো জৈন সম্প্রদায় শেষের তিনটি 'নয়'কে বাদ দিয়াছেন, কারণ উহাদের সহিত প্রথম চারিটির প্রকৃতপক্ষে কোনো মিল বা সাদৃশ্যই নাই।

ভারতীয় তর্কধারার বৈশিষ্ট্য[১] সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে আধুনিক তার্কিক পণ্ডিতগণ হয়ত তাৎকালিক রীতিতে বিচারপ্রণালীকে সংক্ষিপ্ততর করিবার

ভারতীয় তর্কশাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য

প্রয়াস পাইবেন, কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, ভারতীয় তর্কশাস্ত্রে আছে 'a fundamental quality of breadth and realism, implying a full realisation that the world is more complex and subtle than we (the Europeans) think it, and that what is true of a thing in one of its aspects may at the same time be false in another."[২]

১ দ্রঃ 'Indian Logic'—Kuppuswami Sastri.

২ The Wonder that was India, pp. 503.

ভারতীয় দর্শনের কয়েকটি প্রধান পারিভাষিক শব্দ

অক্ষর—অবিনাশী, অমর, মায়াবাদিগণের মতে পরব্রহ্ম; বেদান্তিগণ ইহাকে মোক্ষও বলিয়াছেন, কাব্যজ্ঞগণের মতে অকারাদি বর্ণসকল।

অজাতবাদ—বিশ্বের উৎপত্তি বলিয়া কিছু নাই,—এই বৌদ্ধ মতবাদ।

অণু—অতি সূক্ষ্ম বস্তু যাহাকে আর ভাগ করা যায় না, যাহা নিরবয়ব তাহাই অণু। 'ভক্তুমশক্যা অণবঃ' (সর্বদর্শনসংগ্রহ)—atom.

অতিদেশ—এক স্থলে শ্রুত বস্তুর অন্য স্থলে সম্বন্ধ স্থাপনের নাম অতিদেশ বা analogy; 'ইতরধর্মস্য ইতরস্মিন্ প্রয়োগায় আদেশঃ' (বাচস্পত্যম্); 'প্রাকৃতাৎ কর্মণো যস্মাৎ তৎসমানেষু কর্মসু। ধর্মোপদেশো যেন স্যাৎ সোঽতিদেশ ইতি স্মৃতঃ ॥'(জৈমিনীয় ন্যায়মালা)

অতিপ্রসংগ—অপ্রাসংগিক আলোচনা (unwarranted discussion) বা অতিব্যাপ্তি। 'প্রকৃতাদন্যত্র প্রসঞ্জনম্' (ন্যায়কোশঃ)।

অতিব্যাপ্তি—অতিপ্রাসংগিক বা অপ্রাসংগিক—প্রয়োজনীয় বস্তু অপেক্ষা অধিক দেশ ব্যাপ্ত করিয়া থাকাকে অতিব্যাপ্তি বলা হয় (being too wide); 'ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধিঃ। বিপক্ষমাত্রাদ্ ব্যাবৃত্ত্যভাবাৎ সোপাধিকত্বাচ্চ' (তর্কভাষা)।

অতীন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়জ-প্রত্যক্ষের বাহিরে; 'ইন্দ্রিয়জন্যলৌকিক-প্রত্যক্ষা-বিষয়ত্বম্' (ন্যায়কোশঃ)।

অত্যন্তাভাব—Absolute non-existence : কোনো কালেই ছিল না, বা সর্বকালেই অভাবের বোধ থাকিলে অত্যন্তাভাব হয়। 'ত্রৈকালিক-সংসর্গাবিচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকোঽভাবঃ' (তর্কসংগ্রহঃ)। ঘটের বর্তমানতা-বস্থাতেই, যেখানে ঘট থাকে সেই স্থান ভিন্ন অন্য সকল স্থানেই আমরা ঘটের যে জাতীয় অভাব বুঝি···তাহা ঘটের অত্যন্তাভাব।

অর্থবাদ—ব্যাখ্যামূলক অথবা প্রশংসাত্মক মন্ত্রাদি; exegesis। 'অর্থস্য

স্বর্গাদেবাদঃ কথনম্, বিধ্যর্থপ্রশংসাপরং বচনমিত্যর্থঃ। অর্থবাদো হি স্তুত্যাদিদ্বারা বিধ্যর্থং শীঘ্রং প্রবৃত্তয়ে প্রশংসতি' (গৌতমসূত্রবৃত্তিঃ)।

অর্থাপত্তি--ইহা মীমাংসকগণের একটি প্রমাণ। Cicumstantial inference ; deduction of a matter from that could not else 'be'। 'মূষিকেণ দণ্ডো ভক্ষিতঃ। অতএব দণ্ডস্থিতঃ অপূপঃ ভক্ষিতঃ এব ইতি অর্থাপত্ত্যালভ্যতে। অর্থেন তাৎপর্যেণ আপত্তিঃ আপাদনং লাভঃ।'

অদৃষ্ট—নিয়তি, ভাগ্য, প্রভাব, অপূর্ব। 'ধর্মাধর্মশব্দবদস্যার্থোঽনুসন্ধেয়ঃ' (ভাষাপরিচ্ছেদঃ)।

অদ্বৈত—দ্বৈতবিহীন ; একক, absolute monism. 'ন বিদ্যতে দ্বৈতং দ্বিধাভাবো যত্র তৎ' (ন্যায়কোশঃ)।

অধিকরণ—যাহাকে আশ্রয় করিয়া কোনো বস্তু বিদ্যমান থাকে সেই আধারকেই বলা হয় অধিকরণ বা container। 'প্রতীতিসাক্ষিকঃ স্বরূপসম্বন্ধ-বিশেষঃ' অথবা, বিষয়, সংশয়, পূর্বপক্ষ, উত্তর ও সিদ্ধান্ত এই ৫টিকে একসংগে অধিকরণ বলা হয়।

অধ্যবসায়—মানসিক সংকল্প; দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া কোন কর্মসাধনের প্রচেষ্টা ; determinative cognition , 'বুদ্ধেঃ রজস্তমোঽভিভবে সতি যঃ সত্ত্বসমুদ্রেকঃ সোঽয়মধ্যবসায় ইতি সাংখ্যাঃ, স চাধ্যবসায় আত্মধর্ম ইতি নৈয়ায়িকাঃ (সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী)।'

অধ্যাস—অযথার্থজ্ঞান। ইহা অর্থাধ্যাস ও জ্ঞানাধ্যাসভেদে দ্বিবিধ। 'প্রমাণদোষসংস্কারজন্মান্যস্য পরাত্মতা। তদ্ধীশ্চাধ্যাস ইতি হি দ্বয়মিষ্টং মনীষিভিঃ'॥ (সর্বদর্শনসংগ্রহঃ)।

অনবস্থা—যাহার আর শেষ নাই তাহাকে অনবস্থা বা Infinite Regress বলে। 'কৢপ্তবস্তুসজাতীয়বস্তুপরম্পরাকল্পনস্য বিরামাভাবঃ' (ন্যায়কোশঃ)।

অনাদি—আদি বা উৎপত্তিবিহীন ; immemorial ; 'উৎপত্তিশূন্যত্বম্' (বাক্যবৃত্তিঃ)।

অনাহত—দশ প্রকার (শব্দ বা) নাদ যাহা হৃৎচক্র বা হৃৎপদ্মের দ্বাদশ

দলের মধ্যস্থল হইতে উৎপন্ন হয়, যোগদর্শন এবং তন্ত্রশাস্ত্রে এই শব্দটির উল্লেখ দেখা যায়।

অনুপলব্ধি—উপলব্ধি বা অনুভবের অভাব; noncognition জ্ঞানের একটি করণ, প্রমাণ বিশেষ। 'জ্ঞানকরণাজন্যাভাবানুভবসাধারণকারণমনুপলব্ধিরূপং প্রমাণম্।...অনুপলব্ধেযোগ্যতা চ তর্কিত প্রতিযোগিসত্ত্বপ্রসঞ্জিত প্রতিযোগিকত্বরূপা' (ন্যায়কোশঃ)।

অনুবন্ধ—যে কোনো শাস্ত্রের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক বিষয়বিশেষ। বেদান্তিগণের মতে অনুবন্ধ ৪টি—বিষয়, প্রয়োজন, অধিকারী এবং সম্বন্ধ। 'ইৎসংজ্ঞতয়া কৃতলোপো বর্ণ ইতি শাব্দিকাঃ। ফলসাধনং পুনঃপুনরনুষ্ঠানাভ্যাস ইতি ধর্মশাস্ত্রবিদঃ' (ন্যায়কোশঃ)।

অনুবাদ—বিধিবিহিত বচনেরই পুনরুক্তিকে বলে অনুবাদ। Repetition. 'প্রাপ্তস্যানু পশ্চাৎকথনং সপ্রয়োজনমনুবাদ ইতি সামান্যলক্ষণম্' (গৌতমসূত্রবৃত্তিঃ)।

অনুষঙ্গ—'জনিতান্বয়স্য পদস্য অন্বয়ার্থানুসন্ধানম্'। অবিনাভাবকে অনুষঙ্গ বলা হয়। কখনও কখনও ইহা প্রসঙ্গ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। স্থানান্তরে স্থিত অথচ নিকটবর্তী পদকে কোথাও অনুসন্ধান করিয়া যোজনা করাকেও অনুষঙ্গ বলে।

অনৈকান্তিক—অস্থির, অনিশ্চিত, inconclusive। সাধারণ, অসাধারণ এবং অনুপসংহারী ভেদে ৩ প্রকার, অথবা ৫ প্রকার হেত্বাভাসের একটি। 'অনৈকান্তিকঃ সব্যভিচারশব্দেন ব্যবহ্রিয়তে। বৈশেষিকমতে তু সন্দিগ্ধ ইত্যুচ্যতে।' (ন্যায়কোশঃ)।

অন্যথাসিদ্ধ—যাহা প্রকৃত কারণ নহে, হেত্বাভাস মাত্র; accidental circumstance। 'অবশ্যকপ্তনিয়তপূর্ববর্তিন এব কার্যসম্ভবে তৎসহভূতঃ' (ন্যায়কোশঃ)। ইহা তিন প্রকার। "বস্তুতঃ কারণ নহে, অথচ আপাতদৃষ্টিতে যাহা কারণের মত প্রতীত হয় তাহাকে অন্যথাসিদ্ধ বলে" (সুখময়)।

অন্যোন্যাধ্যাস—পরস্পরের ঐক্য সম্বন্ধে ভ্রমাত্মক জ্ঞান; reciprocal

attribution of identity. "জলব্যোম্না ঘটাকাশো যথা সর্বস্তিরোহিতঃ। তথা জীবে চ কূটস্থঃ সোঽন্যোন্যাধ্যাস উচ্যতে ॥"

অন্যোন্যাভাব—পরস্পরের ক্ষেত্রে পরস্পরের অভাব; mutual non-existence। 'নিত্যত্বে সতি অত্যন্তাভাবভিন্নত্বে সতি অভাবঃ' 'তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকোঽভাবঃ' (তর্কসংগ্রহঃ)। যে বস্তু যে বস্তু নহে, সেই বস্তুতে সেই বস্তুর যে অভাব তাহাই অন্যোন্যাভাব। অন্যোন্যাভাব ও ভেদ—এই দুইটি শব্দ একই প্রকার অর্থ বুঝাইয়া থাকে।

অন্যোন্যাশ্রয়—ইহাকেই অক্ষপাদদর্শনে ইতরেতরাশ্রয় শব্দ দ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে। কার্য এবং কারণের পারস্পরিক সম্বন্ধ; reciprocal relation of cause and effect, 'পরস্পরজ্ঞানসাপেক্ষজ্ঞানাশ্রয়োঽন্যোন্যাশ্রয় ইতি স্মার্তৈরুক্তমিতি বাচস্পত্যে'।

অন্বয়—সাধ্য বা affirmative premise। তৎসত্ত্বে তৎসত্তা।

অন্বাচয়—গৌণকর্ম বা উদ্দেশ্যকে মুখ্যকর্ম বা উদ্দেশ্যের সহিত সংযোজিত করাকে অন্বাচয় বলে। 'প্রধানগুণভাবেন যত্র ক্রিয়ান্বয়তাৎপর্যং সোঽন্বাচয়ঃ' (তর্কপ্রকাশঃ)। 'পরস্পরনিরপেক্ষস্যান্যতরস্যানুষঙ্গিকত্বে অন্বাচয়ঃ দ্বন্দ্বসমাস-বিশেষঃ। যথা ভিক্ষামট, গাঞ্চানয়।'

অপকর্ষ—বিদ্যমান ধর্মের অপচয় বা হ্রাসকে বলে অপকর্ষ (diminution) 'সাধ্যসাধনান্যতরস্যাভাবপ্রসঞ্জনম্' (গৌতমসূত্রবৃত্তিঃ)।

অপদেশ—হেতু; কোন একটি বিষয়ের উপন্যাসকেও অনেক সময় অপদেশ বলা হইয়া থাকে। Second step in an Indian inference.

অপবর্গ—মোক্ষ, আত্যন্তিকভাবে দুঃখের নিবৃত্তি, ফলপ্রাপ্তি, নির্বাণ-লাভ। 'আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিরপবর্গঃ' (সর্বদর্শনসংগ্রহঃ)।

অপূর্ব—অদৃষ্ট (বৈশেষিক); পূর্বে যাহা ঘটে নাই (unprecedented), প্রারব্ধকর্ম (বেদান্ত); গুণবিশেষ (মীমাংসা); ধর্মাধর্ম (ন্যায়), পুণ্যপাপ (পুরাণ); unseen force.

অভিচার—মারণমন্ত্র; শত্রুবধের জন্য প্রযুক্ত ক্ষতিকর ইন্দ্রজাল (incantation); 'বৈরিবধাদ্যুৎকটকামনা' (তর্কপ্রকাশঃ)।

অবিদ্যা—অজ্ঞান, ক্লেশ, ভ্রান্তধারণা, 'nescience'। 'অনিত্যা-শুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা' (পা. যো. সূ ২।৫)। 'অসৎপ্রকাশনশক্তিরবিদ্যা'।

অবিনাভাব—Invariable relation : ব্যাপ্তিঃ, সম্বন্ধমাত্রম্; মীমাংসকমতে তু স্বদেশবৃত্তিত্বং তাদাত্ম্যঞ্চাবিনাভাবঃ। (নিয়ত) সম্বন্ধযুক্ততা।

অব্যক্ত—অপ্রকাশিত (unmanifested)। 'অব্যক্তং প্রধানমিতি সাংখ্যাঃ। অপ্রকাশিতমিতি শাব্দিকাঃ।' প্রকৃতি বা প্রধানও অব্যক্ত।

অব্যয়—নিত্য, অক্ষর, অবিনাশী; eternal, imperishable.

অব্যাপ্তি—ব্যাপ্তিশব্দের অর্থ সম্বন্ধ। "অব্যাপ্তি অসম্বন্ধ। কোন অর্থের সহিতই শব্দের সম্বন্ধ থাকিবে না ইহা অসম্ভব। সুতরাং যে স্থলে সম্বন্ধ থাকা উচিত, সে স্থলে সম্বন্ধ না থাকিলেই অসম্বন্ধ বুঝিতে হইবে।" (চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার)। Inadequate pervasion of a proposition. 'লক্ষ্যতাবচ্ছেদক-সমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বম্। লক্ষ্যৈকদেশাবৃত্তিত্বম্। লক্ষ্যৈকদেশে লক্ষণস্যাবর্তনম্।' (ন্যায়কোশঃ)

অসৎ—সদ্ভিন্ন, যাহা সৎ নহে, যাহার সত্তা নাই। 'তৎকালীনস্বজনকাভাব-প্রতিযোগি। নামরূপাভ্যামব্যাকৃতং কারণাত্মনাস্থিতং সূক্ষ্মরূপমব্যক্তমিতি মায়াবাদিনঃ' (ন্যায়কোশঃ)। Non-real; non-being।

আত্মাশ্রয়—নিজেকে নিজেই অপেক্ষা বা আশ্রয় করিয়া থাকায় যে দোষের উদ্ভব হয়, তাহাকে আত্মাশ্রয় বলে। 'স্বগ্রহসাপেক্ষগ্রহসাপেক্ষ-গ্রহকত্বমাত্মাশ্রয়ঃ।'

ইতরেতরাশ্রয়ত্ব—অন্যোন্যাশ্রয়ত্ব, mutual dependence.

ইষ্টাপত্তি—ইষ্টলাভকে ইষ্টাপত্তি বলে। অথবা 'আপনার প্রদর্শিত আপত্তিতে (objection) আমার সম্মতি আছে—ঐ আপত্তি আমার অভিলষিত' এরূপ উক্তিকে ন্যায়ের ভাষায় ইষ্টাপত্তি বলে।

উপাদান—"যে বস্তুর নির্মাণের জন্য লোকে যে বস্তুর সংগ্রহ করে অর্থাৎ যে বস্তু দ্বারা অভিলষিত বস্তু নির্মিত হয় তাহার নাম উপাদান।" (চন্দ্রকান্ত); material or substantive cause. 'সমবায়িণম্' ।কার

উপাধি—'সাধ্যের যে ব্যাপক এবং হেতুর যে অব্যাপক তাহাকে উপাধি বলে।' (ভাষা পরিচ্ছেদ); conditions.

উহ—"তর্ক। শাস্ত্রাবিরোধিযুক্তিদ্বারা সংশয় ও পূর্বপক্ষ নিরসনপূর্বক শাস্ত্রার্থের অবধারণই তর্ক।" (চন্দ্রকান্ত)। Modification by conjecture or by reasoning. (according to Smritikaras and grammarians); 'অপূর্বোৎপ্রেক্ষণমূহঃ'।

কারণ—ভাষা পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে, 'অন্যথাসিদ্ধিশূন্যত্বে সতি নিয়তপূর্ববৃত্তিত্বম্ কারণত্বম্' অর্থাৎ কারণ হইতেছে তাহাই যাহা থাকিলে যাহা হয় এবং যাহা না থাকিলে যাহা ঘটে না, যাহা কার্যের পূর্বে থাকে এবং যাহা না থাকিলে কার্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। Cause.

কার্য—কারণ হইতে জাত এবং কারণের পশ্চাতে যাহার উৎপত্তি ঘটে তাহাই কার্য। Effect.

কুম্ভক—শ্বাসনিরোধপ্রক্রিয়ার একটি। 'অন্তঃস্তম্ভবৃত্তিঃ' (সর্বদর্শনসংগ্রহ)। Suspension of breath। ইহার দ্বারা প্রাণবায়ুর ক্রিয়া পর্যন্ত নিয়মিত হয়।

কূটস্থ—অপরিবর্তনীয়, অপরিণামী। 'অবিচালী', unchangeable. জন্যধর্মের অনাশ্রয়, অবিকারী ও অসঙ্গ।

কৈবল্য—দুঃখ তিন প্রকার। সেই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত অভাবই কৈবল্য। মোক্ষকেও কৈবল্য বলা হয়। Absolute liberation. 'স চাত্যন্তিক-দুঃখত্রয়বিগম ইতি সাংখ্যাঃ। নির্লেপস্য পুরুষস্য কৈবল্যেনাবস্থানং কৈবল্যম্। অদ্বিতীয়ব্রহ্মভাবাপত্তিরিতি মায়াবাদিনঃ।'

ক্ষেত্রজ্ঞ—জীবাত্মা। 'ক্ষেত্রং শরীরমাত্মত্বেন জানাতীতি ক্ষেত্রজ্ঞঃ।' Soul.

চিৎ—জীব, জ্ঞান, বিবেক। (Consciousness). 'চিদিতি প্রোক্তো জীব ইতি রামানুজপাদাঃ।'

চোদনা—বিধিবাক্য: প্রাভাকরমতে প্রবর্তক বেদবাক্যইচোদনা।

তন্মাত্র—সূক্ষ্মভূত (Subtle element). শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই ৫টি তন্মাত্র। সাংখ্যমতে সূক্ষ্ম ৫টি ভূত, আকাশ প্রভৃতি।

তাদাত্ম্য—অভিন্নত্ব (indentity); তদ্বৃত্তিধর্মবিশেষ।

ত্রসরেণু—দুইটি পরমাণুর সংযোগে দ্ব্যণুক এবং তিনটি দ্ব্যণুকের সংযোগে ত্রসরেণু উৎপন্ন হয়। Mote or atom of dust in a sunbeam.

দেহাত্মবাদিন্—যাঁহারা দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে করেন অর্থাৎ দেহ ও আত্মার মধ্যে কোনো প্রভেদ স্বীকার করেন না, তাঁহাদের দেহাত্মবাদী বলা হয়। চার্বাকদর্শনসম্মত এই মত।

নিত্য—উৎপত্তিবিনাশবিহীন বস্তু। 'নিত্যত্বঞ্চ প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বে সতি ধ্বংসাপ্রতিযোগিত্বম্।' (ন্যায়কোশঃ)।

নিদিধ্যাসন—গুরুমুখ হইতে শ্রুত বিদ্যার নিরন্তর বিচার ও একাগ্র-চিত্তে তাহার যে ধ্যান তাহাকে নিদিধ্যাসন বলা হয়। সমাধি।

নির্বাণ—বৌদ্ধদের মোক্ষ।

নির্বিকল্পক—"যে জ্ঞানে বিশেষ্য-বিশেষণভাব ভাসমান হয় না, যাহাতে কেবল বস্তুর স্বরূপমাত্র ভাসমান হয়, তাহা নির্বিকল্পক। এই জ্ঞান অতীন্দ্রিয়, উহা প্রত্যক্ষ নহে, অনুমেয় মাত্র" (চন্দ্রকান্ত)।

নিঃশ্রেয়স—মুক্তি, জন্মমরণ বন্ধের ছেদ বা বিরতি এবং সর্বদুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। "দুঃখাপায়ে চাত্যন্তিকোঽপবর্গো নিঃশ্রেয়সমিতি বাৎস্যায়নঃ। আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিঃ। নিত্যনিরতিশয়সুখাভিব্যক্তিরিতি দীধিতিকৃৎ।" (ন্যায়কোশঃ)।

নৈরাত্ম্য—নৈরাত্ম্য "means the state of being devoid of ātman which signifies.........svabhāva, "own being", i.e, innate character which never undergoes any change, nor depends on anything for its being.

(H. of P. E & W. vol I, p. 182)

পরিণাম—অবস্থান্তরপ্রাপ্তি। তিনপ্রকার:—ধর্মপরিণাম, লক্ষণপরিণাম এবং অবস্থা-পরিণাম। সাংখ্য এবং পাতঞ্জলমতে পরিণামের অর্থ অবস্থিত দ্রব্যের পূর্ব ধর্মের নিবৃত্তি এবং অন্য ধর্মের উৎপত্তি। মায়াবাদী বৈদান্তিকের মতে পূর্বরূপ পরিত্যাগের পর নানারূপের প্রতিভাসই পরিণাম।

পারিমাণ্ডল্য—অণুপরিমাণকে প্রশস্তপাদ পারিমাণ্ডল্য বলিয়াছেন।

পুদগল—পরমাণু। বৌদ্ধদের মতে দ্ব্যণুকাদিপদার্থ বিশেষ। পুদ্গল স্পর্শ, রস, গন্ধ এবং বর্ণযুক্ত ও দ্বিবিধ। অণু এবং স্কন্ধ এই দুই প্রকার।

প্রকৃতি—সত্ত্ব, রজ এবং তমগুণের সাম্যাবস্থা। প্রকৃতি মায়া এবং অবিদ্যা—এই দ্বিবিধভেদযুক্তা বলিয়া শাংকরমতাবলম্বী অদ্বৈতবেদান্তিগণ মত প্রকাশ করেন। জড়াত্মক এবং ভগবানের অংশবিশেস—বাল্লভগণের মত। মাধবগণের মতে লক্ষ্মীও বটেন।

প্রতিপ্রসব—নিষিদ্ধের পুনঃপ্রাপ্তির সম্ভাবনাকে প্রতিপ্রসব বলে।

প্রতিযোগিন্—যাহার অভাব সে প্রতিযোগী। যেমন ঘটাভাবস্থলে ঘট প্রতিযোগী।

প্রতীত্যসমুৎপাদ—বুদ্ধদেব কার্যকারণশৃঙ্খল অবলোকনা করিয়া প্রতীত্যসমুৎপাদ বা দ্বাদশ নিদানের কথা বলিতেন, যথা,—অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান (আসক্তি), ভব, জাতি, জরামরণ।

প্রত্যভিজ্ঞা—ইন্দ্রিয়সংযোগে সংস্কারজন্যজ্ঞানত্বকে বলা হয় প্রত্যভিজ্ঞা। প্রত্যভিজ্ঞাতে আত্মাই বিষয়।

প্রপঞ্চ—সংসারঃ। বল্লভসম্প্রদায়ের বেদান্তবাদিগণ বলিয়াছেন, প্রপঞ্চ ভগবানের কায, সংসার মায়ার কার্য।

প্রমা—প্রমাণ।

প্রাগভাব—উৎপত্তির পূর্বে সমবায়িকারণে কার্যের সংসর্গের অভাবই প্রাগভাব। "কোনো কার্য যে পর্যন্ত উৎপন্ন না হয়, সেই পর্যন্ত যে জাতীয় অভাবকে আমরা অনুভব করি, সেই জাতীয় অভাবকে প্রাগভাব বলে।" (প্রমথনাথ শর্মা)।

প্রারব্ধকর্ম—শরীরের ভোগজন্য যে কর্ম তাহাই প্রারব্ধকর্ম। অথবা দেহাদির আরম্ভক অদৃষ্টবিশেষ।

বুদ্ধি—জ্ঞান। অথবা, আত্মাশ্রয়ের যে প্রকাশ তাহাই বুদ্ধি।

ব্রহ্মবিহার—বুদ্ধদেব বলেন, ধর্ম সত্যে প্রতিষ্ঠিত, নির্বাণলাভ করিতে হইলে বহু সাধনার প্রয়োজন। উহা লাভ করিতে হইলে সোপানের

আবশ্যক। তাহার নাম ভাবনা বা চর্চা। ইহার ৪টি স্তর—মৈত্রী, করুণা মুদিতা, উপেক্ষা। ইহাদেরই অন্য নাম ব্রহ্মবিহার।

ভাক্ত—গৌণ।

ভাবনা—ভাবনার অর্থ ভবিতার অর্থাৎ জায়মানের উৎপত্তির অনুকূল ভাবকব্যাপার-বিশেষ। ভাবনা লিঙ্‌প্রত্যয়জন্যা। অথবা "যে সংস্কারের দ্বারা পূর্বানুভূত বস্তুর স্মরণ হয়, সেই সংস্কারের নাম ভাবনা" (সুখময়)।

মধ্যস্থ—উদাসীন। বাদিপ্রতিবাদীর বিতর্কের কারণসমূহ সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া যে তত্ত্বের নির্ণয় করে তাহাকে মধ্যস্থ বলে।

মাধ্যমিক—বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতবিশেষ। "গুরুকৃত্যাকরণাদুত্তমাঃ পযন্যোগস্যা-করণাদধমাশ্চ। অতস্তেষাং মাধ্যমিকা ইতি প্রসিদ্ধিঃ।" (ন্যায়কোশঃ)।

মায়া—মিথ্যাবুদ্ধির হেতুভূত যে অজ্ঞান তাহাই মায়া। ঈশ্বরোপাধিই এই অজ্ঞান।

মূলপ্রকৃতি—যাহার আর অন্য কোনো বিকৃতি ঘটে না এমন যে 'কেবলা প্রকৃতি' তাহাকেই বলে মূলপ্রকৃতি। ইহাকেই 'প্রধান' বলা হইয়া থাকে।

যুক্তযোগী—যোগের অভ্যাসবশত সর্বদা সকল বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন তাপসকে যুক্তযোগী বলা হয়।

যুঞ্জানযোগী—চিন্তা করিয়া যিনি সকল বিষয় জানিতে পারেন তাঁহাকে যুঞ্জানযোগী বলা হয়।

যোগাচার—ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিশেষ।

রূপস্কন্ধ—বিষয়প্রপঞ্চ (form)।

রেচক—কোষ্ঠস্থিত বায়ুর বহির্নিঃসারণ নামক যৌগিক প্রক্রিয়াবিশেষ।

লিঙ্গদেহ—সূক্ষ্মদেহ।

লোকায়তিক—চার্বাকদর্শনবাদী।

বাসনা—স্মৃতির কারণীভূত সংস্কার বিশেষ। 'একসন্তানবর্তিনামালয়বিজ্ঞানানাং তত্তৎপ্রবৃত্তিজননশক্তিরিতি বিজ্ঞানবাদিনো বৌদ্ধাঃ' (ন্যায়কোশঃ)।

বিকার—প্রকৃতির অন্যরূপে পরিণামের নাম বিকার। কেহ কেহ স্বরূপ

পরিত্যাগের পর রূপান্তর গ্রহণকেও বিকার বলিয়া থাকেন। "বস্তুর সহিত যে অন্যথা প্রথা কিনা অন্যরূপ জ্ঞান, তাহা বিকার।" (চন্দ্রকান্ত)

বিজ্ঞানবাদ—বৌদ্ধমতবিশেষ। এই মতে প্রবৃত্তিবিজ্ঞান এবং আলয়বিজ্ঞান ভেদে বিজ্ঞান দ্বিবিধ। প্রবৃত্তিবিজ্ঞান যেমন, এই ঘট। আলয়-বিজ্ঞান যেমন, আমি জানি।

বিজ্ঞানস্কন্ধ—আলয়বিজ্ঞান এবং প্রবৃত্তিবিজ্ঞানের প্রবাহ (consciousness)।

বিতণ্ডা—"নিজের কোনও পক্ষনির্দেশ না করিয়া কেবল পরপক্ষ খণ্ডনের উদ্দেশে বিজিগীষু যে কথার প্রবর্তনা করে, তাহার নাম বিতণ্ডা।" (চন্দ্রকান্ত)।

বিদেহমুক্তি—মৃত্যুর পর মুক্তি।

বিপাক—অন্যথাভূতের অন্যরূপে পরিণাম।

বিপ্রতিপত্তি—বিরুদ্ধজ্ঞান, সংশয়।

বিবর্ত—পূর্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়া দ্রব্যের রূপান্তরপ্রকার প্রতীতির গোচরীভূত হইলে তাহাকে বিবর্ত বলা হয়। যেমন মায়াবাদিগণের মতে পরব্রহ্মেতেই সমস্ত জগতের বিবর্ত। "বস্তু না থাকিয়াও যে অন্যরূপজ্ঞান হয় তাহার নাম বিবর্ত।" (চন্দ্রকান্ত)।

বিশেষাদ্বৈত—সূক্ষ্ম চিৎ এবং অচিদাত্মক শরীরবিশিষ্ট কারণ-পরমাত্মার সহিত স্থূল চিৎ এবং অচিদাত্মক শরীরবিশিষ্ট কার্য-পরমাত্মার ঐক্যকে বিশেষাদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত বলা হয়।

বেদনাস্কন্ধ—বিষয়জ্ঞানপ্রপঞ্চ। Feelings of pleasure and pain.

ব্যভিচার—একত্র অব্যবস্থাকে ব্যভিচার বলে, যেমন, নিত্যঃ শব্দঃ অস্পর্শত্বাৎ।

ব্যাপ্তি—বিশেষরূপে আপ্তি বা সম্বন্ধ। "কেবলান্বয়িনি কেবলান্বয়িধর্মসম্বন্ধঃ। ব্যতিরেকেণি সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বং ব্যাপ্তিঃ।" (ন্যায়কোশঃ)। হেতুসাধ্যয়োঃ সহচারঃ। সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্।

ব্যাবর্তক—ভেদক। "আশ্রয়াণাং পরস্পরভেদানুমিতিজনকম্ ব্যাবর্তকম। যথা বিশেষস্তৎপরমাণূনাং ব্যাবর্তকঃ।"

ব্যাবৃত্তি—ইতরভেদের অনুমিতিকে বলে ব্যাবৃত্তি। "তত্তদ্ধর্মাবচ্ছিন্নেতরভেদঃ।"

শব্দব্রহ্ম—শব্দই ব্রহ্ম ইত্যাকার কল্পনা।

শাব্দজ্ঞান—শব্দজ্ঞানজন্য যে জ্ঞান তাহাই শাব্দজ্ঞান।

সংসার—দুঃখ প্রভৃতির কার্যকারণভাবকে সংসার বলা হয়। "মিথ্যাজ্ঞানাদয়ো দুঃখান্তা অবিচ্ছেদেন বর্তমানাঃ সংসারশব্দার্থঃ।"

সৎকার্যবাদ—"পরিণামবাদিগণের মতে, কার্য চিরকালই আছে এবং থাকিবে—কার্য কারণের রূপান্তর মাত্র, উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণে অব্যক্ত ভাবে বিদ্যমান থাকে। সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনে এই পরিণামবাদই অবলম্বিত হইয়াছে।" (প্রমথনাথ শর্মা)।

সমুচ্চয়—একই কালে "পর্বত বহ্নিমান্ এবং বহ্ন্যভাববান্ পর্বত" ইত্যাকার জ্ঞানকে সমুচ্চয় বলে।

সম্প্রজ্ঞাত—"একাগ্র চিত্তের যোগকে বলা হয় সম্প্রজ্ঞাত। কেননা তৎকালে ধ্যেয়বস্তু সম্যক্‌রূপে প্রজ্ঞাত হয়।" (চন্দ্রকান্ত)।

সর্বাস্তিবাদী—বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিশেষ।

সাধ্যতা—সাধ্যনিষ্ঠ ধর্ম অথবা সাধ্যের ভাবকে সাধ্যতা বলে।

সাধ্য—'পর্বতে বহ্নি আছে' এরূপ স্থলে পর্বতে বহ্নি সাধ্য। 'যে বস্তুকে সাধন করিতে যাইতেছি, হেতুর সাহায্যে যাহাকে পাইতে চাই, তাহার নাম সাধ্য।' (সুখময়)।

সিদ্ধি—সাধ্যবত্তার নিশ্চয়কে সিদ্ধি বলে।

সুগত—বুদ্ধ।

সুষুপ্তি—মায়াবাদিবেদান্তিগণের মতে জীবের জ্ঞানশূন্য অবস্থাবিশেষ। প্রদেশবিশেষে অবস্থিত মনের সংযোগকেও সুষুপ্তি বলা হয়।

সূক্ষ্মশরীর— কোনো কোনো বেদান্তিগণের মতে অপঞ্চীকৃত পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূত সূক্ষ্ম। তাহাদের দ্বারা নির্মিত শরীর সূক্ষ্ম শরীর।

সৌত্রান্তিক—বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিশেষ। এই মতে, বাহ্যবস্তু ছায়ামাত্র, সুতরাং উহাদের জ্ঞান প্রত্যক্ষ নহে। বাহ্যবস্তুর সত্তার উপলব্ধি হয় অনুমান দ্বারা।

স্কন্ধ—যে সকল উপকরণে জীবের জীবন গঠিত তাহাদের নাম 'স্কন্ধ'। বৌদ্ধমতে স্কন্ধ ৫টি—রূপ (form), বেদনা (feelings of pleasure and pain), সংজ্ঞা (perception), সংস্কার (tendencies created by impressions of past experiences) এবং বিজ্ঞান (consciousness)। বৌদ্ধদের মতে এই পঞ্চস্কন্ধ ব্যতিরিক্ত কোনো আত্মা নাই।

স্ফোট—বর্ণের অতিরিক্ত, বর্ণের দ্বারা অভিব্যঙ্গ্য অর্থপ্রত্যায়ক নিত্য শব্দই স্ফোট। "অর্থনিষ্ঠবিষয়তাপ্রযোজকশক্তিমত্ত্বং স্ফোটত্বম্।"

স্যাদ্বাদ—জৈনদিগকে স্যাদ্বাদী বলা হয়। স্যাৎশব্দ অনেকান্ত দ্যোতক অর্থাৎ কথঞ্চিৎ। তাঁহারা বলেন, ঘট "স্যাদস্তি, স্যান্নাস্তি, স্যাদস্তি চ নাস্তি চ, স্যাদবক্তব্যঃ, স্যাদস্তি চাবক্তব্যঃ, স্যান্নাস্তি চাবক্তব্যঃ, স্যাদস্তি নাস্তি চাবক্তব্যঃ।" (সর্বদর্শনসংগ্রহ)।

হেত্বাভাস—"নৈয়ায়িক আচার্যগণ দোষযুক্ত হেতুকে 'হেত্বাভাস' নামে অভিহিত করিয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে হেতু বলিয়া মনে হইলেও বাস্তবিক যাহা হেতু নহে তাহাই হেত্বাভাস।" (সুখময়)। হেতব ইব আভাসন্তে, প্রতীয়ন্তে, নতু হেতবঃ তে হেত্বাভাসাঃ। যথা রাসভনীতমৃত্তিকয়া ঘটস্য উৎপাদনেঽপি তস্য পূর্ববর্তিত্বেঽপি তদ্বিনাপ্যুৎপত্তেঃ ঘটং প্রতি রাসভস্য হেত্বাভাসত্বং ঘটঃ রাসভাদিত্যাদৌ।

গ্রন্থপঞ্জী (দর্শন)

ইংরাজী :—

1) History of Indian Philosophy, Vols. I-V, S. N. Das Gupta
2) Indian Philosophy Vols. I—II—S. Radhakrishnan
3) History of Philosophy : Eastern and Western, Vol. I
ed. S. Radhakrishnan
4) Cultural Heritage of India, Vol III—
ed. H D. Bhattacharyya
5) Outline of Indian Philosophy—M. Hiriyanna
6) Essentials of Indian Philosophy—Do
7) The Wonder That Was India—A. L. Basham
8) The Legacy of India—G. T. Garratt
9) Ancient Indian Civilisation—Louis Renou
10) Nyaya Vaisesika Philosophy—S. Bhaduri
11) Nyāya Theory of Knowledge—S C. Chatterjee
12) Introduction to Indian Philosophy—Datta and Chatterjee
13) History of Indian Logic—S. C. Vidyabhusana
14) Vedanta for the Western World—Isherwood and others
15) Indian Philosophy Vols. I—III—Maxmuller
16) The Discovery of India—J. Nehru
17) Studies in Jainism—Nathmal Tatia
18) Philosophy of Hindu Sādhanā—N. K. Brahma
19) Glossary of Philosophical Terms
20) Great Men of India (Home Library Club edn.)
21) Sarvadarshanasamgraha (Eng. Trans.)—Cowell and Gough (in Truberner's Oriental Series)
22) The Buddhist Philosophy of Universal Flux—Satkari Mookherjee
23) A Critical History of Greek Philosophy—Stace
24) History of Indian Philosophy, Vols I—II—S. K. Belvalkar and R. D. Ranade

25) Philosophies of India—Zimmer

26) Abhinavagupta : A Historical and Philosophical Study —K. C. Pande

27) Comparative Aesthetics Vol I—Indian Aesthetics (in the Chowkhamba Sanskrit Series Vol 2)—K. C. Pande.

বাংলা :—

(১) ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা—সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

(২) ভারতদর্শনসার—উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

(৩) হিন্দুদর্শন : ১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড—চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার (শ্রীগোপাল বসু মল্লিক, ফেলোশিপ লেক্‌চার)

(৪) ন্যায়দর্শন ১-৫ খণ্ড—ফণিভূষণ তর্কবাগীশ

(৫) ন্যায় পরিচয়— ঐ

(৬) প্রাচ্যবাণী গ্রন্থমালা ৫ম পুষ্প—যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ

(৭) দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা ১ম-৩য় খণ্ড—সন্তদাস ব্রজবিদেহী

(৮) প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস—প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

(৯) সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস—জাহ্নবীচরণ ভৌমিক

(১০) যোগপরিচয়—মহেন্দ্রনাথ সরকার

(১১) ন্যায়দর্শন—সুখময় ভট্টাচার্য

(১২) বৈশেষিক দর্শন—ঐ

(১৩) মীমাংসাদর্শন (১ম ও ২য় খণ্ড)—ভূতনাথ সপ্ততীর্থ

(১৪) বেদান্তদর্শন—রমা চৌধুরী

(১৫) মায়াবাদ—প্রমথনাথ শর্মা

(১৬) গ্রীকদর্শন—শুভব্রত রায়চৌধুরী

(১৭) আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শন—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

(১৮) লোকায়ত দর্শন— ঐ

(১৯) ভারতীয় সাধনার ঐক্য—শশিভূষণ দাশগুপ্ত

(২০) ভারতের অধ্যাত্মবাদ—নলিনীকান্ত ব্রহ্ম

(২১) ভারতের সংস্কৃতি—ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
(২২) প্রাচীন বাংলার গৌরব—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
(২৩) দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি—উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
(২৪) সর্বদর্শনসংগ্রহ (বঙ্গানুবাদ)—নরনাথ মুখোপাধ্যায়
(২৫) ঐ ঐ —জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন
(২৬) বেদান্তদর্শন ১ম খণ্ড : অদ্বৈতবাদ—আশুতোষ শাস্ত্রী
(২৭) ঐ ২য় খণ্ড — „
(২৮) ঐ ৩য় „ — „
(২৯) কিরণাবলী—গৌরীনাথ শাস্ত্রী
(৩০) বেদান্তদর্শনের ইতিহাস—প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী
(৩১) অভয়ের কথা—ক্ষেত্রমোহন মুখার্জী

সংস্কৃত :—

(১) সাংখ্যসূত্র—কপিল
(২) যোগসূত্র—পতঞ্জলি
(৩) ন্যায়সূত্র—গোতম
(৪) বৈশেষিকসূত্র—কণাদ
(৫) বেদান্তসূত্র (ব্রহ্মসূত্র)—বাদরায়ণ
(৬) মীমাংসাসূত্র—জৈমিনি
(৭) চার্বাকষষ্টি—দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী
(৮) ন্যায়কোশ—(ম.ম.) ঝাল্‌কীকর
(৯) সর্বদর্শনসংগ্রহ—মাধবাচার্য
(১০) তন্ত্রসিদ্ধান্তরত্নাবলী—অ.চিন্নস্বামী শাস্ত্রী

তিন

তন্ত্রশাস্ত্র[১]

'তন্ত্র' শব্দে কি বুঝায় ?

'তন্ত্র' পদটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'স্ব-তন্ত্র', 'পরতন্ত্র' প্রভৃতি শব্দে 'তন্ত্র' পদের অর্থ 'অধীন'। 'পঞ্চতন্ত্র' বলিতে পাঁচটি প্রসঙ্গ বা গল্পের সমষ্টিকে বুঝায়। 'তন্ত্রশাস্ত্র' দ্বারা আমরা সেই শাস্ত্রকেই বুঝিয়া থাকি যাহাতে রহস্যময় মণ্ডল, মুদ্রা, যন্ত্র, মন্ত্র, চক্র, সিদ্ধি প্রভৃতি বর্ণিত আছে ; কিন্তু, এস্থলে 'তন্ত্র' শব্দটির স্পষ্ট কোন অর্থ বুঝা যায় না। 'তন্ত্র' শব্দদ্বারা কখনও কখনও মতবাদ (theory বা doctrine) বুঝান হয় ; যেমন, প্রজাতন্ত্র, গণতন্ত্র ইত্যাদি। এই অর্থে তন্ত্রশাস্ত্রকে বলা যাইতে পারে যে, ইহা সেই শাস্ত্র যাহাতে বিশেষ মতবাদ উপস্থাপিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, তন্ত্রে যে সমস্ত বিষয় পাওয়া যায় উহারা বেদে বা বেদানুবর্তী অন্যান্য শাস্ত্রে আলোচিত হয় নাই। 'শতপথ-ব্রাহ্মণ' ও 'তাণ্ড্যব্রাহ্মণ' প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে 'তন্ত্র' পদটি প্রধান অংশ বা সারাংশ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। এমন হইতে পারে যে, তন্ত্রশাস্ত্র-প্রণেতৃগণ ইহাকে শাস্ত্রসমূহের সার বলিয়া মনে করিতেন।

বিস্তারার্থক তন্ ধাতু হইতে কেহ কেহ 'তন্ত্র' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করিয়াছেন—তন্যতে বিস্তার্যতে জ্ঞানমনেন ; অর্থাৎ, যাহাদ্বারা জ্ঞান বর্ধিত হয় তাহাই তন্ত্র।[২] এই অর্থে শাস্ত্রমাত্রকেই 'তন্ত্র' শব্দে অভিহিত করা হয় ; যেমন, সাংখ্যদর্শনের নাম কপিলতন্ত্র, ন্যায়দর্শনকে বলা হয় গোতমতন্ত্র ইত্যাদি।

শাক্ততন্ত্রগুলিকে দশমহাবিদ্যার নাম অনুসারে দশটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। ইহাদের মধ্যে 'ষোড়শীতন্ত্র' 'শ্রীবিদ্যা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

১. বর্তমান প্রসঙ্গে হিন্দুতন্ত্রই আমাদের প্রধান আলোচ্য, প্রসঙ্গতঃ বৌদ্ধতন্ত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র।

২. তনোতি বিপুলানর্থান্ তত্ত্বমন্ত্রসমন্বিতান্।
ত্রাণং চ কুরুতে যস্মাৎ তন্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥
কালিকাগম।

তন্ত্রশাস্ত্রের শ্রেণীবিভাগ

সাধারণভাবে 'তন্ত্রশাস্ত্র' দ্বারা আমরা যে শাস্ত্রকে বুঝিয়া থাকি, তাহাকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়; যথা (১) আগম, (২) সংহিতা ও (৩) তন্ত্র। ইহাদের পরস্পরের প্রভেদ খুব স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান না হইলেও, সাধারণতঃ শৈবগণের তন্ত্রশাস্ত্রকে 'আগম' নামে অভিহিত করা হয়, 'সংহিতা' বলিতে বুঝায় বৈষ্ণবতন্ত্রকে এবং শাক্ততন্ত্রকে শুধু 'তন্ত্র' বলা হয়।

সাধারণতঃ, তন্ত্রশাস্ত্রের বিষয়বস্তু শিব ও পার্বতীর কথোপকথন আকারে বর্ণিত হইয়া থাকে। যে গ্রন্থে দেবী শিষ্যার ন্যায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন এবং শিব শিক্ষকের ন্যায় প্রশ্নাবলীর উত্তর দেন, তাহাকে 'আগম' আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। আর, যে গ্রন্থে ইহার বিপরীত পদ্ধতি অনুসৃত হয় তাহাকে বলা হয় 'নিগম'।

হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্র ভেদে তন্ত্রশাস্ত্রের দ্বিবিধ বিভাগও করা হইয়া থাকে। তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে ভারতবর্ষকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়:—(১) বিষ্ণুক্রান্ত, (২) রথক্রান্ত ও (৩) অশ্বক্রান্ত (বা, গজক্রান্ত)। 'শক্তিমঙ্গলতন্ত্রে' এই অংশগুলির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে নিম্নলিখিত রূপে:—বিষ্ণুক্রান্ত—বিন্ধ্যপর্বত হইতে চট্টল (চট্টগ্রাম) পর্যন্ত, রথক্রান্ত—ঐ পর্বত হইতে মহাচীন পর্যন্ত (নেপাল সহ); অশ্বক্রান্ত—ঐ স্থান হইতে মহাসমুদ্র পর্যন্ত, অর্থাৎ, ভারতের অবশিষ্ট সমস্ত অংশ। এই স্থানগুলির সীমা সম্বন্ধে মতভেদও আছে। এই তিনস্থানে রচিত গ্রন্থগুলিকে তিনশ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে; অবশ্য, কোন্ গ্রন্থ কোন্ অঞ্চলে রচিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে মতান্তর দেখা যায়।

সদাগম ও অসদাগম ভেদে লোকপরম্পরায় তন্ত্রশাস্ত্রের দ্বিবিধ শ্রেণীবিভাগও আছে। গ্রন্থগুলির মধ্যে কোন্‌টি সৎ, কোন্‌টি অসৎ সেই সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও স্থূল কথা এই যে, যাহাতে আচার অনুযায়ী প্রকৃত পূজার্চনাই উদ্দেশ্য তাহাই সৎ; তদ্বিপরীত অসৎ।

আস্তিক এবং নাস্তিক ভেদেও তন্ত্রশাস্ত্রের দ্বিবিধ ভাগ করা হইয়া থাকে। এই দুই প্রকারের তন্ত্রকে যথাক্রমে বৈদিক এবং অবৈদিকও বলা হয়। বৌদ্ধ ও জৈন তন্ত্রগুলি নাস্তিকতন্ত্রের অন্তর্গত। আস্তিক তন্ত্রগুলিকে দেবতার প্রাধান্য

অনুযায়ী নিম্নলিখিতরূপেও বিভক্ত করা হইয়া থাকে—(১) শাক্ত, (২) শৈব, (৩) সৌর, (৪) গাণপত্য ও (৫) বৈষ্ণব।

তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তি

এই শাস্ত্র বর্তমানে বিপুল। কিন্তু, ইহার উৎপত্তিকাল অনিশ্চয়তার ঘন কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন। তন্ত্রের প্রাচীনতম নেপালী পুঁথিগুলির লিপিকাল খৃঃ সপ্তম হইতে নবম শতাব্দীর মধ্যে। 'মহাভারতের' অর্বাচীন অংশসমূহে ইতিহাস এবং পুরাণের উল্লেখ থাকিলেও তন্ত্রের কোন উল্লেখ নাই। ফা-হিয়েন (খৃঃ চতুর্থ শতক) ও হিউয়েন-সাং (খৃঃ সপ্তম শতক) প্রভৃতি চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণ তন্ত্রশাস্ত্রের উল্লেখ করেন নাই। সংস্কৃত সাহিত্যে তন্ত্রশাস্ত্রের স্পষ্ট উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় 'ভাগবতপুরাণে' (আঃ খৃঃ ১০ম শতক)।[১] এই সমস্ত কারণে, ভিণ্টারনিৎস্ প্রমুখ পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, মূল তন্ত্রগুলি সম্ভবতঃ খৃঃ পঞ্চম কি ষষ্ঠ শতকের পূর্বেকার রচনা নহে। তন্ত্রশাস্ত্রকে যাঁহারা অবাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, তাঁহারা অন্যান্য যুক্তির মধ্যে একটি যুক্তি দেখাইয়া থাকেন যে, বিখ্যাত অভিধান 'নামলিঙ্গানুশাসনে' শাস্ত্রার্থক তন্ত্রশব্দের উল্লেখ নাই।

এই সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, অথর্ববেদের উল্লেখ উক্ত অভিধানে নাই বলিয়া অথর্ববেদকে অমরসিংহের পরবর্তী কালের রচনা বলা চলে না।

তন্ত্রশাস্ত্রের প্রাচীনত্ব[২] প্রমাণ করিতে যাইয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ঋগ্বেদের দেবীসূক্তের (১০।১২৫) ঋকৃগুলিতে দুর্গাদেবীরই প্রচ্ছন্ন উল্লেখ রহিয়াছে এবং এই দুর্গা তন্ত্রশাস্ত্রের প্রধান দেবী শক্তি বা কালীর পূর্ববর্তী রূপ। তাঁহারা আরও বলেন যে, অথর্ববেদোক্ত ইন্দ্রজাল ও অভিচারাদি প্রক্রিয়া পরবর্তী তান্ত্রিক বিদ্যারই অগ্রদূত[৩]। তন্ত্রশাস্ত্রের প্রাচীনত্বের সমর্থনে অপর এক যুক্তি এই যে, 'মার্কণ্ডেয়' ও 'লিঙ্গ' প্রভৃতি পুরাণে তন্ত্রের প্রভাব সুস্পষ্ট। 'বরাহ', 'পদ্ম', 'স্কন্দ,' 'ব্রহ্ম' ইত্যাদি পুরাণে তন্ত্রের উল্লেখ রহিয়াছে। শঙ্করাচার্য

১. দ্রষ্টব্য— A History of Indian Literature, I (Winternitz), পৃঃ ৫৫৬।

২. এই সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য যাদবেশ্বর তর্করত্ন-রচিত প্রবন্ধ 'তন্ত্রের প্রাচীনত্ব'—সাহিত্য-সংহিতা, আশ্বিন, ১৩১৭।

৩. অথর্ববেদের 'নৃসিংহতাপনীয়োপনিষদ্' তন্ত্রগ্রন্থেরই ন্যায়। শঙ্করাচার্য ইহার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন।

(খৃঃ ৮ম-৯ম শতক) তৎকৃত 'আনন্দলহরী' ও 'শাক্তামোদ'-এ তন্ত্রকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। 'শারীরকভাষ্যে' শঙ্কর তান্ত্রিক ষট্‌চক্রের উল্লেখ করিয়াছেন। মাধবাচার্য (খৃঃ চতুর্দশ শতক) 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' পাতঞ্জলদর্শন প্রসঙ্গে তন্ত্রশাস্ত্রের বহু পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

তন্ত্রশাস্ত্রকে যাঁহারা নিতান্ত অর্বাচীন ও অপ্রামাণিক বলিয়া গণ্য করেন তাঁহাদের যুক্তি প্রধানতঃ নিম্নলিখিতরূপ ঃ

(১) প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের ন্যায় তন্ত্র ভারতের সর্বত্র প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। তন্ত্রশাস্ত্র আর্যগণের সৃষ্ট নহে ; ইহা অনার্য আদিম অধিবাসিগণের প্রভাবে বঙ্গদেশেই রচিত হইয়াছিল এবং বঙ্গেই ইহার প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে।

(২) বৌদ্ধগণের মহাযান সম্প্রদায়ের মধ্যে তারা, বজ্রযোগিনী প্রভৃতি দেবীর পূজা এবং মন্ত্র, বীজ ও জপ ইত্যাদির প্রচলন আছে। তান্ত্রিকগণের মধ্যেও অনুরূপ পূজা ও মন্ত্রাদির প্রচলন হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, বৌদ্ধ মহাযান ধর্ম হইতেই তন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল।

(৩) অনার্য আদিম অধিবাসিগণের মধ্যে শক্তি, ভূতপ্রেত, সর্প ও বৃক্ষাদি পূজার প্রচলন হইতে মনে হয়, তাহাদের প্রভাবেই অনুরূপ বিষয়বস্তু আলোচিত হইয়াছিল তন্ত্রশাস্ত্রে।

(৪) তন্ত্রগুলির অর্বাচীনত্বের প্রমাণ 'যোগিনীতন্ত্রে'ই রহিয়াছে। ইহাতে (১৩।১৪) কোচবিহার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিষ্ণুসিংহ বা বেণুসিংহের কথা আছে, এই রাজত্ব বিগত তিনশত বৎসরের পূর্বে স্থাপিত হয় নাই।

এই যুক্তিসমূহের বিরুদ্ধযুক্তিও আছে। একথা যথার্থ নহে যে, বাংলা দেশের বাহিরে তন্ত্রের প্রামাণিকত্ব স্বীকৃত হয় নাই। বাংলা দেশের ন্যায়, ভারতের অনেক প্রদেশেই উচ্চবর্ণের অধিবাসিগণ শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্তভেদে বিভক্ত। এই ত্রিবিধ মন্ত্রসমূহই তান্ত্রিক। মহাযান বৌদ্ধধর্মের সহিত তন্ত্রের সাদৃশ্য আছে বলিয়াই যদি বলা হয় যে শেষোক্ত ধর্ম পূর্বোক্ত ধর্ম হইতে উদ্ভূত, তাহা হইলে, অনুরূপ যুক্তিবলে ইহাও বলা যায় যে, মহাযান ধর্মই তন্ত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম ও তন্ত্রধর্মের কতকগুলি মৌলিক প্রভেদের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে, বৌদ্ধধর্ম তন্ত্রের জনক হইতে পারে না। বৌদ্ধমতে

নিষ্কাম কর্মের উপদেশ আছে, কিন্তু তন্ত্রে সকাম কর্মের নির্দেশ রহিয়াছে। তন্ত্রে অধিকারিভেদে বিভিন্নপ্রকার ধর্মোপদেশ আছে, কিন্তু বৌদ্ধধর্মে অধিকারিভেদের বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই। বৌদ্ধধর্মে পশুবলি প্রভৃতি হিংসাত্মক কর্ম গর্হিত বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু তন্ত্রে ছাগ ও মহিষাদির বলির ব্যবস্থা আছে। আদিম অধিবাসী বলিতে অর্বাচীনত্ববাদিগণ কি বুঝাইতে চাহেন তাহা স্পষ্ট নহে। আর্যেতর জাতিগণের মধ্যে ভারত অধ্যুষিত ছিল দ্রাবিড়, ওড্র, পৌণ্ড্রিক প্রভৃতি জাতি দ্বারা। ইঁহারা দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী ছিলেন। বাংলার পণ্ডিতসমাজ তাহাদের প্রভাবে তন্ত্রশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, একথা বলিলে বাঙ্গালী পণ্ডিতের প্রতিভার অবমাননা করা হয়। অপর প্রকার আদিম অধিবাসী ছিল আসামের পার্বত্য অঞ্চলে ; ইহারা ছিল সাঁওতাল, গারো, কোচ প্রভৃতি অসভ্য জাতি। যে বাঙ্গালী পণ্ডিত ভারতের অপর প্রদেশসমূহে মান্য 'মিতাক্ষরা'কে স্বীকার না করিয়া নিজেই 'দায়ভাগ' রচনা করিয়া লইয়াছিল, সেই স্বাধীনচেতা বাঙ্গালী যে উক্ত জাতিগণের নিকট হইতে তন্ত্রশাস্ত্র স্বীকার করিয়া লইয়াছে, এই কথা বলিলে ইতিহাসকে ও বাঙ্গালী চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করা হয়। শক্তি-দেবতা বিভিন্ন নামে ও রূপে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহুকাল পূর্ব হইতে পূজিত হইয়া আসিতেছে ; যথা—কামরূপে কামাখ্যা, নেপালে গুহ্যেশ্বরী, বিন্ধ্যদেশে বিন্ধ্যবাসিনী, জলন্ধরে জ্বালামুখী, কাশীতে চৌষট্টি যোগিনী ও অন্নপূর্ণা প্রভৃতি। সুতরাং তন্ত্রোক্ত শক্তিপূজা অর্বাচীন বা বঙ্গদেশোদ্ভূত এই মত নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায় না। তন্ত্রপ্রভাবিত দুর্গাপূজা শুধু এই দেশেই প্রচলিত নহে। দুর্গাপূজা ও ইহার নামান্তর নবরাত্রব্রত অন্যান্য স্থানেও প্রচলিত। সুদূর গোবর্ধন পর্বতেও মনসাদেবীর মূর্তি আছে ; অতএব সর্পপূজা যে শুধু বাংলা-দেশেই প্রচলিত তাহা নহে। 'যোগিনীতন্ত্র' সম্বন্ধে রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের অষ্টা-বিংশতিতত্ত্বে ও কৃষ্ণানন্দের 'তন্ত্রসারে' উল্লেখ আছে। এই স্মার্ত ও তান্ত্রিক খৃঃ ষোড়শ শতকের লেখক ; অতএব 'যোগিনীতন্ত্র' বিগত তিনশত বৎসরের পূর্বে রচিত হইতে পারে না—এইরূপ ধারণা ভ্রান্ত। এই গ্রন্থে কোচবিহার রাজবংশের উল্লেখ পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে।

উল্লিখিত যুক্তি ও প্রতিযুক্তিসমূহ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে,

তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তিকাল নিশ্চিতভাবে নিরূপণ করার কোন উপায় নাই। এই শাস্ত্রকে অতি প্রাচীন বা অতি অর্বাচীন বলিবার পক্ষে কোন নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ নাই। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বলিতে হইবে যে, তন্ত্রশাস্ত্রের বয়স যতই হউক না কেন, কোন কোন তন্ত্রগ্রন্থ বা তাহাদের অংশবিশেষ অতি আধুনিক কালে রচিত। নিদর্শন স্বরূপ 'মেরুতন্ত্র' নামক তন্ত্র হইতে নিম্নলিখিত পংক্তি কয়টি উদ্ধৃত করা যায়ঃ—

ফিরঙ্গভাষয়া মন্ত্রাস্তেষাং সংসাধনাদ্ভুবি।
ইংরেজা নবষট্‌পঞ্চ **লণ্ড্রজাশ্চাপি** ভাবিনঃ॥

'ফিরঙ্গ', 'ইংরেজ', 'লণ্ড্র' (London) প্রভৃতি শব্দ হইতে মনে হয়, এই গ্রন্থ বা অন্ততঃ এই অংশটি খৃঃ অষ্টাদশ শতকের পূর্বে রচিত হয় নাই। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। অদ্যাবধি প্রাপ্ত তন্ত্রগুলি ছাড়া যে প্রাচীনতর তন্ত্রগ্রন্থ ছিল না তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। আমরা এটুকু বলিতে পারি যে, তন্ত্রে যে-ধরণের বিশ্বাস ও আচার প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা বৈদিক যুগে এবং বৌদ্ধ যুগে কিয়ৎপরিমাণে প্রচলিত ছিল; যদিও শাস্ত্রাকারে রচিত সে যুগের কোন তন্ত্রগ্রন্থ আমরা পাই নাই।

স্বর্গত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে, ভারতীয় অক্ষরমালার 'ব্রাহ্মী' এবং 'দেবনাগরী' নামে তন্ত্রের প্রভাব রহিয়াছে। অষ্ট মাতৃকার এক মাতৃকা 'ব্রাহ্মী', তাঁহারই নামে উক্ত লিপির ব্রাহ্মী নাম হইয়াছে বলিয়া তিনি মনে করেন। বিদ্যানিধি মহাশয় মনে করেন যে, পুরাকালে দেবীর চিত্রিত চিহ্নের পূজার প্রথা ছিল। এক প্রকার চিহ্ন ছিল দেবনাগর অর্থাৎ দেবের বাসস্থান-চক্র, ইহা হইতেই 'দেবনাগরী' লিপির ঐরূপ নাম হইয়াছিল।

তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তিস্থল

তন্ত্রশাস্ত্রের 'আগম' শ্রেণীর ও 'তন্ত্র' শ্রেণীর গ্রন্থের প্রথম উদ্ভব হয় সম্ভবতঃ যথাক্রমে কাশ্মীরে ও বঙ্গদেশে। 'সংহিতা' শ্রেণীর গ্রন্থের উৎপত্তি হইয়াছিল

বঙ্গ ও দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি ভারতের নানাস্থানেই। কেহ কেহ মনে করেন যে, তন্ত্রশাস্ত্রের মূলতত্ত্বগুলি ভারত পাইয়াছে চীনদেশ হইতে। কিন্তু, পণ্ডিতপ্রবর উড্‌রফ (Arthur Avalon) এই মত সমর্থন করেন না।

তন্ত্রশাস্ত্রের গ্রন্থাবলী

তন্ত্রশাস্ত্রের গ্রন্থ অসংখ্য। যে সমস্ত গ্রন্থ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ছাড়াও পুঁথি আকারে বহু তন্ত্রগ্রন্থ নানাস্থানে রহিয়াছে।[১] বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা শুধু প্রধান ও বিখ্যাত গ্রন্থগুলিরই উল্লেখ করিব।

কাশ্মীরের আগমশাস্ত্রের প্রধান গ্রন্থ :—

(১) মালিনীবিজয়,
(২) স্বচ্ছন্দ,
(৩) বিজ্ঞানভৈরব,
(৪) উচ্ছুষ্মভৈরব,
(৫) আনন্দভৈরব,
(৬) মৃগেন্দ্র,
(৭) মতঙ্গ,
(৮) নেত্র,
(৯) নৈশ্বাস,
(১০) স্বায়ম্ভুব,
(১১) রুদ্রযামল।

আগম সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত প্রত্যভিজ্ঞা সাহিত্য। শেষোক্ত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহের নাম নিম্নে লিখিত হইল :—

(১) শিবদৃষ্টি (সোমানন্দকৃত),
(২) প্রত্যভিজ্ঞাকারিকা (উৎপলরচিত),
(৩) মালিনীবিজয়োত্তরবার্তিক,
(৪) প্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিনী,
(৫) তন্ত্রালোক,
(৬) তন্ত্রসার,
(৭) পরমার্থসার,
(অভিনবগুপ্তকৃত)
(৮) প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয় (অভিনবগুপ্ত-শিষ্য ক্ষেমরাজ কর্তৃক রচিত)

১. ভারতে ও অন্যান্য দেশে রক্ষিত সংস্কৃত পুঁথিসমূহের তালিকাতে এই শাস্ত্রের অসংখ্য পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায়।

সংহিতাশ্রেণীর প্রধান প্রধান গ্রন্থ নিম্নলিখিতরূপ :—

(১) অহির্বুধ্ন্যসংহিতা,
(২) ঈশ্বর "
(৩) পৌষ্কর "
(৪) পরম "
(৫) সাত্বত "
(৬) বৃহদ্ব্রহ্ম "
(৭) জ্ঞানামৃতসার "।

তন্ত্রশ্রেণীর গ্রন্থসমূহের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

(১) মহানির্বাণ,
(২) কুলচূড়ামণি,
(৩) তন্ত্ররাজ,
(৪) কালীবিলাস,
(৫) শারদাতিলক,
(৬) জ্ঞানার্ণব,
(৭) প্রাণতোষিণী,
(৮) বরিবস্যারহস্য,
(৯) কুলার্ণব,
(১০) প্রপঞ্চসার (শঙ্করকৃত)।

'বারাহীতন্ত্রে' ৫৪টি তন্ত্রের নাম আছে।

মূলগ্রন্থ ছাড়াও তন্ত্রশাস্ত্রের সারসংকলন, টীকা ও অভিধানাদি অনেক আছে; যথা, 'প্রাণকৃষ্ণশব্দাম্বুধি', 'তন্ত্রাভিধান', 'মন্ত্রকোষ' ইত্যাদি। কৃষ্ণানন্দের 'তন্ত্রসার' বর্তমানে সবিশেষ প্রামাণ্য ও আদৃত। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ছিলেন নবদ্বীপের বিখ্যাত তান্ত্রিক ; তিনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের লেখক।

বৈদিক ধর্ম ও তান্ত্রিক ধর্ম

কেহ কেহ মনে করেন যে, তান্ত্রিক ধর্ম বেদবিরোধী। ইহা বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, পরবর্তী যুগে তন্ত্রে যাঁহাকে বলা হইয়াছে শক্তি, তাঁহারই আদিম রূপের পরিচয় পাওয়া যায় 'ঋগ্বেদে'র দেবী-সূক্তে। এই সম্বন্ধে অবশ্য সকলে একমত নহেন। তন্ত্রশাস্ত্রের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিতে যাঁহারা ব্যগ্র তাঁহারা বলিয়াছেন যে, অথর্ববেদের ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা ও অভিচারাদি ক্রিয়াতেই তন্ত্রোক্ত অনেক বস্তুর বীজ উপ্ত হইয়াছিল।

উপনিষদের অনেক তত্ত্বের সঙ্গে কিন্তু তন্ত্রের মূলতত্ত্বগুলির সাদৃশ্য স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। উপনিষদের সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবাদের ধারণা 'মহানির্বাণতন্ত্রে'র দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনেক শ্লোকে পাওয়া যায়। উপনিষদের যিনি সগুণ ব্রহ্ম তিনিই ঈশ্বর। সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও সংহারকর্তা—এই তিন রূপ তাঁহারই। উক্ত তন্ত্রের অনেক শ্লোকে অনুরূপ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে।

যাঁহারা তন্ত্রের প্রাচীনত্বে আস্থাবান্, তাঁহারা ইহাকে পঞ্চম বেদ বলেন এবং বেদ অপেক্ষা ইহার প্রামাণিকত্ব কম বলিয়া মনে করেন না।[১] কেহ কেহ মনে করেন যে, বাস্তবজীবনে প্রয়োগার্হ বৈদিক আচার অনুষ্ঠানই তন্ত্রের বিষয়-বস্তু; ইঁহাদের মতে তন্ত্র মূল বেদবৃক্ষের শাখাস্বরূপ। বৈদিক ও তান্ত্রিক ধর্মের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়ে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, পুষ্পে গন্ধের ন্যায় বেদে তন্ত্র অন্তর্নিহিত হইয়া আছে। বৈদিক অনুষ্ঠানাদিকে তন্ত্র বর্জন করে নাই, সংক্ষিপ্ত ও অনায়াসসাধ্য করিয়াছে মাত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বৈদিক যজ্ঞের হোমকে তন্ত্রও স্বীকার করে, কিন্তু বেদের ন্যায় হোমের বহিরঙ্গের উপর তন্ত্র তেমন জোর দেয় না। তন্ত্রে হোমের অন্তর্নিহিত অর্থ আত্মসমর্পণের উপরই জোর বেশী।

'মনুস্মৃতি'র প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ব্যাখ্যাতা কুল্লুকভট্ট তন্ত্রকে শ্রুতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া বৈদিকী ও তান্ত্রিকী ভেদে শ্রুতিকে দ্বিবিধা বলিয়াছেন।

তন্ত্রে বিজ্ঞান[২]

তন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সমস্তই তন্ত্রকারগণের স্বকপোলকল্পিত ও রহস্যময় এবং বাস্তবজীবনের সহিত ইহাদের কোন যোগ নাই—এইরূপ ধারণা অনেকে পোষণ করেন। কিন্তু, বর্তমান বিজ্ঞানপ্রধান যুগে জনসাধারণের বুদ্ধির অগোচর অনেক বস্তু ও তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং হইতেছে। বিজ্ঞানী মন লইয়া যাঁহারা তন্ত্রোক্ত তত্ত্বসমূহের সার উপলব্ধি করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন,

---

১. দ্রঃ—A. Avalon : *Principles of Tantra*, p. 41.

২. বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য B. Bhattacharya লিখিত প্রবন্ধ Scientific Background of the Buddhist Tantras (*Indian Historical Quarterly*, XXXII, Nos 2 & 3, পৃঃ ২৯০-২৯৬)। এই প্রবন্ধ অবলম্বনে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ লিখিত হইল।

তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তন্ত্রের অনেক বিষয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সন্ধান পাইয়াছেন।

দূর-দর্শন, দূর-শ্রবণ ও দূর-চিকিৎসা প্রভৃতি 'সিদ্ধি' তান্ত্রিক সাধনাবলে লাভ করা যায়—ইহা কোন কোন তন্ত্রে বলা হইয়াছে। বর্তমানে আমরা টেলিভিসন্ (television), রেডিও ও টেলিথেরাপি (teletherapy) প্রভৃতির সাহায্যে যাহা করিতে পারি, উল্লিখিত সিদ্ধিসমূহ দ্বারা তাহাই সাধিত হইতে পারিত বলিয়া মনে হয়।

তন্ত্রে প্রতি দেবতারই একটি বিশিষ্ট বর্ণ আছে; ধ্যানী বুদ্ধগণ কোন না কোন বিশেষ বর্ণবিশিষ্ট। সৃষ্টি সম্বন্ধে বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণের শূন্যবাদ ও উল্লিখিত বর্ণসমূহের জ্ঞান হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে, জড়জগতের আদিম অবস্থায় আলোকরশ্মি ও তাহার বিকিরণ সম্বন্ধে তান্ত্রিকগণ সচেতন ছিলেন। সুতরাং বর্তমানে আমরা যাহাকে 'কস্মিক্ রে' (cosmic ray) বলি, তাহা তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল না।

তন্ত্রের একাক্ষরাত্মক বীজমন্ত্রগুলির গূঢ় তাৎপর্য আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, 'লং' মন্ত্রে বুঝায় পঞ্চভূতের ক্ষিতি বা পৃথিবীকে; 'বং' মন্ত্র অপ্ বা জলবোধক।

পুরাণ ও তন্ত্র

পূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, বহু পুরাণগ্রন্থে, বিশেষতঃ 'ভাগবতপুরাণে', তন্ত্রের গভীর প্রভাব বিদ্যমান। আবার ইহাও লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, পুরাণের দ্বারাও তন্ত্র অনেক পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছিল। তন্ত্রে মন্ত্র ও কবচ-বহুল দেবদেবীর উপাসনা পৌরাণিক উপাসনাপদ্ধতিরই অনুরূপ। তবে এই দুই প্রকারের উপাসনার মধ্যে প্রভেদও স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। তান্ত্রিক উপাসক যে দেবদেবীর উপাসনা করেন, তাঁহাদের সহিত নিজেকে অভিন্ন কল্পনা করিয়া নেন; কিন্তু পৌরাণিক উপাসক এই অভেদ-কল্পনা কখনও করিতে পারেন না—দেবতার অসীমত্ব ও নিজের সসীমত্বকে তিনি বিস্মৃত হইতে পারেন না।

তন্ত্র ও বেদান্ত

তন্ত্রমতে কুণ্ডলিনী শক্তি বাহ্য পদার্থ নহে। ইহা আধ্যাত্মিক শক্তি;

মানুষের মধ্যে ইহা সুপ্তাবস্থায় অবস্থান করে। সাধনা দ্বারা ইহাকে জাগ্রত করিয়া মানুষ সেই স্তরে পৌছিতে পারে যেখানে তাহার মানব-সত্তা দেব-সত্তাতে পরিণত হয়। তখনই জীব শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। এই মত পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার একত্ব লাভ করারই ন্যায়; শেষোক্ত মত উপনিষদের। কিন্তু বেদান্ত ও তন্ত্রের মধ্যে প্রভেদ এই যে, বেদান্তমতে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় শুধু ভাবনা; কিন্তু তন্ত্রমতে শিবত্ব লাভ করিতে হইলে আবশ্যক ভাবনা এবং ক্রিয়া। মানসিক বা আধ্যাত্মিক শক্তির সহিত দৈহিক প্রচেষ্টাও তন্ত্রমতে প্রয়োজনীয়। জীবের শিবত্বকে বেদান্ত শাশ্বত সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে; কিন্তু তন্ত্র বলিয়াছে যে, বিশেষ ক্রিয়াসমূহের দ্বারাই শিবত্ব লব্ধ হইতে পারে।

তন্ত্র ও সাংখ্য

কাহারও কাহারও ধারণা, তান্ত্রিক ধর্ম সাংখ্যদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং, এই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। 'পুরুষ' ও 'প্রকৃতি' শব্দ দুইটি সাংখ্য ও তন্ত্র এই উভয় শাস্ত্রেই প্রযুক্ত হইয়াছে; ইহাই সম্ভবতঃ উক্ত ধারণার মূল কারণ। কিন্তু সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি এবং তন্ত্রের পুরুষ-প্রকৃতির মধ্যে প্রভেদ যথেষ্ট। সাংখ্যের পুরুষ তন্ত্রের শিবের ন্যায় বিশ্বের পরমাত্মা নহেন; তিনি অখণ্ড, অনন্ত ও শাশ্বত ব্রহ্ম নহেন। সাংখ্যমতে, পুরুষ বহু ও জীবভেদে পুরুষের ভেদ স্বীকৃত হয়। প্রকৃতির অধিষ্ঠাতৃরূপে মূল প্রকৃতির সহিত তিনি অবস্থান করেন বটে, কিন্তু নিজে নিষ্ক্রিয়; কিছুই সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতি সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন করেন; পুরুষ সেই সৃষ্টি কার্যের স্থির দ্রষ্টা। সাংখ্যের মূল প্রকৃতি হইতে তন্ত্রের শক্তি বা পরাপ্রকৃতি ভিন্ন। তন্ত্রের পরাপ্রকৃতি পরমেশ্বরের ঐশী শক্তি; 'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে' ইত্যাদি দ্বারা উপনিষদ ইহাকেই ব্রহ্মের পরমা শক্তি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে।

তন্ত্র অনেকাংশে উপনিষদের দর্শনের অনুগামী। উপনিষদের ন্যায় তন্ত্রের মতেও সৃষ্টি পরম পুরুষের লীলামাত্র; সৃষ্টিকালে পুরুষ ও প্রকৃতি যুগপৎ আবির্ভূত হইয়া থাকেন এবং তাঁহাদের সত্তা পরম পুরুষকে আশ্রয় করিয়া থাকে। প্রলয়কালে তাঁহারা পুনরায় অনাদি ব্রহ্ম বা ঈশ্বরেই লয়প্রাপ্ত হন। সাংখ্য দর্শনের

মতে সৃষ্টির মূলে জড়া প্রকৃতি ; ইনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা—পুরুষের সহিত সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতি হইতে মহদাদি ক্রমে সৃষ্ট তত্ত্বসমূহের অভিব্যক্তি হয়, আবার প্রলয়কালে প্রকৃতিতেই সৃষ্টবস্তু বিলীন হয়, প্রকৃতি শাশ্বতী। কিন্তু তন্ত্রমতে 'নিষ্কল' পরব্রহ্ম হইতে পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েরই অভিব্যক্তি ঘটে। প্রকৃতি ব্রহ্মের সৃজনী শক্তি, এই শক্তিযুক্ত ব্রহ্মকেই 'সকল' ব্রহ্ম বলা হয়। 'সকল' ব্রহ্ম ও তদীয় শক্তি একান্তভাবে ভিন্ন পদার্থ নহেন। এই 'সকল' ব্রহ্মকে পুরুষ এবং তাঁহার শক্তিকে প্রকৃতি বলা হয়। এই পুরুষ (শিব) ও প্রকৃতির (শক্তি) মিলন না হইলে সৃষ্টি অসম্ভব।

সাংখ্যদর্শন দ্বৈতবাদের অনুকূল ; কিন্তু তন্ত্রের পুরুষ ও প্রকৃতি এক অনাদি অনন্ত ব্রহ্মেরই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। অতএব, উপনিষদের ন্যায় তন্ত্র অদ্বৈতবাদী।[১] নির্গুণ নিষ্কল পরব্রহ্মের সহিত একাত্মতা লাভই তান্ত্রিক উপাসনার চরম লক্ষ্য।

সাংখ্য হইতে তন্ত্রের অপর একটি পার্থক্য এই যে, সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী[২], কিন্তু তান্ত্রিক ধর্ম ঈশ্বরবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। সাংখ্যমতে সৃষ্টির নিমিত্তকারণ প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ ; পুরুষ নিষ্ক্রিয়। উঁহার সহিত সংযোগের ফলে জড়া ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সাম্যাবস্থা হইতে বিচ্যুতি ঘটে এবং প্রকৃতি সৃষ্টিকার্যোন্মুখী হন। কিন্তু তন্ত্রমতে সৃষ্টি সগুণ ব্রহ্মের লীলা। ব্রহ্ম এবং তাঁহার প্রকৃতি অভিন্ন—সুতরাং, প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা হইলেও জড়া নহেন। তিনি চৈতন্যরূপিণী এবং তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই সগুণ ব্রহ্ম (ঈশ্বর) জগৎ-প্রপঞ্চরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

তন্ত্র ও বৌদ্ধধর্ম

বৌদ্ধধর্মের যে মূলনীতি অহিংসা পরম ধর্ম, ইহার সহিতই তন্ত্রের ঘোর বিরোধ। তন্ত্রমতে এই নীতি অসার ; কারণ, হিংসা না হইলে জীবনধারণ সম্ভবপর হয় না। মানুষের প্রাণধারণের জন্য যে খাদ্য অপরিহার্য, সেই খাদ্যই

১. কোন কোন অপেক্ষাকৃত অপ্রসিদ্ধ তন্ত্রে দ্বৈতবাদ স্বীকৃত হইয়াছে, যথা, 'মৃগেন্দ্রতন্ত্র' (২।১১)।

২. ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ—সাংখ্যসূত্র, ১।৯২।

জীব। পশুবধ প্রত্যক্ষ হিংসা। কিন্তু, বৃক্ষের ফল সংগ্রহ করিলেও উহার প্রতি হিংসাই করা হয়। গোদুগ্ধ পান করিলেও গোবৎসের প্রতি হিংসা করা হয়। এইভাবে দেখা যায়, আত্মরক্ষা হিংসা ব্যতিরেকে হইতে পারে না।

তন্ত্রের বিষয়বস্তু

পূর্বে দেখিয়াছি, তন্ত্রশাস্ত্র বিপুল ও তন্ত্রগ্রন্থ অসংখ্য। বর্তমান ক্ষুদ্র গ্রন্থের পরিসরে এই শাস্ত্রোক্ত প্রত্যেকটি বিষয়ের বা প্রতিটির তন্ত্রগ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা অসম্ভব। সুতরাং, তন্ত্রশাস্ত্রে আলোচিত প্রধান প্রধান বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া যাইতেছে। প্রধান বিষয়গুলি এইরূপ— :

(১) তন্ত্রের উৎপত্তি ও স্বরূপ,

(২) সৃষ্টিতত্ত্ব—শিব ও শক্তি,

(৩) দেহতত্ত্ব ও মানব প্রকৃতি,

(৪) আচার,

(৫) সাধনা—পঞ্চতত্ত্ব,

(৬) সিদ্ধি,

(৭) মন্ত্র,

(৮) যোগ,

(৯) গুরু ও শিষ্য— দীক্ষা এবং অভিষেক।

(১) তন্ত্রের উৎপত্তি ও স্বরূপ

অধিকাংশ হিন্দুশাস্ত্রের ন্যায় তন্ত্রশাস্ত্রেরও উদ্ভব অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়। অনেক তন্ত্রগ্রন্থেই ইহাদের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে শিব ও শক্তির কথোপকথন হইতে ; কখনও শিব বক্তা, শক্তি শ্রোত্রী, কখনও বা ইহার বিপরীত। নিদর্শন স্বরূপ 'মহানির্বাণতন্ত্রে'র উল্লেখ করা যাইতে পারে ; ইহাতে শিব গুরু ও শক্তি তাঁহার শিষ্যা।

অনেকের একটা ভ্রান্ত ধারণা এই যে, তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য সমস্ত বিষয়ই ধর্মশাস্ত্রাদির বিষয়বস্তু হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে. সনাতন হিন্দুধর্মের মুখ্য বিষয়গুলি তন্ত্রও মানিয়া লইয়াছে। অন্যান্য শাস্ত্র অনুযায়ী

মানুষের যাহা চরম লক্ষ্য ও পরম কাম্য তন্ত্রও তাহাকেই স্বীকার করে ; প্রভেদ শুধু পদ্ধতির। অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় তন্ত্রের মতেও পুরুষার্থ চারিটি—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ; প্রথম তিনটি প্রবৃত্তিমার্গে, শেষটি নিবৃত্তিমার্গে। তন্ত্রানুসারেও মোক্ষ বা মুক্তি হইতেছে ব্রহ্মপ্রাপ্তি। সর্বপ্রকার আসক্তিহীন জীবন্মুক্তিবাদকে তন্ত্রও স্বীকার করিয়াছে ।

হিন্দুশাস্ত্রের অপরাপর শাখার ন্যায় তন্ত্রশাস্ত্রেও পাপপুণ্যের কথা আছে এবং পাপ ও পুণ্যের স্বরূপ সর্বত্রই একই প্রকারের। বিহিত কর্মের অননুষ্ঠান ও নিন্দিত কর্মে প্রবৃত্তিই পাপের জনক। পাপ দুঃখজনক ও পুণ্য আনন্দজনক। অন্যান্য শাস্ত্রের মত তন্ত্রও কর্মবাদকে স্বীকার করে। পূর্বজন্মার্জিত কর্মানুযায়ী মানুষের ইহজগতে প্রকৃতি ও রুচি গঠিত হয় এবং ইহলোকে অনুষ্ঠিত কর্মের দ্বারা পরজন্ম নিয়ন্ত্রিত হয়। কর্মপাশের ছেদনই জীবের মুক্তির উপায়।

যে বর্ণাশ্রমধর্মের ভিত্তিতে হিন্দুসমাজ প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে তন্ত্র অস্বীকার করে নাই। তন্ত্রের বৈশিষ্ট্য শুধু এই যে, বৈদিক ধর্মের সীমাবদ্ধভাব ইহাতে নাই। স্ত্রী, শূদ্র, এমন কি চণ্ডাল এবং যবনেরও তান্ত্রিক দীক্ষায় কোন বাধা নাই।

যে বেদের ভিত্তিতে হিন্দুশাস্ত্র যুগ যুগ ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেই বেদকে তন্ত্রও মূলশাস্ত্র বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। তন্ত্রগ্রন্থসমূহে বলা হইয়াছে যে, সত্য-যুগে প্রামাণ্য ছিল শ্রুতি (=বেদ উপনিষদ প্রভৃতি), ত্রেতায় স্মৃতি, দ্বাপরে পুরাণ এবং কলিতে তন্ত্র।[১] কলিযুগে মানুষের আয়ুষ্কাল এবং শারীরিক ও মানসিক শক্তির হ্রাস হইয়াছে বলিয়া বৈদিক কর্মকাণ্ডোক্ত অনুষ্ঠানাদি দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং, সহজ ভাবে মানবজীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপায় তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

তন্ত্রশাস্ত্রকে তান্ত্রিকগণ অতিশয় গুহ্য বলিয়া মনে করেন। তান্ত্রিক সাধকের নিকট তাঁহার তন্ত্র-সাধনা ও বীজমন্ত্রাদি 'মাতৃজারবৎ গোপনীয়'।

১. কৃতে শ্রুত্যুক্ত আচারস্ত্রেতায়াং স্মৃতিসম্ভবঃ।
দ্বাপরে তু পুরাণোক্তং কলৌ আগমঃ কেবলম্॥
—কুলার্ণবতন্ত্র।
'মহানির্বাণতন্ত্র' এবং অন্যান্য তন্ত্রগ্রন্থেও অনুরূপ উক্তি আছে।

(২) শিব ও শক্তি

পরব্রহ্ম অনাদি ও অবিকারী। তিনি একাধারে নিষ্কল এবং স-কলঃ; 'কলা' শব্দে প্রকৃতিকে বুঝায়। ব্রহ্মের শক্তি 'অনাদি-রূপা' ও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। ব্রহ্মরূপা শক্তি নির্গুণা এবং সগুণা। চৈতন্যরূপিণী দেবীস্বরূপে তিনি ভূতজাতকে প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং আনন্দরূপিণী দেবীস্বরূপে তাঁহার দ্বারা ব্রহ্ম নিজেকে ব্যক্ত করেন।[২] তিলে তৈলের ন্যায় বিশ্বে শক্তি পরিব্যাপ্তা। ব্রহ্ম-শক্তি হইতে উদ্ভূত হইল নাদ; নাদ হইতে হইল বিন্দুর সৃষ্টি।[৩] দেবীকে 'মূলমন্ত্রাত্মিকা' যখন বলা হয়, তখন তাঁহার সূক্ষ্ম দেহের কথাই বলা হইয়া থাকে।

মায়াজালে আবদ্ধ ও আবৃত শিব এবং নির্বাণ শক্তিকে পরং বিন্দু স্বরূপে কল্পনা করা হয়। এই বিন্দু বৃত্তাকার—ইহার কেন্দ্রে ব্রহ্মপদ, যেখানে প্রকৃতি-পুরুষের অবস্থান; মায়াকার পরিধিতে বৃত্তটি সীমায়িত। এই বিন্দুই প্রকৃতি-পুরুষ, ইহাই শব্দব্রহ্ম বা অপরব্রহ্ম।[৪] শিব ও শক্তির মিলনের ফলে দেবী শিবের প্রতি 'উন্মুখী' হন। তখন মায়াজাল ছিন্ন হইয়া সৃষ্টির সূচনা হয়। শিব-শক্তির সম্বন্ধ বিতর্কের বিষয়। এই সম্বন্ধে কুলার্ণবতন্ত্রের উক্তি প্রণিধান-যোগ্য—

> অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি, দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।
> মম তত্ত্বং ন জানাতি দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিতম্॥ (১।১১০)

জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি—এই ত্রিবিধ শক্তিতে শব্দব্রহ্ম নিজেকে ব্যক্ত করে। 'ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানশক্তি-ক্রিয়াশক্তিস্বরূপিণী' নামে দেবীকে বুঝান হইয়া থাকে। শিবের পূর্ণত্ব বুঝাইতে নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যবহার হয়—স্বতন্ত্রতা, নিত্যতা, নিত্যতৃপ্ততা, সর্বকর্তৃতা ও সর্বজ্ঞতা।

১. দ্রঃ 'শারদাতিলক', ১ম অধ্যায় ও 'শাক্তানন্দতরঙ্গিণী', ১ম অধ্যায়।

২. 'কুব্জিকাতন্ত্র', ১ম পটল।

৩. 'সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাদ্ বিন্দুসমুদ্ভবঃ।'

৪. 'শারদাতিলক', ১ম অধ্যায়।

পরমশিব হইতে শম্ভুর উৎপত্তি ; শম্ভু হইতে উদ্ভূত সদাশিব, সদাশিব হইতে ঈশান এবং স্ব স্ব শক্তি লইয়া রুদ্র, বিষ্ণু ও শিব উদ্ভূত হন। এই শক্তিগণ ভিন্ন রুদ্রাদির কোন ক্ষমতাই নাই।[১]

'মহানির্বাণতন্ত্রে' শম্ভু, সদাশিব, শঙ্কর ও মহেশ্বর প্রভৃতি বিভিন্ন নামে শিবকে সম্বোধন করা হইয়াছে। ইঁহারা সবই এক শিবের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা, গুণ বা প্রকাশের নামকরণ মাত্র।

শক্তি একাধারে মায়াস্বরূপিণী ও মূলপ্রকৃতি। এই মায়াবলেই ব্রহ্ম স্বস্বরূপকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া ভিন্নরূপে প্রতিভাত হন। মূলপ্রকৃতি অব্যক্তা; ব্যক্তাবস্থায় ইনি নামরূপাত্মক বিশ্বে বিরাজমানা। এই শিব-শক্তি মানুষের মধ্যে মূলাধার ও কুণ্ডলিনীতে[২] অবস্থান করেন। সমস্ত প্রাণীতেই শব্দব্রহ্ম কুণ্ডলিনী আকারে অবস্থান করেন এবং অক্ষরাকারে প্রকাশিত হন।

তন্ত্রে সৃষ্টিক্রম নিম্নলিখিতরূপ :—

মূলপ্রকৃতি = শক্তি (শিবাশ্রিতা)

মহৎ

বৈকারিক বা সাত্ত্বিক অহঙ্কার	তৈজস বা রাজসিক অহঙ্কার	তামসিক বা ভূতাদির অহঙ্কার

পঞ্চতন্মাত্র
(শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ)

পঞ্চভূত
(ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম)

শক্তিকে বিভিন্ন আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে, যথা, মায়া, মহামায়া, দেবী, প্রকৃতি ইত্যাদি। শক্তিকে অবিদ্যা ও বিদ্যা এই উভয়রূপেই কল্পনা করা হয়; ইনি অবিদ্যাস্বরূপে বন্ধনকর্ত্রী ও বিদ্যাস্বরূপে সংসারক্ষয়কারিণী ও মুক্তি-

---

১. 'কুব্জিকাতন্ত্র', ১ম অধ্যায়।

২. দেবী কুণ্ডলিনী সর্পাকারে মূলাধারকে বেষ্টন করিয়া থাকেন।

দায়িনী। সৃষ্টির পূর্বে ইনি ছিলেন বলিয়া ইঁহাকে বলা হয় আগ্যাশক্তি। প্রকৃতির মধ্যে চিৎ-এর প্রকাশস্বরূপে ইঁহাকে বলা হয় বাচকশক্তি, আবার চিৎস্বরূপিণী ইনি বাচ্যশক্তিও বটেন। আত্মাকে কল্পনা করিতে হয় দেবীরূপে। সুতরাং, দেবী বা শক্তি ব্রহ্মেরই মাতৃরূপে প্রকাশমাত্র।[১] ইনিই অম্বিকা এবং ললিতা।

পরব্রহ্মস্বরূপে দেবী রূপাতীত ও গুণাতীত। তন্ত্রে ইঁহাকে ত্রিবিধরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। প্রথম বা 'পরম'রূপে তিনি অজ্ঞেয়।[২] তাঁহার দ্বিতীয় বা সূক্ষ্মদেহ মন্ত্রাত্মক। এই নিরাকার রূপ মানুষের ধ্যানশক্তির অগম্য বলিয়া শক্তি তৃতীয় বা স্থূলদেহে অধিষ্ঠান করেন; এইরূপে মানুষ সহজে তাঁহাকে ধ্যানের গোচর করিতে সমর্থ হয়।[৩]

মহাদেবীস্বরূপে শক্তি সরস্বতী, লক্ষ্মী, দুর্গা, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি বিভিন্ন রূপে অবস্থান করেন। সতী, উমা, পার্বতী প্রভৃতি নামে দেবী শিবের পত্নীস্বরূপা। সতীরূপেই দক্ষযজ্ঞের পূর্বে ইনি দশমহাবিদ্যার আকারে শিবের নিকট নিজেকে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। দক্ষযজ্ঞে যখন সতী দেহত্যাগ করেন, তখন তাঁহার মৃতদেহ শিব বহন করিতে থাকেন। বিষ্ণু চক্রের সাহায্যে সতীদেহকে একান্নটি খণ্ডে ছিন্ন করেন। উহারা পৃথিবীর নানাস্থানে পতিত হইয়া একান্নটি মহা-পীঠস্থানের সৃষ্টি করে। প্রত্যেকটি মহাপীঠে দেবী তাঁহার ভৈরব সহ বিভিন্ন নামে পূজিত হইয়া থাকেন।

শক্তির আকারের অন্ত নাই। তিনি বিশ্বের প্রাণী ও অপ্রাণী সকলের মধ্যেই বিরাজমানা। কিন্তু তিনি বস্তুতঃ এক এবং একটি চন্দ্র যেমন বিভিন্ন জলাধারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনই ইনিও বিভিন্ন বস্তুতে ও প্রাণীতে নিজেকে প্রকাশিত করিয়া থাকেন।

উক্ত শক্তি বা পরাশক্তি অথবা মহাশক্তি সর্বদাই শিবাশ্রিতা। বিশ্ব-বিকাশে শক্তির প্রাথমিক বিকাশ। ইহার পূর্বে শক্তি শিবে স্তিমিতা বা নিমীলিতা।

---

১. সচ্চিদানন্দরূপাহং ব্রহ্মৈবাহং স্ফুরৎপ্রভম্—'যোগিনীতন্ত্রে' (১ম ভাগ, ১০ম অধ্যায়) কালীর উক্তি।

২. মাতস্তৎপরমরূপং তন্ন জানাতি কশ্চন—শাক্তানন্দতরঙ্গিণী, ৩য় অধ্যায়।

৩. অমূর্তৌ চিৎ স্থিরো ন স্যাৎ ততো মূর্তিং বিচিন্তয়েৎ—ঐ, ১ম অধ্যায়।

এই যে নিমীলন, এই যে পরমশিবের নির্বিশেষ স্থিতি, ইহাকেই শৈবাগমে সাধারণতঃ 'শূন্য' বলা হয়।[১] এই অবস্থা অতিমানসিক ; ইহা সকল সংজ্ঞা বা জ্ঞানের অতীত বলিয়াই ইহা 'শূন্য' নামে অভিহিত।

(৩) দেহতত্ত্ব ও মানবপ্রকৃতি

তান্ত্রিক সাধনার দুইটি ধারা—একটি বাহ্য, ইহা বিশ্বতত্ত্বের ধারা ; অপরটি আভ্যন্তরিক, ইহা দেহতত্ত্বের ধারা। দেহস্থ গুপ্ত ও সুপ্ত শক্তির উন্মেষ হইলে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত শক্তি বশীভূত হইতে পারে বলিয়া কোন কোন তন্ত্র বিশ্বাস করে। ব্রহ্মাণ্ডের সহিত দেহভাণ্ডের সাম্য বুঝাইতে গিয়া তন্ত্র বলিয়াছে —ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে। কেহ কেহ দেহতত্ত্ব অনুসারে গীতা ও চণ্ডীর ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

কোশ

তন্ত্রশাস্ত্রে মানবদেহকে বলা হয় 'ব্রহ্মপুর', ব্রহ্মার পুর বা নগর। এই দেহ পাঁচটি কোশের সমষ্টি—(১) অন্নময়, (২) প্রাণময়, (৩) মনোময়, (৪) বিজ্ঞানময় এবং (৫) আনন্দময়।

নাড়ী

তন্ত্রের মতে, মানুষের দেহে সাড়ে তিন কোটি নাড়ী আছে। ইহাদের মধ্যে চৌদ্দটি প্রধান। এই চৌদ্দটির মধ্যে আবার প্রধান তিনটি—ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্ণা। সুষুম্ণা বৃহত্তম ; ইহার অবস্থান মূলাধার হইতে মস্তিষ্ক পর্যন্ত। ইড়া নাড়ী আছে বামদিকে ; ইহা সুষুম্ণাকে জড়াইয়া থাকে এবং বাম নাসারন্ধ্র ইহার নির্গমন-পথ। পিঙ্গলারও স্বরূপ ইড়ার ন্যায় ; পিঙ্গলা দক্ষিণদিকে অবস্থান করে এবং ইহার নির্গমন-পথ দক্ষিণ নাসারন্ধ্র।

চক্র

মানবদেহে ছয়টি চক্র আছে ; যথা (১) মূলাধার, (২) স্বাধিষ্ঠান, (৩) মণিপুর, (৪) অনাহত, (৫) বিশুদ্ধ ও (৬) আজ্ঞা। ইহাদের সকলের উপরে রহিয়াছে 'সহস্রারপদ্ম' ; ইহা সহস্রদল পদ্মের ন্যায়। দেহের ঠিক

১, 'শূন্যরূপং শিবং সাক্ষাৎ'।

মধ্যভাগে আছে মূলাধার, ইহা ত্রিভুজাকৃতি ও ইহার শীর্ষদেশ (apex) অধোমুখ। ইহার স্বরূপ চতুর্দল রক্তপদ্মের ন্যায়। মূলাধারের উপরে নাভির নীচে রহিয়াছে 'স্বাধিষ্ঠান'; ইহা ষট্‌দল পদ্মের ন্যায়। 'স্বাধিষ্ঠানে'র উপরে নাভিদেশে আছে 'মণিপূরচক্র', ইহার আকৃতি দশদল স্বর্ণপদ্মের ন্যায়। হৃদ্দেশে যে চক্র আছে উহার নাম 'অনাহত'; উহা গাঢ়রক্তবর্ণ দ্বাদশদল পদ্মের মত। কণ্ঠমূলে আছে 'বিশুদ্ধচক্র' বা 'ভারতীচক্র'; ইহাতে বাগ্‌দেবী অধিষ্ঠান করেন। ইহা ধূম্রবর্ণ ষোড়শদলবিশিষ্ট পদ্মের ন্যায়। ভ্রূযুগলের মধ্যদেশে আছে, 'আজ্ঞাচক্র'। ইহাকে 'পরমকুল' বা 'মুক্তত্রিবেণী' আখ্যাও দেওয়া হয়। এখান হইতেই ইড়াদি তিন নাড়ী বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হয়। আজ্ঞাচক্র দ্বিদল পদ্মাকৃতি!

'সহস্রারপদ্ম' সর্ববর্ণবিশিষ্ট; ইহা অধোমুখে ব্রহ্মরন্ধ্রে অবস্থান করে। তন্ত্রে মানবদেহকে বিশ্বের সংক্ষিপ্ত প্রতিরূপ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে: ইহাকেই ইংরাজী ভাষায় বলা হইয়াছে microcosm। 'নির্বাণতন্ত্রে'র নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে এই ধারণাই ব্যক্ত হইয়াছে:—

> ব্রহ্মপদ্মে পৃথিব্যাং তু বর্তন্তে মানুষাদয়ঃ,
> এবং চক্রে সর্বদেহে ভুবনানি চতুর্দশ।
> প্রতিদেহং পরেশানি ব্রহ্মাণ্ডং নাত্র সংশয়ঃ॥

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ন্যূনতা ও আধিক্য অনুসারে মানবপ্রকৃতিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। মানবপ্রকৃতির বিভিন্নতা হেতুই দীক্ষাতে গুরুর প্রয়োজন; শিষ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী গুরু তাহাকে উপযুক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত করিবেন। ইহা হইতেই অধিকারিভেদের উদ্ভব। উক্ত গুণগুলির ভিত্তিতেই মানুষের 'ভাব' বা প্রবণতাকে তন্ত্র তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছে—(১) পশুভাব, (২) বীরভাব ও (৩) দিব্যভাব। 'পশু' শব্দটির ব্যুৎপত্তি হইতেছে বন্ধনার্থক পশ্‌ ধাতু হইতে। পশুভাবপ্রধান লোক দয়া, মোহ, ভয়, লজ্জা, ঘৃণা, কুল, শীল ও বর্ণ প্রভৃতির পাশে আবদ্ধ।[১] এই জাতীয় মানুষের মধ্যে তমোগুণের উপরে রজোগুণের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে ভ্রান্তি,

১. দ্রঃ 'কুলার্ণবতন্ত্র'

আলস্য ও তন্দ্রা অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। ইহাদের মন্ত্রতন্ত্রে বা গুরুতে বিশ্বাস নাই ; ইহারা বৈদিক আচার পালন করে। তন্ত্রে পশুভাবাপন্ন লোককে অধম শ্রেণীর মানুষ বলা হইয়াছে।

বীরভাবের লোকের মধ্যে রজোগুণের প্রাধান্য বেশী বলিয়া ইহারা এমন সমস্ত কাজ করিয়া থাকে যেগুলি দুঃখজনক।

দিব্যভাবের যাহারা মানুষ, তাহাদের মধ্যে সত্ত্বগুণ প্রধান ; এই জাতীয় লোককে বলা হইয়াছে শ্রেষ্ঠ। এই ভাবের লোক দয়াশীল, ধার্মিক ও শুচিতা-সম্পন্ন ; ইনি শত্রুমিত্রে সমদর্শী ও সত্যবাদী।

কলিযুগে কোন্ ভাবের লোক বেশী, এই সম্বন্ধে তন্ত্রশাস্ত্রে বিস্তর মতভেদ আছে। 'মহানির্বাণতন্ত্রে'র মতে,[১] কলিযুগে বীরভাবের লোকই অধিকতর ; দিব্যভাব ও পশুভাব বিরল। 'প্রাণতোষিণী' গ্রন্থে উদ্ধৃত একটি শ্লোকে দেখা যায়, 'দিব্যবীরময়োভাবঃ কলৌ নাস্তি কদাচন' ; অর্থাৎ, কলিযুগে দিব্যভাব ও বীরভাব কখনও হয় না। এই বিষয়ে মতভেদ সত্ত্বেও কলিযুগে দেবভাবের বিরলতা সম্বন্ধে সকল গ্রন্থেই ঐকমত্য আছে।

(৪) আচার

তন্ত্রমতে নানাপ্রকারের সাধনা ও উপাসনা আছে। এই প্রকারভেদগুলির সংখ্যা কোন কোন তন্ত্রের মতে সাত, আবার কোন কোন তন্ত্রের মতে নয়। 'কুলার্ণবতন্ত্রে' (২য় অধ্যায়) নিম্নলিখিত শ্রেণীগুলির উল্লেখ আছে :—

(১) বেদাচার, (২) বৈষ্ণবাচার, (৩) শৈবাচার, (৪) দক্ষিণাচার, (৫) বামাচার, (৬) সিদ্ধান্তাচার, (৭) কৌলাচার।

ইহারা উত্তরোত্তর উচ্চতর স্তরের। কাহারও কাহারও মতে, এই আচার-গুলি বিভিন্ন প্রকারের উপাসকগণকে বুঝায় না ; ইহারা উপাসনার বিভিন্ন স্তরমাত্র।

বেদাচারে বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানই অধিক। বৈষ্ণবাচারে অন্ধ বিশ্বাস কাটাইয়া উপাসক ব্রহ্মের রক্ষিণী শক্তির প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসী হন। ইহা ভক্তিমার্গ।

---

১. প্রথম অধ্যায়, ২৪ শ্লোক।

তৃতীয় আচারে হয় জ্ঞানমার্গে প্রবেশ; ইহাতে সাধকের মনে বিশ্বাসের সহিত ভক্তি ও শক্তির মিশ্রণ হয়, সাধক শক্তি অর্জনে তৎপর হন। চতুর্থে সাধক ব্রহ্মের ক্রিয়া, ইচ্ছা ও জ্ঞান এই ত্রিবিধ শক্তির ধ্যানধারণা করিতে সমর্থ হন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের পূজার যোগ্যতা অর্জন করেন। পঞ্চমে সাধকের প্রবৃত্তিমার্গ হইতে নিবৃত্তিমার্গে গমন হয়। দয়া, মোহ, লজ্জা, কুল, শীল এবং বর্ণ প্রভৃতি যেসব পাশে পশুভাবাপন্ন মানুষ আবদ্ধ থাকে, এই আচারে সাধক উহাদিগকে ছিন্ন করেন। এই অবস্থায় তিনি শিবত্বপ্রাপ্তির যে পথ পাইলেন তাহারই সমাপ্তি হইল ষষ্ঠ আচারে। এইবার গুরুর সাহায্যে তিনি কৌলাচারে[১] পৌঁছিবার সুযোগ পাইলেন। এই অবস্থায় তিনি জীবন্মুক্ত হইয়া এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতঃ পরমহংসত্ব অর্জন করেন; ইহাই তান্ত্রিক সাধনার চরম লক্ষ্য।

(৫) সাধনা—পঞ্চতত্ত্ব

সিদ্ধিলাভের উপায় সাধনা। সাধনা নানাবিধ—পূজা (বাহ্য ও মানসিক), শাস্ত্রজ্ঞান, জপতপ, মন্ত্র, পঞ্চতত্ত্ব ইত্যাদি। শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক গুণাগুণের ভিত্তিতে সাধক এবং সাধিকাকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা হয়:—

(১) মৃদু, (২) মধ্য, (৩) অধিমাত্রক ও (৪) অধিমাত্রম। শেষোক্ত শ্রেণীর সাধক শ্রেষ্ঠ। কৌলবিভাগে সাধকগণ নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত:—

(১) প্রকৃতি—বীরাচারী, যাগাদি অনুষ্ঠানরত ও পঞ্চতত্ত্বের সাধক।

(২) মধ্যমকৌলিক—প্রকৃতির অনুরূপ। প্রভেদ এই যে, ইহাদের মন ধ্যান-ধারণা, জ্ঞান ও সমাধিতে আসক্ত।

(৩) কৌলিকোত্তম—কর্মকাণ্ডকে অতিক্রম করিয়া যাঁহারা পরমাত্মার ধ্যানরত।

১, অজ্ঞ তন্ত্রনিন্দুকগণ কৌলাচারিগণকে নিম্নলিখিতরূপে নিন্দা করিয়াছেন —

অন্তঃশাক্তাঃ বহিঃশৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবা মতাঃ।
নানারূপধরাঃ কৌলা বিচরন্তি মহীতলে॥

ইঁহারা অন্তরে শাক্ত ও বাহিরে শৈব, সভায় বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত; এইভাবে নানারূপ ধারণ করিয়া তাঁহারা পৃথিবীতে চলাচল করেন।

তান্ত্রিক সাধনায় পঞ্চ ম-কারের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা[১] ও মৈথুন—এই পাঁচটিকে একত্র সংক্ষেপে বলা হয় পঞ্চ ম-কার। বীরপ্রকৃতির সাধক এই পাঁচটিকে স্বরূপে ভোগ করিয়া সাধনায় অগ্রসর হইবেন। পশুপ্রকৃতির সাধকের পক্ষে ইহাদের স্বরূপে ভোগ নিষিদ্ধ। তাঁহাদের পক্ষে 'মদ্য' শব্দে বুঝিতে হইবে নারিকেলোদক ও দুগ্ধ প্রভৃতি অনুকল্প, মৎস্যের পরিবর্তে তিনি ভোগ করিবেন রক্তমূলক, রক্ততিল, মসূর ইত্যাদি। মাংসের অনুকল্প হইবে আদা, তিল, লবণ অথবা রসুন। 'মুদ্রা' শব্দ তাঁহার পক্ষে প্রযুক্ত হইবে অন্ন, যব প্রভৃতি দ্রব্যে। মৈথুনের পরিবর্তে তাঁহার জন্য বিধের শক্তির পাদপদ্মে শিশুর ন্যায় আত্মসমর্পণ। দেবপ্রকৃতির সাধকের পক্ষে 'মদ্য' অর্থ যোগলব্ধ পরব্রহ্মের উন্মাদনাজনক অনুভূতি, যাহার বলে তিনি বহির্জগৎ সম্বন্ধে অচেতন হইয়া পড়েন, 'মাংস' শব্দের অর্থ সেই ক্রিয়া যাহা দ্বারা সাধক সমস্ত কর্ম ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত নিজেতে সমর্পণ করেন। তাঁহার পক্ষে 'মৎস্য' শব্দে বুঝায় সেই সাত্ত্বিক জ্ঞান, যদ্দ্বারা তিনি সমস্ত ভূতের সহিত নিজেকে এক মনে করিয়া তাহাদের সুখদুঃখের অনুভূতি নিজে বোধ করেন, 'মুদ্রা'র অর্থ বন্ধজনক অসংবস্তুর সাহচর্য ত্যাগ। দেবপ্রকৃতির সাধক 'মৈথুন' শব্দ দ্বারা বুঝিবেন স্বীয় সহস্রারচক্রে পরমশিবের সহিত মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনীশক্তির মিলন।

এই পঞ্চ ম-কার সাধনাকে উদ্দেশ্য করিয়াই অনেকে তন্ত্রের তীব্র নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু, তান্ত্রিক দর্শনের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে তন্ত্র সাধককে এই পাঁচটি ম-কারের সাধনার অধিকার দিয়া সাধককে হীন প্রবৃত্তিসমূহের চরিতার্থতার প্রশ্রয় দেয় নাই; শ্রেয়কে লাভ করিবার জন্যই প্রেয়ের বিধান করিয়াছে। এই ভোগ উপেয় নহে, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মসত্তাকে উপলব্ধি করিবার উপায় মাত্র। সাধক যে-কোন অবস্থায় এই ভোগে লিপ্ত হইতে পারেন না। আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছিয়া গুরুর সতর্ক তত্ত্বাবধানে সাধক

১. এই শব্দটি দ্বারা সাধারণতঃ পূজাদিতে ব্যবহৃত হস্তের বিভিন্ন ভঙ্গীকেই বুঝান হয়, যেমন, কূর্মমুদ্রা, মৎস্যমুদ্রা ইত্যাদি। কিন্তু 'যোগিনীতন্ত্রে'র ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখা যায়, চর্বণযোগ্য যবাদি শস্যমাত্রকে 'মুদ্রা' নামে অভিহিত করা হয়।

এই সাধনা অবলম্বন করিতে পারেন। এই জন্যই পশুভাবপ্রধান সাধকের জন্য এই ম-কারসমূহের অনুকল্পের বিধান করা হইয়াছে; কেবল সংযত বীরাচারী সাধকের পক্ষেই এই সাধনা বিধেয়।

সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইলে সাধকের প্রস্তুতির প্রয়োজন; এই প্রস্তুতি দেহের, প্রাণশক্তির ও মনের। দেহের প্রস্তুতি হয় বিভিন্ন আসনের দ্বারা, প্রাণশক্তিকে সাধনার অনুকূল করিতে প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হয় এবং মনকে প্রস্তুত করিবার জন্য আবশ্যক ভাবনা।

তন্ত্রশাস্ত্রে সাধনার তিনটি স্তর উক্ত হইয়াছে—(১) শুদ্ধি, (২) স্থিতি ও (৩) অর্পণ। সাধককে প্রথমে কায়িক ও মানসিক মালিন্য দূর করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে। দ্বিতীয় অবস্থায় তাঁহার মোহান্ধকারনাশ হইয়া জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত হইবে। তৃতীয় এবং চরম অবস্থায় সাধক পরমারাধ্যের সহিত একাত্মতা অনুভব করিবেন।

স্নান, তর্পণ, সন্ধ্যা, পূজা ও হোম—এই পাঁচটি ক্রিয়া সাধকের অবশ্য অনুষ্ঠেয়।

তান্ত্রিক সাধনার মূল কুণ্ডলিনীযোগ। পূর্বেই বলা হইয়াছে, মানবদেহের অভ্যন্তরে সুপ্ত অধ্যাত্মশক্তির নাম কুণ্ডলিনী। ইহা বলয়াকৃতি ও মূলাধারে বিরাজমানা। এই শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিলেই মানুষ উচ্চতর সত্তায় পৌঁছিতে পারে। কুণ্ডলিনী জাগ্রত হইলে মানব-সত্তা সুকোমল সঙ্গীতসুধায় আপ্লুত হয়; এই সঙ্গীতই কুণ্ডলিনীর কূজন বলিয়া অভিহিত হয়।

ব্যক্তিগত কুণ্ডলী ছাড়াও তন্ত্রে মহাকুণ্ডলীর কথা আছে। ব্যক্তিগত কুণ্ডলী ব্যক্তিগত সত্তার বিকাশ জন্মায়। আধ্যাত্মিক জীবনের সহিত আধিদৈবিক জীবনের সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া তন্ত্র বলিয়াছেন যে, মহাকুণ্ডলীতে আরূঢ় হইতে পারিলে সাধক সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিভাবকে অতিক্রম করিয়া ব্যাপক বিশ্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন; বিশ্বের মূলে রহিয়াছে এই মহাকুণ্ডলিনী।

(৬) সিদ্ধি

সাধনাদ্বারা সিদ্ধি লাভ করা যায়। সিদ্ধি নানারূপ হইতে পারে; যথা—মন্ত্রসিদ্ধি, বাক্‌সিদ্ধি প্রভৃতি। আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছিলে মানুষ নিম্নলিখিত অষ্টসিদ্ধির অধিকারী হইতে পারে:—

(১) অণিমা, (২) মহিমা, (৩) লঘিমা, (৪) গরিমা, (৫) প্রাপ্তি, (৬) প্রাকাম্য, (৭) ঈশিত্ব ও (৮) বশিত্ব।

এইগুলি ছাড়াও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিদ্ধি আছে। সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি মহানির্বাণ বা মোক্ষ; ইহাই মনুষ্যজীবনের চরম লক্ষ্য।

(৭) মন্ত্র

তন্ত্রে মন্ত্রের স্থান অতি উচ্চে। দেবতাকে মন্ত্রস্বরূপা বলা হইয়াছে এবং মন্ত্রই মোক্ষলাভের সুনিশ্চিত উপায় স্বরূপে নির্দেশিত হইয়াছে। মন্ত্রের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—যাহা মননের দ্বারা ত্রাণ করে।

'শারদাতিলকে' উদ্ধৃত 'পিঙ্গলাতন্ত্রে' আছে—

মননং বিশ্ববিজ্ঞানং ত্রাণং সংসারবন্ধনাৎ।
যতঃ করোতি সংসিদ্ধং মন্ত্র ইত্যুচ্যতে ততঃ॥

মন্ত্রের নির্জীব বর্ণগুলি সুষুম্ণা নাড়ীর সংযোগে উচ্চারিত হইলেই অসীম শক্তি লাভ করে বলিয়া তন্ত্রের বিশ্বাস।

মন্ত্রের শক্তি বিভিন্নরূপ। কোন মন্ত্রে ইচ্ছা প্রধান, কোন মন্ত্রে আনন্দ, কোনটিতে সৃজনী শক্তি এবং কোনটিতে বা শান্তি প্রধান।

(৮) যোগ

তান্ত্রিক যোগ প্রধানতঃ দ্বিবিধ—হঠযোগ ও সমাধিযোগ। কায়িক যে প্রক্রিয়াবিশেষের দ্বারা মনোজয়ের পথ প্রশস্ত হয়, তাহার নাম হঠযোগ। এই যোগের পাঁচটি বহিরঙ্গ—(১) যম—ইন্দ্রিয় সংযম, অহিংসা প্রভৃতি, (২) নিয়ম—শাস্ত্রাধ্যয়ন, ঈশ্বরপ্রণিধান ইত্যাদি, (৩) আসন, (৪) প্রাণায়াম—শ্বাসক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ, (৫) প্রত্যাহার—পার্থিব বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সমূহের বিমুখীকরণ।

সমাধিযোগ ছয় প্রকার[১]—(১) ধ্যানযোগ, (২) নাদ-যোগ, (৩) রসানন্দ যোগ, (৪) লয়সিদ্ধি যোগ, (৫) ভক্তিযোগ ও (৬) রাজযোগ।

---

১. বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য—Woodroffe : **Introduction to Tantra Shastra**, পৃ ১৩৪-১৩৫।

পাতঞ্জল যোগ হইতে ইহার প্রধান প্রভেদ এই যে, তন্ত্রে শক্তি ও তত্ত্বের মধ্যে কোন ভেদ নাই বলিয়া শক্তিই সব সঙ্কোচ অতিক্রম করিয়া পরমশিবে যোগীর অবস্থিতি করায়। কিন্তু, পতঞ্জলি প্রকৃতির উর্ধ্বে কোন পরাশক্তি মানেন না বলিয়া প্রকৃতি অতিক্রম করিয়া কোন শক্তির স্ফুরণের সহিত যোগীর পরিচয় ঘটে না।

(৯) গুরু ও শিষ্য—দীক্ষা, অভিষেক

উপনয়ন সংস্কার না হইলে যেমন বৈদিক ধর্মাচরণে অধিকার জন্মে না, দীক্ষা ব্যতিরেকেও তেমন তান্ত্রিক ধর্মচর্যার যোগ্যতা অর্জিত হয় না। অদীক্ষিতের জপ ও পূজাদি নিষ্ফল হয়। দীক্ষা যিনি দিবেন, সেই গুরুরও কতক বিশেষ গুণ থাকা আবশ্যক[১]। গুরু প্রথমতঃ স্বীয় দেহে পরম গুরুর প্রাণশক্তির সঞ্চার করিবেন, পরে উহা শিষ্যদেহে সঞ্চারিত করিবেন। কোন্ মন্ত্র কোন্ শিষ্যের অনুকূল হইবে, তাহা গুরু স্থির করিবেন। স্ত্রীলোক কর্তৃক দীক্ষাদান অতিশয় ফলপ্রদ ; জননী কর্তৃক দীক্ষার ফল তাহার অষ্টগুণ।

তন্ত্রোক্ত দীক্ষার কয়েকটি বিশিষ্ট প্রকার ভেদের নাম 'অভিষেক'। শিষ্যের আধ্যাত্মিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রকার অভিষেক হইয়া থাকে। অভিষেক অষ্টবিধ—প্রথমটি শাক্তাভিষেক। সাধন মার্গে প্রবেশমাত্রই গুরু শিষ্যকে ইহা দেন। ইহাতে গুরু শিষ্যের নিকট শক্তিতত্ত্ব প্রকাশিত করেন এবং শিষ্যের মধ্যে বিস্ময়কর অভিনব এক শক্তি সঞ্চারিত হয়। দ্বিতীয় অভিষেকের নাম পূর্ণাভিষেক। পুরশ্চরণাদি দ্বারা শিষ্য যোগ্যতা অর্জন করিলে এই দীক্ষা তাহাকে দেওয়া হয়, এবং ইহাতে প্রকৃত সাধনার আরম্ভ হয়। তৃতীয় স্তরে হয় ক্রমদীক্ষাভিষেক। তৎপর নানারূপ কঠিন পরীক্ষা অতিক্রম করিয়া শিষ্য সাম্রাজ্যাভিষেক ও মহাসাম্রাজ্যাভিষেক প্রাপ্ত হন। তাহার পর হয় অতি কষ্টসাধ্য যোগদীক্ষাভিষেক। তাহার পর ক্রমশঃ হইয়া থাকে পূর্ণদীক্ষাভিষেক ও মহাপূর্ণদীক্ষাভিষেক। অষ্টম ও শেষ স্তরে সাধক যখন আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপূর্তি লাভ করেন তখন তিনি নিজের শ্রাদ্ধ নিজে

১. দীক্ষাদাতার যোগ্যতা সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য—তন্ত্রসার, ১ম অধ্যায়।

করেন, যজ্ঞসূত্র ও শিখা দ্বারা পূর্ণাহুতি দেন। এই অবস্থায় গুরু-শিষ্য সম্বন্ধের অবসান হয়। সাধক নিজেই ক্রমশঃ 'সোঽহং' তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া জীবন্মুক্তি লাভ করতঃ 'পরমহংস' সংজ্ঞায় অভিহিত হন। বস্তুতঃ, জীব-ব্রহ্মের অভিন্নতাবোধই তান্ত্রিক দীক্ষার চরম লক্ষ্য।

তন্ত্রে দীক্ষা দ্বিবিধা—বহির্দীক্ষা ও অন্তর্দীক্ষা। পূর্বোক্ত দীক্ষায় পূজা, হোম প্রভৃতি বহু বাহ্য প্রক্রিয়া আবশ্যক, ইহাতে চিত্তের সাত্ত্বিক ভাব উদিত হয়। অন্তর্দীক্ষা কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণে সহায়ক।

কোন কোন মতে দীক্ষা ত্রিবিধা—(১) শাম্ভবী, (২) শাক্তী ও (৩) মান্ত্রী। প্রথম প্রকারের দীক্ষায় চিত্ত শুদ্ধ হয়। দ্বিতীয় প্রকারের দীক্ষায় অধ্যাত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ হয়। মান্ত্রীতে মন্ত্রশক্তি ও দেবতা জাগ্রত হয়।

মানুষের মলগুলি অপসারণ করিয়া তাহাকে মুক্তিপথে অগ্রসর করাই তান্ত্রিক দীক্ষার উদ্দেশ্য। মলগুলি এইরূপ—আণব, বুদ্ধিগত ও মায়ীয়। আণব মল শিবের সঙ্কীর্ণ জীবভাবের সৃষ্টি করে, ইহা অপগত না হইলে শিব-শক্তির অভিন্নতার উপলব্ধি হয় না। বুদ্ধিগত মল অপসারিত হইলে প্রকৃত জ্ঞান সম্ভবপর হয়। মায়ীয় মল বিষয়-বিষয়ী জ্ঞানের মূল, অহঙ্কারের কারণ; এই মল দূরীভূত না হইলে মুক্তি লভ্য হয় না।

তন্ত্রের মূল্য ও প্রভাব

উল্লিখিত আলোচনা হইতে এটুকু বুঝা গেল যে, এই শাস্ত্র শুধু রহস্যময় মন্ত্র ও যন্ত্রাদিপূর্ণ নহে। এই অভিযোগও সত্য নহে যে, কেবলমাত্র মানুষের আদিম প্রবৃত্তিসমূহের চরিতার্থতার জন্যই এই শাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল। তন্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্বে একটি বিশিষ্ট দর্শন আছে, ইহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। ইহাও দেখিয়াছি যে, তন্ত্রে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বেরও আভাস রহিয়াছে।

পুরাণগ্রন্থগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায়, খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতক হইতে তন্ত্রশাস্ত্র উহাদিগকে প্রভাবিত করিতেছিল।[১] স্মৃতিনিবন্ধগুলিতে বহু

১. দ্রঃ—R. C. Hazra রচিত Studies in the Puranic Records ইত্যাদি, পৃঃ ২৬০। কাহারও কাহারও মতে, মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত চণ্ডী তন্ত্রোক্ত দেহতত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্বের সারমাত্র দ্রষ্টব্য-পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৮)।

তন্ত্রের উল্লেখ ও তন্ত্রোক্ত শ্লোক, তত্ত্ব বা মন্ত্রের অসংখ্য উদ্ধৃতি আছে। বাংলার স্মৃতিনিবন্ধসমূহের মধ্যে রঘুনন্দনের নিবন্ধগুলিতে তান্ত্রিক প্রভাব সর্বাধিক।[১] ইহার একটি কারণ সম্ভবতঃ তাঁহার সমকালে বাংলার তান্ত্রিককুলশিরোমণি কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের আবির্ভাব। 'কুলার্ণবতন্ত্রে' বলা হইয়াছে যে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চারিযুগে যথাক্রমে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রের প্রাধান্য। 'মহানির্বাণতন্ত্রে'ও (১।২০) কলিযুগে তন্ত্রের প্রাধান্যের উল্লেখ আছে। মনুস্মৃতির টীকাকার কুল্লূকভট্ট বৈদিকী ও তান্ত্রিকী ভেদে শ্রুতিকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছেন।

ধর্মের দিক হইতে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, তন্ত্র বৌদ্ধধর্মকে প্রভাবিত করিয়াছিল অতিমাত্রায়। ফলে বৌদ্ধ সহজিয়াতত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছিল। আবার ইহার প্রভাবে উৎপত্তি হইয়াছিল বৈষ্ণব সহজিয়াতত্ত্বের।

বাংলাদেশের চিন্তাধারাকে তন্ত্র প্রভাবিত করিয়াছে যুগে যুগে। এই প্রভাবের ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে বাংলার সাহিত্যে ও সমাজে। তন্ত্র-প্রভাবিত বৌদ্ধ সহজিয়াতত্ত্ব অবলম্বনে চর্যাপদের অনেক পদ রচিত হইয়াছিল। কতক পদে শূন্যবাদের প্রতি পদ-রচয়িতার গভীর বিশ্বাস প্রতিফলিত হইয়াছে। চর্যাপদের ভাষাকেও কেহ কেহ তান্ত্রিক সন্ধ্যা ভাষা বলিয়াছেন। তন্ত্র-প্রভাবিত ধর্মতত্ত্ব এবং নাথধর্মও অনেক ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য হইয়াছে।[২] মাণিকচন্দ্র রাজার গান ময়নামতীর গান, গোপীচন্দ্রের গীত, গোরক্ষবিজয় প্রভৃতি নাথসাহিত্যের বিখ্যাত রচনাবলী। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতির ইঙ্গিত আছে।[৩] বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ লোকসঙ্গীত

১। বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধসমূহে তন্ত্রের প্রভাব সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত 'স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী'।

২। বাংলা সাহিত্যে তান্ত্রিক প্রভাবের বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য—শশিভূষণ দাশগুপ্ত রচিত Obscure Religious Cults.

৩। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নলিখিত পদটি উদ্ধৃত করা যায়ঃ—

ইড়াপিঙ্গলাসুসমনা সন্ধী
মনপবন তাতে কৈল বন্দী। পৃঃ ১৪১

বাউল-গান বহুলাংশে সহজিয়াপ্রভাবিত। সাধক কবি রামপ্রসাদ সেনের শ্যামা-সঙ্গীত তান্ত্রিক প্রভাবের উজ্জ্বল নিদর্শন। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' শাক্ত প্রভাব সুবিদিত১। শাক্তধর্ম-প্রভাবিত অসংখ্য শাক্ত পদাবলী রসজ্ঞ বাঙ্গালীমাত্রেরই উপভোগ্য।

মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' (পঞ্চম সর্গ), হেমচন্দ্রের 'দশমহাবিদ্যা', বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা', নবীনচন্দ্রের 'শবসাধন' কবিতা, বিবেকানন্দের 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' নামক কবিতা, কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'মানা মহাশক্তি' নামক গ্রন্থ প্রভৃতি তান্ত্রিক ভাবপ্রবাহের সাক্ষ্য বহন করে।

রবীন্দ্রনাথের "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়," "ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার" প্রভৃতি পংক্তিতে তান্ত্রিকভাবনার প্রতিধ্বনি রহিয়াছে। উল্লিখিত লেখকগণ তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছিলেন—ইহা আমাদের বক্তব্য নহে। কিন্তু বাংলার তান্ত্রিক ভাব-ঐতিহ্য যে এই দেশের চিন্তাধারার সহিত সমীকৃত হইয়া নবনবরূপে যুগে যুগে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, উক্ত রচনাবলী তাহারই নিদর্শন।

বাংলার সমাজে তান্ত্রিকতার সূচনা কোন্ যুগে কি ভাবে হইয়াছিল তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, বৈদেশিক শাসনের নিষ্পেষণে ব্রাহ্মণ্যধর্ম যখন বিপন্ন তখনই সমাজে তন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিল। বাংলার হিন্দুরাজবংশের পতন ও মুসলিম রাজত্বের প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষভাগ ও ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগের মধ্যে, তন্ত্র বহু সমাজে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ক্রমে তান্ত্রিক ধর্ম উচ্চকোটি ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশ্রিত হইয়া রঘুনন্দনের যুগে (খৃষ্টীয় ষোড়শ শতক) স্মৃতিশাস্ত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। তান্ত্রিক দীক্ষাকে রঘুনন্দন ধর্মজীবনের প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

১। দৃষ্টান্ত :—

মৃণালের তন্তুমধ্যে সদা আসে যায়॥
প্রকৃতিপুরুষরূপা তুমি সূক্ষ্ম স্থূল।
কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি বিশ্বমূল॥

এই তান্ত্রিক দীক্ষা অদ্যাবধি বাঙ্গালী হিন্দুর অবশ্য গ্রহণীয় এবং বীজমন্ত্রের জপ বিধেয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় যে যুগন্ধর পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল সেই রামমোহন রায়ের জীবনাদর্শ তন্ত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তৎকর্তৃক মূর্তিপূজার বিরোধিতা, ব্রহ্মোপাসনার বিশিষ্ট পদ্ধতির অনুসরণ ও প্রচার—এই সব কিছুরই মূলে ছিল তন্ত্রের মতবাদ। পরবর্তী কালে নববিধান ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্রের মাতৃভাবে উপাসনার আদর্শ তন্ত্রমূলক।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসও ছিলেন মুখ্যতঃ তান্ত্রিক সাধক।

ধর্মে, জীবনে, সাহিত্যে, সমাজে আমরা তন্ত্রের ব্যাপক ও গভীর প্রভাব লক্ষ্য করিলাম। কিন্তু, বেদকেন্দ্রিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের এই যে তান্ত্রিক প্রভাব ইহার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া যায় না। সংক্ষেপে বলা যায়, তন্ত্রের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ এই যে তন্ত্রোক্ত ধর্ম ও সাধনপদ্ধতি মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে, ইহারা শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য নহে।

বৈদিক কর্মকাণ্ডের জটিলতা ও কষ্টসাধ্যতার জন্য জনসাধারণ বাস্তব জীবনোপযোগী ধর্মাচরণের পথের অনুসন্ধান করিতেছিল এবং ইহার ফলে তান্ত্রিক পদ্ধতিকে আশ্রয় করিয়াছিল। এই ধর্মের জনপ্রিয়তার অপর একটি প্রধান কারণ এই যে, প্রাচীনতর ব্রাহ্মণ্যধর্ম কালক্রমে সঙ্কীর্ণগণ্ডীতে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তন্ত্র তাহার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল উচ্চনীচ নির্বিশেষে জনসাধারণের প্রবেশের জন্য। যে স্ত্রীলোক ও শূদ্রবর্ণ বেদবিহিত অনুষ্ঠানের বহিরঙ্গনে স্থান পাইতেন তাঁহারাই প্রবেশাধিকার লাভ করিলেন তান্ত্রিক ধর্মের অন্তরতম প্রদেশে।[১] কোন এক তন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, স্ত্রীলোকই মানুষের গুরু হইবার জন্য সর্বাপেক্ষা যোগ্য; মাতার নিকট হইতে পুত্রের দীক্ষাই প্রশস্ত। অন্ত্যজ ও যবনাদি বর্ণাশ্রমধর্মবহির্ভূত জাতিও তান্ত্রিক ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার যোগ্য ২

১। 'সর্ববর্ণাধিকারশ্চ নারীণাং যোগ্যমেবচ'—গৌতমীয়তন্ত্র, ১ম অধ্যায়।

২ মহানির্বাণতন্ত্র, ১৪।১৮৪, ১৮৭।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মে বিশ্বের বহু দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস ও তাঁহাদের পূজার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তান্ত্রিক ধর্মে 'এহ বাহ্য'; দেহস্থ দেবতার প্রতিই একমাত্র লক্ষ্য।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিসমূহের নিরোধ সম্বন্ধে অনুশাসন কঠোর। কিন্তু, তন্ত্রে মানুষের স্বাভাবিক জৈবপ্রকৃতিকে স্বীকার করিয়া লইয়াই সাধনার পথ নির্দেশিত হইয়াছে। ইহা তান্ত্রিক ধর্মের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। প্রবৃত্তিমার্গে সাধনার প্রতিই মানুষের প্রবণতা অধিকতর। প্রকৃতিকে বর্জন করিয়া নহে, অর্থাৎ বৈরাগ্য-সাধনে ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া নহে, প্রকৃতির সাহায্যেই সাধক সিদ্ধিলাভ করিতে পারে—তান্ত্রিক ধর্মের ইহাই আদর্শ।

বৈদিক ধর্মে সাধকের লক্ষ্য ব্রহ্মে লয়। কিন্তু তন্ত্রমতে ইহজীবনে প্রতিকর্মে শিবের সহিত একাত্মতার অনুভূতিই সাধকের চরম লক্ষ্য। তন্ত্রোক্ত সাধনার ফল শুধু পারত্রিক মুক্তি বা নিঃশ্রেয়সই নহে; ঐহিক ভুক্তি এবং অভ্যুদয় লাভও ইহাদ্বারা সম্ভবপর। সাধনার এই প্রত্যক্ষ ফলই জনসাধারণের চিত্তাকর্ষক।

জটিল বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে ঔপনিষদিক জ্ঞানকাণ্ডের উদ্ভব হইয়াছিল। আবার, জনসাধারণের উপযোগী বলিয়া পৌরাণিক পূজাপদ্ধতির প্রয়োজন হইয়াছিল। উপনিষদের সাধনার চরম লক্ষ্য যেমন পরব্রহ্মপ্রাপ্তি, তান্ত্রিক সাধনারও তেমন পরমশিবত্বলাভ; পরমশিব পরব্রহ্মেরই নামান্তর মাত্র। উক্ত দর্শনকে মানিয়া লইয়া তন্ত্র পৌরাণিক উপাসনাপদ্ধতিকেও অনেকাংশে স্বীকার করিয়াছিল। এই সকলই তন্ত্রের জনপ্রিয়তার সহায়ক।

কিন্তু তন্ত্রের ক্রমবর্ধমান প্রসারে সম্ভবতঃ ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া এবং স্বকীয় ধর্মের সম্ভাব্যগ্লানির ভয়ে, সনাতনপন্থী ব্রাহ্মণসমাজ ইহার তীব্র নিন্দা করিয়াছিল, যদিও তন্ত্রের প্রতি জনসাধারণের প্রবণতা তাহাতে লুপ্ত হয় নাই। অপরদিকে ইহাও লক্ষণীয় যে, তান্ত্রিক ধর্ম অশেষ জীবনীশক্তিসম্পন্ন সনাতন ব্রাহ্মণ্যধর্মকে সাময়িকভাবে ম্লান করিলেও একেবারে নিশ্চিহ্ন করিতে পারে নাই। পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রতিকূল হইলেও, তাহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া বাঁচিয়া থাকার ক্ষমতা ব্রাহ্মণ্যধর্মের ছিল বলিয়াই যুগে যুগে বৌদ্ধ জৈন ও ইসলাম প্রভৃতি ধর্মমতের সংঘাত ও সংঘর্ষ সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ্যধর্ম স্বমহিমায় উজ্জ্বল হইয়াই ভারতে অদ্যাবধি

বিরাজ করিতেছে। তান্ত্রিক ধর্ম যে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিতে পারে নাই, তাহার প্রধান কারণ এই যে, শেষোক্ত ধর্ম তান্ত্রিক মতবাদগুলি অনেকাংশে আত্মস্থ করিয়া লইয়াছে। এই জন্যই পুরাণ ও স্মৃতি প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্যধর্মের গ্রন্থসমূহে তান্ত্রিক প্রভাব সুস্পষ্ট।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, জাতীয় জীবনের দিক হইতে তন্ত্রের একটা বিশেষ মূল্য ছিল। বৈদেশিক শাসনের সংঘাতে যখন হিন্দুধর্ম বিপন্ন হইয়াছিল, তখন তান্ত্রিক আচার জাতির সংহতির পথে সহায়ক হইয়াছিল। উচ্চতম ব্রাহ্মণ হইতে নিম্নতম চণ্ডালেরও তন্ত্রে অধিকার ছিল। তন্ত্রের সঙ্গে সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্মের যে আপোষ তাহা দেশের কল্যাণকরই হইয়াছিল।

মূর্তিপূজা সম্বন্ধে কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, বৈদিক কর্মকাণ্ডে ইহার প্রচলন ছিল না। বৌদ্ধধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধের মূর্তি পূজা করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। পরে বৌদ্ধ মহাযানী তান্ত্রিকগণ প্রজ্ঞাপারমিতা ও তারা প্রভৃতির মূর্তিপূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা হইতে পরে ব্রাহ্মণ্যধর্মে ইহার প্রচলন হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সম্ভবতঃ তন্ত্রের সর্বাধিক প্রভাব বশতঃ ভারতের অন্যান্য স্থানের তুলনায় বাংলা দেশে মৃন্ময়ী মূর্তির পূজা সর্বাপেক্ষা ব্যাপক। কিম্বদন্তী এই যে, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের আবির্ভাবেরপূর্বে বাংলাদেশে কালীপূজা হইত মন্ত্রে বা ঘটস্থাপনা করিয়া। আগমবাগীশই নাকি সর্বপ্রথম আধুনিক কালীর ন্যায় মূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজার প্রচলন করেন।

তন্ত্রের প্রভাব সম্বন্ধে একটি কথা বলা আবশ্যক। তন্ত্রশাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য যতই মহান্ হউক, পরবর্তী কালে অনধিকারীর হস্তে তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠানে যথেষ্ট গ্লানির উদ্ভব হইয়াছিল। মধ্যযুগের বাংলাদেশে তান্ত্রিক কদাচার ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল। চৈতন্যদেবের প্রচারিত প্রেমভক্তিতে ঐ কদাচার সাময়িক ভাবে স্থগিত থাকিলেও তাঁহার তিরোভাবের কিছুকাল পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা অনেকেই সহজিয়া তান্ত্রিক হইয়া পড়িয়াছিলেন।

উপসংহার

তন্ত্র সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যে আলোচনা করা গেল তাহা হইতে বুঝা যায় যে, তন্ত্রে কর্ম-ভক্তি ও জ্ঞান-মার্গের একটা সমন্বয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে। এই শাস্ত্রে

বৈদিক কর্মকাণ্ডের সরলীকরণ, ঔপনিষদিক দর্শন ও পৌরাণিক পূজাপদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, তন্ত্রের অনেক তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ইহার মন্ত্রগুলি অর্থহীন বর্ণসমষ্টি নহে। 'হ্রীং', 'হ্রাং' প্রভৃতি কৌতুককর ধ্বনিসমূহ নহে; ইহারা নিগূঢ় তত্ত্বের প্রতীকমাত্র। ধর্ম-শাস্ত্রে ও জনসাধারণের জীবনে তন্ত্রের অসীম প্রভাবও আমরা লক্ষ্য করিয়াছি।

বর্তমান যুগে যাঁহারা তন্ত্রকে অশ্লীল বা প্রাকৃতজনোচিত বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তন্ত্রশাস্ত্রে প্রবেশ না করিয়া ইহার গতানুগতিক নিন্দার সহিত সুর মিলাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। এইরূপ সমালোচকের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই মহাকবি কালিদাস 'পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধি' বিশেষণটি'র প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ইংরেজীতে বলা যায়, The tantras are more hated than understood। এ বিষয়ে কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে, তান্ত্রিক আচারের দোহাই দিয়া অথবা পঞ্চ ম-কার সাধনার নামে যে সমস্ত কুৎসিত ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, সেইগুলি স্বচক্ষে দেখিয়া তান্ত্রিক ধর্মকে সভ্যসমাজে কলুষিত না বলিয়া থাকা যায় না। এই সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে কোন ধর্মের বিকৃতিকেই সেই ধর্মের স্বরূপ বলিয়া মনে করা সমীচীন নহে, অনুষ্ঠানকারীর গ্লানি ধর্মকে কলুষিত করিতে পারে না। তন্ত্রশাস্ত্র-প্রণেতা মানুষকে অধঃপাতে নিয়া যাওয়ার চেষ্টা করেন নাই; তিনি তাঁহাকে মোক্ষের পথে অগ্রসর করিবার প্রয়াসই করিয়াছেন। যে নারীর মাতৃত্ব দর্শনে কবিচিত্ত মুগ্ধ হইয়াছে, সেই নারীকেই দুশ্চরিত্র ব্যক্তি বারাঙ্গনারূপে দেখিতে পারে; তাই বলিয়া নারীজাতিই গর্হিত হইতে পারে না। যে গঙ্গাজলে দেবতার পূজা হয়, সেই গঙ্গাজলেই ঘৃণ্যতম মালিন্যও শোধন করে; যে ইহাকে যেরূপে ব্যবহার করিবে সে সেরূপ ফলই পাইবে। উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী ও সংস্কারমুক্ত মন লইয়া তন্ত্রশাস্ত্রে প্রবেশ করিলে দেখা যাইবে, ইহার প্রতি যে কলঙ্ক ও কলুষকালিমা আরোপিত হইয়া থাকে তাহা ভিত্তিহীন ও অনেক সময় অজ্ঞতাপ্রসূত।

বর্তমান যুগে তন্ত্রের আবশ্যকতা কি? অনেকে এই প্রশ্ন করিতে পারেন। বর্তমান জীবনে আধ্যাত্মিকতার যে প্রয়োজন আছে, তাহা কি প্রাচ্যে কি প্রতীচ্যে সর্বত্রই চিন্তাশীল ব্যক্তিরা স্বীকার করিতেছেন। জড়বাদের যে চরম

পরিণতি মানুষের মধ্যে পশুভাবের সৃষ্টি করে, তাহার নগ্নরূপ বিশ্বময় প্রকাশিত হইতেছে। ইহার প্রতিকার আধ্যাত্মিক অনুশীলন। বর্তমান যুগের নাগরিক সভ্যতায় নিবৃত্তিমার্গে উপাসনা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং, তান্ত্রিক উপাসনাই এই যুগোপযোগী বলিয়া মনে হয়; জীবন ও মুক্তির সমন্বয় তন্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। জীবনের মধ্যে থাকিয়া জীবনাতীতের সন্ধান তান্ত্রিক উপাসনায় পাওয়া যাইবে। বর্তমান যুগে যুদ্ধবিগ্রহ ও অভাব-অভিযোগে নিপীড়িত জীবনকে ভোগ করিতে হইলে যে শক্তির প্রয়োজন, তন্ত্র মহাশক্তির মাধ্যমে সেই তাহারই সন্ধান দেয়। আধুনিক কালে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই যে নারীর অধিকার, তন্ত্রমতে তাহাতে কোন অসঙ্গতি নাই; তন্ত্রে নারী বিশ্বশক্তির আধার।

বর্তমান সমাজ নারীকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দেখিতে শিখিয়াছে। তন্ত্রে বলা হইয়াছে, স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ নিম্নাভিমুখী না হইলে তাহাদের উচ্চতর সত্তাকে বিকশিত করিয়া সিদ্ধির পথে অগ্রসর করে। এই সমস্ত বিষয়ের পর্যালোচনা করিলে মনে হয় তন্ত্র অনেক পরিমাণে জীবন-বিকাশের সহায়ক হইতে পারে।

তন্ত্রশাস্ত্রের কতিপয় পারিভাষিক শব্দ

তন্ত্রে অনেক শব্দ বিশিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। বর্তমান গ্রন্থে এইরূপ সমস্ত শব্দের সংগ্রহ সম্ভবপর নহে। শুধু অপেক্ষাকৃত অধিকতর পরিচিত শব্দগুলিকে অ-কারাদিক্রমে সাজাইয়া তাহাদের অর্থ সংক্ষেপে লিখিত হইল।

অভিষেক—তান্ত্রিক দীক্ষার প্রকারভেদের নাম। শিষ্যের আধ্যাত্মিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে গুরু তাঁহার বিভিন্ন প্রকার অভিষেক করিয়া থাকেন। অভিষেক অষ্টবিধ।

অশ্বক্রান্ত—কোন কোন তন্ত্রে ভারতবর্ষকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে; ইহাদের এক ভাগের নাম অশ্বক্রান্ত। ইহার অপর নাম গজক্রান্ত। 'শক্তিমঙ্গল তন্ত্রে'র মতে, বিন্ধ্যপর্বত হইতে মহাসমুদ্র পর্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ডের নাম অশ্বক্রান্ত। ভারতের অপর দুইটি ভাগের নাম বিষ্ণুক্রান্ত (=বিন্ধ্যপর্বত হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত) ও রথক্রান্ত [বিন্ধ্য পর্বত হইতে মহাচীন পর্যন্ত (নেপাল সহ)]

ইড়া—তন্ত্রমতে ইহা মানবদেহস্থ স্নায়ুচক্রের (nervous system) একটি প্রধান নাড়ী, ইহা দেহের বাম পার্শ্বে অবস্থিত।

কুণ্ডলিনী—মানবদেহের অভ্যন্তরে সুপ্ত অধ্যাত্মশক্তির নাম। ইহা সর্পাকারে মূলাধারকে বেষ্টন করিয়া আছে বলিয়া তন্ত্রে কল্পনা করা হইয়াছে। ব্যক্তিগত কুণ্ডলিনী ছাড়াও, বিশ্বের মূলে মহাকুণ্ডলিনীর কল্পনাও তন্ত্রে আছে।

কোশ—তন্ত্রমতে মানব দেহ পাঁচটি কোশের সমষ্টি। কোশগুলি এই—(১) অন্নময়, (২) প্রাণময়, (৩) মনোময়, (৪) বিজ্ঞানময় ও (৫) আনন্দময়।

কৌল—তন্ত্রে নানা শ্রেণীর বা স্তরের আচারের কথা লিপিবদ্ধ আছে। ইহাদের মধ্যে কৌলাচার শ্রেষ্ঠ এবং সাধক বা উপাসকের চরম লক্ষ্য। এই স্তরে পৌছিলে সাধকের জীবন্মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। কৌলাচারিগণকে সংক্ষেপে কৌল বলা হয়।

চক্র—তন্ত্রমতে মানবদেহে ছয়টি চক্র আছে; যথা—(১) মূলাধার, (২) স্বাধিষ্ঠান, (৩) মণিপুর, (৪) অনাহত, (৫) বিশুদ্ধ ও (৬) আজ্ঞা।

ন্যাস—ইহা সেই প্রক্রিয়ার নাম যাহা দ্বারা সাধক স্বীয় দেহের বিভিন্ন অংশ আরাধ্যমান দেবতার দেহের সঙ্গে একীভূত বলিয়া কল্পনা করেন। ন্যাস বহুবিধ, যথা—অঙ্গন্যাস, করন্যাস, মাতৃকান্যাস ইত্যাদি।

পঞ্চতত্ত্ব—ইহাকে তন্ত্রে 'কুলদ্রব্য' বা 'কুলতত্ত্ব' নামেও অভিহিত করা হয়। সাধারণ ভাষায় ইহাকে বলা হয় পঞ্চ-মকার সাধনা। এই পঞ্চ-মকার যথা:—

(১) মদ্য, (২) মাংস, (৩) মৎস্য, (৪) মুদ্রা ও (৫) মৈথুন। মদ্যকে অনেক স্থানে বলা হইয়াছে 'কারণবারি' বা 'তীর্থবারি'। পঞ্চম তত্ত্বকে বা স্ত্রীলোকের সহিত সাধনাকে 'লতাসাধনা'ও বলা হইয়াছে।

পশু—তন্ত্রে এই শব্দটি অনেক ক্ষেত্রেই বিশিষ্ট প্রকৃতির মানুষকে বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে। মানবপ্রকৃতির ত্রিবিধ ভাগ—বীরভাব, পশুভাব ও দেবভাব। পশুভাবাপন্ন ব্যক্তি নিম্নতম স্তরের মানুষ।

পিঙ্গলা—তন্ত্রমতে মানবদেহস্থ স্নায়ুচক্রের একটি প্রধান নাড়ী; ইহা দেহের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত।

পুরশ্চরণ—ইহা একপ্রকার তান্ত্রিক সাধনা। ইহাতে সাধক পঞ্চগব্য ও

হবিষ্যান্নাদি আহার করিয়া সংযতচিত্তে বিশেষ কোন মন্ত্রকে বহুবার আবৃত্তি বা জপ করেন এবং ব্রাহ্মণভোজন করান।

প্রাণায়াম—তান্ত্রিক উপাসনার প্রক্রিয়াবিশেষের নাম। ইহাদ্বারা শ্বাস ও প্রাণবায়ু নিয়ন্ত্রিত হয়। তান্ত্রিকগণ বিশ্বাস করেন যে, এই প্রক্রিয়ার ফল শক্তির জাগরণ, রোগমুক্তি, বিষয়ে বৈরাগ্য এবং আনন্দ।

ব্রহ্মপুর—তন্ত্রে মানবদেহের এই নাম দেওয়া হইয়াছে।

ভূতশুদ্ধি—এই তান্ত্রিক প্রক্রিয়াদ্বারা দেহস্থ পঞ্চভূতকে শোধন করা হয়।

মুদ্রা—মুদ্ ধাতু হইতে এই শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে; ইহার অর্থ 'যাহা আনন্দদায়ক তাহা'। সাধারণতঃ ইহাদ্বারা পূজাকালে হস্তের বিভিন্নপ্রকার ভঙ্গীকে বুঝায়; যেমন, মৎস্যমুদ্রা, শঙ্খমুদ্রা, ইত্যাদি। মুদ্রা শব্দে যোগাভ্যাস-কালীন বিভিন্ন দেহভঙ্গীকেও বুঝাইয়া থাকে; যেমন, অশ্বিনীমুদ্রা। পঞ্চতত্ত্বের অন্তর্গত মুদ্রাশব্দের অর্থ অনেক ক্ষেত্রে শস্যবিশেষ।

যন্ত্র—একটি রহস্যময় চিত্র। ইহা কোন ধাতব দ্রব্যে অঙ্কিত হয় অথবা পূজাকালে ভূমিতে চিত্রিত হয়। পূজক কল্পনা করেন যে, পূজ্যমান দেবতা পূজকের প্রার্থনানুসারে যন্ত্রে অধিষ্ঠান করেন। উদ্দিষ্ট দেবতাভেদে যন্ত্রের আকৃতি বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে।

রথক্রান্ত—অশ্বক্রান্ত দ্রষ্টব্য।

বিষ্ণুক্রান্ত—অশ্বক্রান্ত দ্রষ্টব্য।

সিদ্ধি—তান্ত্রিক সাধনার উচ্চতম স্তরে পৌঁছিলে সাধক সিদ্ধিলাভ করেন; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিদ্ধি ব্যতীতও নিম্নলিখিত আটটি সিদ্ধিকে তন্ত্রে সাধারণতঃ 'অষ্টসিদ্ধি' নামে অভিহিত করা হয়:—

(১) অণিমা, (২) লঘিমা, (৩) মহিমা, (৪) গরিমা, (৫) প্রাপ্তি, (৬) প্রাকাম্য, (৭) ঈশিত্ব ও (৮) বশিত্ব। শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি মোক্ষ।

সুষুম্না—তন্ত্রমতে মানুষের শরীরস্থ স্নায়ুচক্রের সর্বাপেক্ষা প্রধান নাড়ী; ইহা দেহের মধ্যভাগে অবস্থিত। ইহাকে 'ব্রহ্মবর্ত্ম' আখ্যাও দেওয়া হইয়া থাকে।

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী

মূলগ্রন্থ ও নিবন্ধ

অহির্বুধ্ন্যসংহিতা—সং রামানুজাচার্য, মাদ্রাজ, ১৯১৬।

কালীবিলাসতন্ত্র— „ পার্বতী তর্কতীর্থ, Tantrik Texts, vol. VI, 1917.

কুলচূড়ামণি— „ গিরীশ বেদান্ততীর্থ, Tantrik Texts, vol. IV, 1915.

কুলার্ণবতন্ত্র— „ তারানাথ বিদ্যারত্ন, Tantrik Texts, vol. V, 1917.

জ্ঞানার্ণবতন্ত্র—আনন্দাশ্রম গ্রন্থাবলী, ১৯১২।

তন্ত্রসমুচ্চয়— সং গণপতি শাস্ত্রী।

তন্ত্রসার (কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ)—বসুমতী সংস্করণ।

তন্ত্ররাজতন্ত্র—(প্রথম অংশ) প্রকাশক লক্ষ্মণ শাস্ত্রী, Tantrik Texts, vol. VIII, 1918.

নারদপাঞ্চরাত্র— সং কে. এম. ব্যানার্জী, কলিকাতা, ১৮৭৬।

প্রপঞ্চসারতন্ত্র— সং তারানাথ বিদ্যারত্ন, Tantrik Texts, vol. III, 1914.

বৃহদ্ব্রহ্মসংহিতা—আনন্দাশ্রম গ্রন্থাবলী।

মহানির্বাণতন্ত্র— সং আদি ব্রাহ্মসমাজ, কলিকাতা, ১৮৭৬। ইং অনুবাদ
—এম. এন. দত্ত, কলিকাতা, ১৯০০।
—A. Avalon, London, 1913.

তন্ত্রবিষয়ক বিবিধ গ্রন্থ ও প্রবন্ধ

ইংরাজী

Avalon, A. (Sir John Woodroffe): Principles of Tantra, Madras, 1952.
[শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ভট্টাচার্য মহোদয়ের কৃত তন্ত্রতত্ত্বের ইং অনুবাদ।]

Bagchi, P. C.: Studies in the Tantras, Pt. I, Calcutta University, 1939.

Bhattacharya, B. : Scientific Background of the Buddhist Tantras, *Indian Historical Quarterly, XXXII*, Nos, 200, 1956, . pp. 290—295.

Bose, D. N. : Tantras—their Philosophy and Occult Secrets, Calcutta.

Brahma. N. K. Philosophy of Hindu Sadhana, London, 1932.

Chakravarti, Chintaharan : The Tantras—studies on their religion and literature, Calcutta, 1963.

Chakravarti, P. C. Philosophy of Tantras, Jha Comm. Vol.

Das Gupta, S. B. : Obscure Religious Cults, Calcutta, 1946.
বাংলার শাক্তধর্ম, বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৬২।

" " S. N, . A History of Indian Philosophy, Vol III.

Pratyagatmananda : Philosophy of the Tantras, Cultural Heritage of India, Vol. III, Calcutta, 1953.

Schrader, F. O. Introduction to the Pancaratra and the Ahirbudhnya-samhita, Madras, 1916.

Winternitz, M. A History of Indian Literature, Vol I, Calcttta, 1927.

Woodroffe, Sir John : Shakti and Shakta, Madras.

Do The World as Power

Do Mahamaya, 1953

Do The Garland of Letters, 1951

Do The Great Liberation (Mahanirvana Tantra)

Do Introduction to Tantra Shastra, Madras, 1952.

Do Serpent Power, 1950.

Zimmer, H. Philosophies of India, London, 1951.

বাংলা

তন্ত্রকথা : চিন্তাহরণ চক্রবর্তী (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, কলিকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ)

তন্ত্রের আলো : মহেন্দ্র সরকার, কলিকাতা, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী (২য় খণ্ড), কলিকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ

পৌরাণিক উপাখ্যান : যোগেশচন্দ্র রায়, কলিকাতা।

চার

সাহিত্যতত্ত্বে বর্তমানকালে রসতত্ত্বের পরেই অলংকারতত্ত্বের স্থান। পূর্বাচার্যগণের নিকট অলংকারতত্ত্বই ছিল প্রধান আলোচ্য বিষয়। সাহিত্যতত্ত্ব বা Poeticsও সেইজন্য অলংকার-শাস্ত্র নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

ভূমিকা

কাব্যমীমাংসায়[১] রাজশেখর অলংকার শাস্ত্রকে বলিয়াছেন 'সপ্তম বেদাঙ্গ'। এই শাস্ত্রে বুৎপত্তি ব্যতীত বেদার্থেরও সম্যক্ উপলব্ধি হয় না। শব্দ ও অর্থ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচ্য বিষয় অলংকার। 'শব্দালংকার' ও 'অর্থালংকার' লইয়া অলংকারপ্রকরণ আকারে অত্যন্ত বৃহৎ। আমরা এই অধ্যায়ে অলংকারশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত আলোচনা মাত্র করিব।

অলংকার' শব্দের অর্থ

ক)ব্যাপক অর্থ

সংস্কৃতে 'অলম্' শব্দের এক অর্থ 'ভূষণ'; অতএব অলম্ বা ভূষণ হয় যাহার দ্বারা তাহাই অলংকার। সেইজন্য অলংকার শব্দের ব্যাপক অর্থ সৌন্দর্য, সংকীর্ণ অর্থ অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতি বিশিষ্ট অলংকার। অলংকারশাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ কিন্তু সৌন্দর্যশাস্ত্র বা কাব্যসৌন্দর্যবিজ্ঞান। ইংরাজীতে ইহাকে বলা যায় Aesthetic of Poetry।[২] প্রাচীন আচার্যগণ সৌন্দর্য অর্থে অলংকার শব্দকে গ্রহণ করিয়া সাহিত্যতত্ত্ব বা Poetics-এর সার্থক নামকরণ করিয়াছিলেন।

(খ) বিশিষ্ট অর্থ

বিশিষ্ট অর্থে অলংকার শব্দকে আচার্যগণ অনুপ্রাস-উপমাদি বুঝিয়াছিলেন, যাহাকে ইংরাজীতে বলা যায় Figures of Speech এবং তাঁহাদের গ্রন্থের পৃথক্ পৃথক্ অধ্যায়ে তাঁহারা উহাদের আলোচনা সম্পন্ন করিয়াছেন। প্রাচীন আলংকারিকদের আলোচনা হইতে মনে হয়—তাঁহারা সকলেই বিশিষ্টার্থক অলংকারকে কাব্যের অনিত্য ধর্ম বলিয়া মনে

১ কাব্যমীমাংসা, ২য় অধ্যায়।

২ Whatever, remaining in a functionary place, aids to embellish and add to the main theme's beauty is Alankara—V. Raghavan.

করিতেন; তাহা যেন কাব্যশরীরের আত্মভূত নহে, কটককুণ্ডলাদির ন্যায় শোভাবর্ধক মাত্র।[১]

অলংকার শব্দের অর্থ বিষয়ে প্রাচীন আলংকারিকগণের মধ্যে দণ্ডী ও বামনের মতই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে সকল ধর্ম কাব্যের শোভাবর্ধক, তাহারাই দণ্ডীর মতে অলংকার। বলা বাহুল্য, অলংকারের ইহা সাধারণ ধর্ম এবং এখানে অলংকার, কাব্যসৌন্দর্যকে বুঝাইতেছে। দণ্ডীর মতানুযায়ী দশটি গুণ ও দ্বিরুক্তি বা পুনরুক্তি (যাহাতে আতিশয্য বুঝান যায় তাহাও) অলংকার।[২] বামন অলংকারের সংজ্ঞা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—কাব্যের সৌন্দর্যই অলংকার। অলংকৃতিমাত্রই অলংকার; তবে করণবাচ্যে ব্যুৎপত্তি করিলে পুনরায় এই অলংকার শব্দই উপমাদিকে বুঝায়।

দণ্ডীর মত

বামন

পরবর্তী আলংকারিকেরা সৌন্দর্য না বলিয়া বলিয়াছেন রস এবং জগন্নাথ পরে পুনরায় সৌন্দর্যবাচক 'রমণীয়তা' শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন। প্রাচীন আচার্যগণের মতে ইংরাজীতে অলংকার শব্দের তাহা হইলে অর্থ দাঁড়ায় 'the beautiful in poetry।'[৩]

জগন্নাথ

উপরের আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে কাব্যশাস্ত্রের নাম প্রাচীনকালে কেন অলংকারশাস্ত্র হইয়াছিল। এক সময়ে অলংকার শাস্ত্র যথার্থই 'a treatise on Beauty' অর্থে ব্যবহৃত হইত।[৪]

বামন রীতিকে বলিয়াছেন কাব্যের আত্মা।[৫] এই উক্তির সহিত—কাব্যের উপাদেয় স্বরূপ হইতেছে সৌন্দর্য—এই পূর্ব উক্তির কোনই সামঞ্জস্য নাই। বামন সম্ভবত, রীতি, গুণ ও অলংকার সকলকেই অলংকার বা সৌন্দর্য অর্থে বুঝিয়াছিলেন এবং অপূর্ব কাব্য সকলের

'রীতি' সম্পর্কে বামন

১ সাহিত্যদর্পণ।

২ কাব্যাদর্শ ২।১।

৩ "Effective expression, the embodiment of the poet's idea is Alankāra."—V. Raghavan.

৪ "শব্দকে অলংকারে...সাজিয়ে সুন্দর করা যায়; অর্থকে...নানা অলংকারে চারুত্ব দান করা যায়। কাব্য যে মানুষের উপাদেয়, সে এই অলংকারের জন্য।" (কাব্যজিজ্ঞাসা, ২য় সংস্করণ: পৃঃ ৫)।

৫ কাব্যালংকার, ১।২।৬।

যথোচিত সন্নিবেশেই হয় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। গুণ ও অলংকারের সমষ্টিই কাব্য—এই কথা বামন বৃত্তিতে বলিয়াছেন। তবুও বামনের মতে কাব্যের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য রীতি। অলংকার কাব্যের অনিত্যধর্মমাত্র।

অলংকারের অনন্তত্ব সম্বন্ধে আলংকারিকগণ

কাব্যসৌন্দর্য অনন্ত বলিয়া দণ্ডীর মতে অলংকারসমূহকে সম্পূর্ণরূপে গণনা করা সম্ভব নয়; অলংকারসমূহ নিত্যই স্পষ্ট হইতেছে।[১] আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন—প্রতিভা অনন্তপ্রকার বলিয়া অলংকারও অনন্তপ্রকার। নমিসাধুও অলংকারের অনন্তত্ব স্বীকার করিয়াছেন।[২] তাই অলংকারকে মূলত কেবলমাত্র কাব্যসৌন্দর্য না বলিয়া উপায় নাই। আবার দেখা যায়—কাব্যশাস্ত্রের যত বিভাগ আছে, প্রাচীনগণের আলোচনায় সেই সমস্তই এই বিশিষ্ট অলংকারাবলীর অন্তর্ভূত হইয়াছে।[৩]

রস ও ধ্বনি কাব্যশাস্ত্রের প্রধান আলোচ্য

কাব্যশাস্ত্রে প্রধান আলোচ্য বিষয় দুইটি—রস ও ধ্বনি। রসকে ভামহ, দণ্ডী ও উদ্ভট অলংকারের অন্তর্গত বলিয়াছেন। বামন রসকে গুণের অন্তর্গত করিয়াছেন।[৪] ধ্বনিও প্রাচীন আচার্যগণের পর্যায়োক্ত অলংকারেরই অন্তর্ভূত। গুণীভূতব্যঙ্গ্য, সমাসোক্তি প্রভৃতি অলংকারের মধ্যে বর্তমান। বিশিষ্ট অলংকারগুলি তো নিশ্চয়ই অলংকার শাস্ত্রেরই অন্তর্গত। রীতি ও গুণের মধ্যেও শব্দালংকার রহিয়াছে। অতএব ইদানীং আমরা যাহাকে রস-ধ্বনি-রীতি ও অলংকারাত্মক কাব্যশাস্ত্র বলি, পূর্বে তাহাকেই অলংকারশাস্ত্র বলা হইত। অতএব অলংকার শব্দটি যথার্থই কাব্যসৌন্দর্যজ্ঞাপক।[৫] অলংকারশাস্ত্র আজও উক্ত অর্থেই চলিয়া আসিতেছে।

কাব্যালংকার বিচারের সূচনা :—ভোজদেব (খৃঃ একাদশ শতাব্দী) মানব দেহের সহিত কাব্য বা শব্দাত্মক সাহিত্যের তুলনা করিয়াছেন; তাঁহার

১ কাব্যাদর্শ ২।১।
২ ধ্বন্যালোক—সেনগুপ্ত ও ভট্টাচার্য, পৃঃ ৮।
৩ কাব্যালোক —সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, পৃঃ ৬০০।
৪ ঐ পৃঃ ১০৪-১০৫।
৫ ধ্বন্যালোক--পৃঃ [৫]—[৭]।

মতে—"শব্দ ও অর্থ কাব্যের শরীর। রস প্রভৃতি কাব্যের আত্মা (ওজঃ শ্লেষ প্রভৃতি), গুণ শৌর্য প্রভৃতির ন্যায়, (কাব্যের) দোষসমূহ (মানব দেহের) কাণত্বাদির ন্যায়, রীতিসমূহ অবয়বের সন্নিবেশের সহিত তুলনায় এবং অলংকারসমূহ কটক কুণ্ডল প্রভৃতির সদৃশ।" রাজশেখর কাব্যমীমাংসা গ্রন্থে কাব্য-পুরুষের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"বৎস! শব্দ এবং অর্থ তোমার শরীর। সংস্কৃত তোমার মুখ।··· তুমি সমতা, প্রসাদ এবং মাধুর্য এবং ওজোগুণযুক্ত···রস তোমার আত্মাস্বরূপ, তোমার রোমরাজি ছন্দোময়; অনুপ্রাস এবং উপমা প্রভৃতি তোমাকে অলংকৃত করিতেছে।"

ভোজদেব

রাজশেখর

কাব্য শব্দ ও অর্থের সমষ্টি। সাহিত্য শব্দে শব্দ ও অর্থের সংযোগ বুঝায়। কাব্য ও সাহিত্য যে সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে তাহারও বৈশিষ্ট্য এইস্থলেই। সাহিত্যের বা শিল্পকলার সৌন্দর্য মানুষের সৃষ্টি—নিসর্গসৌন্দর্য হইতে পৃথক্ এই সৌন্দর্য। কাব্যের যে সৌন্দর্য—শব্দ ও অর্থের পথেই তাহার অন্বেষণ করিতে হইবে।

কাব্য শব্দার্থের সমষ্টি

আমাদের দেশের অলংকারশাস্ত্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়াই অনেকের ধারণা। ঋগ্বেদ প্রভৃতি সংহিতায়, ব্রাহ্মণ আরণ্যক বা উপনিষৎ প্রভৃতিতে, শ্রৌতসূত্র বা ধর্মসূত্রাদিতে অলংকারশাস্ত্রবর্ণিত বিষয়ের বিশেষ কোন উল্লেখ নাই। যাস্কের নিরুক্তে উপমার সামান্য উল্লেখ আছে। তিনি ভূতোপমা, জপোপমা, সিদ্ধোপমা, লুপ্তোপমা বা অর্থোপমার উল্লেখ করিয়াছেন; প্রসঙ্গক্রমে যাস্ক গার্গ্যের উপমালঙ্কারেরও উল্লেখ করিয়াছেন; বোধ হয় গার্গ্য অপেক্ষা প্রাচীনতর আলংকারিকের সন্ধান আর মিলিবে না; গার্গ্যের মতে দুইটি বিভিন্ন বস্তুকে যখন একজাতীয় কোনও গুণের দ্বারা তুলনা করা হয়, তখনই তাহাকে উপমা বলা হয়। উপমার লক্ষণ সম্বন্ধে গার্গ্য আরও কয়েকটি কথা বলিয়াছেন। বোধহয় গার্গ্যের সময় হইতেই উপমা অর্থালংকাররূপে গৃহীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার পর

অলংকারশাস্ত্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক

বৈদিক সাহিত্যে অলংকার

"পাণিনির সূত্রে, কাত্যায়নের বৃত্তিতে, শান্তনবের ফিট্‌সূত্রে ও মহাভাষ্য, উপমান ও উপমেয়ের নানা সম্বন্ধের বিষয় আলোচিত হইয়াছে।"১

উপমা শব্দটি ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। অলংকার শব্দটি শতপথ ব্রাহ্মণ২ ও ছান্দোগ্য উপনিষদে৩ পাওয়া গিয়াছে। যাস্ক উপমাবাচক শব্দ 'ইব', 'যথা', 'ন', 'চিৎ', 'নু', 'আ' ইত্যাদির প্রয়োগ দেখাইয়াছেন। পাণিনি উপমান ও উপমিত শব্দ যে ব্যবহার করিয়াছেন৪ তাহা উপরে বলা হইয়াছে। অলংকরিষ্ণু অর্থে পাণিনি অলংকার শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন (৩।২।৩৬)।

ডঃ দে'র মত খণ্ডনে অধ্যাপক কানে

ডঃ সুশীলকুমার দের ধারণা—বৈদিক সাহিত্যে অধ্যাপক কানে যে সকল অলংকার ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সর্বাংশে যুক্তিসহ নহে। ইহার উত্তরে অধ্যাপক কানে তাঁহার সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের ইতিহাসে (২য় সংস্করণে৫) যে যুক্তিজাল প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। কানের মতে ঋগ্বেদের বিশ্বামিত্র ও নদীদের মধ্যে কথোপকথন (৩।৩৩), যমযমী সংবাদ (১০।১০), সরমা এবং পণিদের (১০।১০৮), ইন্দ্র, মরুদ্‌গণ ও অগস্ত্যসংবাদ (৪।১৪) ইত্যাদি পরবর্তী ক্লাসিক্যাল যুগের নাটকগুলির অগ্রদূত। দ্বিতীয়ত, নাটকের উপাদান—এককভাষণ (monologue) ও স্বগতোক্তি (soliloquy) ঋগ্বেদে ছিল। সুন্দর সুন্দর অসংখ্য উপমা ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদীয় ঋষিগণ যে কেবল উপমা, অতিশয়োক্তি ও রূপকেরই ব্যবহার করিয়াছেন তাহাই নহে, তাহাদের অলংকারশাস্ত্র সম্বন্ধেও ধারণা সম্ভবত কিছু কিছু ছিল। এইরূপ বলিবার সংগত কারণও আছে।৬ তাহারা একই শব্দ বা একই অক্ষরের পুনরাবৃত্তি করিয়া অনুপ্রাসের effect সৃষ্টি করিতেন (৪।৩।১৪, ৪।১২।৬ ইত্যাদি)। বিভিন্ন পাদের প্রথমে একই শব্দের পুনরাবৃত্তি করিয়া তাঁহারা যমকের ব্যবহার দেখাইয়াছেন (৪।২৩।৮-৫; ৮।৪০।৫, ৫।২৭।৪, ৫।১৬।২)।

---

১ কাব্যবিচার। ২ শঃ ব্রা ১৩।৮।৪।৭; ৩।৫।১।৩৬। ৩ ছা. উ. ৮।৮।৫।

৪ পা. ৩।১।১০, ২।১।৫৫, ২।১।৫৬, ৫।১।১১৫, ২।৩।৭২।

৫ History of Sanskrit Poetics (1951 edn)—Kane.

৬ বৈদিক সাহিত্যে পরবর্তী কালের সকল অলংকারের নিদর্শনের জন্য দ্রঃ সিদ্ধভারতী ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৩-২০০।

ঋগ্বেদ ১০।৭১।২ থেকে দেখা যায়—সাধারণ বাক্য প্রয়োগের সহিত কাব্যে ব্যবহৃত বাক্য প্রয়োগের পার্থক্য কোথায়। ঋগ্বেদের বাক্‌সূক্ত ও শতপথ ব্রাহ্মণের কিয়দংশে (১।২।৫।১৬) অলংকারের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। নাট্যশাস্ত্র-প্রণেতা ভরত বলিয়াছেন[১] যে পাঠ্য (আবৃত্তি ও কথোপকথন), গীত, অভিনয় এবং রস যথাক্রমে ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ হইতে লওয়া হইয়াছে। বৌধায়ন গৃহ্যসূত্র ও হিরণ্যকেশি গৃহ্যসূত্রে ক্ল্যাসিক্যাল নাটকের চক্রবাকমিথুনের উল্লেখ পাওয়া যায়। উপনিষদের মধ্যে যদিও দার্শনিক ও রহস্যপূর্ণ তত্ত্বই বেশী, তবুও স্থানে স্থানে[২] আপনা হইতেই অপূর্বকাব্য সৃষ্ট হইয়াছে। কঠোপনিষদে[৩] 'রূপক' ও 'সার' অলংকারের উদাহরণ আছে। মহাভারত এবং রামায়ণে অসংখ্য স্থলে অলংকারপূর্ণ অংশ দেখিতে পাওয়া যায় যেগুলি পরবর্তী যুগে 'ধ্বন্যালোক' ও 'কাব্যপ্রকাশে' আলোচিত হইয়াছে। রামায়ণ প্রকৃতই কাব্য, সেইজন্য ইহাতে প্রায়ই কল্পনাবিলাস ও উন্নত ধরণের কবিত্বময় বর্ণনা আছে।

১ নাট্যশাস্ত্র ১।১৭।

২ মুণ্ডক উপ. ২।২।৩।

৩ কঠ উপ. ১।৩।৩ ইত্যাদি।

কাব্যের আত্মা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ

বিভিন্ন আলংকারিক কাব্যের লক্ষণ এবং কাব্যের আত্মা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাচীন আলংকারিকগণের মধ্যে কয়েকজনের সংজ্ঞায় শব্দ এবং অর্থ উভয়কেই কাব্যের সমপ্রয়োজনীয় অংগ বলা হইয়াছে। অনেকে আবার শব্দের উপরই বিশেষ জোর দিয়াছেন। কেহ কেহ কাব্যের মৌলিক অর্থ অপেক্ষা তাহার লক্ষণকে আরও দুর্বোধ্য করিয়া ফেলিয়াছেন। শব্দ এবং অর্থের সমপ্রাধান্যবিশিষ্ট লক্ষণ যাঁহারা দেখাইয়াছেন, ভামহ, রুদ্রট, কুন্তক, মম্মট, প্রতাপরুদ্র, বাগ্‌ভট, হেমচন্দ্র প্রভৃতি তাঁহাদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১]

কাব্যের লক্ষণ

কেবলমাত্র শব্দের উপরেই যাঁহারা বিশেষ জোর দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অগ্নিপুরাণ, দণ্ডী, জগন্নাথ প্রভৃতির মত প্রণিধানযোগ্য।[২] দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের লেখকগণের লক্ষণ কাব্যের একটি দিকই মাত্র বড় করিয়া দেখাইয়াছে। উহা এই :—কাব্য যদিও চলিত ভাষা হইতে শব্দসম্ভার গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হয় তবুও দৈনন্দিন শব্দরাশির লৌকিক ব্যবহারই কাব্য নহে; রমণীয়ার্থ-প্রতিপাদক বা সৌন্দর্যব্যঞ্জক শব্দসম্ভারের বিশেষ রীতিতে সজ্জার নামই কাব্য। কিন্তু এই লক্ষণগুলি দোষমুক্ত নহে। দণ্ডী যে

শব্দ

অর্থ

১ Kane, "History of Sanskrit Poetics" (1951 edn), পৃঃ ৩৩৮। "শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্" (ভামহ); "শব্দার্থৌ কাব্যম্" (রুদ্রট), "শব্দার্থৌ সহিতৌ" (বক্রোক্তিজীবিত), "তদদোষৌ শব্দার্থৌ, সগুণাবনলংকৃতী পুনঃ ক্বাপি" (মম্মট), "গুণালংকারসহিতৌ শব্দার্থৌ দোষবর্জিতৌ কাব্যম্" (প্রতাপরুদ্রীয়), "শব্দার্থৌ নির্দোষৌ সগুণৌ প্রায়ঃ সালংকারৌ কাব্যম্" (বাগ্‌ভট), "অদোষৌ সগুণৌ সালংকারৌ চ শব্দার্থৌ কাব্যম্" (হেমচন্দ্র)।

২ শরীরং তাবদিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী (কাব্যাদর্শ ১।১০); ইষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী। কাব্যং স্ফুটবদলংকারং গুণবদ্দোষবর্জিতম্ (অগ্নিপুরাণ, ৩৩৬।৬-৭); রমণীয়ার্থপ্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্ (রসগঙ্গাধর)।

বলিয়াছেন শব্দই কাব্যের শরীর, তাহাতে কাব্যের আত্মার লক্ষণ কি তাহাতো বলা নাই। কিন্তু কাব্যের আত্মার লক্ষণ সম্বন্ধে অলংকার শাস্ত্রের বিভিন্ন সম্প্রদায় বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। ভরতের মতানুসরণ করিয়া রসবাদী আলংকারিক রসকেই কাব্যের আত্মা বা প্রাণ বলিয়াছেন, আবার আনন্দবর্ধনের মতানুসারী ধ্বনিবাদী আলংকারিক ব্যঙ্গ্যকে কাব্যের আত্মা বলিয়াছেন।১

রস

ধ্বনি

এই সকল কাব্যলক্ষণগুলির প্রত্যেকটিরই অসংখ্য সমালোচনা হইয়াছে, গ্রন্থবিস্তারের জন্য তাহার আলোচনা অসম্ভব।২ রস, ধ্বনি, গুণ, অলংকার এবং রীতিবাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ আলোচনা করিতে গেলেই বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন মতবাদের আলোচনা অপরিহার্য। সেই জন্য তাহাদের মূল বক্তব্যগুলি সংক্ষেপে উপস্থাপিত হইয়াছে। প্রধান মতবাদগুলি যথাক্রমে রস, অলংকার, রীতি, ধ্বনি ও বক্রোক্তি।

কাব্যের আত্মা সম্বন্ধে ৫টি প্রধান মতবাদ

সংস্কৃত আলংকারিকগণের মতে কাব্যের আত্মা কি, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল। উহার বিশেষ আলোচনা বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক মতানুসারে দিবার পূর্বে কাব্য বলিতে আমরা কি বুঝি, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। কাব্য কাহাকে বলে? না, কবি তাহার অপূর্ব-বস্তু-নির্মাণক্ষম প্রতিভাবলে সহৃদয় পাঠকের নিমিত্ত অলৌকিক আনন্দময় যে শব্দার্থের সাহিত্য সৃষ্টি করেন তাহাই কাব্য। অর্থাৎ আনন্দময় বাক্যই কাব্য। কাব্যে লক্ষ্য ও উপাদান আনন্দময় বাক্য। কাব্যের প্রয়োজন লোকোত্তর আনন্দ, উপায় রস ও রম্যবোধ অথবা ধ্বনি, আলম্বন অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের বিচিত্র বস্তু এবং সর্বশেষে সর্বাধিক আলোচ্য কাব্যের উপাদান শব্দার্থ,—এই সকলই উহার

কাব্য কি বস্তু?

কাব্যের জগৎ

১ "আস্বাদজীবাতুঃ পদসন্দর্ভঃ কাব্যম্।" "কাব্যং রসাদিমদ্বাক্যং শ্রুতং সুখবিশেষকৃৎ।" "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।" "নির্দোষং গুণবৎ কাব্যমলংকারৈরলংকৃতম্। রসান্বিতং কবিঃ কুর্বন্ কীর্তিং প্রীতিঞ্চ বিন্দতি॥"

২ দ্রঃ কাব্যালোক ১৮-৩৬; কাব্যবিচার ৩৪।

(কাব্যের) লক্ষণের অন্তর্গত।[১] কাব্যের জগৎ বাস্তবজগতের যথাযথ চিত্র নয়, বরং ইহা এক প্রকার স্ব-প্রতিষ্ঠ, স্বয়ম্বশ, অখণ্ড জগৎ।[২] কড্ওয়েল কাব্যকে 'nascent self-consciousness of man' আখ্যা দিয়াছেন। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের মতে "Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings."

সংক্ষেপে কবির রসাত্মক বাঙ্নির্মিতিই কাব্য। কাব্য শব্দময় শিল্প। যে শক্তিবলে কবি এই শিল্পের সৃষ্টি করেন তাহার নাম প্রতিভা।[৩] কবি শব্দ-মায়াময় এক অলৌকিক জগৎ সৃষ্টি করেন। মম্মট বলিয়াছেন যে, কবিকৃতি প্রজাপতির সৃষ্টি অপেক্ষাও সুন্দরতর। কবি শব্দকে রসাত্মক বাণীমূর্তি দান করিতে পারেন। কবিসৃষ্ট কাব্যজগৎ পাঠককে অনাবিল আনন্দ দেয়, নবরসের বিচিত্র সুখময় অপূর্ব আস্বাদ দেয়। কবির শরীর দিব্যশরীর, "কাব্যময় কান্ত বপু"।[৪]

মম্মটের মত

কাব্যের ভোক্তা বা আস্বাদয়িতা সহৃদয় সামাজিক ; আর কাব্যের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য আনন্দ। কাব্যপ্রকাশে (১।২) বলা হইয়াছে—"কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে। সদ্যঃ পরনির্বৃতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে॥" কাব্য-পাঠের আনন্দ লোকোত্তর। দেশকালানবচ্ছিন্ন এই আনন্দ। সেজন্যই তো কাব্যানন্দকে অভিনবগুপ্ত পর-ব্রহ্মাস্বাদসচিব বলিয়াছেন এবং বিশ্বনাথের মতে ইহা অখণ্ড প্রকাশানন্দ চিন্ময় এবং ব্রহ্মাস্বাদসহোদর।[৫] "কাব্যকে আশ্রয় করিয়া বাগ্ধেনুর রসদুগ্ধের আস্বাদলাভ সকল সহৃদয়ের পক্ষেই সম্ভবপর।"

কাব্যের ভোক্তা

কাব্য ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর

১ কাব্যালোক, ২।

২ সাহিত্যসন্দর্শন, ১৯ ; কাব্যাদর্শে দণ্ডী—"নৈসর্গিকী চ প্রতিভা" ইত্যাদি।

৩ ধ্বন্যালোক ১।৬ টীকায় অভিনবগুপ্ত।

৪ ভামহ।

৫ "The object of poetry......is to produce an emotional delight, a pure and elevated pleasure." (Aristotle's Theory of Poetry and Fine Art—Butcher, p. 221)

রসবাদী সম্প্রদায়ঃ—সম্ভবতঃ ভরতের পূর্ব হইতেই নাট্যরস সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া আসিতেছিল। যদিও নাট্যে রস-নিষ্পত্তির ক্ষেত্র ব্যাপক, তথাপি কাব্যের মধ্যেও রসের স্থান যথেষ্টই আছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রেও রসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা সর্বপ্রথম পাওয়া যায়। ভরত রসের সংজ্ঞায় বলিয়াছেন—"বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ।"[১] ভামহ রসবদলংকারে বাচ্যার্থের অঙ্গীভূত রসের কথা বলিয়াছেন। বিভাবনার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন যে বিভাবনাদির দ্বারা বক্রোক্তিপ্রযুক্ত কাব্যের অর্থ রসপদবীতে আরোহণ করে।

রসের সংজ্ঞা

ভামহের কাব্যলক্ষণের আলোচনাতেও বুঝা যায় যে কাব্যের মধ্যে রসকে একটি প্রধান বস্তু বলিয়া তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন। অভিনবগুপ্ত প্রভৃতির কালে রসের বিষয়ে যেমন গভীর আলোচনা হইয়াছিল, ভামহ, দণ্ডী প্রভৃতির মধ্যে রসের সে জাতীয় পারিভাষিক আলোচনা দেখা যায় না। দণ্ডী যে কেবল রসবদলংকারকেই স্বীকার করিয়াছিলেন তাহাই নহে, তিনি মাধুর্য গুণকে রসময় বলিয়া মনে করিতেন। রস শব্দ দণ্ডীতে বোধ হয় 'ভালোলাগা' অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু ভরত যে অর্থে রসশব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, দণ্ডী প্রভৃতির তাহা না জানা থাকার তো কোন কারণ নাই। প্রত্যুত মহাকাব্যের বর্ণনায় দণ্ডী বলিয়াছেন যে উহাতে রস ও ভাব থাকা আবশ্যক এবং তিনি ভরতোক্ত আটটি রসেরই উল্লেখ করিয়াছেন। অভিনবগুপ্তের ধারণা যে, রসসম্বন্ধে দণ্ডীর মত অনেকটা ভট্টলোল্লটের মতের অনুরূপ; কিন্তু দণ্ডী রসসম্বন্ধে সামান্য যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহার মত কি ছিল তাহা সুস্পষ্ট ভাবে বলা যায় না। মোটকথা অভিনবগুপ্ত প্রভৃতির মধ্যে রসের যে প্রাধান্য, দণ্ডীতে তাহা নাই। দণ্ডী রসকে অলংকার ও রীতির অঙ্গরূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। বামন সকল অলংকারকেই ঔপম্যগর্ভ বলিয়া মনে করিতেন। রসকে বামন কাব্যের একটি প্রধান গুণ বলিয়া স্বীকার

'রস' সম্বন্ধে পরবর্তী কালে আলোচনা

দণ্ডীর মতে রস

বামনের মত

[১] নাট্যশাস্ত্র, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

করিয়াছেন। এই গুণের নাম কান্তি। উদ্ভট আবার রসবদলংকারের মধ্যেই রসকে স্বীকার করিয়া রস থাকিলেই কাব্যকে জীবিত বলা যায় বলিয়াছেন। সেইজন্য রসকে কাব্যের আত্মা বলা যাইতে পারে। রসের সহিত কাব্যের যে একটি গভীর সম্বন্ধ আছে, রুদ্রট তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন। প্রাচীন আটটি রসের সহিত তিনি আরও দুইটি রস যোগ করিয়া দিয়াছিলেন—ঐ রস দুইটি প্রেয় ও শান্ত। কিন্তু রসের সহিত কাব্যের কি যোগ তাহা রুদ্রট কোথাও সুস্পষ্টভাবে দেখান নাই। রুদ্রট শব্দ এবং অর্থকেই কাব্যের প্রধান উপাদান বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন; কিন্তু ইহার মধ্যে রসের স্থান কোথায় সে সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নাই। রুদ্রট প্রধানত অলংকারবাদী; বস্তুত ভামহ, দণ্ডী, রুদ্রট, বামন প্রভৃতি প্রাচীন লেখকদের মধ্যে রস সম্বন্ধে কোন সুচিন্তিত তথ্য পাই না।

উদ্ভটের মত

রুদ্রট

ভরত লিখিয়াছেন—'তস্মাৎ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ।' অভিনব ইহার অর্থ করিয়াছেন যে রসের সমুদয়ই নাট্য। রস কিন্তু শুধুই নাট্যের বিষয় নহে, ইহা কাব্যেরও বিষয় বটে। কাব্যার্থ-বিষয়ে যখন প্রত্যক্ষ-কল্প-ভাবে কাব্যবস্তু উপস্থাপিত হয় তখনই রসের উদয় হয়। 'কাব্যকৌতুক' গ্রন্থে[১] লিখিত আছে যে কাব্যার্থ নাট্যের ন্যায় প্রতিফলিত না হইলে তাহার প্রকৃত আস্বাদ হয় না। বিভাবাদি দ্বারা সম্যক্ প্রতিফলিত কাব্যার্থ প্রত্যক্ষের ন্যায় স্ফুট হইয়া উঠে।

অভিনব গুপ্ত

পূর্বে ভামহ হইতে বামন পর্যন্ত যে সকল আলংকারিকের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা প্রধানত গুণ, অলংকার ও সৌন্দর্যাতিশয়ের দ্বারাই কাব্যের রসাস্বাদ বর্ণনা করিয়াছেন। অভিনবগুপ্তও ইহাই লক্ষ্য করিয়াছিলেন।[২] কিন্তু তাঁহার মতে কাব্যই নাট্য এবং সে জন্যই নাট্য হইতে যে প্রণালীতে রসাস্বাদ ঘটে, কাব্য হইতেও সেই প্রণালীতে রসাস্বাদ ঘটে। যাহাদের চিত্ত স্বভাবনির্মল এবং কাব্য-রসগ্রহণের উপযোগী, তাহারা কাব্য শুনিতে শুনিতেই তাহার রস আস্বাদ-

কাহারা প্রকৃত রসাস্বাদ করিতে পারে?

১ ভট্টতৌতকৃত।

২ "অন্যে তু কাব্যেঽপি নানালংকারসৌন্দর্যাতিশয়কৃতং রসচর্বণমাহুঃ।"

করিতে পারে। স্বাভাবিক শক্তি যাহাদের কম তাহাদের জন্যই নাট্যপ্রক্রিয়ার প্রয়োজন। নাট্যে প্রত্যক্ষভাবে অভিনয় না দেখা পর্যন্ত তাহাদের চিত্তে রসাস্বাদ অঙ্কুরিত হয় না। চিত্ত যাহাতে সাধারণ লৌকিক অনুভবে পরিণত না হয় সেইজন্য ভরত মাঝে মাঝে গীতবাদ্যাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

অভিনব বলেন যে বিভাবাদি ব্যাপারের দ্বারা যাহা উপস্থাপিত হয় তাহা জ্ঞানে আনন্দময়রূপে প্রকাশ পায়। রতিসুখাদি বাসনা দ্বারা আনন্দের আস্বাদে যে বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঘটে তাহাই বিভিন্ন রসরূপে পরিচিত হয়।[১]

অভিনয় প্রভৃতির দ্বারা হৃদয়স্থ রসকে যাহা প্রকাশিত করে তাহাকে ভাব বলা হয়। ভাবের দ্বারা যেমন রস প্রকট হয়, রসের দ্বারাও তেমনি ভাব প্রকট হয়। "ভাবা রসান্ ভাবয়ন্তি নিষ্পাদয়ন্তি। রসাস্তু ভাবান্ ভাবয়ন্তি ভাবান্ কুর্বন্তি ভাবাদিব্যপদেশ্যান্ কুর্বন্তি।" কবিগত রসানুভূতি সমস্ত রসাস্বাদের বীজ, কাব্য তাহার বৃক্ষ, অভিনয়াদি ব্যাপার সেই বৃক্ষের পুষ্প স্বরূপ, পাঠক বা দর্শকের রসাস্বাদ তাহার ফল। এই দিক্ দিয়াই বিশ্বকে বলা হইয়াছে রসময়।

'ভাব' কি ?

ভরত বলিয়াছেন—"বাগঙ্গসত্ত্বোপেতান্ কাব্যার্থান্ ভাবয়ন্তীতি ভাবাঃ।" কাব্যার্থ বলিতে কাব্যের দ্বারা উপস্থাপিত অভিধেয় স্বরূপ কোনও বস্তু সংক্ষেপ বুঝায় না। 'অর্থ' শব্দের অর্থ অভিধেয় নহে। কাব্য যাহা প্রধানভাবে প্রকাশ করিতে চাহে তাহাই অর্থ। কাব্য প্রধান ভাবে কি প্রকাশ করিতে চায়? রস। এই জন্যই কাব্যার্থ শব্দের অর্থ কাব্য দ্বারা প্রকাশ্য রস। ভরতের মতে আটটি স্থায়ী ভাব, তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাব এবং আটটি অন্য ভাব —এই উনপঞ্চাশটি একত্রিত হইয়া কাব্যরস সঞ্চারিত করে—এই জন্য ইহারা সকলেই ভাব। যে ভাব অন্তর্হৃদয়ের সহিত পরিচয়-প্রযুক্ত আপনাকে চিত্তের মধ্যে ব্যাপ্ত করে তাহাই রসের কারণ। এ জন্য ভাবগুলির আস্বাদ্যমানতাই রস।

কাব্যার্থ = কাব্যদ্বারা প্রকাশ্য রস

ভাব ৪৯ প্রকার

১ কাব্যবিচার, পৃঃ ১২৮।

ভরতের মতে মূল রস চারি প্রকার—শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর ও বীভৎস। শৃঙ্গার হইতে হাস্য, রৌদ্র হইতে করুণ, বীর হইতে অদ্ভুত ও বীভৎস হইতে ভয়ানক রস উৎপন্ন হয়। "অভিনবের মতে[১] পুনরায় রৌদ্র হইতে ভয়ানক এবং শৃঙ্গার হইতে করুণ রসের উৎপত্তিও হইতে পারে। অভিনব কাব্যার্থকে যদিও রস বলিয়া গিয়াছেন এবং কাব্যের একান্ত তাৎপর্য রসের মধ্যেই—ইহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট-ভাবে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তথাপি এই রসের মধ্য দিয়া সমগ্র বিশ্বের যে একটি অন্তর্দৃষ্টি ফুটিয়া উঠে এবং কবি যে তাহার কাব্যের ভিতর দিয়া বিশ্বভুবনের সত্যকে নিত্য-নবোন্মেষিণী বুদ্ধির দ্বারা রসসিক্ত করিয়া প্রকাশ করিয়া ভগবৎপ্রাপ্তির ন্যায় চরমানন্দ লাভ করেন তাহা তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন।"

ভরতের মতে রস ৪ প্রকার

অভিনবের মতে রস চরমানন্দ লাভের উপায়

কবির বাক্যের মধ্য দিয়া কেবল রসগঙ্গাই প্রবাহিত হয় না, "সেই রসগঙ্গার প্রত্যেক ঊর্মির মধ্য দিয়া নব নব সূর্যোচ্ছ্বাসে সত্যের দীপ্তি উদ্ভাসিত ও উন্মেষিত হইয়া উঠে। সত্যকে রসের পথ দিয়া প্রবাহিত করাতেই কবির সার্থকতা।"

(কাব্যবিচার)

অভিনব যেরূপ একমাত্র রসকেই কাব্যের তাৎপর্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার পূর্ববর্তী আর কেহই সেরূপ করেন নাই। তাঁহার পরবর্তীদের মধ্যেও অনেকে সম্পূর্ণভাবে অভিনবের মত গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু বিশ্বনাথ ও কেশব মিশ্র অভিনবকেই অনুসরণ করিয়াছেন। বিশ্বনাথের মতে[২], রসাত্মক বাক্যই কাব্য। কেশব মিশ্র বলেন[৩]—রসই কাব্যের আত্মা। ভোজ বলিয়াছেন, কাব্য নির্দোষ, গুণযুক্ত, অলঙ্কারশোভিত এবং রসান্বিত।[৪] ভোজ

বিশ্বনাথের মত

ভোজ

১ কাব্যবিচার, পৃঃ ১৩৪।

২ সাহিত্যদর্পণ, ১।৩।

৩ অলঙ্কারশেখর।

৪ "নির্দোষং গুণবৎ কাব্যমলংকারৈরলংকৃতম্।
রসান্বিতং কবিঃ কুর্বন্ কীর্তিং প্রীতিঞ্চ বিন্দতি।

অলংকারকে মুখ্যত এবং রসকে গৌণত স্বীকার করিয়াছেন। ক্ষেমেন্দ্র[১] আবার ঔচিত্যকেই প্রধান স্থান দিয়াছেন। তাঁহার মতে লোকে রসকেই কাব্যের আত্মা বলিয়া থাকিলেও ঔচিত্যই রসের প্রাণ। ঔচিত্যের অর্থ 'propriety' বা সদৃশতা। যাহার সহিত যাহা মিলে বা খাপ খায় তাহাকেই ঔচিত্য বলে।

ক্ষেমেন্দ্র

বিশ্বনাথ প্রধানত ভরত এবং অভিনবকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার মত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মোটামুটি তিনি মম্মটকেই অবলম্বন করিয়া তাঁহার গ্রন্থ লিখিয়াছেন, কিন্তু মম্মটের তীব্র সমালোচনা করিতেও তিনি ইতস্তত করেন নাই। মম্মটকৃত লক্ষণের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে কাব্য হইলেই যদি তাহা দোষরহিত হইত তবে অনেক উত্তম কাব্যের মধ্যেও দোষ থাকার জন্য সেগুলিকে বর্জন করিতে হয়। যথার্থভাবে রসকে দূষিত না করা পর্যন্ত দোষই হয় না। অতএব দোষ থাকিলেই কাব্য হইবে না ইহা বলা যায় না। মম্মটপ্রযুক্ত অদোষশব্দের অর্থ ঈষদ্দোষও নহে, কারণ ঈষদ্দোষযুক্ত কাব্যকে কাব্য বলিলে দোষবিহীন কাব্য আর কাব্যপদবাচ্য হইবে না। গুণের পৃথক্ উল্লেখেরও প্রয়োজন নাই, কেননা গুণ তো রসেরই ধর্ম—রস থাকিলে ত গুণ থাকিবে।[২] বিশ্বনাথ বক্রোক্তিকে অলংকারমাত্র মনে করিয়া কুন্তকের কাব্য-লক্ষণকেও নিরাকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং পূর্বোক্ত ভোজের লক্ষণেরও নিন্দা করিয়াছেন। ধ্বনিকারের লক্ষণকেও নিরাকরণ করিতে গিয়া বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—রসধ্বনিকেই একমাত্র কাব্যের আত্মা বলা যাইতে পারে, বস্তু বা অলংকার ধ্বনি কিন্তু কাব্যের আত্মা নহে। এই প্রসঙ্গে নিজের সমর্থনে তিনি 'অগ্নিপুরাণে'র মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রধান প্রধান মতগুলির এইরূপে উল্লেখ ও তাহাদের সমালোচনা করিয়া বিশ্বনাথ রসাত্মক বাক্যকেই বলিয়াছেন কাব্য।[৩]

বিশ্বনাথের রস সম্বন্ধে বক্তব্য

রসাত্মক বাক্যই কাব্য

১ ঔচিত্যবিচারচর্চা—"ঔচিত্যং রসসিদ্ধস্য স্থিরং কাব্যস্য জীবিতম্।"

২ "কাব্যস্য শব্দার্থৌ শরীরং রসাদিশ্চাত্মা, গুণাঃ শৌর্যাদিবৎ, দোষাঃ কাণত্বাদিবৎ, রীতয়োঽ-বয়বসংস্থানবিশেষবৎ, অলংকারাশ্চ কটককুণ্ডলাদিবৎ।" সাহিত্যদর্পণ, ১ম অধ্যায়।

৩ "কাব্য যে রসাত্মক বাক্য—একথার তাৎপর্য এই যে, সমগ্র কাব্য বড় বা ছোট যেমন

মম্মট যদিও রসকে কাব্যলক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই, তবু অলংকারাদির আলোচনা করিতে যাইয়া অজ্ঞাতসারে রসকেই প্রাধান্য দিয়া ফেলিয়াছেন। রসই কাব্যের মুখ্য অর্থ। রসকে আশ্রয় করিয়া যাহা থাকে তাহাকেই বলা হয় শব্দের অর্থ। যে বাক্যে রস আছে তাহারই দোষ সম্ভব। গুণের লক্ষণে মম্মট বলিয়াছেন আত্মার যেমন শৌর্যাদিগুণ, তেমনি রসের যে সকল অঙ্গীভূত ধর্ম অব্যভিচারী ভাবে তাহার উৎকর্ষ উৎপাদন করে তাহাই গুণ। রীতিকে মম্মট অনেকটা গুণের মধ্যেই নিবিষ্ট করিয়াছেন। অতএব মম্মট যদিও অদোষ ও গুণযুক্ত শব্দকেই কাব্য বলিয়াছেন তবুও দোষ এবং গুণের লক্ষণের মধ্যে রসকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন বলিয়া কাব্যলক্ষণের মধ্যে কাব্যার্থকে রস বলিয়া পরিগণনা করায় বাস্তবিক কাব্যলক্ষণের মধ্যে রসকেই প্রধানভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং 'রসগঙ্গাধরে' জগন্নাথ, 'সাহিত্যদর্পণে' বিশ্বনাথ ও 'কাব্যপ্রকাশে' মম্মট রসকে কাব্যলক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই বলিয়া যে দোষ দেওয়া হইয়া থাকে তাহা সর্বাংশে সত্য নহে।[১]

মম্মটের মতের মর্মোদ্ঘাটন

উপরের আলোচনায় বুঝা গেল, সাহিত্য বিচারের প্রধান বিষয়ই রস। অভিনব প্রভৃতির মতে কাব্যের উদ্দেশ্য রসকে অভিব্যক্ত করা। "রস যদি সুন্দর ভাবে অভিব্যক্ত হয় এবং দোষাদি দ্বারা তাহা যদি গুরুতররূপে ব্যাহত না হয় এবং অলংকারাদি দ্বারা যদি তাহা পরিপুষ্ট হয় তাহা হইলেই কাব্যের সফলতা হয়।"[২]

কাব্যের উদ্দেশ্য রসকে অভিব্যক্ত করা

বিশ্বনাথের মতে সত্ত্বগুণের উদ্রেকে হৃদয়ের চমৎকারিতারূপ যে বিস্তার ঘটে, তাহার ফলে পুণ্যশালী লোকোত্তর-চমৎকার-প্রাণ-স্বরূপ ব্রহ্মাস্বাদতুল্য রসকে

হউক একটি সম্পূর্ণ বাক্য বাঙ্ময়ী মূর্তি বা expression; এবং এই expressionই রস।" মোহিতলাল, পৃঃ ৮০ (সাহিত্যকথা)।

দ্রষ্টব্য—সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা, ১ম ভাগ, পৃঃ ৯১।

১ কেশবমিশ্রও বলেন—রসই আত্মা। আত্মা ব্যতীত যেমন শরীর থাকা সম্ভব নহে, রস ব্যতীত কাব্যও সেরূপ অসম্ভব।

২ কাব্যবিচার, পৃঃ ১৪১।

নিজের সহিত অভিন্ন ভাবে আস্বাদন করিয়া থাকেন। চমৎকার শব্দের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে চমৎকারিত্ব হৃদয়ের বিস্তার। হৃদয়ের বিস্তারকে তিনি অদ্ভুতত্ব আখ্যা দিয়াছেন। ইহাই বোধহয় ইংরাজীর 'sublime' বা 'beautiful'। সমস্ত প্রকার রসাস্বাদের সময়েই তাহার প্রাণভূত হইয়া একটি চমৎকারিত্ববোধ বা 'sense of sublimity' থাকে।[১] বিশ্বনাথের পূর্বে চমৎকারিত্ব অদ্ভুত অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। ইহাকে কেহ বলিয়াছেন—'aesthetic attitude', কেহ বা হৃদয়জনিত হ্লাদ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। রস যে ব্রহ্মাস্বাদসহোদর এবং আনন্দাত্মক—মম্মট হইতে বিশ্বনাথ এই তথ্য লইয়াছেন। চমৎকার অর্থে মম্মট আস্বাদ বুঝিয়াছেন।

চমৎকারিত্ব কি

বিশ্বনাথ ও তাঁহার পূর্ববর্তীদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে অভিনবগুপ্ত, মম্মট প্রভৃতি রসের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাই দিয়াছেন, কোনরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করেন নাই। মম্মট ও অভিনবগুপ্ত উভয়ের মতেই সীমাবদ্ধ বাসনার বন্ধনহীন অসীম সাধারণীভাবে স্ফুরণই রসাস্বাদের কারণ, কিন্তু 'ব্যাপারোঽস্তি বিভাবাদেনাম্না সাধারণীকৃতিঃ' (কাব্যালোক)। উভয়ের মতেই সীমাবদ্ধ বাসনার বন্ধনহীন অসীম সাধারণীভাবে স্ফুরণই রসাস্বাদের কারণ, কিন্তু বিশ্বনাথের মতে সাধারণী বৃত্তিরূপে কাব্যার্থ উপস্থাপিত হইলে পরিশেষে হয় সত্ত্বোদ্রেক এবং এই সত্ত্বোদ্রেকের ফলে চিত্ত স্বপ্রকাশ ও আনন্দময় হইয়া দেখা দেয়। সত্ত্বগুণের প্রাচুর্যবশত প্রকাশ ও আনন্দ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারতুল্য, এ কথা বলা হইয়াছে। উপদেশ দিবার জন্য কবি কাব্য রচনা করেন না, মানুষের চিত্তকে পুণ্য, পবিত্র করিবার জন্যও কবি কাব্য রচনা করেন না; তাঁহার সৃষ্ট কাব্য যদি রসোৎপাদনক্ষম হয়, তাহা হইলে মানুষের চিত্ত রস-সম্ভোগের সংগে সংগে পাপমুক্ত হইতে থাকে। মম্মটের মতে, কাব্যরসস্ফূর্তি দ্বারা উন্নতচরিত্র প্রকাশ করিয়া তাদৃশ চরিত্রের প্রতি পাঠক বা দর্শককে আকৃষ্ট করিতে পারে। ভামহ বলেন—যেমন প্রথমে মধু-লেহন করিয়া লোকে পরে তিক্ত ঔষধও পান করিতে পারে, তেমনি কাব্যরস

কাব্যাস্বাদের ফল

[১] "তচ্চমৎকারসারত্বে সর্বত্রাপ্যদ্ভুতো রসঃ।" সা, দ।

মিশ্রিত করিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করাও সাধারণের পক্ষে দুরূহ হয় না। এমন শব্দ নাই, এমন অর্থ নাই, এমন যুক্তি নাই, এমন কথা নাই যাহা কাব্যের অন্তর্ভূত নহে। রাজশেখরের মতে, কবি যে-স্বভাবের, তাঁহার কাব্যও সেই স্বভাবেরই হইবে; চিত্রী (চিত্র-শিল্পী বা চিত্রকর) যে-স্বভাবের, তাঁহার চিত্রও সেই স্বভাবেরই হইবে। বিদ্যানাথ[১] বলিয়াছেন—যে কাব্যে উত্তম পুরুষের বর্ণনা নাই, সে কাব্য সর্বথা পরিত্যাজ্য। এইরূপে কাব্যবর্ণিত বস্তুমাহাত্ম্য ও চরিত্রমাহাত্ম্যের উপরেই কাব্যের উপদেশ দানের ক্ষমতা প্রধানভাবে নির্ভর করে, প্রাচীন আলংকারিকদের অনেকেই ইহা বলিয়াছেন।

ভামহ হইতে আরম্ভ করিয়া দণ্ডী, বামন প্রভৃতি সকলেই ঔচিত্যকে কাব্যের একটি প্রধান গুণ বলিয়াছেন। কুন্তকও ঔচিত্যকে একটি প্রধান স্থান দিয়াছেন। কিন্তু একথা স্বীকার করা যায় না যে, ঔচিত্যবোধ সৌন্দর্যবোধের একটি প্রধান অঙ্গ। ক্ষেমেন্দ্র ঔচিত্যকে ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা করেন নাই। কিন্তু ঔচিত্যের হানি হইলে কোন বস্তুই সুন্দর বলিয়া প্রতীত হয় না—এদিক্ দিয়া ঔচিত্যকে কাব্যের একটি 'essential condition' বলা যায়।

কাব্যে ঔচিত্য

জগন্নাথ কাব্যের লক্ষণ নির্দেশ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, 'রমণীয়ার্থ প্রতিপাদক শব্দই কাব্য'। রমণীয়তা অর্থে জগন্নাথ বুঝিয়াছেন, "লোকোত্তরাহ্লাদজনকজ্ঞানগোচরতা।" যে জাতীয় আহ্লাদের মধ্যে একটি বিশেষ চমৎকারিতা আছে যাহা সহৃদয় রসজ্ঞই একমাত্র অনুভব করিতে পারেন এবং যাহা অপর সকল প্রকার আহ্লাদ হইতে স্বতন্ত্র তাহাই লোকোত্তরাহ্লাদ। সাধারণ লৌকিক বাক্যে এরূপ আনন্দ বা আহ্লাদ জন্মে না—এইজন্য ঐরূপ বাক্য কাব্য নহে। ফলকথা—জগন্নাথের মতে চমৎকারিত্বই কাব্যত্ব। চমৎকার শব্দের দ্বারা তিনি আহ্লাদ বা আনন্দমাত্রই বুঝেন নাই—কাব্যের

জগন্নাথের 'কাব্য'-সংজ্ঞা

চমৎকারিত্বই কাব্যত্ব

১ প্রতাপরুদ্রযশোভূষণে : দণ্ডীর মতেও—

আদিরাজযশোবিম্বমাদর্শং প্রাপ্য বাঙ্ময়ম্।
তেষামসন্নিধানেঽপি ন স্বয়ং পশ্য নশ্যতি॥ কাব্যাদর্শ।

আহ্লাদে যে সৌন্দর্যরূপ বাসনার সহিত স্ফুট চিত্তের মিলনজাত এক অতীন্দ্রিয় (inexplicable) অনুভূতি আছে, তাহাকেই তিনি চমৎকার শব্দের দ্বারা বুঝিতে চাহিয়াছেন।[১]

কবিপ্রতিভাই জগন্নাথের মতে কাব্যোৎপত্তির কারণ। প্রতিভার বৈশিষ্ট্যই কাব্যের বৈশিষ্ট্য। ইহার বিশেষত্ব—যেরূপ শব্দার্থের সাহিত্যে সুকাব্য রচিত হইতে পারে, সেইরূপ বাক্যার্থ কবিচিত্তে সহসা প্রাদুর্ভূত হয়।

কাব্যোৎপত্তির কারণ কবিপ্রতিভা

রসের বর্ণনায় জগন্নাথ বলেন—রস বিভাবাদি দ্বারা ব্যক্ত হয়। বিভাবাদিদ্বারা আত্মচৈতন্যের আবরণ উন্মোচিত হইলে আত্মচৈতন্য আপনাকে প্রকাশিত করে, আর সংগে সংগে রত্যাদিকেও প্রকাশ করিয়া থাকে। বিভাবাদি যখন চিত্তে উপস্থাপিত হয় তখনই তাহারা চিত্তধর্ম বলিয়া পরিগণিত হয়। স্থায়ী যে ভাব তাহার উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই। যোগীর চিত্ত যেরূপ সমাধিতে তন্ময় হইয়া যায়, সহৃদয় রসিকের চিত্তও সেরূপ আনন্দরূপ স্থায়ী ভাবে তদ্গত হইয়া যায়। রসের এই প্রকার যে ব্যাখ্যা জগন্নাথ ইহাকে অভিনব ও মম্মটানুযায়িনী বলিয়া মনে করেন। মুক্তিদশাতে যেরূপ ব্রহ্মস্বরূপ মাত্রই স্ফূর্ত হয়, রসাস্বাদকালে সেইরূপ কেবলমাত্র রসই স্ফূর্ত হয়। সেজন্য ব্রহ্মাস্বাদের সহিত রসাস্বাদের সাদৃশ্য আছে। শ্রুতিও বলিয়াছেন—রসো বৈ সঃ, রসংহ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। (তৈত্তি. উপ., ব্রহ্মানন্দবল্লী, ২।৭)।

রসাস্বাদ ব্রহ্মস্বাদের তুল্য

রসাস্বাদের প্রকার সম্বন্ধে জগন্নাথ নানা মতের অতি নিপুণ আলোচনা করিয়াছেন। রসসম্বন্ধে ভট্টনায়ক, ভট্টলোল্লট, ভট্টশঙ্কুক, অভিনবগুপ্ত যে সরস আলোচনা করিয়াছেন, সহৃদয় পাঠক "সাহিত্য ও রসতত্ত্ব"[২] প্রবন্ধটি পড়িলে তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

ভরত নাট্যশাস্ত্রে রসের যে সংজ্ঞা বা লক্ষণ দিয়াছেন, লোল্লট, শঙ্কুক, ভট্ট-

১ দ্রষ্টব্য Some Concepts of the Alankara Sastra—V. Raghavan. পৃঃ ২৬৮-২৭১।

২ সাহিত্যমীমাংসা—বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, পৃঃ ২১—৭৯।

নায়ক ও অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি প্রত্যেকেই বিভিন্ন উপায়ে সেই সূত্রস্থ সন্দিগ্ধস্থলের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। ভট্টলোল্লটের মতের নাম 'উৎপত্তিবাদ'। তাঁহার মতে কাব্য বা নাট্য জনিত রসবোধ মুখ্য নহে, গৌণ। কবি, সহৃদয়, অনুকার্য এবং অনুকর্তার মধ্যে অনুকার্যই (যথা— দুষ্মন্ত, শকুন্তলা প্রভৃতি) প্রকৃতপক্ষে রসের মুখ্য আশ্রয়।

ভট্টলোল্লটের উৎপত্তিবাদ

ভট্টশঙ্কুকের রসালোচনার নাম 'অনুমিতিবাদ'। শঙ্কুকের মতে রসানুভব কেবল-মাত্র সহৃদয় সামাজিকের পক্ষেই সম্ভব। ভরতের রসসূত্রে "নিষ্পত্তি" পদের অর্থ "অনুমিতি" (inference)। ধূম যেমন পরোক্ষ বহ্নির অনুমাপক, সেইরূপে বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারিভাবও পরোক্ষ অন্তর্গূঢ় স্থায়ী চিত্তবৃত্তির অনুমাপক।"[১] ভট্টনায়কের রসবিষয়ের সিদ্ধান্ত অলংকারশাস্ত্রে 'ভুক্তিবাদ' নামে প্রসিদ্ধ। ভট্ট-নায়কের মতে রস উৎপন্ন হয় না বা অনুমিত হয় না—উহা আত্মগতও নহে, পরগতও নহে।[২] ভট্টনায়ক ভাবকত্ব ও ভোজকত্বরূপে দুইটি বৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে, বিভাবাদি অবলম্বন না থাকিলে রসের প্রতিপত্তি হইতে পারেনা।[৩] কবি-কর্মজনিত রসানুভূতির বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া ভট্টনায়ক অভিধা, ভাবনা এবং ভোগীকৃতি নামে সাহিত্যের তিনট ব্যাপার কল্পনা করিয়াছেন। সামাজিকের রস উদ্বুদ্ধ হইবার পূর্বে এই ব্যাপার তিনটির ক্রিয়া অপরিহার্য। এই ব্যাপার তিনটি রসচর্চার উপযোগী। ইহার মধ্যে পুনরায় ভোগী-কৃতি ব্যাপারটিই মুখ্য, অন্য দুইটি তাহারই অঙ্গ। ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদকে[৪] পরবর্তী টীকাকারগণ সাংখ্য-সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াছেন। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে তাঁহার মত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে রসচর্বণাজনিত আনন্দ সচ্চিদানন্দময় আত্মচৈতন্যেরই

ভট্টশঙ্কুকের অনুমিতিবাদ

ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদ

অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ

১। সাহিত্যমীমাংসা, পৃঃ ৪৫।

২ "রসো ন প্রতীয়তে, নোৎপদ্যতে।"

৩ কাব্যবিচার, পৃঃ ১৬৩।

৪ ভট্টনায়কের গ্রন্থের নাম হৃদয়দর্পণ। এই গ্রন্থের বিশদ আলোচনার জন্য দ্রঃ History of Sanskrit Poetics, পৃঃ ২১২—২১৫।

স্বরূপ। সাংখ্যদর্শনকেই যদি ভট্টনায়ক অনুসরণ করিতেন রসাস্বাদ তবে সুখ ও দুঃখ উভয়াত্মক হইত, কিন্তু ভট্টনায়কের রসচর্বণার মধ্যে দুঃখের লেশমাত্রও নাই। উহা ব্রহ্মাস্বাদসহোদর পরিপূর্ণ আনন্দের আস্বাদ। অতএব ভট্টনায়ক সাংখ্য মতানুসারী নহেন বলিয়াই আমাদের ধারণা। অভিনবগুপ্তের মত আলংকারিক সম্প্রদায়ে 'অভিব্যক্তিবাদ' নামে প্রসিদ্ধ। ইহাই রসচর্বণার শেষ কথা এবং অভিনবই রসতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ মীমাংসক। অভিনবের এই মতবাদের ফলে রসচর্বণা অবাস্তব কাল্পনিকতার রাজ্য হইতে বাস্তব কার্যকারণতত্ত্বের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রসতত্ত্বের কেন্দ্রস্থানীয় ব্যক্তি সহৃদয় সামাজিক, কেননা ঈদৃশ ব্যক্তির হৃদয়েই রসানুভূতির উদ্রেক ঘটিয়া থাকে। বিভাব প্রভৃতি কারণ ও রসাস্বাদরূপ কার্যের অভিন্নতা যাহাতে সুরক্ষিত থাকে, সামানাধিকরণ্য যাহাতে ব্যাহত না হয় তাহাই দেখিতে হইবে। এই সামানাধিকরণ্য স্থাপন করিতে যাইয়া অভিনব বৌদ্ধযোগাচার সম্প্রদায়ের বিজ্ঞানবাদকে আশ্রয় করিয়াছেন। "রস যেরূপ সহৃদয়ের স্বকীয় অসাধারণ অনুভূতিবিশেষ, সেইরূপ তাহার কারণসমূহও দার্শনিক বিচার দৃষ্টিতে সমানভাবেই জ্ঞানস্বভাব। সুতরাং যেহেতু রসরূপ কার্য ও বিভাবাদিরূপ কারণের একই সহৃদয়ের চিত্তে সমাবেশ হইয়া থাকে, অতএব কার্যকারণের সামানাধিকরণ্যের কোনও ব্যতিক্রমই রসানুভূতির স্থলে আশংকা করা যায় না"।[১] অভিনবের মতে—"সংবেদনমেবানন্দঘনমাস্বাদ্যতে। তত্র কা দুঃখাশংকা ? কেবলং তস্যৈব চিত্রতাকরণে রতিশোকাদিবাসনাব্যাপারঃ তদুদ্বোধিনে চাভিনয়াদিব্যাপারঃ।"[২]

অলংকারবাদী সম্প্রদায়ঃ—অলংকার শব্দের বহু বিবর্তন ঘটিয়াছে। রুদ্রদামনের শিলালেখে দেখা যায় খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতক হইতেই গদ্য ও পদ্য অলংকৃত হইয়া আসিতেছে। নাট্যশাস্ত্রে[৩] বলা হইয়াছে যে, কাব্য নাট্যে প্রযুক্ত হইবার জন্য ছত্রিশলক্ষণযুক্ত হওয়া প্রয়োজন, এই লক্ষণগুলির মধ্যে কয়েকটি

১ সাহিত্যমীমাংসা, পৃঃ ৭৫।

২ অভিনবভারতী ; রসবাদের বিশদ আলোচনার জন্য দ্রঃ History of Sanskrit Poetics (Kane), পৃঃ ৩৪০-৩৫৬ ; History of Sanskrit Literature (De & Das Gupta), পৃঃ ৫৯২—৬০৪।

৩ নাট্যশাস্ত্র, ১৭ অধ্যায়।

(যেমন, হেতু, লেশ এবং আশিঃ) পরবর্তী যুগে দণ্ডী প্রভৃতি কয়েকজন প্রাচীন আলংকারিকের গ্রন্থে অলংকারে পরিণত হইয়াছে। ভূষণ অথবা বিভূষণ নামক প্রথম লক্ষণেই নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতা অলংকার ও গুণের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—বিভূষণ অলংকারও গুণ-যুক্ত হওয়া দরকার। নাট্যশাস্ত্রে[১] চারিটি নাট্যালংকারের কথা বলা হইয়াছে—উপমা, রূপক, দীপক ও যমক। বামন অলংকারকে দুইটি অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে পূর্বেই বলিয়াছি। এক অর্থে সৌন্দর্যমাত্রই অলংকার—আর এক অর্থে উপমা, দৃষ্টান্ত প্রভৃতি অলংকার, কেননা তাহারা প্রযুক্ত হইয়া কাব্যের সৌন্দর্যবর্ধন করে। দণ্ডী অলংকারকে আরও ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন।

অলংকারের বিবর্তন

এই সম্প্রদায়ের প্রধান প্রতিনিধি ভামহ এবং উদ্ভট। দণ্ডী, রুদ্রট এবং প্রতীহারেন্দুরাজকেও এই সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত বলা যাইতে পারে। এই আলংকারিকগণ যে রসবাদের সহিত পরিচিত ছিলেন না, তাহা মনে করা ঠিক নহে। উদ্ভট রসবৎ অলংকারের লক্ষণ করিতে যাইয়া স্থায়িভাব, বিভাব, সঞ্চারি (বা ব্যভিচারি) ভাব এবং নয়টি রসের নামোল্লেখ করিয়াছিলেন। দণ্ডীও রসবৎ এবং ঊর্জস্বি অলংকারের লক্ষণ বলিয়াছেন এবং "মধুরং রসবদ্বাচি বস্তুন্যপি রসস্থিতিঃ"[২] বলিয়াছেন। তিনি আটটি রস এবং তাহাদের স্থায়িভাবের সহিত সম্পূর্ণই পরিচিত ছিলেন। রুদ্রটও রসের উল্লেখ করিয়াছেন।[২] এই সকল দেখিয়া মনে হয়, 'প্রাচীন আলংকারিকগণের অনেকেই রসবাদ সম্বন্ধে সচেতন থাকিলেও কিভাবে কাব্যে তাহার সম্যক্ প্রয়োগ করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না—তাঁহাদের নিকট কাব্যের সর্বাধিক প্রয়োজনীয় উপাদানই ছিল অলংকার—এবং তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে অলংকারের তুলনায় রসের স্থান গৌণ। ভামহ এবং দণ্ডী অলংকার

ভামহ ও উদ্ভট প্রধানত অলংকারবাদী

দণ্ডী অলংকার ও গুণের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখান নাই

---

১ কাব্যাদর্শ, ৯।৫১

২ রুদ্রট ১২।২।

এবং গুণের মধ্যে কোনো পার্থক্যই দেখান নাই। উভয়ের মতেই 'ভাবিক' একটি গুণমাত্র। দণ্ডী দশটি গুণকে অলংকারের ব্যাপক লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। 'কাব্যাদর্শের' দ্বিতীয় অধ্যায়ে দণ্ডী নাটকের সন্ধিগুলির ৬৪ অঙ্গ, বৃত্তির ১৬ অঙ্গ এবং নাট্যশাস্ত্রোক্ত ৩৬ লক্ষণকেই অলংকারের অন্তর্গত বলিয়াছেন।[১] 'অলংকারসর্বস্বের' মতে "উদ্ভটাদিভিস্তু গুণালংকারাণাং প্রায়শঃ সাম্যমেব সূচিতম্ ।...তদেবমলংকারা এব কাব্যে প্রধানমিতি প্রাচ্যানাং মতম্"। ভামহ এবং দণ্ডী প্রভৃতি তাঁহাদের গ্রন্থে প্রতীয়মান অর্থের উল্লেখ করিলেও কোথাও ধ্বনি বা গুণীভূতব্যঙ্গ্যের কথা বলেন নাই। তাঁহাদের অলংকারলক্ষণের মধ্যে (যেমন অপ্রস্তুতপ্রশংসা, সমাসোক্তি, আক্ষেপ প্রভৃতিতে) তাঁহারা প্রতীয়মানত্বের অর্থ (sense) আনিয়া ফেলিয়াছেন। ধ্বনির অন্যান্য সব কিছুকেই তাঁহারা পর্যায়োক্ত অলংকারের অন্তর্গত করিয়াছেন। এ বিষয়ে জগন্নাথের উক্তি বিশেষভাবে উপভোগ্য।[২] ভামহ এবং দণ্ডী ধ্বনিকে (অথবা ব্যঙ্গ্যকে) কাব্যের সর্বস্ব বলিয়া উল্লেখ না করিলেও বক্রোক্তি অথবা অতিশয়োক্তিকে কাব্যের সর্বপ্রধান উপাদান বলিয়াছেন এবং সকল অলংকারের মূলীভূত বস্তুই অতিশয়োক্তি—ইহাই তাঁহাদের মত।[৩] রুদ্রট ভাবাখ্য অলংকারের লক্ষণে বলিয়াছেন যে, যে বস্তুতে ব্যঙ্গ্য আছে তাহাই ভাব। অতএব তিনিও ব্যঙ্গ্য অর্থের সহিত পরিচিত ছিলেন। দণ্ডী এবং ভামহ অলংকারকে যে অপরিসীম প্রাধান্য দিয়াছিলেন তাহা পরবর্তী যুগেও বেশ প্রবল ছিল, এমন কি, মম্মট যদিও পুরাপুরি 'ধ্বন্যালোকে'র সমর্থক ছিলেন, তবু তাঁহার 'কাব্যপ্রকাশে' তিনি অন্যান্য বিষয়ের অপেক্ষা অলংকারের আলোচনা দীর্ঘতর ভাবে করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন লেখকের আলোচনায় যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে অলংকারের সংখ্যা দুইশতের অধিক দাঁড়ায়।[৪]

অলংকারের মোট সংখ্যা দুই শতের বেশী

১ কাব্যাদর্শ, ২।৩৬৭।

২ রসগঙ্গাধর, পৃঃ ৪১৪-৪১৫।

৩ কাব্যাদর্শ, ২।২২০।

৪ এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য Use and Abuse of Alankara Sastra—V. Raghavan, পৃঃ ৪৮-৯১।

অলংকারের আলোচনায় কয়েকটি প্রসঙ্গ আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে, যেমন অলংকারের শ্রেণীকরণ, বিভিন্ন গুণ ও অলংকারের পার্থক্য, তাহাদের সংখ্যা এবং পরিশেষে রস এবং ধ্বনিবাদে অলংকারের স্থান। সংক্ষেপে এগুলির আলোচনা করিব। ভামহ অলংকারকে শব্দালংকার এবং অর্থালংকার দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। দণ্ডীও এই শ্রেণীগত বিভাগ স্বীকার করিয়াছেন, কেননা 'কাব্যাদর্শে'র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি অর্থালংকারের ও তৃতীয়ে শব্দালংকারের আলোচনা করিয়াছেন। উদ্ভট প্রথমে চারিপ্রকারের শব্দালংকারের আলোচনা করিয়া পরে অর্থালংকারের আলোচনা করিয়াছেন। শ্লেষকে শব্দশ্লেষ ও অর্থশ্লেষে ভাগ করিয়া অর্থালংকারের অন্তর্ভুক্ত করাতে উদ্ভটকে মম্মট কঠোর ভাবে সমালোচনা করিয়াছেন। রুদ্রট প্রথমে শব্দালংকার ও পরে অর্থালংকারের আলোচনা করিয়াছেন। 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণে'[১] ভোজ অলংকারকে শব্দার্থের শ্রেণীতে ফেলিয়াছেন এবং প্রত্যেকটি শ্রেণীর অন্তর্গত ২৪টি অলংকারের সংজ্ঞা, লক্ষণ ও উদাহরণ দিয়াছেন। উপমা রূপক অপহ্নুতি ও অর্থান্তরন্যাস ভোজের মতে একাধারে শব্দে ও অর্থে অলংকার। এবিষয়ে 'অগ্নিপুরাণ' ও 'চমৎকার-চন্দ্রিকা' ভোজের সহিত একমত। ভোজ বাঙ্ময়কে[২] বক্রোক্তি, রসোক্তি ও স্বভাবোক্তিরূপে দেখিয়াছেন। গুণ এবং রসকে ভোজ অলংকারের অন্তর্গত বলিয়াছেন।[৩] 'অলংকারসর্বস্বে' অলংকারকে সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে (সাদৃশ্য, বিরোধ, শৃঙ্খলাবন্ধ, তর্কন্যায়, কাব্যন্যায়, লোকন্যায় ও গূঢ়ার্থপ্রতীতি)। বিশ্বনাথ অলংকারের শ্রেণীবিভাগের মূলনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া গুণ হইতে অলংকারের পার্থক্য কোথায় তাহা

শব্দালংকার ও অর্থালংকার ভেদে অলংকার দ্বিবিধ

ভোজ কর্তৃক অলংকারের শ্রেণী বিভাগ

১ সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, ২।১।

২ ঐ, ৫।৮।

৩ "Bhoja classified Alankaras into those of Sabda; Bahya, those of Artha, Abhyantara and those of both Sabda and Artha, Bahyabhyantara."
—Raghavan

দেখাইয়াছেন। ভরত চারিটি অলংকার ও দশটি গুণের উল্লেখ করিয়াছেন; বামন গুণ ও অলংকার প্রসংগে বলিয়াছেন 'কাব্যশোভায়াঃ কর্তারো ধর্মা গুণাঃ তদতিশয়হেতবস্ত্বলংকারাঃ। ধ্বন্যালোকেই গুণ ও অলংকারের সম্বন্ধ প্রথম সুস্পষ্টভাবে স্থিরীকৃত হইয়াছে।[১] মম্মট প্রভৃতি পরবর্তী আলংকারিকগণের প্রায় সকলেই গুণকে কাব্যের আত্মধর্ম বলিয়াছেন এবং অলংকার রমণীদেহের অথবা মানবদেহের ভূষণের ন্যায় কাব্যদেহের শোভাকর বলিয়াছেন।

বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে ১৮টি অলংকারের উল্লেখ আছে। ভট্টি, দণ্ডী, ভামহ, উদ্ভট, বামন ৩০ হইতে ৪০ অলংকারের আলোচনা করিয়াছেন। মম্মট ৬১, রুয্যক ৭৫, চন্দ্রালোক ১০০ এবং কুবলয়ানন্দ ১১৫টি অলংকারের লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন। 'ব্যক্তিবিবেকে' বলা আছে যে অলংকারের অনেক প্রকারভেদ থাকা সত্ত্বেও সুকবি মাত্র কয়েকটির প্রয়োগেই তাঁহার কার্যসিদ্ধি করিতে পারেন—উপমাই সকল অলংকারের প্রাণ এবং লক্ষ্যোপমাই সর্বাধিক উপভোগ্য।

অলংকার বহুপ্রকার হইলেও মাত্র কয়েকটির সুনির্বাচিত প্রয়োগেই সুকাব্য রচনা করা যাইতে পারে

উপরে অলংকারবাদী সম্প্রদায়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু কাব্যের আত্মা সম্বন্ধে অলংকারবাদীর কি মত বা অলংকারের সহিত ব্যাকরণের সম্বন্ধ কতদূর-এ সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন আছে। "বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতি" বা বক্রোক্তিই সাহিত্যিক সৌন্দর্যের নিদান। সাহিত্যমীমাংসকসম্প্রদায় যে সকল উক্তিবৈচিত্র্য অলংকার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন সে সকলেরই মূলে আছে বক্রতা।[২] এই বক্রোক্তিরই অপর নাম অলংকার। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, অতিশয়োক্তি, সমাসোক্তি, অপ্রস্তুতপ্রশংসা প্রভৃতি অলংকার এই বক্রোক্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। কুন্তক এই বক্রোক্তিকেই কাব্যের প্রাণস্বরূপ বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। "বক্রতাই যে অলংকারের 'জীবাতু' তাহা স্পষ্টই বুঝা গেল। প্রাচীন আলংকারিকগণের 'কাব্য' লক্ষণ পর্যালোচনা করিলে

বক্রতাই অলংকারের ভিত্তিস্বরূপ

১ তমর্থমবলম্বন্তে যেঽঙ্গিনং তে গুণাঃ স্মৃতাঃ। অঙ্গাশ্রিতাস্ত্বলংকারা মন্তব্যাঃ কটকাদিবৎ॥

২ সাহিত্যমীমাংসা, পৃঃ ৮২।

সাহিত্যক্ষেত্রে অলংকারের প্রাধান্য অতি সুস্পষ্টভাবে লক্ষিত হইবে।"[১] পূর্বে ইহার সবিশেষ আলোচনা করা হইলেও এই স্থলে তাহাদের কিঞ্চিৎ পুনরাবৃত্তি হয়ত অপ্রাসঙ্গিক নহে।

ভামহ বলিয়াছেন, "সুন্দরীর মুখচ্ছবি যতই কমনীয় হউক, ভূষাহীন হইলে তাহা কখনই শোভা পায় না।" বামনের মতে,"অলংকারবশতই কাব্য সহৃদয়গণের আস্বাদযোগ্য হইয়া উঠে।" "সাধারণ লৌকিক বুদ্ধিতে সত্যই কাব্যের সহিত অলংকারের সম্বন্ধ এমনই অবিচ্ছেদ্য বটে।' সাহিত্যবিচারে অলংকারের এই অত্যধিক প্রাধান্যই সাহিত্যমীমাংসাশাস্ত্রকে অলংকারশাস্ত্র আখ্যা দিয়াছে।" সংস্কৃত সাহিত্য-বিচারের যে কোনও গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে উহার প্রতিপাদ্য বিষয় শুধু অলংকারই নয় ধ্বনি, রস, রীতি গুণ, দোষ প্রভৃতির বিশ্লেষণ এবং মীমাংসাও উহার উদ্দেশ্য। কিন্তু অলংকার বিচার আর সকল বিচারকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে।"[২]

অলংকার কাব্যের শোভাবর্দ্ধক

সাহিত্যবিচারে অলংকারের প্রাধান্য

যমক, অনুপ্রাস প্রভৃতি শব্দালংকার এবং উপমা, রূপক প্রভৃতি অর্থালংকার যে সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের প্রাথমিক পর্যায়ে কবিকৃতির অপরিহার্য সামগ্রী ছিল তাহাতে বিস্ময়ের কোনো কারণ নাই। পূর্বে যাহা স্থূল ছিল, এখন তাহা সূক্ষ্ম হইয়াছে। নূতন নূতন অলংকার নিত্যই উদ্ভাবিত হইতেছে; বাক্যযোজনায় কত নূতন বৈচিত্র্য। এ সমস্তই কাব্যসৌন্দর্য সাধনের জন্য। কেননা, সৌন্দর্যই তো অলংকার।

"ভামহ, দণ্ডী প্রভৃতি কাব্যালংকারগুলির সাহিত্যক্ষেত্রে যে একটি বিশিষ্ট স্থান নির্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন, ইহা তাঁহাদের সুরুচিবোধের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়"।[৩] কিন্তু তাঁহাদের মতে অলংকারকে বাদ দিয়া কবিকর্মের কোনও অস্তিত্বই থাকিতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, কবচকুণ্ডলাদি

১ সাহিত্যমীমাংসা পৃঃ ৮২।

২ ঐ

—পৃঃ ৮৩

অপসারিত করিলে ভূষণহীন নারীদেহের কি কোনও সৌন্দর্যই অবশিষ্ট থাকে না? কোন সৌন্দর্যরসিক ব্যক্তিই তাহা স্বীকার করিবেন না। কাব্যের স্থলেও অলংকারচ্যুতি কাব্য-সৌন্দর্যের ব্যাঘাত করিলেও উহার লোপ করিতে পারে না। উপমা, রূপক প্রভৃতি সমস্ত অলংকার বিযুক্ত করিয়া লইলেও ভূষণহীন কাব্যশরীরের যে কান্তি আপন মহিমায় দীপ্তি পাইতে থাকে, যাহা কাব্যদেহের লাবণ্যস্বরূপ, তাহাই কাব্যবস্তুর আত্মা বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য।[১] এই লাবণ্যের অপর নাম ধ্বনি।

অলংকার কি কাব্যের অবশ্য প্রয়োজনীয় অংগ

ভামহ প্রভৃতি প্রাচীন আচার্যগণ লৌকিক অলংকারের সমস্ত ধর্ম সাহিত্যিক অলংকারের উপর নিঃশেষে অর্পিত করিয়াছেন। কাব্যালংকারগুলি যে কটক কুণ্ডলাদি হইতে কোনও অংশে পৃথক্ হইতে পারে এই আশংকার কোনও আভাস তাঁহারা দেন নাই। কিন্তু আনন্দবর্ধন দেখাইলেন সাহিত্যের যাহা মূলীভূত তত্ত্ব অর্থাৎ রসধ্বনি, অলংকার তাহারই অনুযায়ী হইবে। অলংকারের কোনও পৃথক্ সৌন্দর্য নাই। "শবশরীরে অলংকারসংযোজনের দ্বারা কোন সৌন্দর্য সাধন করা যায় না, সেখানে আত্মার অস্তিত্ব নাই" (অভিনবগুপ্ত)। রসই উপেয়, অলংকার তাহার উপায় মাত্র। উত্তম কাব্যে শব্দ ও অর্থের সহিত অলংকারের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। "উত্তম কাব্যে অলংকার কোন আগন্তুক ধর্ম নহে, উহা শব্দার্থেরই অন্তরঙ্গ বিলাস।"[৩] প্রকৃত অলংকার কবির চিন্তাধারারই অন্তরঙ্গ রূপ মাত্র। সুকবি যে সকল অলংকার রচনা করেন তাহা কাব্য শরীরের সহিত দৃঢ়সংবদ্ধ—'ললাটিকা'র ন্যায়। প্রথমত অলংকার বলিয়া তাহাদের চেনাই যায় না—শব্দ ও অর্থের সহিত তাহাদের একাত্মতা এমনই প্রগাঢ়। মহাকবিদের অলংকার রচনার ইহাই বৈশিষ্ট্য। বাচ্যালংকারে এই একাত্মীয়তা সম্ভব নহে। "কবির অন্তর্গূঢ় রসবীজ আপন প্রাণশক্তির উল্লাসবশে

আনন্দবর্ধনের মতে অলংকারের রসধ্বনি ছাড়া কোন পৃথক সৌন্দর্য নাই

১ সাহিত্যমীমাংসা, পৃঃ ৮২-৮৩।

২ ঐ —পৃঃ ৮৪।

৩ ঐ —পৃঃ ৮৬

শব্দ, অর্থ, অলংকাররূপে আপনাকে অঙ্কুরিত, কুসুমিত, মঞ্জরিত করিয়া তুলে, সর্বশেষে পরিণত হয় সহৃদয়ের রসচর্বণায়।"[১]

কাব্যশরীরের সহিত অলংকারের সম্বন্ধ আলোচিত হইল। এক্ষণে ব্যাকরণের সহিত তাহার সম্বন্ধের কথা বলিতেছি। ব্যাকরণ যেমন পদের প্রকৃতি ও অর্থ লইয়া ও বিভিন্ন পদের পারস্পরিক সম্বন্ধ লইয়া ব্যস্ত, অলংকারশাস্ত্রও তেমনি পদ ও বাক্যের অর্থগত সৌন্দর্য ও মনোহারিত্ব লইয়া ব্যাপৃত। বৈয়াকরণের সহিত আলংকারিকের যে একটি ঘনিষ্ঠ যোগ আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। আনন্দবর্ধন বাক্যের দুই প্রকার অর্থ স্বীকার করিয়াছেন—বাচ্যার্থ ও প্রতীয়মানার্থ। মহাকবিদের বাক্যে এমন একটি বিশেষ অর্থ প্রকাশ পায়, যাহা তাহার সাধারণ অর্থের অতীত। শব্দের যাহা প্রসিদ্ধ অর্থ তাহাকে অতিক্রম করিয়া এই নূতন বস্তুটির সন্ধান পাওয়া যায় না। বাচ্যার্থের সাহায্যেই প্রতীয়মান অর্থকে অন্বেষণ করিতে হইবে। শব্দ বা তাহার সাধারণ অর্থ যখন আপনাকে গৌণ রাখিয়া আর একটি বস্তুকে প্রধান করিয়া প্রকাশ করে তখনই এই প্রতীয়মান অর্থ ধ্বনিত হইয়া উঠে।

ব্যাকরণের সহিত অলংকারের সম্পর্ক

উপরের আলোচনা হইতে বলা যায় যে, "ব্যাকরণ যেমন পদের সহিত পদের অর্থে অন্বয়-নিরূপণ করিয়া একটি অখণ্ড বাক্যার্থকে দ্যোতিত করে, অলংকার-শাস্ত্রও তেমনি শব্দসৌষ্ঠব ও অর্থসৌষ্ঠবের সমন্বয়ে মহাকবিদের বাক্যে কেমন করিয়া নূতন অর্থ, নূতন সাদৃশ্য বা নূতন রসলাবণ্য প্রোদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতে পারে, তাহারই অনুসন্ধানে ব্যস্ত।"[২] শব্দের অভিধা এবং লক্ষণা নামক যে দুই বৃত্তি আলংকারিকেরা স্বীকার করেন তাহাতে বৈয়াকরণদের অনুসরণ করা হইয়াছে। অভিনবগুপ্ত ব্যঞ্জনা বা ধ্বনিকেও বৈয়াকরণদের স্ফোটের ন্যায় একরূপ স্ফোট বলিয়াছেন। এইজন্য ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মনে করেন, বৈয়াকরণদের মধ্য হইতেই আলংকারিকদের উৎপত্তি হইয়াছিল[৩]।

সম্ভবত ব্যাকরণ অলংকারের জনক

১ সাহিত্যমীমাংসা, পৃঃ ৮৯।

২ কাব্যবিচার, পৃঃ ৪।

৩ History of Sanskrit Literature (Das Gupta & De), পৃঃ ৫১৩-৫১৭।

রীতিবাদী সম্প্রদায় :—এই সম্প্রদায়ের সর্বপ্রধান প্রতিনিধি বামন। অপরের মতে রীতি কি বস্তু সে সম্বন্ধে দণ্ডীও কাব্যাদর্শে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। পরবর্তী যুগের প্রায় সকল লেখকই রীতির সম্বন্ধে কিছু না কিছু বলিয়া গিয়াছেন। বামন গুণ ও অলংকারের মধ্যে পার্থক্য দেখাইয়াছেন তাঁহার স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া। বামন শব্দের দশটি গুণ এবং অর্থেরও সেই দশটি গুণেরই কথা বলিয়াছেন। সেগুলি যথাক্রমে ওজঃ, প্রসাদ, শ্লেষ, সমতা, সমাধি, মাধুর্য, সৌকুমার্য, উদারতা, অর্থব্যক্তি, কান্তি। দণ্ডীও দশটি গুণের অনুরূপ নামকরণ করিয়াছেন কিন্তু শব্দগুণ ও অর্থগুণের মধ্যে কোনো পার্থক্য তিনি দেখান নাই। অধ্যাপক কানের মতে গুণবাদ সুপ্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত ছিল। রুদ্রদামনের শিলালেখে যে মাধুর্যাদি গুণের উল্লেখ আছে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কৌটিল্যও কয়েকটি গুণের কথা বলিয়াছেন। বাণভট্ট 'হর্ষচরিতে'[১] বলিয়াছেন যে ভারতের বিভিন্নাংশের কবিগণ কাব্যের বিভিন্ন দিকের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আয়ত্ত করিয়াছিলেন। বাণ নিঃসন্দেহে যে কোন অলংকার-শাস্ত্র প্রণেতার পূর্ববর্তী। এইস্থলে আমরা গৌড়ী ও দাক্ষিণাত্যা দুইটি বিভিন্ন রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ পাই। দণ্ডী কিন্তু কোথাও রীতি শব্দটি ব্যবহার করেন নাই[২]; তৎপরিবর্তে তিনি মার্গ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি পরিষ্কারই বলিয়াছেন যে কয়েকটি রীতি প্রচলিত আছে যাহাদের ভিতর সূক্ষ্ম পার্থক্য বর্তমান; কিন্তু তিনি গৌড়ীয় মার্গকে পৌরস্ত্যমার্গ বলিয়াছেন এবং মাত্র দুইটি রীতি—বৈদর্ভী ও গৌড়ী—বর্ণনা করিয়াছেন।[৩] গৌড়ীয় মার্গের বর্ণনা-কালে দণ্ডী বাণপ্রযুক্ত ডম্বর শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের রচনাশৈলীকে তিনি বৈদর্ভী রীতি আখ্যা দিয়াছেন। রচনাশৈলীর পরিবর্তে

দণ্ডী ও বামন প্রধানত রীতিবাদী

দণ্ডী 'রীতি'র পরিবর্তে মার্গ শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন

১ "শ্লেষপ্রায়মুদীচ্যেষু প্রতীচ্যেষ্বর্থমাত্রকম্। উৎপ্রেক্ষা দাক্ষিণাত্যেষু গৌড়েষ্বক্ষরডম্বরঃ॥" (হর্ষচরিত, ভূমিকা, শ্লোক ৭)।

২ দ্রঃ Concepts of Riti and Guna in Sanskrit Literature by Dr. Prakas chandra Lahiri (D. U.), কাব্যাদর্শ, প্রথম পরিচ্ছেদ।

৩ রীতি প্রতি কবিভেদে ভিন্ন হইতে পারে।

তিনি স্থলে স্থলে বর্ত্মশব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। রাজশেখরের কাব্য-মীমাংসাতেও রচনাশৈলী বুঝাইতে মার্গশব্দের ব্যবহার হইয়াছে। ধ্বন্যালোক[১] বলিয়াছে—"এতদ্ধ্বানপ্রবর্তনেন নির্ণীতং কাব্যতত্ত্বমস্ফুটস্ফুরিতং সদশক্নুবদ্ভিঃ প্রতিপাদয়িতুং বৈদর্ভী গৌড়ী পাঞ্চালী বেতি রীতয়ঃ প্রবর্তিতাঃ। অধ্যাপক কানের মতে সম্ভবতঃ এখানে বামনের প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে। ধ্বন্যালোক রীতির সম্বন্ধে অল্পই আলোচনা করিয়াছে—তৎপরিবর্তে বৃত্তি এবং সঙ্ঘটনার উপর অনেক বেশী আলোচনা ইহাতে হইয়াছে।

নাট্যশাস্ত্রও উপরিউক্ত দশটি গুণেরই আলোচনা করিয়াছে।[২] নাট্যশাস্ত্রে গুণ এবং অলংকারের স্থান গৌণ। রসই নাট্যশাস্ত্রে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। দণ্ডী কিন্তু গুণগুলিকে[৩] যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়াছেন এবং গুণ ও অলংকারের আলোচনাতেই প্রায় তাঁহার গ্রন্থটি পরিপূর্ণ। দণ্ডীর মতে দশটি গুণ বৈদর্ভ মার্গ বা বৈদর্ভী রীতির প্রাণস্বরূপ, কিন্তু গৌড়ীয় মার্গে এই গুণগুলির অনবস্থিতিই বৈশিষ্ট্য সূচিত করে।[৪] কেবল অর্থব্যক্তি, উদারতা ও মাধুর্য দুইটি রীতিতেই দেখা যায়। এস্থলে স্মরণীয় যে বৈদর্ভী রীতির গদ্য রচনাতে ওজোগুণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইত, কিন্তু পদ্যে নহে। গৌড়ীয় রচনায় কিন্তু পদ্যেও ওজোগুণ একটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। দণ্ডী বলিয়াছেন, সমাধি গুণই কাব্যের সর্বস্ব। কিন্তু ইহাতে তাঁহার মতে সমাধিগুণ যে কাব্যের আত্মাস্বরূপ এইরূপ প্রতীতি হয় না। ভামহ গৌড়ীয় ও বৈদর্ভ মার্গের মধ্যে পার্থক্য অস্বীকার করিয়াছেন। বামন ঘোষণা করিয়াছেন যে রীতিই কাব্যের আত্মা, বিশিষ্ট পদরচনাই রীতি এবং গুণযুক্ত হইলেই পদে আসে বৈশিষ্ট্য। এ সম্বন্ধে পূর্বেই কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। বামন তিনটি রীতির কথা বলিয়াছেন (গৌড়ীয়া,

দণ্ডীর মতে গুণ দশটি

মার্গ ২টি

বামনের মতে রীতিই কাব্যের আত্মা

১ ধ্বন্যালোক ও লোচন—সেনগুপ্ত ও ভট্টাচার্য, পৃঃ ২৪৮।

২ ১৭।৯৬

৩ কাব্যাদর্শ ১।৪০-১০১।

৪ ঐ ১।৪২; "In poetic expression there is always a finally analysable scheme of two definite styles, the simple and the grandiloquent, the plain and the elevated, the unadorned and the figurative."—Raghavan.

বৈদর্ভী ও পাঞ্চালী)। গৌড়ীয়া রীতিতে বামনের মতে ওজোগুণ এবং কান্তিগুণের প্রাধান্য, কিন্তু বৈদর্ভীতে সবগুলিরই সমান প্রাধান্য। পাঞ্চালীর বৈশিষ্ট্য মাধুর্য ও সৌকুমার্য গুণের ব্যবহারে। কি কারণে রীতিত্রয়ের নামগুলি ঐরূপ হইয়াছে বামন তাহার ব্যাখ্যা দিয়াছেন। এস্থলে অবশ্য স্মরণীয় যে বিভিন্ন গুণের সংজ্ঞা লইয়া ভরত, দণ্ডী ও বামনের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে, যদিও কতকগুলির সংজ্ঞায় আবার মতৈক্যও দেখা যায়। অলংকারবাদী লেখকগণ অলংকারকে কাব্যের অবশ্যপ্রয়োজনীয় উপাদান বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু রীতিবাদী সম্প্রদায় অলংকারবাদী লেখককে কাব্যলক্ষণের বিচারে বহুদূর ছাড়াইয়া গিয়াছেন। অলংকারের প্রাধান্য কাব্যে সত্যই গৌণ, কারণ অলংকার ছাড়াও কাব্যের অস্তিত্ব অনায়াসেই স্বীকার করা যায়। কিন্তু রীতিবাদ যদিও কাব্যের আত্মভূত বস্তুতে পৌঁছাইতে পারে নাই, তবু ইহার অতি নিকটেই পৌঁছিয়াছে। অলংকারকে কাব্যের প্রাণস্বরূপ বলিয়া মনে করার পরিবর্তে এই সম্প্রদায় গুণকেই কাব্যের আত্মভূত বলিয়াছেন। "The riti school was not yet well aware of that to which the gunas belonged. It is therefore that the Dhvanikarika says about the riti school asphuta-sphutitam etc."[১] বামন তাঁহার বক্রোক্তিতে সকল অবিবক্ষিত বাচ্যধ্বনিকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন এবং কান্তি-গুণের মধ্যে তিনি রসগুলির অস্তিত্বকে মানিয়া লইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে গুণ রসেরই অঙ্গীভূত, আর রসই কাব্যের আত্মা।[২]

রীতি ৩টি

রীতিবাদ কাব্যের আত্মস্বরূপের অতি নিকটেই পৌঁছাইয়াছে

ভামহ গুণের অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন এবং মাধুর্য, প্রসাদ ও ওজোগুণের কথা বলিয়াছেন। মম্মট এবং হেমচন্দ্র প্রভৃতি পরবর্তী আলংকারিক অন্যান্য গুণকে এই তিন গুণেরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করেন। রীতির সংখ্যা অলংকার শাস্ত্রে লেখকভেদে বিভিন্ন রূপ হইয়াছে। ভোজ সরস্বতীকণ্ঠাভরণে

১ History of Sanskrit Poetics (Kane, 1951 ed.), পৃঃ ৩৬৪।

২ দ্রঃ ধ্বন্যালোক, পৃঃ ৭৮-৮২।

বামনোক্ত তিনটি রীতি ছাড়া আবন্তী, মাগধী ও লাটী—এই তিন রীতিও আছে বলিয়াছেন।

বৃত্তি এবং প্রবৃত্তি কাহাকে বলে এবং রীতির সহিত তাহাদের সম্বন্ধ কিরূপ সে সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। ভরত নাট্যশাস্ত্রে চারিটি বৃত্তির কথা বলিয়াছেন এবং বৃত্তিগুলিকে নাট্যের মাতৃস্বরূপা মনে করিয়াছেন। 'সাহিত্য-দর্পণে'র[১] মতও তাহাই। ধ্বন্যালোক ব্যবহারকেই বৃত্তি বলিয়াছেন। কাব্য প্রকাশে উপনাগরিকা নামক বৃত্তি মাধুর্যগুণযুত অক্ষরসমন্বিতা বলা হইয়াছে। মম্মট বলেন যে, বামন এবং অন্যান্য আলংকারিকগণ উপনাগরিকা, পরুষা ও কোমলা বৃত্তিকে যথাক্রমে বৈদর্ভী, গৌড়ী ও পাঞ্চালী রীতি বলিয়াছেন। রুদ্রট চারিটি রীতির উল্লেখ করিয়াছেন। 'নাট্যশাস্ত্র' চারিটি প্রবৃত্তির কথা বলিয়াছে. 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণে'ও বৃত্তির ছয়টি প্রকারভেদ বর্ণিত হইয়াছে।[২] ডাঃ রাঘবনের মতে, "The concept of Pravritti in manners is Riti in speech, in literature. Riti is literary manner."

রীতি ও style

প্রায়ই বলা হইয়া থাকে যে, সংস্কৃতে যাহাকে আমরা রীতি বলিয়া থাকি তাহা মোটেই ইংরাজীর "style" নহে। ডঃ সুশীলকুমার দে বলিয়াছেন[৩] যে, ইংরাজী style শব্দে আছে একটা "distinct subjective valuation" যাহা সংস্কৃত রীতিশব্দে নাই। কিন্তু রীতি বলিতে আবার "the expression of poetic individuality" বুঝায় না ; রীতি বলিতে প্রকৃত পক্ষে বুঝায় "the outward presentation of its beauty called forth by a harmonious combination of more or less fixed literary excellences." দুইটি কারণে রীতিকে ইংরাজী style-এর বাংলা প্রতিশব্দ বলা যায় না :—প্রথমত ইংরাজী style শব্দটির অর্থ অতি ব্যাপক। ইহার দ্বারা আমরা রচনার বিষয়বস্তু, লেখকের ব্যক্তিত্ব ও

১ সাহিত্যদর্পণ, ৬।১২২-১২৩ (Kane's ed.)

২ রীতিবাদ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার জন্য দ্রঃ Kuppuswami Sastri Commemoration volume, পৃঃ ৮৯-১১৮, Some Concepts of Alankara Sastra, পৃঃ ১৩১-১৮১।

৩ Sanskrit Poetics Vol II-De, পৃঃ ১১৫-১১৬।

প্রকাশভঙ্গী—এই তিনটির সামগ্রিকত্ব বুঝি। কিন্তু সংস্কৃত রীতি শব্দের অর্থ কতকগুলি নির্দিষ্ট গুণের সমষ্টি। দ্বিতীয়ত সংস্কৃতে রীতি শব্দের দ্বারা মাত্র দুইটি, তিনটি, চারিটি বা ছয়টি বিভিন্ন রচনা-প্রকারের কথাই বলা হয়, কিন্তু ইংরাজীর style শব্দ লেখকের স্বরূপ বুঝাইয়া দেয়। কিন্তু ডঃ রাঘবন তাঁহার রীতির আলোচনায় দেখাইয়াছেন যে, "....it is neither impossible nor incorrect to render Riti by the English word style···that there are always two conceptions of Riti···a subjective one and an objective one in relation to the poet and in relation to the theme .."[১]

সাহিত্য জগতে রচনার স্বকীয় বিশিষ্টতাকে আমরা স্টাইল বা বাণীভঙ্গী বলি। Pater তাঁহার "Appreciations" গ্রন্থে বলিয়াছিলেন—"the chief stimulus of good style is to possess a full rich complex matter to deal with." অনেকে আবার বিষয়বস্তুর প্রকাশভঙ্গীকেই স্টাইলের সর্বস্ব মনে করেন। বামনের মতেও তাই কাব্যের বিশিষ্ট অবয়বসংস্থানই style বা রীতি।[২] কিন্তু অবয়বসংস্থানের অর্থ তো শুধুই প্রকাশভঙ্গী নয়, প্রকাশভঙ্গীর সহিত প্রকাশক বা লেখকের ব্যক্তিত্ব যে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধে জড়িত। লেখকের বাণীভঙ্গীর অন্তরালে যখন তাঁহার ব্যক্তিসত্তা স্পন্দিত হয় তখনই আমরা বলিয়া থাকি, "The style is the man"[৩] স্টাইলের পরিপূর্ণ প্রকাশের জন্য প্রয়োজন—বিষয়বস্তু, লেখকের ব্যক্তিত্ব ও কলাকুশলতার ত্রিবেণীসঙ্গম। পেটারও কাব্যের পশ্চাতে কবিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, কারণ কাব্য যে কবিরই কৃতি। বারোজ style-এর সংজ্ঞায় বলেন—"The idea of style is essentially and immutably manner, the whole manner....manner of thinking, manner of feeling and manner of expression."

বামনের মতে রীতি কাব্যের অবয়ব-সংস্থান

১ Some concepts of the Alankara Sastra, পৃঃ ১৪০-১।

২ 'Style is a form of words'—A. Bennett.

৩ Appreciations (style): W. Pater—পৃঃ ৩৫।

মোহিতলাল "সাহিত্যের স্টাইল" প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে স্টাইল শব্দটি তিনটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথম, ভাষায় ব্যক্তিবিশেষের বিচিত্র বাক্-ভঙ্গী। ইহা আমাদের সংস্কৃত আলংকারিকের রীতি নহে। দ্বিতীয় অর্থে স্টাইল রচনা-নৈপুণ্য বা "the power of lucid exposition of a sequence of ideas." তৃতীয় অর্থে "a complete fusion of the personal and the universal." বাংলা ভাষায় styleএর এই তৃতীয় অর্থের উপযুক্ত প্রতিশব্দ নাই।[১]

স্টাইল সম্পর্কে মোহিতলাল

ধ্বনিবাদী সম্প্রদায়ঃ—ধ্বনিবাদ রসবাদেরই বিস্তার বা বিশদ আলোচনা মাত্র। কাব্যের ক্ষেত্রে রসবাদকে আশ্রয় করিলেই ইহার সূচনা। পূর্বেই দেখাইয়াছি যে রসকে সাক্ষাৎভাবে ভাষায় প্রকাশিত করা যায় না, ইহা অভিব্যঞ্জিত হয় (suggested)। সুতরাং ধ্বন্যালোকও সেই মতের অনুসরণ করিয়া বলিয়াছে—শ্রেষ্ঠ কাব্য তাহাই যাহাতে মনোহর ব্যঙ্গ্যার্থ নিহিত থাকে। যদিও প্রত্যেক শব্দ বা প্রত্যেক বাক্য হইতেই ব্যঙ্গ্যার্থ আবিষ্কার করা যায়, তবুও সকল শব্দ বা বাক্যই কাব্য নহে। কাব্যলক্ষণাক্রান্ত বিশিষ্ট পদসজ্জার মধ্যে যখন ব্যঙ্গ্যার্থ প্রকাশিত হয়, তখনই তাহা সুকাব্য। ধ্বনিকার ব্যঙ্গ্যার্থকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—রসাদি, অলংকার এবং বস্তু। রসাদির অন্তর্গত নয়টি রস, সকল প্রকার ভাব এবং তাহাদের আভাসগুলি। বস্তু-ধ্বনির অর্থ বিশিষ্টার্থক শব্দসমষ্টি দ্বারা কোন ব্যাপারের ব্যঞ্জনা। আর, অলংকারধ্বনি বলিতে বুঝায় যে কাল্পনিক বস্তুই এখানে ব্যঙ্গ্য, এবং এই কাল্পনিক বস্তুকে যদি ভাষায় প্রকাশ করা যায় শব্দসমষ্টির সাহায্যে, তাহা হইলে তাহা একটি বিশিষ্ট অলংকারের আকার ধারণ করে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের ন্যায় ধ্বনিকারও বোধ হয় কাব্যকে "the spontaneous overflow of powerful feelings" বলিয়া মনে করিতেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলিয়াছেন—ক্রৌঞ্চমিথুনের একটির বিয়োগে কবি বাল্মীকির মনে যে দুঃসহ শোকের উদ্রেক হইয়াছিল, তাহাই কাব্যের শ্লোকের রূপ ধারণ

ব্যঙ্গ্যার্থ

৩ শ্রেণীতে বিভক্ত

১ সাহিত্যকথা—মোহিতলাল মজুমদার, পৃঃ ২৪৭।

করিয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা মনে করিলে ভুল হইবে যে কবি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াই তাঁহার মনের আকূতি কাব্যে প্রকাশ করিয়াছেন বা পাঠক কবির আবেগময় কবিতা-পাঠে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছে। আসলে কবি বা পাঠক কেহই দুঃখিত হন নাই, যদি হইতেন তবে কেহই ঐ কাব্য-পাঠে আনন্দ লাভ করিতেন না।[১] ধ্বন্যালোকের মতে, রসাশ্রয়ী নহে এমন কাব্যের রচনায় কোন যথার্থ কবির কালক্ষেপ করা উচিত নহে। কাব্য ধ্বনিকারের মতে তিন প্রকার—ধ্বনিকাব্য, গুণীভূত ব্যঙ্গ্যকাব্য এবং চিত্রকাব্য। চিত্রকাব্যের অন্তর্গত সকল শব্দালংকার এবং অর্থালংকার। ধ্বনিকাব্যই শ্রেষ্ঠ কাব্য।

ধ্বনিকাব্যই শ্রেষ্ঠকাব্য

ধ্বন্যালোকের মতে ধ্বনিই কাব্যের আত্মা। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, ধ্বনি কাহাকে বলে? সমগ্ররূপে কাব্য বিচারে এবং কাব্যের আস্বাদনে ধ্বনিবাদ যে বিশেষ সহায়তা করে ইহা অনস্বীকার্য। "আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনায় ধ্বনির সমধিক উল্লাস দেখা যাইতেছে, ধ্বনি যেন আরও সূক্ষ্ম, রমণীয় ও মহনীয় হইয়া উঠিতেছে।"[২] তাই কাব্যের বিচারে ধ্বনির স্বরূপ উপলব্ধি করা বিশেষ প্রয়োজন। ধ্বনি অলংকার শাস্ত্রের একটি পারিভাষিক শব্দ। "কাব্যের ধ্বনি বলিতে বুঝায় কাব্যের একটি অর্থ যাহা কাব্যের শব্দরাশি দ্বারা সাক্ষাৎভাবে বুঝায় না, বুঝায় ইঙ্গিতে, আভাসে, ব্যঞ্জনায়, কাব্যের বাচ্যার্থের অনুরণন ক্রমে। কাব্যের বাচ্যার্থ একটিমাত্র, তাহা যখন বর্জিত না হইয়া নিজ স্বরূপে প্রকাশ পাইতে থাকে, অথচ তাহাকে অতিক্রম করিয়া পাঠকের চিত্তে একই সময়ে আর একটি অর্থ প্রতীয়মান হয়, তখন সেই প্রতীয়মান অর্থটিকে বলা হয় ধ্বনি।...এই অর্থ হয় বাচ্যার্থ দ্বারা দ্যোতিত, ব্যঞ্জিত বা প্রতীয়মান।.. যে শক্তির বলে এই ধ্বনি আসে, তাহাকে বলে দ্যোতনা বা ব্যঞ্জনাশক্তি, ইংরাজীতে বলে power of suggestion."[৩]

ধ্বনি কি

---

১ History of Sanskrit Poetics (Kane), পৃঃ ৩৭০

২ কাব্যালোক।

৩ ঐ পৃঃ ৩৬৩-৪।

ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনায় ডঃ সুবোধ সেনগুপ্ত বলেন—কাব্যে শব্দের দুইটি অর্থ পাওয়া যাইতে পারে। একটি শব্দের সহজ, সাধারণ অর্থ।...প্রত্যেক শব্দই একটি বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে।...প্রত্যেক শব্দের সঙ্গেই একটি অর্থ গাথা থাকে; ইহাকে বলা যাইতে পারে সঙ্কেত। এই সঙ্কেতিত অর্থের নাম বাচ্যার্থ। ইহার অপর নাম অভিধা। শব্দ সাক্ষাৎভাবে এই অর্থ জানাইয়া দেয়।

"অনেক সময় অভিধা গ্রহণ করিলে কোন সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায় না। পুরুষসিংহ বলিলে নরসিংহ অবতার বুঝায় না অথচ পুরুষ তো আর সিংহ নয়।... সিংহ-শব্দের মুখ্য অভিহিত অর্থ এখানে বাধিত হইয়াছে। 'পুরুষ সিংহ' বলিলে তেজস্বিতা বুঝিব ...এই জাতীয় অর্থকে বলে লাক্ষণিক বা গৌণ অর্থ। কিন্তু এই অর্থও বাচ্য অর্থের সঙ্গই। প্রাথমিক অর্থ বাধিত হওয়ায় অভিপ্রেত অর্থ সোজাসুজিভাবে লক্ষিত হয়। সুতরাং লাক্ষণিক অর্থ বাচ্য অর্থেরই অন্তর্গত।...

বাচ্যার্থ ও লাক্ষণিক অর্থ

"বাচ্য অর্থ সাক্ষাৎভাবে শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়া থাকে; ইহা শব্দের সঙ্গে সম্বদ্ধ। ব্যঙ্গ্য অর্থ শব্দশক্তিমূলক ও অর্থশক্তিমূলক—উভয়ই হইতে পারে। কিন্তু কোথাও ইহা সাক্ষাৎভাবে শব্দের সঙ্গে যুক্ত নহে। শব্দের সঙ্গে সম্বদ্ধ যে বাচ্যার্থ ইহা তাহার সঙ্গে সম্বদ্ধ। সুতরাং শব্দের বাচ্য অর্থ ও ব্যঙ্গ্য অর্থের মধ্যে খানিকটা দূরত্ব থাকে। এই ক্রম সব সময় লক্ষিত হয় না এবং অধিকাংশ সময় বাচ্য ও ব্যঙ্গ্য অর্থ পৃথক্ হইয়া প্রতীতও হয় না। কিন্তু তবু এই দূরত্ব বা ক্রম অবশ্যম্ভাবী।...

"বাচ্য অর্থ ও ব্যঙ্গ্য অর্থের পার্থক্য অন্যভাবেও বিচার করা যাইতে পারে। বাচ্য অর্থ প্রসিদ্ধ; তাহা শব্দের সঙ্গে প্রসক্ত হইয়া থাকে।...শব্দের সঙ্গে অর্থের নিয়ত সম্বন্ধ। কিন্তু বক্তার অভিপ্রায়ানুসারে কোন কোন স্থানে এই নিয়ত সম্বন্ধ বিশিষ্ট অর্থকে অতিক্রম করিয়া আর একটি অর্থ আক্ষিপ্ত হইতে পারে। এই আরোপিত, ঔপাধিক, আনয়ত সম্বন্ধকে ব্যঞ্জনা বলা যাইতে পারে।"

বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ

ব্যঙ্গ্যার্থের বক্তা ও শ্রোতাকে বলা হয় সহৃদয়। ইঁহারা একে অপরের কথা বুঝিতে পারেন। বিশেষ অভিপ্রায় প্রণোদিত অর্থ ইঁহাদের সম্পদ্; বাচ্য অর্থ কিন্তু সহৃদয় অসহৃদয় সকলেরই সম্পত্তি।

সহৃদয়

কাব্য রসাত্মক বাক্য, ইহা আমরা দেখিয়াছি এবং রস কি তাহাও জানিয়াছি। কিন্তু রসের জন্য ব্যঞ্জনার প্রয়োজন ও উপযোগিতা কি? এমন একটি জগৎ কি রচনা করা অসম্ভব যেখানে ভাবগুলি ব্যক্তিগত গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যাইবে, যেখানে পরগত অনুভব সম্পর্কে আমরা উদাসীন থাকিব না, যেখানে লৌকিক জগতের সিদ্ধির অভিপ্রায়ে ইহাদিগকে সঙ্কুচিত করিতে হইবে না? এই জগৎই যে রসের ও কাব্যের জগৎ। কবি বাল্মীকির শোক তাঁহার নিজস্ব ভাব। কিন্তু কাব্য-রচনার পরে শোক আর তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত শোক রহিল না, ইহা নিখিল মানবের আনন্দবিধায়ক করুণ রসে রূপান্তরিত হইল। ইহা আর ব্যক্তি-বিশেষের শোকমাত্র নহে, ইহা সকলের উপভোগ্য বস্তু হইয়া গিয়াছে। "আস্বাদ্য-মানতাই তো রসের প্রাণ এবং রস নামের সেখানেই তো সার্থকতা। আর এই রস ব্যঞ্জনা দ্বারাই লভ্য। ব্যঞ্জনার প্রাধান্য না হইলে রস পূর্ণতালাভ করিতে পারে না। অলংকারবর্গ তখনই শ্রেষ্ঠ কাব্যের লক্ষণ হইয়া থাকে, যখন তাহারা প্রতীয়মান রসকে আক্ষিপ্ত করে; সেখানে ব্যঙ্গ্যের স্পর্শ থাকিলেও ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্য থাকে না; সেই রচনা কাব্য হইলেও ধ্বনির উদাহরণ নহে। যেখানে ব্যঙ্গ্য প্রাধান্য লাভ করে তাহাই ধ্বনির বিষয়। যেখানে বাচ্য প্রাধান্য লাভ করে, তাহা ধ্বনি নহে।

রস ও ব্যঞ্জনা

"আনন্দবর্ধন বাচ্যকে রসসৃষ্টি হইতে একেবারে বাদ দেন নাই। তিনি বাচ্যার্থকে ব্যঞ্জনার ভূমি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আলোকার্থী যেমন দীপশিখার প্রতি যত্নবান্ হয়, ব্যঙ্গ্যার্থপ্রয়াসীরও তেমনি বাচ্যের প্রতি অভিনিবেশ কর্তব্য। পদের অর্থের সাহায্যে বাক্যার্থকে যেমন জানা যায়, বাচ্যার্থের সাহায্যে তেমনি ব্যঙ্গ্যকে জানা যায়। আলো প্রকাশ করিয়াই

১ ধ্বন্যালোক, পৃঃ ১৬।

২ ধ্বন্যালোক, পৃঃ ১৮।

প্রদীপশিখা নিবৃত্ত হয় না, সে নিজের অস্তিত্বও জানাইয়া দেয়। বাচ্য ইতিবৃত্তাদি বর্ণনা করে এবং সেই ইতিবৃত্ত কাব্যের শরীর। ব্যঙ্গ্য অর্থ শরীরের অন্তরস্থিত আত্মা। ব্যঙ্গ্য পুনরায় অবয়বসংস্থানাতিরিক্ত দেহলাবণ্য। বাচ্য নিমিত্ত, ব্যঙ্গ্য নৈমিত্তিক। এই সমস্ত তুলনা হইতে দেখা যায় বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের সম্বন্ধ খুবই ঘনিষ্ঠ।

বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ

শব্দার্থই কাব্যের শরীর, কিন্তু ইহারা কেহই ধ্বনি নহে। শব্দার্থের চারুতাকে ধ্বনি বলা যায় না; কারণ, শব্দের চারুতা শব্দালংকার আর অর্থের চারুতা অর্থালংকার। রীতি গুণালংকার ছাড়া আর কিছু নয়। কাব্য আলোচনা করিলে সহজেই ধ্বনি বলিয়া এমন কিছু পাওয়া যায় না, শব্দার্থের গুণালংকার ছাড়া যাহার অন্য কোনও স্বাতন্ত্র্য আছে। গীত, নৃত্য, হাস্যাদির সহৃদয় হৃদয়াহ্লাদী শব্দার্থময়ত্বই কাব্যত্বের লক্ষণ। কেহ কেহ বলেন যে, ধ্বনিবস্তুর কোনও লক্ষণ দেওয়া যায় না। তাহা বাক্যের অগোচর, কেবল সহৃদয় ব্যক্তিরাই তাহার আস্বাদ পাইয়া থাকেন। ইহার উত্তরেই ধ্বনিকার ধ্বনির স্বরূপ নির্ণয় করিয়া সকল সন্দেহের নিরসন করিয়াছেন। আনন্দবর্ধনের ভাষায়—"তস্য হি ধ্বনেঃ স্বরূপম্—সকল-সৎকবিকাব্যোপনিষদ্ভূতম্ অতিরমণীয়ম্ অণীয়সীভিঃ চিরন্তনকাব্যলক্ষণাভি-ধায়িনাং বুদ্ধিভিরনুন্মীলিতপূর্বম্।"[১] ধ্বনি কাব্যশরীরের মধ্য দিয়াই অভিব্যক্ত হয় বটে, অথচ কাব্যশরীর হইতে ইহা একান্ত স্বতন্ত্র। অভিনব রসধ্বনিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধ্বনি বলিয়া মনে করেন। অভিনবের মতে রসই যথার্থ কাব্যার্থ। ধ্বনিকার বলিয়াছেন—ধ্বনিই কাব্যের আত্মা—ধ্বনিকারের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য অভিনব বলিয়াছেন যে, যেহেতু রস ধ্বনি দ্বারাই প্রতীত হইতে পারে, সেজন্য রসধ্বনিকেও ধ্বনি বলা যায় এবং সেই হিসাবে ধ্বনি কাব্যের আত্মা।[২]

ধ্বনির কোন সঠিক লক্ষণ দেওয়া কি সম্ভবপর?

আনন্দবর্ধনের মতে ধ্বনির স্বরূপ

১। ধ্বন্যালোক ও লোচন—সেনগুপ্ত ও ভট্টাচার্য, পৃঃ ১১।

২। 'That Dhvani is the only artistic process by which Rasa, the 'Atman', is portrayed by the poet and is got at by the Sahridaya and that everywhere things appeal most by being deftly concealed and suggested by suppression in a fabric of symbology, are the reasons why Anandavardhana posits Dhvani as the Atman of poetry'—Raghavan, p. 214.

কিন্তু কেবলমাত্র ধ্বনি থাকিলেই কাব্য হয় না। মনোহারী শব্দ ও অর্থ এবং তাহাদের বিন্যাসের চাতুর্য ও অলংকারাদি গুণযুক্ত হইলে যদি তাহা ধ্বনি-প্রবণ হয় তবেই তাহা রসসৃষ্টির অনুকূল হয়। জগন্নাথ কিন্তু দূরবর্তিভাবে রসকে টানিবার কোন প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। তাঁহার মতে সেজন্য চমৎকৃতি বা রমণীয়ত্ব থাকিলেও কাব্যত্ব হয়। ধ্বনিকার ধ্বনির লক্ষণ দিতে গিয়া অন্যস্থলে বলিয়াছেন, "যেখানে শব্দ এবং অর্থ আপনাদিগকে গৌণ করিয়া কোনও অর্থ বিশেষকে অভিব্যক্ত করে, তাদৃশ কাব্যবিশেষকেই ধ্বনি কহে।" ধ্বনি না থাকিলে কোনও রচনাকে কেবলমাত্র লেখা বলা যাইতে পারে, কাব্য বলা চলে না—ইহাও বলা চলে না যে ধ্বনি যখন একটি কমনীয়তাবিশেষমাত্র তখন তাহাকেও অলংকারের মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে। কারণ ধ্বনি বাচ্যবাচককে অতিক্রম করিয়া অপর একটি বস্তু বা রসকে অভিব্যক্ত করে। যাহা কিছু বাচ্য বা বাচকের শোভা বর্ধন করে তাহা ধ্বনির অঙ্গীভূত সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া তাহার সহিত ধ্বনির অভিন্নতা স্বীকার করা যায় না।

ধ্বনি কাহাকে বলে এবং ধ্বনিকে কি হিসাবে কাব্যের আত্মা বলা হয়, সে সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপরে দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর ধ্বনিবাদীরা কি কি স্বীকার বা অস্বীকার করিয়াছেন সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন।

ধ্বনিকারের মতে রসের স্বরূপ

ধ্বনিকার প্রভৃতি রসকে বলিয়াছেন অভিব্যক্তি স্বরূপ। সম্বন্ধ-স্মরণ ব্যতিরেকে সৎ বা অসৎ যাহা কিছু প্রকাশকের সহিত যুগপৎ প্রকাশিত হয়, তাহাকেই অভিব্যক্ত বলে।[১]

"ধ্বনিবাদীরা শব্দের ব্যঞ্জকত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কেবলমাত্র প্রতীয়মান অর্থটি ধ্বনিত হয়—এই তত্ত্বের প্রকাশ ব্যতীত ধ্বনিবাদী কাব্যের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচারের কোনও সহায়তা করেন নাই।" সমস্ত দিক্ পর্যালোচনা করিলে ধ্বনিবাদীরা যাহাকে ধ্বনি বলেন তাহা একটি ভাক্ত বা লাক্ষণিক অর্থ বা অনুমানগম্য অর্থ ছাড়া আর কিছুই নহে।"[২]

আনন্দবর্ধন এমন কথা বলেন না যে, অর্থান্তর প্রতীতি হইলেই উত্তম ধ্বনি

১ কাব্যবিচার, পৃঃ ১৯৯।
২ ঐ পৃঃ ২০১।

হইবে। তাঁহার বক্তব্য এই যে, যদি প্রতীত অর্থ বাচ্যার্থ অপেক্ষা প্রধান হয় অর্থাৎ অকথিত অর্থ (ব্যঙ্গ্য) যদি মনোহর হয় তবেই তাহা ধ্বনি হইবে। অলংকার, গুণ এবং রীতি—ইহারা কাব্যের অঙ্গস্বরূপ; ধ্বনি কাব্যের অঙ্গী।

'ধ্বনি' শব্দ যে ধ্বনিকারই আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা নহে। ইহার পূর্বেও অন্যান্যস্থলে 'ধ্বনি'শব্দের ব্যবহার দেখা গিয়াছে। ভর্তৃহরির মতে, সংযোগ-বিয়োগাদি কারণের দ্বারা শব্দ হইতে উৎপন্ন শব্দকে ধ্বনি বা স্ফোট কহে। বর্ণনাসমষ্টির শেষ অংশটুকু পর্যন্ত গৃহীত হইলে তাহারা যে স্ফোটার্থকে অভিব্যক্ত করে, তাহাকে ধ্বনি বলা হয়। এই সাদৃশ্যব্যঞ্জক শব্দার্থকেও ধ্বনি বলা যায়। অভিনব ধ্বনির সহিত স্ফোটের সাজাত্য দেখাইবার চেষ্টা করিলেও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে ধ্বনি স্ফোটজাতীয় নহে।

ধ্বনিকারের পূর্বে ধ্বনি শব্দের ব্যবহার

আনন্দ ধ্বনিকে প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—অবিবক্ষিতবাচ্য ও বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য। যেখানে বাচ্যার্থ একেবারেই উদ্দিষ্ট নহে—কিংবা যেখানে বাচ্যার্থ হইতে একেবারে তাহার বিপরীত অর্থের অবগতি হয়, তাহা অবিবক্ষিতবাচ্য। মম্মটের মতে, অবিবক্ষিত-বাচ্যের এই দুই ভাগের প্রথমটি অর্থান্তরসংক্রমিত, দ্বিতীয়টি অত্যন্ততিরস্কৃত। সেইপ্রকার ধ্বনিই বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য যেখানে বাচ্য অর্থটি বাচ্য হইয়াই থাকে, কিন্তু সেই সংগে অন্য আর একটি অর্থ ব্যঞ্জিত হয়। ইহাও আবার দুই প্রকার: লক্ষ্যক্রম এবং অলক্ষ্যক্রম।

ধ্বনি প্রধানত ২ প্রকার

অনেকে বলেন যে ভাক্ত বা লক্ষণা এবং ধ্বনি একই বস্তু এবং এই জন্য স্বতন্ত্র ধ্বনি মানিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু অভিনব বলেন যে শব্দ, অর্থ-ব্যাপার, ব্যঞ্জনা ও সমুদয় যেদিক্ দিয়াই দেখা যাক না কেন, লক্ষণা ও ধ্বনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যেখানে ধ্বনি হয় না সেখানেও লক্ষণা দেখা যায় এবং লক্ষণা ব্যতিরেকেও ধ্বনি দেখা যায়। কোনও নিগূঢ় তাৎপর্য না থাকিলে প্রয়োজনের কোনও চারুতা থাকে না এবং তাহাকে ধ্বনি বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

লক্ষণা এবং ধ্বনি কি একই?

আনন্দবর্ধন প্রভৃতির এই মতের বিরুদ্ধে তাঁহাদের বিরুদ্ধদলের অভিযোগ

এই যে, ধ্বনি হইলেই যদি তাহা কাব্য হয় তবে সেই ধ্বনি চারু হইল কি অচারু হইল এই বিচারের কি উপযোগিতা আছে? ধ্বনি ছাড়া চারুতার অন্য কোন লক্ষণ বা মাপকাঠি ত ধ্বনিবাদীরা দেন নাই। কি হইলে ধ্বনি চারু হয় তাহার কোনও লক্ষণও তে দেওয়া নাই। অতএব সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে তাঁহারা কাব্যের যথার্থ লক্ষণ দিতে পারেন নাই। ইহার উত্তরে ধ্বনিকার বলিয়াছেন যে, অন্য প্রকারে বলিলে যে চারুতাকে প্রকাশ করা যাইত না, যেরূপ বাক্যে তাদৃশ চারুতা প্রকাশ পায় তাহাকেই ধ্বনিবাক্য বলা যায়।

ধ্বনির চারুতা 'নেতি' প্রকারে নির্দিষ্ট হয়

যখন কোনও ব্যভিচারী ভাব উদ্রিক্ত হইয়া বিশেষ কোনও চমৎকারিত্ব প্রকাশ করে, তখন তাহাকে ভাবধ্বনি কহে। অনেক সময় বিভিন্ন ভাব (ব্যভিচারী) একত্রিত হওয়ায় চমৎকারাতিশয্য ঘটিয়া থাকে; তাহাকে বলে ভাবসবলতা।

ভট্টনায়ক যাহাকে বলিয়াছেন রসের ভোগীকরণ, তাহাকেই অভিনব প্রভৃতি ধ্বনন বলিয়াছেন।[১] কিন্তু ভট্টনায়কের ভাবকত্ব সম্বন্ধে অভিনবের মত এই যে, কেবলমাত্র কাব্যশব্দ হইতে রসাদির ভাবনা হইতে পারে না, কারণ অর্থ না হইলে রসাদির বোধ হইতে পারে না। কেবলমাত্র অর্থ হইতেও তাহা হয় না। কারণ একই অর্থ কোনও শব্দবিন্যাসে কাব্য হইয়া দাঁড়ায়, অথচ অন্য শব্দবিন্যাসে কাব্য হয় না। অতএব শব্দ এবং অর্থ যখন গুণ, অলংকার, ঔচিত্যাদি যুক্ত হয় তখনই কাব্যরসকে ব্যঞ্জিত করিতে পারে। এইজন্য রসভাবনার প্রতি ব্যঞ্জনা বা ধ্বননই কারণ। ইহা ছাড়া স্বতন্ত্র ভাবকত্ব বলিয়া কোনও ব্যাপার নাই।

রসভাবনার প্রতি ব্যঞ্জনা বা ধ্বননই কারণ

উপমা প্রভৃতি অলংকার যদিও বাচ্যার্থকে অলংকৃত করে, তবুও সেই অলংকরণ ব্যাপারের বা শোভা সম্পাদন ব্যাপারের মূল তাৎপর্য এই যে, তাহাদের দ্বারা ব্যঙ্গ্যার্থের অভিব্যঞ্জন করিবার সুবিধা ঘটে। মুখ্যভাবে বাক্যার্থের শোভা সম্পাদন করিয়া যথার্থভাবে তাহারা ধ্বনিরই শোভা সম্পাদন

১ "ভোগীকরণব্যাপারশ্চ কাব্যাত্মকরসবিষয়ো ধ্বননাত্মৈব।"

করে। ধ্বনিকে অবলম্বন করিয়া যে সমস্ত মাধুর্যাদি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তাহাকে গুণ কহে। যেখানে কবিচিত্ত রসে পূর্ণ হইয়া থাকে সেখানে অলংকারগুলি বিনা যত্নে, বিনা চেষ্টায়, যেন আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয় এবং বাচ্যার্থভূত হইয়াও রসচর্বণার সাহায্য করে। "ইহা অত্যন্ত বিস্ময়কর যে চিত্ত যখন রসাপ্লুত হয় তখন শব্দালংকার এবং অর্থালংকারগুলি সেই রসস্রোতে আপনিই যেন ভাসিয়া আসে ও সেই রসাস্বাদের অনুকূলতা করে। যে কবি রসবস্তুকে আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ের বাসনাগুলি স্বয়ং উদ্বুদ্ধ হইয়া রসাস্বাদের অঙ্কুর উৎপন্ন করিতে গিয়া সেই সংগে সংগে রসাস্বাদের অঙ্গরূপে অলংকারাদিভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। প্রতিভাশালী কবির চিত্ত রসাপ্লুত হইলে অন্য অলংকারগুলি কবির বুদ্ধিপূর্বক চেষ্টার অপেক্ষা না করিয়াই এমনভাবে আবির্ভূত হয় যে বুদ্ধির দ্বারা চেষ্টা করিলে কবি তাহা কখনও করিতে পারিতেন না। কবি নিজেই মাঝে মাঝে আশ্চর্য হইয়া যান যে কেমন করিয়া তিনি ইহা রচনা করিলেন।" দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'কাদম্বরী' কাব্যে কাদম্বরী-দর্শনের বর্ণনা ও সেতুবন্ধ কাব্যে মায়ারামাদির মস্তক দেখিয়া সীতাদেবীর শোক বর্ণনা।

অলংকারের সহিত ধ্বনির সম্পর্ক

এইজন্য অলংকারসন্নিবেশের সময় রসানুসরণে ধাবিত হইয়া তাহাকেই অঙ্গী করিয়া যতটুকু অলংকার আসে, তাহাতেই কবির সন্তুষ্ট থাকা উচিত। যত্ন করিয়া অলংকারানুসরণ করিতে গেলে অলংকারই মুখ্য হয় এবং রস গৌণ হয়।

শব্দশক্তিমূলক ধ্বনি ও শ্লেষালংকারের মধ্যে পার্থক্য কি দেখা যাউক। আনন্দবর্ধন বলেন যে, যেখানে শব্দশক্তির দ্বারা সাক্ষাৎভাবে অলংকার বাচ্যার্থ বলিয়া প্রতীত হয় সেইখানেই হয় শ্লেষ। কিন্তু যেখানে শব্দগুলির সামর্থ্যে আক্ষিপ্ত হইয়া বাচ্যকে অতিক্রম করিয়া একটি ব্যঙ্গ্যার্থ প্রকাশিত হয় এবং তাহাই কোন অলংকারকে প্রকাশ করে তখন তাহাকেই বলা হয় ধ্বনি। যেখানে শব্দব্যাপারকে অপেক্ষা না রাখিয়া একটি অর্থের দ্বারা আর একটি অর্থ আক্ষিপ্ত হইয়া আসে তাহাকে অর্থশক্ত্যুদ্ভব ধ্বনি বলে। এই অর্থ-শক্ত্যুদ্ভব ধ্বনি দুই প্রকার—কবি-প্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ এবং কবিনিবদ্ধবক্তৃ-প্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ।

শ্লেষালংকার ও শব্দশক্তিমূলক ধ্বনি

বাচ্যার্থ অপেক্ষা প্রতীয়মানার্থ যদি চারুতর না হয় তবে আনন্দবর্ধন তাহাকে ধ্বনি বলিতে রাজী নহেন। এইজন্য দীপক প্রভৃতি অলংকারে উপমার প্রতীতি থাকিলেও তাহা ধ্বনি নয়, কারণ বাচ্যার্থ অপেক্ষা প্রতীয়মান অর্থ সেখানে চারুতর, একথা বলা যায় না। অর্থ ব্যঙ্গ্য কিন্তু শব্দ ব্যঞ্জক।

বাচ্যার্থ অপেক্ষা প্রতীয়মানার্থ চারুতর হইলে তবেই ধ্বনি হয়

অভিনবের মতে পদ, বাক্য, বর্ণ, পদভাগ, পদসংঘটনা, মহাবাক্য প্রভৃতি নানাবিধ শব্দ ধ্বনির ব্যঞ্জক হয়। পদ, পদাংশ প্রভৃতি দ্বারা যে অবিবক্ষিত বাচ্য ও অত্যন্ত তিরস্কৃত বাচ্য—দুই প্রকার ধ্বনি দ্যোতিত হইতে পারে, মম্মট প্রভৃতি তাহার অনেক উদাহরণ দিয়াছেন। আনন্দবর্ধনও অনেক উদাহরণের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, পদের দ্বারা ধ্বনি কি করিয়া প্রকাশিত হয়। আনন্দের মতে এই ধ্বনি পদের বাচকতাকে অবলম্বন না করিয়া হইতে পারে না। পদসমষ্টির দ্বারা গঠিত হয় কাব্যশরীর। যখন বুঝা যায় যে ধ্বনিত অর্থের চারুতা কোন পদবিশেষের প্রয়োগের উপর নির্ভর করে, তখন সেই পদই সেই ধ্বনির ব্যঞ্জক—ইহা স্বীকার করিতেই হয়। কিন্তু অসংলক্ষ্য ক্রমব্যঙ্গ্যস্থলে অর্থেরই ব্যঞ্জকতা স্বীকার করিতে হয়।

গদ্য রচনার স্থলে বা পদ্যাদি ছন্দঃস্থলে যে বৈচিত্র্য দেখা যায় তাহার প্রধান কারণ কবিগত রসানুপ্রেরণা। সর্বপ্রকার বাক্যরচনার মধ্যে যাহা কিছু

ঔচিত্য কাব্যরচনার রহস্য

অনুচিত বা অননুরূপ, তাহাই রসভঙ্গের কারণ হয়। এই জন্য ঔচিত্যরক্ষাকেই রসাভিব্যক্তির পরম রহস্য বা পরম-গুহ্যতত্ত্ব বলা যাইতে পারে।[১] ক্ষেমেন্দ্র বলিয়াছেন—ঔচিত্যই রসের প্রাণ। তৃতীয় উদ্যোতে আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন—"অনৌচিত্য ছাড়া রসভঙ্গের অন্য কোন কারণ নাই। প্রসিদ্ধ ঔচিত্যানুযায়ী রচনা রসের শ্রেষ্ঠগুপ্তরহস্য স্বরূপ।"[২] ঔচিত্য-বিরোধী দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া ধ্বনিকার বলিয়াছেন—কোন রসবর্ণনা করিতে করিতে তাহার বিরোধী রসের বর্ণনা করা, বিস্তৃতভাবে কোন বিষয়ের আলোচনা করিয়া পুনরায় তাহার আলোচনা করা,

১ ধ্বনি ও ঔচিত্য সম্বন্ধে দ্রঃ Some concepts of Alankara Sastra, p 216.

২ ধ্বন্যালোক—পৃঃ ২১১।

যেখানে অবসর নহে এমন সময় হঠাৎ কোনও রসবর্ণনা করা, যেখানে বর্ণনা করা উচিত সেখানে হঠাৎ বন্ধ করা, পুষ্ট রসকে পুনরায় পোষণ করিবার চেষ্টা করা কিংবা অনুচিত ব্যবহার বর্ণনা করা—এইগুলি সমস্তই রসের পরিপন্থী এবং সেইজন্য অনুচিত।[১]

বৃত্তি বা রীতির কথা বলিতে গিয়া আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন যে রসের অনুকূল ঔচিত্যযুক্ত শব্দ ও অর্থের ব্যবহারকে বৃত্তি বলে। কাব্য ও নাটকে রসাদি-তাৎপর্যের অনুকূল ভাবে শব্দার্থের ব্যবহার হইলে তাহা অত্যন্ত কমনীয় হয়। ব্যঙ্গার্থের প্রাধান্য হইলে ধ্বনি হয়—ইহা বলা হইয়াছে। কিন্তু বাচ্যার্থ যদি ব্যঙ্গ্যার্থ হইতে অধিকতর চারু হয়, তবে তাহাকে বলা হয় গুণীভূতব্যঙ্গ্য। অনেক সময় বাচ্য অলংকারের মধ্যে ব্যঞ্জিত অলংকার যদি অনুপ্রবিষ্ট থাকে, তবে সেই অলংকারের চারুত্ব বর্ধিত হয়। মম্মট তাঁহার 'কাব্যপ্রকাশে' গুণীভূতব্যঙ্গ্যের অনেকগুলি বিভাগ দেখাইয়াছেন—অগূঢ়, অস্ফুট, সন্দিগ্ধ, তুল্য প্রাধান্য, কাকুদ্বারা আক্ষিপ্ত ও অসুন্দর।

মম্মটের মতে ধ্বনি

ধ্বনিবিভাগ করিতে গিয়া মম্মট বলিয়াছেন যে, ধ্বনি প্রধানত তিন প্রকার—শব্দশক্তি-প্রভব, অর্থশক্তি-প্রভব ও শব্দার্থশক্তি-প্রভব। শব্দশক্তিপ্রভব ব্যঞ্জনা দুই প্রকার। অর্থশক্তিপ্রভব ব্যঞ্জনা আবার তিন প্রকার—স্বতঃসম্ভবী, কবিপ্রতিভাসিদ্ধ এবং কবিনিবদ্ধবক্তৃ-প্রতিভাসিদ্ধ। ইহারা আবার প্রত্যেকে দুই প্রকার—বস্তুধ্বনি এবং অলংকার-ধ্বনি। শব্দার্থ-উভয়োদ্ভব ধ্বনি এক প্রকার। বিশ্বনাথ বলেন যে বোদ্ধা ব্যক্তির স্বরূপ অনুসারে, সংখ্যা, নিমিত্ত, কার্য, প্রতীতিকাল, আশ্রয় এবং বিনয়াদির ভেদ অনুসারে ব্যঙ্গ্যের ভেদ হইয়া থাকে।

অভিহিতান্বয়বাদী নৈয়ায়িক এবং ভাট্টমতানুযায়ী কোন কোন মীমাংসক যে শব্দের ব্যঞ্জনা স্বীকার করিতে চাহেন না, ইহাতে মম্মটের বড়ই আশ্চর্য বোধ হয়। তাঁহাদের মতে শব্দের সাধারণ শক্তি জাতিতে। আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি, যোগ্যতা প্রভৃতি পদার্থের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ বুঝিবার জন্য ইঁহারা তাৎপর্য নামক স্বতন্ত্র বৃত্তি স্বীকার করেন। এই তাৎপর্যবৃত্তি আকাঙ্ক্ষাদিবশত প্রতীত হয়।

১ কাব্যবিচার, পৃঃ ২২৭-২২৮।

অনেকে বলেন যে শব্দ দ্বারাই যখন ব্যঙ্গ্যার্থের বোধ হয়, তখন তাহাকে বাচ্যার্থ বলিতে দোষ কি ? মম্মট তাহার উত্তরে বলেন যে শব্দ যে ব্যঙ্গ্যার্থকে জানায়, এ সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। কিন্তু যে রকম ব্যাপারের দ্বারা শব্দ বাচ্যার্থকে জানায়, সেরকম ব্যাপারের দ্বারা তাহা ব্যঙ্গ্যার্থকে জানায় না। বাচ্যার্থ সকল সময়েই একরূপ, কিন্তু ব্যঙ্গ্যার্থ প্রকরণাদি নানা কারণে নানারূপ হইতে পারে। অনেক সময় ব্যঙ্গ্যার্থকে বাচ্যার্থের সম্পূর্ণ বিপরীতও দেখা যায়। ধ্বনিকারের গ্রন্থ লিখিত হইবার পর অধিকাংশ আলংকারিকেরাই ব্যঙ্গ্যার্থের সত্তা স্বীকার করিয়াছেন এবং তাহা বুঝাইবার জন্য ব্যঞ্জনা[১] নামক শব্দের স্বতন্ত্র ব্যাপারও স্বীকার করিয়াছেন।

ধ্বনিবাদের প্রচারের ফলে অলংকার সম্বন্ধে প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গীর বহুল পরিবর্তন সাধিত হইল।[২] আমাদের মনে হয়, আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্ত বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের সার কথা রসতত্ত্ব, রসতত্ত্বের সহিত সাক্ষাৎভাবে সংশ্লিষ্ট না থাকিলে ধ্বনিবাদ উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করিবে না। আনন্দবর্ধন এবং পরে অভিনবগুপ্ত রসই সকল কাব্যের জীবভূত বলিয়া সর্বপ্রথমে একটি সাধারণ মূলসূত্র স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন। রসবাদ ও ধ্বনিবাদ বলিয়া দুইটি তত্ত্ব উপস্থিত হইলে অভিনবগুপ্ত কার্যত উভয়কে উভয়ের অন্তর্ভূত বলিয়া উভয়ের একপ্রকার ঐক্যই বুঝাইতে চাহিলেন। ধ্বনি তিন প্রকার। তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রসধ্বনি। আবার রসধ্বনির ন্যায় বস্তুধ্বনি ও অলংকারধ্বনিও রসেই বিশ্রাম লাভ করে। রসই আসল বস্তু, রসই কাব্যের আত্মা, রসাদির তাৎপর্যশূন্য কোন কাব্য-ব্যাপার নাই।

বক্রোক্তিবাদী সম্প্রদায়ঃ—সাহিত্যের অতি প্রাচীনকাল হইতেই বক্রোক্তি শব্দটির ব্যবহার হইয়া আসিতেছে এবং শব্দটির প্রয়োগও নানা অর্থে,

---

১ তা'হলে ব্যঞ্জনা হ'ল চারুশিল্পের সেই অনিবার্য শক্তি যা ব্যক্তিগত আনন্দ-বেদনাকে বিশ্বের সকাশে অনায়াসে প্রকাশ করিতে পারে, যা পাঠকের মনে এই ভাব জাগাতে পারে,—'পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ'—পরের অথচ ঠিক পরের নয়, আমার অথচ ঠিক আমার নয়। কোল্‌রিজ্‌ একে বলেছেন "willing suspension of disbelief."—সাহিত্য সংগমে—বিনায়ক সান্ন্যাল পৃঃ ৫২।

২ ধ্বনিবাদের বিশদ আলোচনার জন্য দ্রঃ কাব্যালোক, পৃঃ ৩৬৩-৪১৯।

হইয়াছে। বাণ 'কাদম্বরী'তে 'বক্রোক্তিনিপুণ বিলাসিজনের' উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যত্র বাণ বক্রোক্তি অর্থে ক্রীড়ালাপ ও পরিহাসজল্পনা বুঝিয়াছেন। 'অমরুশতকে'ও বক্রোক্তি এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। বক্রোক্তি বলিতে দণ্ডী[১] স্বভাবোক্তির বিপরীত অলংকার বুঝাইয়াছেন এবং বক্রোক্তির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে সাধারণত শ্লেষ, ইহা বলিয়াছেন। অতএব বক্রোক্তি বলিতে চমৎকারিত্ব বুঝায় এবং ইহা সাধারণ হইতে ভিন্ন শ্লেষমূলক বাগ্‌ধারাকে প্রকাশ করে। ভামহও বক্রোক্তিকে এই অর্থেই গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বক্রোক্তি যে সকল অলংকারের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, এই বিশ্বাস পোষণ করিতেন। ভামহের মতে সকল সার্থক অলংকারের মধ্যে বক্রোক্তি থাকা চাই-ই। তিনি বলিয়াছেন যে, বক্রোক্তি সমস্ত অলংকারের মূল এবং বক্রোক্তি ছাড়া কাব্য হয় না। যতদূর বুঝা যায়, বক্রোক্তি শব্দের দ্বারা ভামহ বলিবার ভঙ্গীর বৈচিত্র্যকে বুঝিয়াছিলেন এবং সেইজন্যই তিনি স্বভাবোক্তিকে অলংকার বা কাব্য বলিয়া মানেন নাই।

ভামহের সমগ্র গ্রন্থপাঠে মনে হয় যে তিনি বাক্যের ভঙ্গীতে ইঙ্গিতে অর্থপ্রকাশকেই কাব্যত্বের প্রয়োজক বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার মতে সমস্ত অলংকারই বক্রোক্তির প্রকার মাত্র। শব্দ ও অর্থ লইয়া কাব্য হয়, কিন্তু সকল বাক্যেই তো শব্দ এবং অর্থ আছে। অতএব সেই বাক্যই কাব্য যেখানে শব্দের কোন বিচিত্র বিন্যাসে বা বাক্যের কোন ইঙ্গিতে বক্তব্য অর্থটি একটি নূতন ভঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করে।

ভামহ দণ্ডী, বামন বা রুদ্রটের ন্যায় বক্রোক্তিকে একটি শব্দালংকার মনে করেন নাই। 'সৈষা সর্বৈব বক্রোক্তিঃ'—ভামহের এই উক্তিই পরবর্তী আলংকারিকেরা বিভিন্ন অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে ভামহ অতিশয়োক্তিকেই বক্রোক্তিমূলক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাই আনন্দবর্ধন ভামহের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—কবিপ্রতিভার দ্বারা অতিশয়োক্তি যে অলংকার আশ্রয় করে শুধু তাহাতেই যথার্থ

---

১ শ্লেষঃ সর্বাসু পুষ্ণাতি প্রায়ো বক্রোক্তিষু শ্রিয়ম্।
ভিন্নং দ্বিধা স্বভাবোক্তির্বক্রোক্তিশ্চেতি বাঙ্ময়ম্॥ কাব্যাদর্শ, ২।৩৬৩

উৎপন্ন হয়। অতিশয়োক্তি সমস্ত অলংকারের রূপ ধারণ করিতে পারে বলিয়া লাক্ষণিকভাবে অতিশয়োক্তিকে সর্বালংকারস্বরূপ বলা হইয়াছে। অভিনব কিন্তু এই বিষয়ে আনন্দের সহিত একমত হইতে পারেন নাই।

দণ্ডী বলেন যে, প্রায় সকল অলংকারেই বক্তব্য অর্থকে বাড়াইয়া বলা হয় এবং সেইজন্য সমস্ত অলংকারেই অতিশয়োক্তির বীজ রহিয়াছে। অতিশয়োক্তি একপ্রকার বক্রোক্তিই। স্বভাবোক্তি ছাড়া সকল অলংকারই বক্রোক্তিমূলক একথা পূর্বেই বলিয়াছি। দণ্ডী তাই বক্রোক্তিকে অলংকারসামান্যবচন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বামন কিন্তু বক্রোক্তিকে স্বতন্ত্র অলংকার বলিয়া গণনা করিয়াছেন। আনন্দবর্ধনের মতে বক্রোক্তি অবিবক্ষিতবাচ্যব্যঙ্গের অনুরূপ। কিন্তু কুন্তক ভিন্ন পরবর্তী আলংকারিকদের মধ্যে কেহই বক্রোক্তিকে আর কোনও বিশিষ্ট স্থান দেন নাই।

কুন্তক সম্ভবতঃ দশম ও একাদশ শতকের লোক ছিলেন। তাঁহার বক্রোক্তিজীবিত অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। কুন্তকের মতে যদিও শত শত অলংকার গ্রন্থ রহিয়াছে, তথাপি কাব্যের দ্বারা যে অসামান্য আহ্লাদ উৎপত্তি হয়, তাহার কোন কারণ পূর্ববর্তীরা কেহই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। কুন্তক বলেন যে, প্রতিভার দৈন্যের জন্য যাহারা কেবলমাত্র শব্দচ্ছায়ার মাধুর্য সৃষ্টি করিতে চাহেন, তাঁহারা কাব্যের যথার্থ সম্পদ্ প্রকাশ করিতে পারেন না। আবার কেবলমাত্র অর্থের চাতুর্যের দ্বারাও শুষ্ক অর্থের গাঁথুনি গাঁথিলে কবিত্ব হয় না। প্রতিভার প্রতিভাসের দ্বারা প্রথমত কবিচিত্তের মধ্যে বর্ণনীয় বস্তুটি অস্ফুটভাবে বিচ্ছিন্ন মণিখণ্ডের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়। এইরূপে অস্ফুটভাবে যাহা মনের মধ্যে উদিত হয়, তাহাই বক্র বাক্যের দ্বারা যখন প্রকাশিত হয়, তখন পরিমার্জিত উজ্জ্বল হীরকের মালার ন্যায় তাহা শোভা পায় এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তির আনন্দ উৎপাদন করিয়া কবিত্ব-পদবী লাভ করে। একই কথা বাক্যের ভঙ্গীতে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হইলে তাহাতে কাব্য-সম্পদের প্রচুর ভেদ হয়।

শব্দ ও অর্থের মিলিত সত্তার চমৎকারিত্বেই হয় কাব্য। কিন্তু কাব্য হইতে হইলে এই শব্দার্থ সাহিত্যের একটি বিশিষ্টতা থাকা আবশ্যক। "যখন একটি

বাক্য অপর বাক্যের সহিত বিচিত্র বিন্যাসে বিন্যস্ত হয়, তখন বর্ণের সহিত বর্ণ মিলিয়া সে যেমন একদিকে ছন্দ ও ধ্বনির সাহায্যে স্বর ও ধ্বনি-লহরীর আতান বিতানে রমণীয় মাধুর্য সৃষ্টি করিবে, অপর দিকে তেমনি তদ্‌গর্ভিত অর্থ ও তাহার সহিত তুল্যযোগিতা করিয়া পরস্পর অর্থের দিক্ দিয়া নূতন চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করিবে। এমনি করিয়া ধ্বনির সহিত ধ্বনির মিলনে, অর্থের সহিত অর্থের মিলনে যে পরস্পরস্পর্ধি চারুতাদ্বয় উৎপন্ন হইবে, তাহাদের পরস্পরের সামঞ্জস্যই সাহিত্য শব্দের অর্থ।"[১] কাব্যশিল্প ঘটিতে গেলে চাই একদিকে পরস্পর অর্থের সামঞ্জস্যে ক্রমবিকাশ এবং অপর দিকে সেই অর্থের সামঞ্জস্যে শব্দের সহিত শব্দের এমন মিলন, যাহাতে একদিকে যেমন ধ্বনি ও ছন্দে শব্দগুলি অর্থের অনুকূলতা আচরণ করিবে, অপর দিকে তেমনি শব্দগুলির বিন্যাসে অর্থধারা যেন কোনক্রমে কলুষিত না হয় বা বিপথে প্রবর্তিত হইতে চেষ্টা না করে তাহারও ব্যবস্থা করিবে।

কুন্তক বলেন যে, কাব্য রচনার সময় বহির্জগতের যে সকল বর্ণনায় পদার্থ কবির চিত্তে রূপ গ্রহণ করে তাহা একান্তভাবে বহির্বস্তুর অনুরূপ নহে। কবির সমগ্র মনোভাবের স্ফুরণের দ্বারা অধিবাসিত হইয়া বিষয়বস্তু একটি স্বতন্ত্র অন্তর্লোকের ভাবময় অলৌকিকরূপে আবির্ভূত হয়। ইহার সান্নিধ্যে কবির চিত্তের মধ্যে যে আলোড়ন উপস্থিত হয়, তাহার ফলে কবি এমন সকল শব্দ আহরণ করিতে পারেন যাহার সহিত তাহার ভাবময় বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকে। কবিচিত্তের মধ্যে যে বিষয়বস্তু নবীন ভাবময় দেহে আপনাকে স্ফুট করিয়া তোলে তাহাই যেন স্বমহিমায় শব্দরূপে অবতীর্ণ হয়। অর্থের কথা বলিতে গিয়া কুন্তক বলেন যে, যদিও বাহ্য পদার্থ আমাদের মনের মধ্যে নানাবিধ ভাবধর্মের দ্বারা রচিত হইতে পারে, তথাপি যে বিশেষ-জাতীয় ভাবধর্মের দ্বারা রচিত হইলে তাহা সহৃদয়গণের আহ্লাদজনক হইতে পারে তাহাই কাব্যাকারে আপনাকে পরিণত করিতে পারে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে বিশিষ্ট-জাতীয় অর্থ ও বিশিষ্ট-জাতীয় শব্দের সাহিত্যেই হয় কাব্য।

শব্দ ও অর্থের যে বিশেষ অলংকৃতি বা বৈচিত্র্য প্রযুক্ত হয় তাহা আপনাকে

১। কাব্যবিচার, পৃঃ ৬৫।

কাব্যরূপে প্রকাশ করিতে পারে এবং সুন্দর বলিয়া সহৃদয় সমাজে আদৃত হইতে পারে ; তাহাকেই কুন্তক 'বক্রতা' আখ্যা দিয়াছেন। "আমরা আধুনিককালে যাহাকে aesthetic quality বলি, সম্ভবত কুন্তক বক্রতা শব্দে তাহারই সূচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।"[১] কোন বস্তুর যথাযথ বর্ণনায় তাহার কাব্যত্ব হয় না। বস্তুর স্বভাবের সহিত অতিরিক্ত কোনপ্রকার ভাব-ধর্মযুক্ত না হইলে কোন অলংকার সৃষ্ট হইতে পারে না। এইজন্য কুন্তক দণ্ডীর স্বভাবোক্তি অলংকারকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। অর্থ না বুঝিলেও সাধুকাব্যের শব্দবিন্যাসেরই এমন মাহাত্ম্য আছে যে তাহা পড়া মাত্রই সঙ্গীতের উচ্ছ্বাসের ন্যায় হৃদয়কে আনন্দে পরিপ্লুত করে। শব্দার্থের অতিরিক্ত এই নির্ঝর ধারাটুকু না থাকিলে বাক্যাবলী যেন মৃতপ্রায় বলিয়া মনে হইত।

কুন্তকের গ্রন্থ দেখিয়া মনে হয় না যে, তিনি ধ্বনিকার বা আনন্দবর্ধনের মতের সহিত পরিচিত ছিলেন। কিন্তু শব্দার্থের পরিচয় তিনি যেভাবে দিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই মনে হয় যে, ধ্বনিবাদীদের সারতত্ত্বটুকু তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। কাব্যের মধ্যে তিনি aesthetic exhilaration-এর সন্ধান পাইয়াছিলেন এই প্রসঙ্গে কুন্তক কত প্রকারে রচনার নানাবিধ বক্রতা (aesthetic character) সম্পন্ন হইতে পারে তাহার প্রচুর উদাহরণ দিয়াছেন ও আলোচনা করিয়াছেন। বক্রতা প্রধানত ছয় প্রকার—তাহার মধ্যেও আবার বহু অবান্তর বিভাগ আছে। বর্ণবিন্যাসবক্রতা, পদবক্রতা, পদপূর্বাধবক্রতা, প্রত্যয়বক্রতা, বাক্যবক্রতা, প্রকরণবক্রতা, প্রবন্ধবক্রতা ইত্যাদি। কাব্যের সৌন্দর্যোৎপাদক অন্তরঙ্গ ধর্মের নাম সৌভাগ্য। বহিরঙ্গ ধর্মের নাম লাবণ্য। প্রতিভা-ব্যাপারের ফলস্বরূপ চিত্তে যে হ্লাদ জন্মে তাহাই সৌভাগ্য। আর বহিরঙ্গ-সন্নিবেশ-বিশেষে যে সৌন্দর্য তাহাকে বলে লাবণ্য।

রীতির আলোচনায় কুন্তক বামনের ত্রিবিধ রীতি ও দণ্ডীর দ্বিবিধ রীতি

---

১ কাব্যবিচার, পৃঃ ৭২ ; "এই উক্তিকৌশল, 'বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতি' এই বক্রোক্তিই সাহিত্যিক সৌন্দর্যের নিদান এবং সাহিত্য মীমাংসকসম্প্রদায় যে সকল উক্তিবৈচিত্র্য অলংকার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, সে সকলেরই মূলে আছে 'বক্রতা' বা 'বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতি'। এই বক্রোক্তিরই অপর নাম 'অলংকার'……।" সাহিত্যমীমাংসা পৃঃ ৮১-৮২।

উভয়কেই অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে কোন দেশবিশেষের নামে কোন রীতির নামকরণ উচিত নহে। কারণ রীতি দেশবিশেষের ধর্ম নহে। কবি-স্বভাব-ভেদেই রীতির বিভিন্নতা হয়। রীতি মোটামুটি তিন প্রকারের বলা যাইতে পারে—সুকুমার, বিচিত্র ও তদুভয়াত্মক মধ্যম। বস্তুত রীতির এইরূপ বিভেদও সম্ভব নয়। কাব্যরচনা রমণীয় হইল কিনা, ইহাই প্রধান বিবেচ্য। কবিদের শক্তি, রুচি, শিক্ষা ও অভ্যাস বশতই তাঁহাদের লিখিবার রীতি বা ভঙ্গীর বিভেদ হইয়া থাকে। কালিদাস প্রভৃতি যে রীতিতে কাব্য লিখিয়াছেন, কুন্তক তাহাকে বলিয়াছেন সুকুমার রীতি। এই রীতির বিশেষত্ব, কবি স্বাভাবিক অম্লান প্রতিভায় যাহাই রচনা করেন, তাহা সুন্দর, সুকুমার হইয়া উঠে। রসজ্ঞ ব্যক্তিদের হৃদয়ের মধ্যে কবি এমন সুন্দরভাবে প্রবেশ করিতে পারেন যে, অতি অল্প আয়াসেই তিনি তাঁহাদের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারেন। এই জাতীয় লেখকদের রচনারীতি বিশ্লেষণ করিয়া বুঝান সম্ভব হয় না।

সুকুমার রীতির বর্ণনার পর কুন্তক বিচিত্র রীতির প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, এই রীতিতে লেখা অত্যন্ত কঠিন। কবির বক্রতাব্যাপার (aesthetic activity) যদি যুগপৎ শব্দ এবং অর্থের মধ্যে সমানভাবে সঞ্চারিত না হয় তবে এই জাতীয় লেখা সম্ভব নহে।[১] এই কাব্যের কবিরা বাচ্যার্থকেও যেমন সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন, সেই বাচ্যার্থের সঙ্গে সঙ্গে প্রতীয়মান আর একটি অর্থকেও তেমনি মনোরমভাবে প্রতীত করাইতে পারেন। শব্দার্থের সাধারণ প্রকাশশক্তিকে অতিক্রম করিয়া একটি নূতন অর্থ প্রকাশ করিবার ক্ষমতাকে বলে প্রতীয়মানতা; ইহাই যথার্থ বক্রতা।[২] বাক্যবক্রতার কথা বলিতে গিয়া কুন্তক বলিয়াছেন যে অনেক স্থলে শব্দার্থ-গুণ ও অলংকার ছাড়া কাব্যের এমন একটি বিশেষ শোভা দেখা যায়, যাহা তাহার প্রাণস্বরূপ হইয়া

---

১ "যৎ কবিপ্রযত্ননিরপেক্ষয়ৈব শব্দার্থঃ স্বাভাবিকঃ কোঽপি বক্রতাপ্রকারঃ পরিস্ফুরন্ পরিদৃশ্যতে।"

২ বাচ্যবাচকবৃত্তিভ্যাং শব্দার্থশক্তিভ্যাং ব্যতিরিক্তিস্য তদতিরিক্তবৃত্তেরন্যস্য ব্যঙ্গভূতস্য অভিব্যক্তিঃ ক্রিয়তে। এষ চ প্রতীয়মানব্যবহারঃ।

উদ্ভাসিত হয়। এই নূতন ভাসমান সৃষ্টিকেও বক্রতা বলে। এই জাতীয় রচনা-পদ্ধতির বিশেষত্বই এই যে, এখানে শব্দার্থ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের একটি শোভাতিশয্য, তাৎপর্য বা রসাদি সমুন্মীলিত হয়। কবিকৌশলের বিচিত্রতাই এই জাতীয় বক্রতার সৃষ্টি করে। বাক্যার্থের দ্বারা ভাবপ্রকাশের এই বিচিত্র প্রণালীকেই কুন্তক বিচিত্র-রীতি বলিয়াছেন।

সুকুমার ও বিচিত্র পূর্বোক্ত এই উভয় মার্গের সম্মিলনকে মধ্যম মার্গের রচনা বলে। মাতৃগুপ্ত প্রভৃতির লেখা মধ্যম মার্গের। অলংকার সম্বন্ধে কুন্তক বলিয়াছেন যে, বক্রতার সহিত অন্বিত না হইলে অলংকার অলংকারই হয় না। কুন্তকের এই মত রুয্যক প্রভৃতি পরবর্তী আলংকারিকেরাও স্বীকার করিয়াছেন। আনন্দবর্ধন বা ধ্বনিকার কেহই অলংকারের স্বরূপ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন নাই। মম্মটের মতে, রসের পোষক না হইলে বা রস না থাকিলে অলংকার উক্তির বৈচিত্র্য মাত্র। ভামহ অতিশয়োক্তিকে বক্রতাস্বরূপ বলিয়াছেন এবং মম্মট অতিশয়োক্তিকে অলংকারের প্রাণস্বরূপ বলিয়াছেন।

কবিপ্রতিভোত্থিত এবং কবিপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ শোভাতিশয্য না থাকিলে অলংকার হয় না। আনন্দবর্ধনের মতে অলংকারই চারুত্বের কারণ। বক্রতার ফলে কিরূপে অলংকার হয়, কুন্তক অতি নিপুণভাবেই তাহা দেখাইয়াছেন। অধিকাংশ আলংকারিকেরা উপমা-গর্ভিত বলিয়াই অলংকারের অলংকারত্ব মানিয়াছেন। কুন্তক কিন্তু সেই সকল অলংকারকে স্বীকার করেন নাই যাহাদের উপমা ছাড়া অলংকারত্ব হয় না। ঐ সকল অলংকারকে তিনি প্রতীয়মান উপমা বলেন।

কুন্তক রসকে অস্বীকার করেন নাই বটে, কিন্তু রসকে বক্রতারই প্রকারভেদ বলিয়াছেন। ভামহ ও দণ্ডী রসবৎ বলিয়া এক স্বতন্ত্র অলংকার স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু কুন্তক তাহাকে অস্বীকার করিয়াছেন। কুন্তক আনন্দবর্ধনের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন যে, রসকে কখনই শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। রসবৎ প্রভৃতি অলংকার্য। এই সকল অলংকারে রসই অঙ্গী। রসই কাব্য সেইজন্যই উহাকে অলংকার বলা উচিত নয়। রস এবং ধ্বনিকে কুন্তক বক্রতার প্রকারভেদ মাত্র বলিয়া মনে করিতেন। আনন্দবর্ধনের মত

তিনি ধ্বনিকে একমাত্র কাব্যের প্রাণস্বরূপ বলিয়া মনে করেন নাই, তাঁহার মতে ধ্বনি গৌণ, বক্রোক্তিই প্রধান। বক্রোক্তি অঙ্গী, ধ্বনি তাহার অঙ্গ। কুন্তক বৈচিত্র রীতি বর্ণনার স্থলে ধ্বনি বা প্রতীয়মান অর্থের বিশেষ গৌরব দেখাইয়াছেন। বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে ধ্বনি-স্বীকার বিষয়ে আনন্দবর্ধনের সহিত কুন্তকের বিশেষ মতানৈক্য নাই।[১] কুন্তক লক্ষণামূল ধ্বনি, বস্তুধ্বনি, রসধ্বনি এবং অলংকার ধ্বনিকে স্বীকার করিয়াছেন।

"যদিও পরবর্তী লেখকেরা কুন্তককে বড় একটা আমল দেন নাই, তথাপি সব দিক্ দিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্বীকার করিতেই হয় যে, কুন্তক যেরূপ সাহিত্য-সৌন্দর্যের সব দিক্ দিয়া আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন, তাহা ধ্বনিকার ও তাহার অনুবর্তীদের লেখায় দেখা যায় না। ধ্বনিকার প্রভৃতি রসবোধের অসামান্য বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু সব দিক্ দিয়া কুন্তকের বিশ্লেষণে যে অসাধারণ সম্পূর্ণতা দেখা যায় তাহা অতি বিস্ময়কর। নিবিষ্ট হইয়া অনুধাবন করিলে দেখা যায়, তাঁহার লেখার মধ্যে অতি আধুনিক সাহিত্য-বিচার-পদ্ধতির আভাস তাঁহার প্রাচীন পরিভাষার মধ্যে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।"[২]

কুন্তক সাহিত্যপদের যে সংজ্ঞা নির্দেশ ও ব্যাখ্যা করেন, তাহা আজ পর্যন্তও অতুলনীয়। সাহিত্যপদের ব্যাখ্যা প্রসংগে কুন্তকের আত্মপ্রসাদ ও প্রচ্ছন্ন গৌরববোধ দেখিয়া মনে হয় পদটির অলংকারশাস্ত্রমত বিশিষ্ট সম্বন্ধ-রূপ অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী আনিয়াছেন তিনিই। কুন্তকের মতে—"ন পুনরেতস্য কবিকর্মকৌশল-কাষ্ঠাধিরুচিরমণীয়স্যাদ্যাপি কশ্চিদপি বিপশ্চিদয়মস্য পরমার্থ ইতি মনাক্ মাত্রমপি বিচারপদবীমবতীর্ণঃ। তদস্য...এতৎ সহৃদয়ষট্চরণগোচরতাং নীয়তে।"[৩] এ গৌরব তাঁহার প্রাপ্য। "ভোজদেবের ক্ষমতা বিভিন্ন গ্রন্থের সংগ্রহব্যবস্থায় ও সমন্বয়করণে, কুন্তকের বৈশিষ্ট্য মৌলিক চিন্তন ও গভীরার্থ দর্শনে। কুন্তকের

১ "In most cases, Dhvani, and Vakrokti and Aucitya are merely the more specific names for the Camatkara (চমৎকার) in a certain point.—" Raghavan, p. 247.

২ কাব্যবিচার, পৃঃ ৮৬।

৩ বক্রোক্তিজীবিত, ১।১৬।

ছিল অমল তত্ত্বদর্শিনী প্রতিভা। ভোজ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, কুন্তক নূতন সৃষ্টি করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থখানির প্রভাবে কুন্তকের 'বক্রোক্তিজীবিত' গ্রন্থ পণ্ডিত সমাজে উপযুক্ত আদর পায় নাই…।"[১]

কুন্তক ও ভোজ উভয়েই ভামহের "শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্"—এই সূত্রকে ভিত্তি করিয়া বিচার আরম্ভ করিয়াছেন। ভোজই শব্দার্থ সম্বন্ধজনিত সকল প্রকার রচনা—এমন কি বৈজ্ঞানিক রচনাও—বুঝাইতে সাহিত্যসংজ্ঞা প্রথম দিয়াছিলেন। ভোজের ব্যাখ্যায় সাহিত্যপদের এইরূপ অর্থব্যাপ্তির বীজ ছিল। কুন্তক কিন্তু সাহিত্যের সংজ্ঞা দিয়াছেন—সাহিত্য হইতেছে শব্দার্থযুগলের এক অলৌকিক বিন্যাসভঙ্গী, যাহা ন্যূনতা ও অতিরিক্ততা-বর্জিত হইয়া মনোহারী ও শোভান্বিত হয়।'[২] অর্থাৎ শব্দার্থযুগলের মনোহারী বিন্যাসভঙ্গীই কাব্য বা সাহিত্য। কাব্যের সংজ্ঞায় কুন্তক বলেন—'সহিত অর্থাৎ মিলিত শব্দার্থযুগল কাব্যজ্ঞগণের আহ্লাদজনক বক্রতাময় কবিব্যাপারপূর্ণ রচনাবন্ধে বিন্যস্ত হইলে কাব্য হইয়া থাকে।' সাহিত্য হইতেছে শব্দ ও অর্থের সাহিত্য বা মধুর মিলন, কুন্তক যাহাকে শব্দার্থের পরস্পর সাম্যসুভগাবস্থান বলিয়াছেন।[৩]

কুন্তকের মতে সাহিত্য হইতেছে সহিত দুইটির ভাব। শব্দ ও অর্থ কেহ কাহারও অপেক্ষা ছোট বা নিকৃষ্ট হইবে না, আবার বড় বা উৎকৃষ্টও হইবে না। তাহারা হইবে পরস্পরকে স্পর্ধা করিয়া সমানভাবে বড় হইয়া পরস্পরের সংযোগে রমণীয়। অতএব কেবল কবিকৌশল-কল্পিত কমনীয়তা-পূর্ণ শব্দ

১ কাব্যালোক, পৃঃ ৫৫১।

২ বক্রোক্তিজীবিত, ১।৭।

৩ "..defining the speciality of S´abda and Artha in Kāvya, Kuntaka points out the 'Pāramārthya' of these two. His S´abdapāramārthya is the only Aucitya or Dhvani of Pada or Paryāya and his Arthapāramārthya is nothing but Arthaucitya...the test of this Aucitya is, according to Kuntaka, Rasa...many items of Vakratā mentioned by Kuntaka are seen in the Abhinavabharati as cases of Vaicitrya."— Raghavan, pp. 241. 236,

কাব্য হইবে না। আবার কেবল রচনাবৈচিত্র্যচমৎকারী অর্থও কাব্য হইবে না। বাচ্য এবং বাচক দুইই সম্মিলিত হইলে কাব্য হয়। প্রশ্ন হইতে পারে—বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ তো সকল শব্দার্থেরই থাকে; সেজন্য সকল শব্দার্থই তো নির্বিচারে সাহিত্য হইতে পারে। ইহার উত্তরে কুন্তক বলিয়াছেন বাচ্য-বাচক বা শব্দার্থের বিশিষ্ট সম্বন্ধই সাহিত্য বলিয়া অভিপ্রেত। বক্রতা দ্বারা বিচিত্র গুণালংকাররূপ সম্পৎসমূহের পরস্পর স্পর্ধাসহকারে প্রকাশই উক্ত সম্বন্ধের বিশিষ্টতা। অতএব শব্দ ও অর্থ সুহৃদের ন্যায় পরস্পরের শোভাবর্ধন করিয়া থাকে।

অন্য কয়েকটি বাচক থাকিলেও যাহা বিবক্ষিত (অভিপ্রেত) অর্থের একমাত্র বাচক হয় তাহাই কুন্তকের মতে শব্দ। আর, সহৃদয়ের হৃদয়ে আহ্লাদ জন্মাইয়া স্বভাবে যাহা সুন্দর হয় তাহাই অর্থ। কবির অভিপ্রেত অর্থের বিশেষভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতাই বাচকত্বের বা শব্দের লক্ষণ।

সাহিত্যকে আমরা সঙ্গীতময় চিন্তা বলিতে পারি, কারণ কুন্তক বলিয়াছেন—সাহিত্য কাব্যজ্ঞগণের হৃদয়ে সঙ্গীতের ন্যায় আনন্দ জন্মাইয়া থাকে। তাঁহার মতে, সাহিত্যে বা কাব্যে অর্থ ও বিভাব একই, অর্থ বাহ্যজগতের বস্তু নহে। এই জন্যই অর্থ সহৃদয়ের হৃদয়ে আহ্লাদ জন্মায় এবং স্বভাবে সুন্দর হয়।

কুন্তক যাহাকে আদর্শ শব্দার্থ-সাহিত্য বলিয়াছেন, Abercrombie তাহাকেই কাব্যের প্রাণস্বরূপ 'incantation' বলিয়াছেন। এই incantation মুগ্ধও করে, উদ্দীপ্তও করে। শব্দের ও অর্থের প্রকৃত সাহিত্যই তাই অলংকারশাস্ত্রগত প্রকৃত সাহিত্য।

কুন্তক সাহিত্যে পানকরসের আস্বাদের[1] ন্যায় শব্দার্থ বা পদবাক্যের অর্থ অতিক্রম করিয়া একটি আশ্চর্য নূতন আস্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। পানকরসের উপমার তাৎপর্য এই যে, কাব্যে শব্দার্থ, গুণালংকার প্রভৃতির বিশিষ্ট আস্বাদের সংগে তাহাদের হইতে বিলক্ষণ একটি অপূর্ব নূতন আস্বাদ লাভ করা যায়। উহাই হইতেছে শব্দার্থ ও গুণালংকার প্রভৃতির সাহিত্যের রস। ইহাই

১ 'পানকাস্বাদবৎ'—বক্রোক্তিজীবিত, ১।১৮।

সাহিত্যের রস, ইহাই কাব্যের আত্মা, ইহারই আবির্ভাবে কাব্য হয় উজ্জীবিত, আনন্দপ্লুত, ইহারই অভাবে কাব্য হয় নিষ্প্রাণ।

'কুন্তকের এই আলোচনা সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে অভিনব, বর্তমানেও উহার তুলনা মিলে না। কেবল দুইটি ত্রুটি তাঁহার আলোচনায় দেখা যায়:—(ক) শব্দের সঙ্গীতধর্মের ন্যায় অর্থের ও চিত্রধর্মের অস্তিত্বকে কুন্তক অস্বীকার করিয়াছেন, (খ) শব্দার্থের সাহিত্যকে সুহৃদ্‌যুগল না বলিয়া অর্ধনারীশ্বরের বা বধূবরের সহিত তুলিত করিলে বোধ হয় অধিকতর মনোহারী হইত।' কাব্যে শব্দার্থকে কখনও পৃথক্ করিয়া দেখা যায় না, কারণ শব্দসত্তা অর্থময় এবং অর্থসত্তা শব্দময়। শব্দই অর্থ, অর্থই শব্দ, উভয়ে অভিন্ন, তাহাতেই কাব্যের প্রকাশ হয়। কালিদাস বলিয়াছেন—শব্দার্থযুগল এক হইয়া পরম মিলনে বিচিত্র রূপের সময় এই কল্পিত কাব্যজগতের সৃষ্টি করিতেছে।'

অলংকারশাস্ত্রের প্রধান প্রধান লেখক

পূর্বের আলোচনায় অলংকারশাস্ত্রের বিভিন্ন মতবাদের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। নবম দশম শতকের আলংকারিক রাজশেখর তাঁহার কাব্যমীমাংসা-গ্রন্থে কাব্যবিদ্যা সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রাচীন লেখকের নাম করিয়াছেন। তিনি বলেন যে সহস্রাক্ষ, উক্তি-গর্ভ, সুবর্ণনাভ, প্রচেতায়ন, চিত্রাঙ্গদ, শেষ, পুলস্ত্য, ঔপকায়ন, পারাশর, উতথ্য, কুবের, কামদেব, নন্দিকেশ্বর, ধিষণ, উপমন্যু ও কচমার বিভিন্ন বিষয় রচনা করেন। এই সকল গ্রন্থকারদের কাহারও কাহারও নাম বাৎস্যায়নের 'কামশাস্ত্রে' ও কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহাদের জীবন বা গ্রন্থ আমরা কিছুই জানি না।

ভরতের নাট্যশাস্ত্র (সূত্র)[১] অতি প্রাচীন গ্রন্থ। কিন্তু এই গ্রন্থটি প্রথম কখন রচিত হয় এবং কোন্ সময় ইহা কোহল, নন্দিকেশ্বর প্রভৃতি লেখকের দ্বারা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয় তাহা নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করা কঠিন। ভরতকে অনেক সময় তৌর্যত্রিকসূত্রকার বা নাট্যসূত্রকার বলিয়া অভিহিত করা হয়; কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ যে কেবল সূত্রাকারেই লিখিত, তাহা নহে। গ্রন্থখানি খৃষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতকের পরবর্তীকালে রচিত নহে বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

আনন্দবর্ধন তাঁহার বৃত্তিতে ভামহের[২] নাম করিয়া গিয়াছেন। বামনের স্থানে স্থানে ভামহের বর্ণনার পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয়। ভামহ উদ্ভট ও বামনের পূর্ববর্তী। ভামহ বৌদ্ধ ছিলেন এবং তিনি দিঙ্‌নাগকৃত প্রত্যক্ষের লক্ষণ স্বীকার করিয়াছেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম হইতে অষ্টম শতকের মধ্যে কোনো এক সময়ে ভামহ তাঁহার স্বকীয় গ্রন্থ রচনা করেন। ভামহ নিজেকে অনেক প্রাচীন লেখকের নিকট ঋণী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভট্টি[৩] ও ভামহ প্রায় সমসাময়িক ছিলেন—এইরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ভট্টির

---

১ History of Sanskrit Poetics (1951 edn.)—পৃঃ ১০-৪৬

২ ঐ পৃঃ ৭৫ ৮৪

৩ History of Sanskrit Poetics (Kane), পৃঃ ৭০-৭৫

দম্ভোক্তিকে শ্লেষ করিয়া ভামহ বলিয়াছেন যে শাস্ত্রের ন্যায় কাব্যও যদি ব্যাখ্যা দিয়া বুঝিতে হয় তাহা হইলে পণ্ডিতদেরই আনন্দ, মূর্খেরা ত একেবারেই মারা গেল।

দণ্ডী[১] কোন সময়ের লোক ছিলেন বলা কঠিন। সম্ভবত তিনি বামনের পূর্ববর্তী ছিলেন। দণ্ডী কাব্যে রীতির প্রশংসামাত্রই করিয়াছেন, কিন্তু বামন বলিয়াছেন, রীতিই কাব্যের আত্মা। দণ্ডী ও ভামহের[২] মধ্যে তুলনা করিলে ভামহকেই প্রাচীনতর বলিয়া মনে হয় এবং অনেক সময়ে ইহাও মনে হয় যে স্থানে স্থানে দণ্ডী ভামহকে আক্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে জোর করিয়া কিছু বলা যায় না।

উদ্ভট[৩] ভামহের উপর টীকা লিখিয়াছিলেন এবং ভামহকেই অবলম্বন করিয়া তাঁহার কাব্যালংকার-সংগ্রহ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তিনি আনন্দবর্ধনের ধ্বনিবাদের সহিত পরিচিত ছিলেন না। উদ্ভটের টীকাকার প্রতীহারেন্দুরাজ দশম শতকে জীবিত ছিলেন। তাঁহার টীকার নাম লঘুবৃত্তি।

বামন[৪] অষ্টম শতকের পরবর্তী লেখক। তিনি তাঁহার গ্রন্থে উত্তররামচরিত হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। আবার রাজশেখর (১০ম শতক) কাব্যমীমাংসায় বামনের পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। বোধহয় বামন আনন্দ-বর্ধনেরও পূর্ববর্তী। বামন ও উদ্ভট সম্ভবত নবম শতকের লোক। আনন্দ-বর্ধনের সময় হইতে বামনের 'রীতিই কাব্যের আত্মা' এই মত ক্রমশ অবসন্ন হইতে লাগিল। বামনের গ্রন্থের নাম 'কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি'।

রুদ্রট[৫] বোধহয় নবম ও দশম শতকের আলংকারিক। মাঘের টীকাকার বল্লভদেব (১০ম শতকের) রুদ্রটকৃত গ্রন্থের টীকা লিখিয়াছেন। রুদ্রটের গ্রন্থের নাম কাব্যালংকার। রুদ্রটের গ্রন্থের অন্তত তিনটি প্রসিদ্ধ টীকা আছে—বল্লভদেব, নমিসাধু ও আশাধর কৃত। নমিসাধু একাদশ শতকে জীবিত ছিলেন।

---

১ History of Sanskrit Poetics (Kane), পৃঃ ৮৪-৯৬
২ ঐ ঐ ৯৬-১২৫
৩ ঐ ঐ ১২৫-১৩১
৪ ঐ ঐ ১৩১-১৩৯
৫ ঐ ঐ ১৪২-১৫২

আনন্দবর্ধনের[১] গ্রন্থ কতকগুলি কারিকা ও তাহাদের বৃত্তির সমষ্টি। এই গ্রন্থের নাম ধ্বন্যালোক। এই গ্রন্থের উপর অভিনবগুপ্তের টীকার নাম লোচন। ইহারও পূর্বে চন্দ্রিকা নামে আর একটি টীকা ছিল। ধ্বন্যালোক নামক যে গ্রন্থের উপর অভিনব টীকা রচনা করেন, তাহার কারিকা ও বৃত্তি একজনেরই কৃত কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অভিনবগুপ্তের কথানুসারে পর্যালোচনা করিলে মনে হয়, আনন্দবর্ধনের অপেক্ষা কোনো প্রাচীন লেখক কারিকাগুলি রচনা করিয়া ধ্বনিমত স্থাপন করেন। তাহার পরে আনন্দবর্ধন নানা যুক্তির দ্বারা সেই মত পরিপুষ্ট করিয়া তাঁহার বৃত্তি লেখেন। এই ধ্বনিকার যে কে ছিলেন এবং কত প্রাচীন ছিলেন তাহা বলা দুরূহ।

কাশ্মীর-শৈব-মত সম্বন্ধে অভিনবগুপ্তঃ বহু দার্শনিক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার অভিনবভারতী[২] ও লোচন-টীকা অলংকার শাস্ত্রের শিরোমণিস্বরূপ। ডাঃ কানের মতে, "The commentary of Abhinavagupta occupies in the Alankara literature a position analogous to that of Patanjal Mahabhasya in grammar or S'ankaracarya's bhasya on the Vedantasūtras. Abhinavagupta was a profound philosopher, an acute critic and a great poet......., was a very prolific writer."[৩] অভিনব 'কাব্য-কৌতুক' নামক গ্রন্থের বিবরণ নামে একখানি টীকা লিখিয়াছেন। কাব্য কৌতুকের রচয়িতা ছিলেন অভিনবগুপ্তের গুরু ভট্টতৌত।[৪] লোচন-টীকায় অভিনব ভট্টতৌত ও ভট্টেন্দুরাজের প্রশংসা করিয়াছেন। অভিনবগুপ্তের কাল দশম-একাদশ শতাব্দী। তাঁহার লোচন-টীকারও আবার ব্যাখ্যা পাওয়া গিয়াছে।

১ History of Sanskrit Poetics, পৃঃ ১৫২-১৯৪
২ ঐ ঐ ১৯৪-৯৭
৩ ঐ ঐ ১৯৪-৯৫, ২২৬-২৩৩
৪ ঐ ঐ ২০৯-২১২

খৃষ্টীয় দশম শতকের লেখক রাজশেখর[১]; কাব্যমীমাংসা তাঁহার অলংকারগ্রন্থ। ইহা ভিন্ন তিনি বালরামায়ণ, হরবিলাস, ভুবনকোষ, কর্পূরমঞ্জরী প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ লেখেন। কাব্যমীমাংসা অসম্পূর্ণ গ্রন্থ। ক্ষেমেন্দ্র, ভোজ, হেমচন্দ্র, বাগ্‌ভট প্রভৃতি লেখকেরা কাব্যমীমাংসা হইতে তাঁহাদের প্রভূত উদাহরণ গ্রহণ করিয়াছেন। রাজশেখরও এই গ্রন্থে বহু প্রাচীন গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

ধনঞ্জয়[২] খৃষ্টীয় দশম শতকে দশরূপক রচনা করেন। "দশরূপকের মধ্যে নাটকের যতরকম বিভাগ হইতে পারে তাহারই কেবল আলোচনা আছে।"[৩] ধনিক ধনঞ্জয়ের দশরূপকের উপর টীকা লেখেন। দশরূপকের ইহা ছাড়া আরও অনেক টীকা আছে।

খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে কুন্তল বা কুন্তক[৪] তাঁহার 'বক্রোক্তিজীবিত' লেখেন। এই গ্রন্থ শ্লোক ও তাহার টীকা—এই আকারে লিখিত হইয়াছে। টীকার মধ্যে কুন্তক বহু লেখক ও কবির বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয় অভিনবগুপ্ত বা কুন্তক কেহই কাহারও উল্লেখ করেন নাই। ভামহোক্ত বক্রোক্তিই কুন্তক প্রণীত গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য বিষয়।

'ঔচিত্য-বিচারচর্চা', 'কবিকণ্ঠাভরণ' ও 'কবিকর্ণিকা' নামক অলংকার-গ্রন্থের রচয়িতা ক্ষেমেন্দ্র।[৫] ইহা ছাড়াও তিনি আরও অনেক গ্রন্থের লেখক। একাদশ শতাব্দী ইঁহার প্রাদুর্ভাবকাল। ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী'তে লেখকের কিছু আত্মপরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার অপর নাম ছিল ব্যাসদাস।

সম্ভবত একাদশ শতাব্দীতে ভোজ[৬] তাঁহার 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' রচনা করিয়াছিলেন। তিনি ধারানগরের নৃপতি। 'দশরূপক' হইতে ভোজ অনেক

১ History of Sanskrit Poetics পৃঃ ১৯৯-২০৮
২ ঐ ঐ ২৩৩-২৩৭
৩ কাব্যবিচার, পৃঃ ২৪
৪ History of Sanskrit Poetics, পৃঃ ২১৫-২২৬
৫ ঐ ঐ ২৫২-২৫৫
৬ ঐ ঐ ২৪৬-২৫২

অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। আল্‌বেরুনি ভোজের উল্লেখ করিয়াছিলেন। 'সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ' ছাড়া 'শৃঙ্গার প্রকাশ' ভোজের আর একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' আকারে বিশাল। এই গ্রন্থের প্রথম আট পরিচ্ছেদে আছে শব্দশক্তির বিচার। নবম ও দশম পরিচ্ছেদে দোষগুণ। একাদশ ও দ্বাদশে মহাকাব্য এবং নাটকের লক্ষণ ও বাকী চব্বিশটি পরিচ্ছেদে রসের বিচার আছে। ভোজের মতে শৃঙ্গারই প্রধান রস। সারদাতনয়ের ভাবপ্রকাশ সরস্বতী-কণ্ঠাভরণের অবলম্বনে লিখিত। ভোজ অভিনবের ধ্বনিবাদ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে তাঁহার মত প্রচার করেন। 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণে'র অনেক প্রসিদ্ধ টীকা আছে।

মহিমভট্ট[১] ব্যক্তিবিবেকে আনন্দবর্ধন ও অভিনবের মত খণ্ডন করিয়াছেন। সম্ভবত ইনি একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। 'তত্ত্বোক্তিকোষ' মহিমের অপর একটি গ্রন্থ।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লেখক মম্মটভট্ট[২] কাব্যপ্রকাশ তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহাতে মম্মট আনন্দবর্ধনকেই প্রধানত অনুসরণ করিয়াছেন। কারিকা ও বৃত্তি লইয়া এই গ্রন্থটি লিখিত। গ্রন্থটির খানিক অংশ মম্মট ও বাকি অংশ অলট লিখিয়াছেন। পরিকর অলংকার পর্যন্ত মম্মটের রচনা, বাকি অংশ অলটের। দোষ প্রকরণ লেখাতেই অলটের হাত ছিল। অনেকের মতে 'কাব্যপ্রকাশে'র কারিকা লিখিয়াছিলেন ভরত আর মম্মট লিখিয়াছেন বৃত্তি। কারিকা ও বৃত্তি একজনেরই লেখা ইহা নিশ্চিত। 'কাব্যপ্রকাশে'র অনেক প্রসিদ্ধ টীকা আছে।

রুয্যক[৩] সম্ভবত দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। তিনি 'কাব্যপ্রকাশসংকেত', 'অলংকারমঞ্জরী', 'সাহিত্যমীমাংসা', 'অলংকারানুসারিণী', 'ব্যক্তিবিবেকবিচার', 'নাটকমীমাংসা,' 'উদ্ভটবিচার', 'অলংকারসর্বস্ব' প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

১ History of Sanskrit Poetics, পৃঃ ২৩৭-২৪৬

২ ঐ ঐ ২৫৫-২৬৩

৩ ঐ ঐ ২৬৪-২৭৪

একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর লেখক হেমচন্দ্র।[১] ইঁহার প্রতিভা ছিল বহুমুখী—ইনি নানা বিষয়ে নানা গ্রন্থ লেখেন। অলংকার সম্বন্ধে তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'কাব্যানুশাসন', ইহার উপর হেমচন্দ্র নিজেই 'অলংকারচিন্তামণি' নামে টীকা লিখিয়াছিলেন।

বাগ্‌ভট ছিলেন দুইজন[২]; বৃদ্ধ বাগ্‌ভট লিখিয়াছেন 'বাগ্‌ভটালংকার' আর কনিষ্ঠ বাগ্‌ভট 'কাব্যানুশাসন' ও তাঁহার 'অলংকারতিলক' বৃত্তি লেখেন। বৃদ্ধ বাগ্‌ভট হেমচন্দ্রের সমসাময়িক কিন্তু কনিষ্ঠ বাগ্‌ভট হেমচন্দ্রের পরবর্তী। এই বাগ্‌ভট দুইজন চিকিৎসক বাগ্‌ভট হইতে ভিন্ন।

জয়দেব[৩] বা পীযূষবর্ষ পঞ্চদশ শতকের লোক। 'চন্দ্রালোক' নামে দশ অধ্যায়ের অলংকার গ্রন্থ ইহার প্রসিদ্ধ রচনা।

বিদ্যাধর[৪] ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লেখেন 'একাবলী'। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের ইতিহাসে ইহা অতি প্রসিদ্ধ রচনা। মল্লিনাথ চতুর্দশ শতাব্দীতে ইহার 'তরলা' নামে টীকা লেখেন।

ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের বিদ্যানাথ[৫] 'প্রতাপরুদ্রযশোভূষণ' নামে প্রসিদ্ধ এবং বৃহৎ অলংকার গ্রন্থ রচনা করেন।

বিশ্বনাথ[৬] ত্রয়োদশ শতকের লেখক। তাঁহার 'সাহিত্যদর্পণ' অলংকার শাস্ত্রের অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। 'সাহিত্যদর্পণ' ভিন্ন তিনি 'রাঘববিলাস', 'কুবলয়াশ্বচরিত', 'প্রভাবতীপরিণয়', 'প্রশস্তিরত্নাবলী' ও 'চন্দ্রকলা' রচনা করেন এবং কাব্যপ্রকাশের একটি টীকা ও 'নরসিংহবিজয়' নামে এক কাব্য লেখেন। সাহিত্যদর্পণের চারিটি টীকার মধ্যে রামতর্কবাগীশের 'বিবৃতি'ই শ্রেষ্ঠ।

---

১ History of Sanskrit Poetics, পৃঃ ২৭৬-২৭৯

২ ঐ ঐ ২৭৫-৭৬, ২৮৩-৮৫

৩ ঐ ঐ ২৭৯-২৮১

৪ ঐ ঐ ২৮১-২৮২

৫ ঐ ঐ ২৮২-২৮৩

৬ ঐ ঐ ২৮৫-২৯৩

অলংকারসাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ সারদাতনয়ের 'ভাবপ্রকাশিকা', সিংহ ভূপালের 'রসার্ণব', ভানুদত্তের 'রসমঞ্জরী'[১] ও 'রসতরঙ্গিণী,[২] ষোড়শ শতাব্দীর রূপগোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি'[৩] এক প্রসিদ্ধ রসগ্রন্থ। জীব গোস্বামী এই গ্রন্থের টীকা লেখেন। ষোড়শ শতাব্দীতে কবিকর্ণপূর 'অলংকার-কৌস্তুভ' নামে গ্রন্থ লেখেন। এই সময়েই অপ্পয়দীক্ষিত[৪] 'কুবলয়ানন্দ', 'চিত্র-মীমাংসা' ও 'বৃত্তিবার্ত্তিক' রচনা করেন। কুবলয়ানন্দের নয়টি ও চিত্র-মীমাংসার তিনটি টীকা পাওয়া যায়। কেশব মিশ্রের[৫] 'অলংকারশেখর' ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগের রচনা।

ভামিনী-বিলাস প্রণেতা জগন্নাথ[৬] ছিলেন সপ্তদশ শতকের লেখক। তাঁহার অলংকারগ্রন্থের নাম 'রসগঙ্গাধর'। ইহা ছাড়া 'চিত্রমীমাংসাখণ্ডন' নামক পুস্তকে তিনি অপ্পয়দীক্ষিতের মত খণ্ডন করেন। 'মনোরমাকুচমর্দিনী' নামে এক ব্যাকরণ গ্রন্থও তাঁহার রচনা। জগন্নাথ শাহ্‌জাহানের পুত্র দারা শিকোর প্রিয়পাত্র ছিলেন। 'রসগঙ্গাধরে'র দুইটি টীকা প্রসিদ্ধ।

উপরি-উক্ত গ্রন্থাদি ও আলংকারিক ছাড়া অলংকারসাহিত্যে আরও অনেক অপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার আছেন—গ্রন্থ-বিস্তার জন্য তাঁহাদের আলোচনা সম্ভব নয়।

---

১ History of Sanskrit Poetics. পৃঃ ২৯৩-২৯৮
২ ঐ ঐ ঐ
৩ ঐ ঐ ২৯৮-৩০৪
৪ ঐ ঐ ৩০৫-৩০৯
৫ ঐ ঐ ৩০৪-৩০৫
৬ ঐ ঐ ৩০৯-৩১২

কাব্যবিচারক

ভারতীয় ও পাশ্চাত্য

কাব্যের আলোচনায় ভারতীয় সাহিত্যে সংস্কৃত আলংকারিকগণের বিচার ভঙ্গী ও কাব্যের লক্ষণ ও মতবাদের সহিত আমরা পরিচয় লাভ করিয়াছি। এস্থলে কাব্যের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ভারতীয় ও প্রতীচ্য রীতির বিচার-শৈলীর তুলনামূলক আলোচনা প্রয়োজন। তাহা না হইলে এই ধরণের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

মম্মট বলিয়াছেন, কবির বাণী হ্লাদৈকময়ী এবং নবরসরুচিরা; অর্থাৎ

সহৃদয় সামাজিক

কাব্য আনন্দস্বরূপ ও নবরসে মনোহর। Shelley ঐ মতের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—'Poetry is indeed something divine'. সংস্কৃত সাহিত্যের নাট্য ও কাব্য বিচারে সহৃদয় সামাজিকের স্থান অতি উচ্চে। গ্রীক সাহিত্যেও তাহাই। Platoর মতে, আনন্দ দ্বারা কাব্য বিচার করিতে হইলে প্রয়োজন এমন একজন সামাজিক যিনি...."preeminent in virtue and education." Butcher-এর কথায় বলা যায়,...."the ideal spectator or listener....may be called 'the rule and standard of that art'...." "উভয় দেশের কাব্যবিচারেই দেখা যায়, কাব্য ব্যক্তিবিশেষের নহে, সমাজের। এক সামাজিক উহা প্রকাশ করেন, অপর সামাজিকেরা আস্বাদ করেন।"[১]

কাব্যপাঠমাত্র সদ্য সদ্য পরমানন্দলাভই কাব্যের মূলীভূত প্রয়োজন, লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য—ভারতীয় কাব্যশাস্ত্র ইহাই ঘোষণা করিয়াছে। এই পরমানন্দলাভের পর আর কিছু নাই, তাই আনন্দ পরব্রহ্মাস্বাদসচিব এবং ব্রহ্মাস্বাদসহোদর। Butcherও এই মত সমর্থন করিয়া বলেন, "The object of poetry is to produce an emotional delight, a pure and elevated pleasure";

ক এই অংশের জন্য লেখকদ্বয় সুধীরকুমার দাশগুপ্তের 'কাব্যালোক' গ্রন্থের নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী।

১ কাব্যালোক, পৃঃ ৯।

'a sane and wholesome pleasure'; 'each is a moment of joy complete in itself, and belongs to the ideal sphere of supreme happiness.'

আত্মানন্দের উপলব্ধি এবং স্থূল ব্যক্তি-সত্তার বিস্মরণ কাব্যেরই একমাত্র চরম ফল ও পরমলক্ষ্য নহে, যাবতীয় সুকুমার শিল্পেরই লক্ষ্য ঐ একই। দার্শনিক Bergsonএর মতে "the aim of art, indeed, is to put to sleep the active powers of our personality, and so to bring us into a perfect state of docility, in which we sympathise with the emotion expressed."

কাব্যানন্দ বুঝাইতে ইংরেজ সমালোচক ও কবি প্রধানত pleasure বা delectation শব্দই প্রয়োগ করিয়াছেন। Butcherএর মতে কাব্যানন্দ delight বা pleasure; Wordsworthএর মতে ইহা কিন্তু শুধু pleasureই নয়, passionও বটে। Shelley আবার "কাব্য সবদাই আনন্দানুস্যূত" বলিয়াছেন। Croce কিন্তু কাব্যপাঠের এই অপূর্ব ফলকে বুঝাইয়াছেন 'pure poetic joy' আখ্যা দিয়া। Keatsও ইহাকে 'joy' শব্দ দ্বারাই অভিহিত করিয়াছেন।

ভাব হইতেছে সাধারণত emotion বা feeling; অর্থকে বলা যায় thought, meaning, character প্রভৃতি। আখ্যানবস্তু হইতে একদিকে জাগে ভাব অর্থাৎ emotion বা feeling; অপরদিকে জাগে অর্থ বা thought ও character প্রভৃতি। এই অর্থ কবিকল্পিত বস্তুর বলিয়া সর্বদাই রম্যার্থ বা রমণীয় অর্থ। এই রমণীয়তা বা রম্যতা অর্থাৎ aesthetic quality কাব্যের ভাব ও অর্থ উভয়েই বর্তমান থাকে। ভাবের রম্যতাকে বলা যায় aesthetic feeling, অর্থের রম্যতা aesthetic sense. শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন—'In thought, for instance, there is the intellectual idea,....and the soul-idea, that which exceeds the intellectual and brings us into nearness or identity with the whole reality of the thing expressed. Equally in emotion......."[১] এস্থলে আমরা যাহাদের অর্থ ও ভাব বলিয়াছি, শ্রীঅরবিন্দের মতে তাহারা thought ও emotion.

কাব্যালোক হইতে উদ্ধৃতিটুকু লওয়া হইয়াছে।

ইহাদেরই পরিণত রূপকে তিনি বলেন soul idea এবং soul of the emotion ; আমাদের মতে ইহারাই রম্যবোধ এবং রস।

দণ্ডী স্বভাবোক্তিকে[১] আদি বা প্রথম অলংকার বলিয়াছেন। স্বভাবোক্তি মানুষের প্রীতিময় চিত্তে আপন প্রসন্নতায় ফুটিয়া উঠে, তাহা কেবল আদিকালের নয়, তাহা নিত্যকালের ; তাহার সহিত অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে সহজ মানুষটির। এই স্বভাবোক্তি দুইপ্রকারের—নিসর্গ কাব্য ও প্রাণিজগতের কাব্য। কাব্য কি বলিতে গিয়া Leigh Hunt বলিয়াছেন, 'the simplest truth is so often beautiful and impressive of itself, that one of the greatest proofs of its genius consists in his leaving it to stand alone........'

গ্রীসে Aristotleই সর্বপ্রথমে নীতি-তত্ত্ব হইতে সৌন্দর্য-তত্ত্বকে পৃথক্ করিয়া কাব্য ও সুকুমার কলাকে বুঝিয়াছিলেন। তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে কাব্যের লক্ষ্য একমাত্র বিশুদ্ধ বা মার্জিত আনন্দ। Richards রসানুকূল অন্তঃপ্রবৃত্তির নানা উদ্বোধনকে কাব্যাস্বাদের প্রধান উপাদান মনে করিয়াছেন, ভাব বা রসকে তাহার দ্যোতক বলিয়া স্বীকার করিলেও উহাকে প্রধান স্থান দেন নাই।

জগন্নাথ রমণীয়তাকে কাব্যের বা কাব্যাত্মক শব্দার্থের প্রধান লক্ষণ করিয়াছেন। এই রমণীয়তার অপর নাম চমৎকার, চমৎকৃতি বা সৌন্দর্য ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই চমৎকার-বোধ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের ন্যায় আনন্দ জন্মায়। এই সাক্ষাৎকারই vision ; Carlyle ইহাকেই বলিয়াছিলেন—'the seeing eye ! It is this that discloses the inner harmony of things.' এই vision দ্বারা অর্থ দীপ্ত হয়, রমণীয়তা লাভ করে এবং কাব্যে পরিণত হয়।

ভারতবর্ষে কান্তাসম্মিত উপদেশ দান ছিল কাব্যের অন্যতম উদ্দেশ্য, গৌণ উদ্দেশ্য ; গ্রীস ও ইটালিতে কিন্তু প্রীতিপ্রদ শিক্ষাদানই ছিল কাব্যের মুখ্য

কাব্যের উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য। Plutarch কাব্যকে দর্শনশিক্ষার এক 'preparatory school' নামে অভিহিত করিয়াছেন। Horaceও আনন্দের সহিত শিক্ষাদানই কাব্যের মূল উদ্দেশ্য বলিয়াছেন,

১ কাব্যাদর্শ, ২।৮।

Goethe সৌন্দর্যের পরিচ্ছদে বিভূষিত শাশ্বত সত্যকে কাব্য বা কলার চরম লক্ষ্য বলিয়াছেন। Carlyleএর মতে কাব্য সঙ্গীতময় চিন্তা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

রসতত্ত্ব সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত ঃ—প্রতীচ্যে কাব্য-শাস্ত্র বা অলংকার-শাস্ত্রের আদিগুরু Aristotle। তিনি খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে আবির্ভূত হন। ভারতবর্ষেও যে খৃষ্টপূর্ব যুগেই নাট্যবেদ, রসসূত্র, কাব্য ও অলংকারসূত্রের পত্তন ও প্রচার হইয়াছিল, তাহা আমরা ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে'ই দেখিতে পাই[১]। Aristotleএর প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার যেমন Butcher, ভরতেরও শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার তেমনি অভিনবগুপ্ত। অভিনব Butcherএর প্রায় আটশত বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন।

'Aristotle ও অভিনব উভয়েই প্রধানত নৈয়ায়িক ও দার্শনিক। উভয়েই দার্শনিক প্রতিভা লইয়া কাব্যালোচনা করিয়াছেন। উভয়েই নাটককে শ্রেষ্ঠ কাব্য গণনা করিয়াছিলেন। গ্রীক দৃষ্টিতে বস্তুই ছিল প্রধান, ভারতীয় দৃষ্টিতে কিন্তু প্রধান ছিল রস। সেজন্য Aristotle ভাব ও রসকে মোটামুটি জানিলেও বস্তুবিচারেই দিয়াছেন অসাধারণ মনীষার পরিচয় এবং 'mimesis' বা অনুকরণকে কেন্দ্র করিয়াই সমুদয় বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষে কিন্তু নাট্যকে লোকবৃত্তানুকরণ বা অবস্থানুকৃতি বলিয়া বুঝিলেও বস্তু অপেক্ষা ভাব ও রসের আলোচনা নাটকেও প্রধান হইয়া উঠিয়াছে অভিনবের গ্রন্থাদিতে।'

অভিনব নাট্যরস বা কাব্যরস বুঝাইতে যে যে বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহার প্রায় সকল অংশই Aristotleএর Poetics-এ বা Butcherএর ভাষ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। কেবল ভাবের রসনিষ্পত্তির স্বরূপ পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণ অংশত উপলব্ধি করিয়াছেন মাত্র।

Aristotle এবং অভিনব উভয়ের মতেই নাট্য ও কাব্যের উদ্দেশ্য আনন্দ বা রস। উভয়ের মতেই রস সম্বন্ধে বোধ জন্মে একমাত্র সহৃদয় সামাজিকের।

১ কাহারও কাহারও মতে, ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রের' রচনাকালের নিম্নতর সীমারেখা খৃঃ চতুর্থ শতক।

উভয়েই বিশ্বাস করেন—কাব্যের মুখ্যবিষয় মানবজীবন, প্রকৃতি উদ্দীপনবিভাব মাত্র। উভয়ের মতেই রসের বা আনন্দের উৎপত্তি ভাব হইতে। উভয়েই স্থায়ীভাব এবং সঞ্চারীভাবকে স্বীকার করিয়াছেন। যেমন ভয় স্থায়ীভাব এবং অনুকম্পা সঞ্চারীভাব। গ্রীক মতে নানাবিধ মনুষ্যজীবনই আলম্বন বিভাব এবং পারিপার্শ্বিক স্থূলজগৎ কেবলমাত্র উদ্দীপনবিভাব। যে সমুদয় কর্ম দ্বারা চিত্তগত ভাবকে বুঝা যায় তাহারাই সেই সেই ভাবের অনুভাব। ইংরাজীতে ইহাকে ensuant বলা চলে। অ্যারিস্টট্‌ল phantasy সম্পর্কে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা অনেকটা অভিনবের বাসনার উদ্বোধেরই ন্যায়। সাধারণীকরণপদ্ধতিটি মোটামুটিভাবে ইয়োরোপের প্রাচীন ও আধুনিক অনেক সমালোচকই লক্ষ্য করিয়াছেন। আর্টের সাধনায় আমরা যে সীমাবদ্ধ ব্যক্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া বিশ্বজনের সহিত এক দুর্লভ সাধারণত্বে দীক্ষা লাভ করি, তাহাই কাব্য শিল্পের মর্মকথা। Butcher এই প্রক্রিয়াকে দুই দিক্ দিয়া দেখিয়াছেন—প্রথম, কাব্যগত নায়কের সহিত একাত্মভাব, দ্বিতীয় বিশ্বজনের সহিত একাত্মতা। সাধারণীকরণের শেষ পরিণাম, প্রেক্ষক তাঁহার স্বাভাবিক সত্তার ঊর্ধ্বে উন্নীত হইয়া নিজের ক্ষুদ্র দুঃখ যন্ত্রণা ভুলিয়া যান। তখন তিনি পরিত্যাগ করেন ব্যক্তিত্বের সংকীর্ণ গণ্ডী। এই সাধারণীকরণের ফলে ভাব বিশুদ্ধ হয়। ভাব যে কিরূপে রসে পরিণত হয় আমাদের কাব্যশাস্ত্রের বিচারেও এই প্রক্রিয়াটি দুর্বোধ্য রহিয়া গিয়াছে। Butcher ইহাকে কোথাও বলিয়াছেন 'purification of the passions', কোথাও 'clarifying process', কোথাও বা 'refining process.' ইহাই Aristotleএর 'Katharsis'। কিন্তু কেবলমাত্র Katharsis বলিলে অথবা তাহাকে 'the expulsion of a painful and disquieting element' বলা হইলে বিশেষ কিছুই বলা হয় না। স্বয়ংপ্রকাশ আত্মার স্পর্শ না পাওয়া পর্যন্ত ভাব রসতা প্রাপ্ত হয় না।

গ্রীকগণ বিহার করিতেন নীতির জগতে—আধ্যাত্মিক জগৎ ছিল তাঁহাদের দুরধিগম্য। ভারতীয়গণ কিন্তু সকল প্রশ্নের সমাধানের জন্য শেষ পর্যন্ত অধ্যাত্মমার্গই অবলম্বন করিতেন। গ্রীক ও ভারতীয় প্রকৃতির বৈলক্ষণ্য সম্বন্ধে

বলা যায়—ভারতবাসীর দৃষ্টি ছিল সান্ত অপেক্ষা অনন্ত এবং নশ্বর অপেক্ষা অবিনশ্বর ভাবের দ্বারা আবিষ্ট। গ্রীসের চিন্তা ছিল নৈতিক, ভারতের আধ্যাত্মিক ; গ্রীসের ছিল যুক্তিনিষ্ঠা, ভারতের ভাবনিষ্ঠা।

ট্র্যাজেডির আলোচনায় গ্রীকগণ এতই নিবিষ্ট ছিলেন যে ভয় ভাব ছাড়া ভাবের আর কোন অলৌকিক রূপান্তর এবং তাহার ফলে আনন্দময় প্রশান্তির প্রকাশ স্বীকার করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ট্র্যাজেডির আশ্রয়ে একটি বিশেষ ভাবের বিকাশে তাঁহাদের দৃষ্টি একান্ত সীমাবদ্ধ হইয়াছিল। ট্র্যাজেডির রস সত্যই কাব্যে বা নাট্যে শ্রেষ্ঠ রস। Shelley যে বলিয়াছেন—'Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts', অভিনবেও তাহার প্রতিধ্বনি ছিল। 'সম্ভোগ-শৃঙ্গার হইতে মধুরতর বিরহ বা বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার, তাহা হইতেও মধুরতর করুণ রস।'[১]

Wordsworthএর লিখিত কাব্যসংজ্ঞা সহৃদয় পাঠকের দিক হইতে নয়, কাব্যস্রষ্টা কবির দিক্ হইতে। তাঁহার মতে 'কাব্য হইতেছে প্রবল অনুভূতি-নিচয়ের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস ; প্রশান্ত অবস্থায় অনুস্মৃতভাব হইতে ইহার উৎপত্তি। এই সংজ্ঞার শেষাংশ, আমাদের রসাত্মক বাক্য যে কাব্য, তাহারই এক অস্ফুট ধারণা জন্মায়। কাব্য ভাব নয়, ভাব হইতে তাহার উৎপত্তি এবং স্মৃতিসহযোগে চিত্তের অচঞ্চল অবস্থায় যে ভাববর্ণনা তাহাতেই কাব্যের উৎপত্তি হয়। পাঠকের চিত্ত যদি সবল, সতেজ থাকে তবে সেখানে ভাবের সহিত আসিবে আনন্দাতিরেক বা overbalance of pleasure. ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ ও শেলির[২] সাধারণীকরণের বর্ণনা প্রায় ভারতীয় রীতির অনুগামিনী। Croce বলিয়াছেন—'poetic idealization is not a frivolous embellishment, but a profound penetration, in virtue of which we pass from troublous emotion to the serenity of contemplation.' (European Literature in the Nineteenth Century.)[৩]

---

১ ধ্বন্যালোক, ২।৯, টীকা।

২ Vide, "Poetry and Poetic Diction"—Wordsworth and 'A defence of poetry'—P.B. Shelley.

৩ দ্রঃ কাব্যজিজ্ঞাসা (অতুল গুপ্ত), 'রস'।

রস ও Beauty :—প্রাচ্যের রস এবং প্রতীচ্যের সৌন্দর্য উভয়ই বস্তু বা বিভাবকে অবলম্বন করিয়া সৃষ্ট ও পুষ্ট হয়। রসবাদে কেবল ভাব অংশের প্রাধান্য, আর সৌন্দর্যবাদে রূপ অংশের প্রাধান্য। কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিকের মতে সৌন্দর্যও রসের ন্যায় বিষয়ীর আত্মগত বোধরূপে প্রকাশ পায় এবং আনন্দ স্বরূপে পরম সার্থকতালাভ করে। Kant বলেন, 'সৌন্দর্য একটি চিত্তপরিতোষ-মাত্র, উহা প্রমাতার (বা বিষয়ীর) আত্মগত ধর্ম।' সৌন্দর্য বস্তু-সমূহের স্বভাবস্থ কোন গুণ নহে, যে চিত্ত তাহাদের চিন্তা করে, তাহাতেই কেবলমাত্র উহা অবস্থান করে—ইহাই Humeএর বক্তব্য। বস্তুত আলোচনা করিলে দেখা যায় কাণ্টের সৌন্দর্য ও ভরতের রস মূলত অভিন্ন। Hegel অদ্বৈতবাদ আশ্রয় করিয়া সৌন্দর্যের মূলে দেখিলেন বস্তুর আশ্রয়ে প্রজ্ঞার ঔজ্জ্বল্য। সকল সৌন্দর্যই ভাবের প্রকাশ এবং এরূপ সকল প্রকাশই সুন্দর—ইহাই আধুনিক পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত।

ধ্বনি ও Suggestion :—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে কাব্যের বাচ্যার্থকে অতিক্রম করিয়া পাঠকের চিত্তে একই সময়ে যে আর একটি অর্থ প্রতীয়মান হয়, সেই প্রতীয়মান অর্থটিকে বলা হয় ধ্বনি। এই অর্থ বাচ্যার্থ দ্বারা দ্যোতিত বা ব্যঞ্জিত হয়। ইহাই ইংরাজীতে spirit বা suggested sense। ধ্বনন ক্রিয়াকে বলা হয় suggestion ; ব্যঞ্জনা শক্তিকে বলে power of suggestion ; Ogdenএর ভাষায় ইহাই evocation in the listener.

ধ্বনি যে কাব্যের কত বড় সম্পদ্, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহা বিশেষ করিয়াই উপলব্ধি করিয়াছেন। Bradleyর মতে ধ্বনি হইতেছে suggestion এবং কাব্য হইতেছে unique expression। শ্রেষ্ঠ কাব্যের সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "About the best poetry, and not only the best, there floats an atmosphere of infinite suggestion. The poet speaks to us of one thing, but in this one thing there seems to lurk the secret of all.....Poetry has in this suggestion, this 'meaning' a great part of its value....It is a spirit. It comes we know not whence...It is not our servant ; it is our master."[১]

১ Oxford Lectures on Poetry.

অলংকার হইতে ধ্বনির উৎপত্তি কিভাবে হইয়াছে এবং ধ্বনিকার ও তাঁহার অনুবর্তিগণ ব্যঞ্জন ও ধ্বনি বলিতে কি বুঝিয়াছেন তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। ব্র্যাড্‌লের মত অন্যান্য পাশ্চাত্য সুধীবৃন্দ এই বিষয়ে কি মন্তব্য ও বিচার বিশ্লেষণ করিয়াছেন এস্থলে তাহাই আলোচ্য। শেক্‌স্‌পীয়ার ও তাঁহার পূর্ব এবং পরবর্তী শ্রেষ্ঠ ইংরেজ কবিগণের কাব্য ও নাট্যে ব্যঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনির নানাবিধ উল্লাস আছে; কিন্তু আলংকারিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ধ্বনিবিচারের বিশেষ কোনো চেষ্টা দেখা যায় নাই। ধ্বনিবাদের শব্দার্থবিজ্ঞানসম্মত আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে সম্প্রতি Richards, Ogden, Jesperson প্রভৃতির আলোচনায়। Shelley, Carlyle, এবং Abercrombieও ধ্বনিতত্ত্বের সহিত কিছু কিছু পরিচিত ছিলেন। Shelleyর মতে, "All high poetry is infinite....veil after veil may be undrawn, and the inmost naked beauty of the meaning never exposed. A great poem is a fountain for ever overflowing with the waters of wisdom and delight..."[১] এই ধ্বনি আছে বলিয়াই শকুন্তলা বা মেঘদূতের নব নব আস্বাদলাভ সম্ভবপর হইয়াছে। এই আলোচনা বা আস্বাদন শেষ হইয়াছে, ইহা কেহই জোর করিয়া বলিতে পারিবেন না। Carlyleও Shakespeare সম্পর্কে বলিয়াছেন—"The latest generations of men find new meanings in Shakespeare, new elucidations of their own being." কাব্যের ভাষাতে magic incantation অবশ্যই থাকা দরকার বলিতে গিয়া এবারক্রম্বি বলিয়াছেন ভাষায় চাই 'unsuspected filaments of fine allusion and suggestion.' বাক্য একটি মাত্র হইলেও তাহাতে যেন বহুবিধ অর্থের অনুরণন উঠে, ইহা দেখা অবশ্য প্রয়োজন। ডাঃ সুধীর কুমার দাশগুপ্তের মতে ইংরেজীর law of Associationই আমাদের ব্যঞ্জনাবৃত্তি।

কাব্য পাঠের সংগে সংগে চিত্তের যে অন্তঃস্ফুরণ ঘটে, রিচার্ডস্ তাহাকে বলিয়াছেন attitude ; চিত্তের বাসনাত্মক স্ফুরণ ব্যাপারই attitude—ইহাই কাব্যাস্বাদের প্রথম প্রযোজক এবং রসানুকূল চর্বণা। ইহার মূলীভূত শক্তিই

১ A Defence of Poetry.

ব্যঞ্জনা। অধ্যাপক Miller এই ব্যঞ্জনাকে বলিয়াছেন—'that which is suggested is meaning'; অপর একজন মনীষী বলিয়াছেন—'The suggestiveness of experience is infinite'।

Richards বাক্যকে বিচার করিয়াছেন চারিটি দিক্ হইতে—Sense, Feeling, Tone এবং Intention; Richardsএর Intentionই আমাদের ব্যঙ্গার্থ বা ধ্বনি।

কাব্যের বস্তু সম্বন্ধে Shakespeare বলিয়াছেন—'The poet's eye, in a fine frenzy rolling, doth glance from[১] heaven to earth, from earth to heaven',; শেলির মতে, 'poetry turns all things to loveliness; it exalts the beauty of that which is most beautiful'. আমাদের আনন্দবর্ধনও বলিয়াছেন—'এমন কোনও বস্তুই নাই যাহা চিত্তবৃত্তিবিশেষ না জন্মায়, এবং যাহার উপাদান হইলে তাহা কবির অর্থাৎ কাব্যের বিষয় না হয়।'[২] Abercrombie আনন্দবর্ধনের অনুরূপ উক্তিই করিয়াছেন—'...the really characteristic thing about the art of poetry is its power to present the whole conceivable world....''

'দশরূপকে' ধনঞ্জয় বলিয়াছেন যে, কবি-ভাবনা দ্বারাই ভাব্যমানতা সম্ভবপর হয়। Schopenhauerও বোধহয় অনুরূপ মতই পোষণ করিতেন, কারণ তিনি বলিয়াছেন—"....everything in the world is capable of being found beautiful perhaps in many different ways, if only we have the necessary genius."

বিভাবকে বা excitantকে বলা যায় নাট্য বা কাব্যের শব্দে সমর্পিত বাহ্য জগতের বস্তু। এই বস্তু শব্দে সমর্পিত হয় কবিচিত্তের ব্যাপারবিশেষের মধ্য দিয়া। বিভাবের সম্পাদনাই সম্ভবত বস্তুর অনুকরণ, অ্যারিস্টট্‌ল্ যাহাকে বলিয়াছেন mimesisবা Imitation। বিভাব বস্তুর সদৃশ হইয়াও বস্তুর নিখুঁত প্রতিচ্ছবি নয়। কবিচিত্ত তো জড় দর্পণসদৃশ নয় যে বস্তু তাহাতে সহজ নিয়মে প্রতিবিম্বিত

১ Midsummer-Night's Dream. Act V, Sc. I, 12-14.

২ ধ্বন্যালোক, ৩।৪৩।

হইয়া আপনি প্রকাশ পাইবে। বস্তু ও বিভাবের বাহ্য সাদৃশ্য উপলব্ধি করিয়াই প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন গ্রীসের আলংকারিকগণ ভাষায় ইহাকে অনুকরণ-প্রক্রিয়া আখ্যা দিয়াছেন। অনুকরণ পশ্চাৎকরণ হইলেও করণই। মন যাহাকে গ্রহণ করে, তাহাকে তাহার আত্মভূত করিয়া লয়। অতএব বস্তুর অনুকরণের মধ্যেই থাকে নবীকরণ। কালিদাসের 'মেঘদূত'কে 'প্রাচীনসাহিত্য গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছেন নিজ ভাবময় ব্যক্তিবোধের মধ্য দিয়া, তাই তাঁহার 'মেঘদূত' প্রবন্ধে প্রকাশ পাইয়াছে অভিনব মেঘদূত।

ভরত, ধনঞ্জয় প্রভৃতির রচনায় এবং 'বিষ্ণু-ধর্মোত্তর' গ্রন্থে এবং অন্যান্য প্রাচীন অলংকার গ্রন্থে 'অনুকরণ' শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। শিল্পশাস্ত্র, নৃত্যশাস্ত্র ও চিত্র-শাস্ত্রে এই অনুকরণের ব্যবহার কিরূপে হইয়াছে তাহারও সম্যক্ আলোচনা পাওয়া যায়। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের এই 'অনুকরণ' শব্দের প্রয়োগে বুঝিতে হইবে একদিকে বস্তুর বাহ্যরূপের সদৃশীকরণ, অপরদিকে তাহার রূপাতীত প্রাণপ্রদ-ধর্মের আবিষ্করণ। এই দুই ক্রিয়াকে একত্র করিয়া আমরা বলিতে চাই নবীকরণ।"[১] অনুকরণ সম্বন্ধে Aristotle বলেন, 'The poet being an imitator....must of necessity imitate one of the three objects,—things as they were or are, things as they are said or thought to be or things as they ought to be.'[২]

Pater-এর মন্তব্য অনুকরণ সম্বন্ধে অনুরূপই। Croce ইহাকে 'Imitation of Nature' বলিয়াছেন।

ঔচিত্যকে আধুনিক সমালোচকগণ বলিয়াছেন কাব্যগত সত্য বা Poetic truth. কবি-শক্তির বলেই আসে এই ঔচিত্য। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, ইতিহাসগত তথ্য এবং কাব্যগত সত্যে পার্থক্য কি? কাব্যজগতে সত্য কি সে সম্বন্ধে Tennyson বলিয়াছেন—Poetry is truer than fact. Aristotle-এর ভাষায়....'the true difference (between the poet and the historian) is that one relates what has happened, the other what may happen. Poetry, therefore, is a more philosophical and higher

---

১ কাব্যালোক, পৃঃ ৪৮০।

২ The Poetics, XXV. I.

thing than history ; for poetry tends to express the universal, history the particular.'[১] ইহাই কাব্যের সার্বজনীন বা universal রূপ।

Plato তাঁহার কল্পিত রাজ্য হইতে কবি ও কাব্যকে নির্বাসিত করিতে চাহিয়াছিলেন। আমাদের শাস্ত্রেও আছে 'কাব্যালাপাংশ্চ বর্জয়েৎ'। কবি ও কাব্যের বিরুদ্ধে আমাদের শাস্ত্রকারদের অভিযোগও বোধহয় ঐরূপই ছিল।

কবির সম্বন্ধে মুখ্য আলোচনাই হইতেছে কবির দৃষ্টিভঙ্গী বা কবিচিত্তের বিশেষ ভাবনা-ভঙ্গী লইয়া। প্রতীচ্যে ইহারই নানা ভেদ Realism, Idealism, Romanticism, Classicism প্রভৃতি নামে পরিচিত। এইগুলি যেমন একদিকে কবিচিত্তের ভাবনাভঙ্গী, অপরদিকে তেমনই কাব্যরচনার বিশেষ কৌশলও বটে। কবির প্রতিভা হইতেই আসে এই বিশেষত্ব। কুন্তক বলেন, 'যাহা কিছু বৈচিত্র্য, সে সকলই কবিপ্রতিভাপ্রসূত।'[২] এই প্রতিভার মধ্যেই নিহিত থাকে কবি-স্বভাব। কিন্তু সকল প্রকার কবি-দৃষ্টির মূলেই আছে এক বিশিষ্ট বিস্ময়বোধ, সকলপ্রকার 'ism'এর মূলে তাহাই। ক্রোচের মতে শ্রেষ্ঠ কবিকে একাধারে ক্লাসিক ও রোমান্টিক হইতে হইবে।

'রঘুবংশে' কালিদাস্ পার্বতীপরমেশ্বরকে বন্দনা করিয়াছেন বাগর্থ লাভের জন্য। বাগর্থ যেন তুল্যগুণ বধূবর। Carlyleএর মতেও '....body and soul, word and idea, go strangely together here as everywhere.'

Croce অলংকারকে রসের বা উপলব্ধির এক অবিচ্ছেদ্য অংগ বলিয়াছেন। তিনি বলেন, "One can ask oneself how an ornament can be joined to expression Externally ? In that case it must always remain separate. Internally ? In that case, either it does not assist expression and mars it ; or it does form part of it and is not ornament but a constituent element of expression, indistinguishable from the whole[৩]" পেটারের মতে ইহাই

১ The Poetics IX. 2, 3.

২ বক্রোক্তিজীবিত, ১।২৮।

৩ Aesthetic, Ch. IX.

"permissible ornament being for the most part structural or necessary."

কাব্যবিচারের ভারতীয় ও প্রতীচ্য রীতির আলোচনায় নিম্নলিখিত দুই একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গ্রীক ক্ল্যাসিক্যাল নাটকে ট্র্যাজেডিই সর্বাধিক প্রশংসিত, কিন্তু সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র নাটকের ট্র্যাজেডিতে পরিণতিকে বাধা দিয়াছে।১ সংস্কৃতে ট্র্যাজেডি নাই—নাটকের নিয়মাবলীর বহির্ভূত হইতেছে ট্র্যাজেডি। গ্রীক ও ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে ইহাই মূলীভূত পার্থক্য। Aeschylus, Sophocles, Euripides প্রভৃতি ট্র্যাজেডি রচনায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। নাটক ট্র্যাজেডি হইলে Katharsis পরিপূর্ণ ভাবেই প্রকাশিত হইত। কবি Shelley যে বলিয়াছেন—'Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts' অথবা Wordsworth-এর মতে যে 'Our thoughts that do often lie are too deep for tears', মনে হয় গ্রীক ট্র্যাজেডির আদর্শও ছিল তাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রকারগণ ট্র্যাজেডির প্রতিকূল ছিলেন, নাটকের পরিণতি তাঁহারা বিয়োগান্ত করিতে দেন নাই। কিন্তু কেন? তবে কি তাঁহারা ট্র্যাজেডি অপেক্ষা কমেডিকেই বেশী ভাল মনে করিতেন? করুণ রসেই যে রসের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি হয়, ইহা কি তাঁহারা জানিতেন না? ট্র্যাজেডি তাঁহাদের নিয়মের বহির্ভূত ছিল বটে, কিন্তু ট্র্যাজি-কমেডির দৃষ্টান্তের২ সংস্কৃত সাহিত্যে অভাব নাই। তবে কেন ট্র্যাজেডির প্রতি এই বিরূপতা?

আমরা জানি যে আত্মদ্বন্দ্বে পরাভূত বা অভিভূত মানবজীবনের করুণ কাহিনীকেই সাধারণত বলা হয় ট্র্যাজেডি। শেক্স্পীয়ারের ট্র্যাজেডিতে দেখান হয় কোন খ্যাতিমান্, বিশিষ্ট ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির পতন। নাট্যকার এই জাতীয় নাটকে গুরুগম্ভীর বাণীভঙ্গীতে নায়কের জীবনের নিদারুণ বেদনাকে রূপ দেন। নায়কের একদিকে থাকে তাহার আপনার সংগে

১ দ্রষ্টব্য :—'ইউরোপীয় ট্র্যাজেডি ও ভারতীয় করুণরস'—[সাহিত্যিকা—নলিনীকান্ত গুপ্ত, পৃঃ ৬৩-৭০।]

২ দৃষ্টান্তস্বরূপ ভবভূতির 'উত্তররামচরিতের' উল্লেখ করা যাইতে পারে

আপনার দ্বন্দ্ব বা Internal conflict ; অপরদিকে বাহিরের ঘটনাবলীর সহিত তাহার দ্বন্দ্ব বা External conflict। "চারিত্রিক ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও আত্ম-নিরপেক্ষ নিয়তিলীলার দ্বন্দ্বযুদ্ধে বার বার পরাজিত হইয়াও যে শুধু Will powerএ অনুপ্রাণিত হইয়া নায়ক আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চায়, তাহাই তাহাকে নায়ক-সুলভ বৃহৎ মর্যাদা দান করে।[১]" রংগমঞ্চে নায়ক বা নায়িকার গতিশীল জীবনকাহিনীর দৃশ্যপরংপরা উপস্থাপিত করিয়া, দর্শকের হৃদয়ে ভীতির উদ্রেক ও সহানুভূতি প্রশমিত করিয়া তাহার মনে করুণ রসের আনন্দ সৃষ্টি করাই ট্র্যাজেডির চরম উদ্দেশ্য।

পূর্বেই বলিয়াছি, শেক্‌স্‌পীয়ারের বিয়োগান্ত নাটকে থাকে ব্যর্থতা এবং মৃত্যুই সেখানে তা'র স্বাভাবিক পরিণতি। কিন্তু আধুনিককালে মৃত্যু সকল সময় ট্র্যাজেডিতে পরিণতি নয়। আধুনিক যুগে কোন ব্যক্তিবিশেষের জীবন-ব্যর্থতার ইতিহাসটিকেই বিয়োগান্ত নাটকের উপজীব্যরূপে গ্রহণ করা হয়। এই ব্যর্থতার বেদনা উদ্বোধনের জন্য আধুনিক ট্র্যাজেডিকে বিয়োগান্ত না বলিয়া বিষাদাত্মক বলাই ভাল।

পূর্বেই বলিয়াছি ট্র্যাজেডি আমাদের দেয় আনন্দ। 'সাহিত্যদর্পণ'কার বলিয়াছেন—করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎ পরং সুখম্।

সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্॥

Abercrombieর মতে, 'Tragedy satisfies us even in the moment of distressing us.'[২] ট্র্যাজেডি মানবজীবনের গভীরতম প্রদেশ পর্যন্ত আলোড়িত করিয়া সামাজিকের সহানুভূতি আকর্ষণ করে এবং তাহার মন করুণা ও ভীতিতে পূর্ণ করিয়া দেয়। সামাজিকের মনে জাগে সহানুভূতি। এই সহানুভূতি জাগে দুই কারণে—প্রথমত, আমাদের জীবনেও অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইলে কি ভয়াবহ হইয়া উঠিবে সে অবস্থা, এই ভাবিয়া আমরা শিহরিয়া উঠি। দ্বিতীয়ত, আমাদের অবস্থা নাটক বর্ণিত ঘটনাচক্রের অনুরূপ না হইলেও, নাটকের পাত্রপাত্রীও আমাদেরই মত রক্তমাংসে গড়া মানুষ,

১ সাহিত্য-সন্দর্শন, পৃঃ ৫৩।

২ The Idea of Great Poetry.

সেজন্য মানুষ হিসাবে তাহাদের জন্য আমাদের হৃদয়ে করুণা জাগে। নায়ক নায়িকার ত্রুটি বিচ্যুতির মধ্যে, আঘাতের মধ্যে আমরা আপনাকে পাই এবং মানবজীবনের নিয়তি সম্বন্ধে সচেতন হই। এইভাবে আত্মবিলুপ্তির মধ্য দিয়া নাটক দর্শনকালে আমাদের যেন নবজন্ম হয়।

নাট্যকার সুকৌশলে কৃত্রিম উপায়ে দুঃখ, বিপদ, হর্ষ, বিষাদ, প্রেম, নৈরাশ্য, ঘৃণা, ক্রোধ প্রভৃতি ভাবগুলি আমাদের মধ্যে উদ্রেক করিয়া দিয়া ইহাদের আকস্মিক ও অত্যুগ্র আত্মপ্রকাশ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন। ট্র্যাজেডি আমাদের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে বাসনা কামনার উদ্রেক করিয়া আবার উহাদের নিরসন করত আমাদের মানসস্বাস্থ্যের সাম্যবিধান করে। "নাট্যকার গভীর ভাবে আমাদের সুপ্ত বেদনা-সিন্ধু উদ্বেলিত করিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে প্রশমিত করিলে, আমরা অশ্রুবিধৌত হইয়া বর্ষণস্নাত শ্যাম প্রকৃতির মত শান্ত, সমাহিত ও কান্তরূপ পরিগ্রহ করি।"[১] জনৈক সমালোচক বলিয়াছেন—'The strange calm which succeeds the spectacle of tragic dissolution, comes not from a sense of defeat but from awe of the fulfilment.'

কমেডিতে কিন্তু সাধারণত মানব জীবনের হর্ষোদ্দীপক লঘুচিত্রটি অংকিত হয়। ইহার নায়ক জীবনের উন্নতির পথে সকল বাধাবিঘ্ন অল্পায়াসে বা অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়। ইহার পরিসমাপ্তি হাস্যমধুর ও আনন্দোজ্জ্বল। অ্যারিস্টট্‌লের মতে, মানব চরিত্রের যে কৌতুকাবহ দিক্‌টি পীড়ন করে না, ব্যথা দেয় না, হাস্যরস সৃষ্টি করে, তাহাই কমেডির উপজীব্য। এই কৌতুকের জন্ম আবার ইচ্ছার সহিত অবস্থার, আকাঙ্ক্ষার সহিত প্রাপ্তির, উদ্দেশ্যের সহিত উপায়ের বা কথার সহিত কার্যের অসঙ্গতির মধ্যে। আপাত-অসম্ভব হইলেও বেদনা হাস্যরসের জন্মভূমি। অপরকে বেদনা দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার কামনাও মানুষের অতি সাধারণ মনোবৃত্তি। রবীন্দ্রনাথের মতে, 'কমেডি এবং ট্র্যাজেডি কেবল পীড়নের মাত্রাভেদ।'

শেক্‌স্‌পীয়ারের কমেডিস্থ হাস্যরস যেন সুস্থসমাজচেতনার উদার ক্ষমাসুন্দর

১। সাহিত্য সন্দর্শন, পৃঃ ৫৫-৫৬।

হাসি। এই হাস্যরসে দর্শকের অহমিকা বোধ থাকে না। সামাজিক হাস্যোদ্দীপক চরিত্রের সহিত অভিন্ন হইয়া নিজের দুর্বলতার মধ্যে নিজেকে দর্শন করেন। কমেডি আমাদের মানবসুলভ ত্রুটিবিচ্যুতি ও নির্বুদ্ধিতার পরিণাম আঁকিয়া আমাদের অশোভন দুর্বলতার হাত হইতে মুক্তি দিয়া স্বাভাবিক ও সুস্থ করিয়া তোলে।

জীবনের কোনো গভীর সমস্যা কমেডির উপজীব্য নয়, ইহা শুধু উপস্থাপিত করে জীবনের লঘুতর দিকটি। ইহার অর্থ এই নয় যে, ইহাতে কোনো জীবন-জিজ্ঞাসা নাই। আসল কথা এই যে কমেডির জীবন-জিজ্ঞাসা মানুষকে কোনো পরম রহস্য সন্ধানে নিয়োজিত করে না ; কমেডি মানুষকে লইয়া যায় সর্বপ্রকার অসংগতির উর্ধ্বে। 'ট্র্যাজেডিতে মানুষ জীবনের ব্যর্থতার মধ্যে, নিরবধি কালের মধ্যে পরম শান্তি এবং সান্ত্বনা খুঁজিয়া পায়। কমেডিতে মানুষ এই পৃথিবীর মধ্যেই তাহার বিজয় পতাকা উড্ডীন দেখিতে পায়।'[১] সংস্কৃত নাটকে আমরা দুই প্রকারের কমেডির সন্ধান পাই :—রোমান্টিক কমেডি ও চক্রান্তমূলক কমেডি।

ইংরেজী সাহিত্যে যাহাকে Historical Drama বলে, সংস্কৃতে তাহার উদাহরণ মেলে 'মুদ্রারাক্ষস নাটকে'। Shakespeare-এর Henry IV এই জাতীয় নাটক ; Shelleyর Prometheus Unbound পৌরাণিক নাটক বা mythical drama র উদাহরণ। সংস্কৃতে এই জাতীয় নাটক ভবভূতির 'মহাবীর চরিত' ও 'উত্তররামচরিত' এবং কালিদাসের 'শকুন্তলা' প্রভৃতি। Maeterlinck-এর The Blue Bird সাংকেতিক (symbolic) নাটকের উদাহরণ। সংস্কৃতে এই জাতীয় রচনা প্রবোধচন্দ্রোদয়, লেখক কৃষ্ণমিশ্র।

সংস্কৃত নাটকের নিয়মানুসারে অঙ্গী বা প্রধান রস শৃঙ্গার বা বীর, কখনও বা শান্তও হইতে পারে। অন্যান্য রস থাকিবে অপ্রধান ভাবে—ইহাতে করুণ রস থাকিলেও বিয়োগান্ত রূপকের (নাটকের) স্থান নাই ; একথা পূর্বেই বলিয়াছি। বোধ হয় জীবন দুঃখময় বলিয়া আলংকারিকগণ আর দৃশ্যকাব্যে ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করিয়া মানুষের মনে বেদনা সৃষ্টি করিতে চাহেন নাই। অথবা

১ সাহিত্যসন্দর্শন, পৃঃ ৫৯।

এমনও হইতে পারে যে, অভিনয়াদি দর্শনে যে করুণরসের সৃষ্টি হয় তাহার ফলে যে রসোদ্রেক হয় তাহাতে পরিশেষে আনন্দ বা aesthetic pleasure-ই হয় উপলব্ধ। অশ্রুর মধ্যেও যে থাকে আনন্দকণা—ইহাতো মাঝে মাঝে আমরা প্রত্যক্ষই উপলব্ধি করি। ট্র্যাজেডি রচনা না করাই বোধ হয় ভারতীয় বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু শ্রব্যকাব্যে তো ট্র্যাজিক রস বা অবস্থা স্বীকৃত হইয়াছে। আদি কবি বাল্মীকির ক্রৌঞ্চমিথুনবিয়োগজনিত শোকই ত শ্লোকরূপে উৎসারিত হইয়াছিল। কবির এই বেদনা-বোধ স্বকীয় দুঃখ-সন্তপ্ত চিত্তের অবস্থা নয়, ইহার মধ্যে আছে তদ্‌গত চিত্তের আনন্দপ্রকাশের আত্মবেদনা—অতএব বলা যায় যে কবির বেদনাবিদ্ধ হৃদয়ই কবিতার জন্মভূমি। কবি বেদনাকে যেন আস্বাদ্যমান রসমূর্তি দান করেন। বেদনার যিনি ভোক্তা, তিনি উহার স্রষ্টা না হইতে পারিলে তাঁহার দ্বারা কাব্যসৃষ্টি সম্ভব নয়। রামায়ণ ও মহাভারতের পরিণতি ট্র্যাজেডিতেই।

উপরে সংক্ষেপে ভারতীয় ও প্রতীচ্য কাব্য-বিচারপদ্ধতির কথা বলা হইল। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে যথার্থই বলিয়াছেন—"সংস্কৃত-সাহিত্যে কাব্যবিচারের মধ্যে যে আশ্চর্য সূক্ষ্মদর্শিতা ও সত্যানুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার সহিত তুলনায় গ্রীক্ সমালোচনাকে অনেকটা তথ্যপ্রধান ও বহিরঙ্গমূলক বলিয়া মনে হয়। এমনকি আধুনিক সাহিত্য-বিচারে যে পরিণত অন্তর্মুখিতা তাহারও সহিত ইহা সমকক্ষতার স্পর্ধা করিতে পারে। কাব্য-সৌন্দর্যের স্বরূপ সন্ধানে ইহা যেরূপ বিশ্লেষণের গভীর হইতে গভীরতর স্তরে অবতরণ করিয়াছে, অনুভূতির আলোকবর্তিকা হস্তে সৃষ্টি রহস্যের মর্মমূল পর্যন্ত স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, চরম সত্য আবিষ্কারের প্রেরণায় পূর্বতন সিদ্ধান্তকে 'এহ বাহ্য' বলিয়া অতিক্রম করিয়া দুর্গমতর পথে পদক্ষেপে সাহসী হইয়াছে তাহার তুলনা পৃথিবীর অন্য কোন সাহিত্যে বিরল।"[১]

"আমাদের আত্মপরিচয় ও যথার্থ পরিচয় চাই। সে পরিচয় হইতে পারে কেবলমাত্র পূর্ববর্তী আচার্যগণের শ্রেষ্ঠ চিন্তারাশির উপলব্ধি ও স্বীকৃতি দ্বারা। পাশ্চাত্যের সহিত তুলনা হইতে আসিবে আমাদের আত্মপ্রত্যয় এবং শক্তি-

১ 'সমালোচনা সাহিত্য' গ্রন্থের ভূমিকা।

বৃদ্ধি ঘটিবে। বিশেষত 'অলঙ্কারশাস্ত্র বা কাব্যশাস্ত্র এমন একটি বিষয়, যাহাতে ভারতীয়গণের গৌরব বোধ করিবার অনেক কারণই বর্তমান। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতীচ্যে যে তত্ত্বের আলোচনার প্রারম্ভিক অবস্থা, সংস্কৃত গ্রন্থে তাহার পরিপক্ক সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয়। আর পাশ্চাত্ত্যের আধুনিক যুগের অনেক বিস্ময়কর আলোচনা ভারতীয় আচার্যগণ আটশত বা দশশত বৎসর পূর্বে অনেকাংশে সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণও মিলে। ব্র্যাড্‌লে কিংবা রিচার্ডস আজ যে কথা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা যদি হাজার বৎসরেরও পূর্বে প্রায় পূর্ণাঙ্গ মতরূপে আনন্দবর্ধন বা অভিনবগুপ্তের আলোচনায় পাওয়া যায় এবং ওয়াল্‌টার পেটারকে যদি নয়শত বৎসরের পূর্ববর্তী কুন্তকের পথেই বিচরণ করিতে দেখা যায়, তবে আনন্দ হয় না কি, এবং সে আনন্দ হইতে আত্মশক্তির উদ্বোধন হয় না কি?"[১]

১ কাব্যালোক, পৃঃ [পাঁচ]।

সংস্কৃত সাহিত্যে নন্দনতত্ত্ব[১]

ভারতীয় নন্দনতত্ত্ব বা সৌন্দর্যতত্ত্বের ইতিহাসে সংস্কৃত সাহিত্যের অবদান অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু এই স্থলে নন্দনতত্ত্ব বলিতে আমরা প্রকৃতপক্ষে কি বুঝিব তাহা পূর্বেই বলিয়া রাখা প্রয়োজন। এখানে aesthetics বলিতে আমরা হেগেলের ভাষায় চারুশিল্পের দর্শন বুঝিব না, বা ভাষায় যাহাকে প্রকাশ করা যায় না সেই অনির্বচনীয় অনুভূতিকেও বুঝিব না। এস্থলে নন্দনতত্ত্ব বলিতে আমরা স্পষ্টভাবেই দুইটি বিষয় বুঝাইতে চাই :—(ক) ইহা চারুকলার বিজ্ঞান ও (খ) ইহা চারুকলার দর্শন উভয়ই বটে।

নন্দনতত্ত্ব

নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কিত সমস্যাগুলিকে নানাদিক্ হইতে সংস্কৃত সাহিত্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার ও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। "Theory of meaning" ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের একটি অতি প্রয়োজনীয় অংশ। সুবিখ্যাত ভারতীয় নন্দনতত্ত্ববিদ্ শ্রী কে. সি. পাণ্ডে বলিয়াছেন "The problems of Aesthetics has been approached from the technical, metaphysical, psychological, epistemic, logical and critical points of view."[২]

ভারতীয় নন্দনতত্ত্ব বলিতে কি বুঝায়?

ইহার সমস্যা

নাট্যসম্বন্ধীয় দুইটি রচনার উল্লেখ পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে দেখা যায় (৪।৩।১১০—১১)। উহাদের লেখক যথাক্রমে শীলালী এবং কৃশাশ্ব। ইহাতেই বুঝা যায় যে গ্রীসে নাটকের আবির্ভাবের বহু পূর্ব হইতেই ভারতবর্ষে নাট্যানুশীলন চলিয়া আসিতেছিল। ইহার পর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ ভরতের নাট্যশাস্ত্র।

পাণিনি

ভরত

১ এই আলোচনার জন্য লেখকগণ Dr. K. C. Pandey এবং Dr. S. K. Deর প্রবন্ধাদির নিকট অশেষভাবে ঋণী।

২ History of Philosophy : Eastern & Western, Vol I, p. 472.

নাটকের প্রসঙ্গে নন্দনতত্ত্বের আলোচনার প্রথম প্রায় সার্ধ তিন শত বৎসর (ভরতের আবির্ভাবকাল হইতে ভট্টলোল্লটের সময়) পর্যন্ত কেবল technique-এর আলোচনাতেই কাটিয়া গিয়াছে। ভরত কয়েকটি আলোচনার বীজ তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে লিখিয়া গিয়াছেন, যেগুলি আধুনিক গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেগুলি যেমন, চক্ষু এবং কর্ণ ই একমাত্র aesthetic ইন্দ্রিয়। অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি ঠিক সংবেদনশীল নহে, অন্তত নাটকের ব্যাপারে। এবিষয়ে টমাস, কাণ্ট এবং অ্যাডিসনও একমত। দ্বিতীয়ত, নাটকের লক্ষ্য হওয়া উচিত (ভরতের মতে) দর্শকের নৈতিক উন্নতি—দর্শক রঙ্গমঞ্চস্থ পাত্রপাত্রীর অভিনয়াদি দর্শন করিয়া তাঁহাদের চরিত্রের উত্তমাংশটুকুর সহিত একান্তভাবে আত্মীয়তা বা অভিন্নতা অনুভব করিলেই নাটকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। তাঁহার মতে ইন্দ্রিয়জ আনন্দ যে দর্শক অনুভব করেন না তাহা নহে, কিন্তু ইন্দ্রিয়জ আনন্দই সর্বস্ব নহে; উহাকে অবলম্বন করিয়াই অবশেষে ধীরে ধীরে রসের উদ্রেক ঘটে। প্লেটো এবং অ্যারিস্টট্লের মধ্যে নাটকের রসচর্বণার ব্যাপার লইয়া যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, ভরতের মধ্যে তাহার সুমীমাংসা দেখা যায়। রঙ্গমঞ্চে স্ত্রীলোকের উপস্থিতির উপর ভরত বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। দর্শক অভিনয়াদি দর্শনকালে অভিনেতা পাত্রাদির সহিত একাত্মতা অনুভব না করিলে নাটক সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই,—ভরতের মতে ইহাই বুঝিতে হইবে। নাটক চারি প্রকার অভিনয়ের দ্বারা রসকে দর্শকের সম্মুখে উপস্থাপিত বা পরিবেশিত করে—ঐ অভিনয়গুলি যথাক্রমে আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক এবং আহার্য। নাটক রঙ্গমঞ্চস্থ করিবার উদ্দেশ্যে ভরত দৃশ্যাবলীর অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন।

ভরতের নাট্যসূত্রে নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক বীজ এবং আলোচনা

রসকে বলা যায় সংবেদনাত্মক উপলব্ধির অনির্বচনীয় আনন্দ বা অনুভূতি। ইহা বহুত্বের মধ্যে একের উপলব্ধির বোধ জন্মায়। স্থায়িভাবই বিভাব অনুভাব এবং ব্যভিচারিভাবকে একত্রিত করিয়া উহাদের মাধ্যমে রসের নিষ্পত্তি ঘটাইয়া থাকে।

রস কি?

নন্দনতত্ত্বকে যাঁহারা দার্শনিক দৃষ্টিতে বিচার করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই কাশ্মীর দেশবাসী। তাঁহারা এই আলোচনাকে চারিটি দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়াছেন—(ক) ন্যায় (খ) সাংখ্য (গ) বেদান্ত এবং (ঘ) কাশ্মীরের অদ্বৈত শৈব বেদান্তের অনুযায়ী এই বিচারগুলি হইয়াছে।

দার্শনিক দৃষ্টিকোণ হইতে নন্দনতত্ত্বের বিচার

'রসসূত্রে'র প্রথম ব্যাখ্যাতা ভট্টলোল্লট[1] (৮৫০ খৃঃ অব্দ)। ইনি রসের বিচার দুইদিক দিয়া করিয়াছেন—(১) কোন্ সময় রসের বিভিন্ন উপাদানের সমষ্টি রসের ঐক্যবোধ ঘটাইয়া থাকে? (২) কি করিয়া ঐ সকল বিভিন্নধর্মী উপাদান রসে পরিণত হইবার সময় একীভূত হইয়া যায়? ভট্টলোল্লট জানিতেন যে বহুত্বের মধ্যে একের যে অনুভূতি তাহা মানসিক এবং মানবের মনেই একমাত্র এই প্রকার বোধ জন্মিতে পারে, অন্যত্র নহে। সেজন্য প্রথম প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছেন যে মুখ্যত আদি ঐতিহাসিক চরিত্রের মধ্যে থাকে রস এবং গৌণভাবে উহা রঙ্গমঞ্চের অভিনেতার মধ্য দিয়া রূপায়িত ও অভিব্যক্ত হয়। উভয় উত্তরকে সমর্থন করিবার জন্য তিনি উপযুক্ত কারণও দিয়াছেন। লোল্লট নাটকের অভিনয়ের মধ্যে যে বাস্তব জীবনের অনুকরণ বা 'imitation' থাকে, তাহার ফলে চিত্তবিভ্রমের উৎপত্তি হয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইহাকে ইংরাজীতে বলা হইয়াছে "Theory of Illusion in Art." এই মতবাদের সমালোচনাও হইয়াছে।

ভট্টলোল্লটের উৎপত্তিবাদ

শ্রীশঙ্কুক (৮৬০ খৃষ্টাব্দ)[2] রসের উৎপত্তি এবং উপলব্ধির সম্বন্ধে সমস্যাটি ন্যায়ের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়াছেন। তিনি aesthetic অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন 'অনুকরণ-অনুমান মত' প্রচার করিয়া।

শ্রীশঙ্কুকের অনুমিতিবাদ

'সাংখ্যকারিকা'য়[3] নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে দুইটি স্থলে উল্লেখ দেখা যায়। একটিতে প্রকৃত ঘটনার নায়কের সহিত রঙ্গমঞ্চস্থ অভিনেতার (যিনি প্রকৃত নায়কের

১ দ্রঃ সাহিত্যমীমাংসা—বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য।
২ ঐ ঐ ঐ
৩ সাংখ্যকারিকা ৫৬-৫৭, ৭৭

জীবনকে অভিনীত করিতেছেন) সম্বন্ধের কথা বলা আছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে অভিনেতা অনুকরণ করে না, সে নিজেই আদি নায়কের সহিত অভিন্ন হইয়া যায়। স্থূলশরীরের সহিত সূক্ষ্মশরীরের যে সম্পর্ক, নায়কের সহিত অভিনেতারও সেইরূপ সম্বন্ধ। অপরস্থলে বলা হইয়াছে যে আনন্দাত্মক (aesthetic) অনুভূতিকালে কর্তা রজোগুণ এবং তমোগুণ হইতে মুক্তি লাভ করেন, ফলে স্বার্থসূচক এবং উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহার হইতে মুক্ত হন। তিনি অভিনেতা হইতে নিজের পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন হন যেমন পুরুষ, প্রকৃতি হইতে তিনি যে ভিন্ন, সে সম্বন্ধে সচেতন থাকেন।

সাংখ্যকারিকা

বেদান্তের মতানুযায়ী ভট্টনায়ক[১] আনন্দাত্মক উপলব্ধির ব্যাখ্যা দিয়াছেন। ভট্টনায়কের মতে (৮৮৩ খৃঃ অব্দ), "in aesthetic experience both the subject and the object are universalised." এ মত সাংখ্যদর্শন-সম্মত। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, কি করিয়া আনন্দময় অবস্থায় subject এবং object উভয়েরই বিশ্বজনীনত্ব সম্ভব হইতে পারে? তিনি ইহার উত্তরে কাব্যের অন্তর্নিহিত দুইটি শক্তির কথা তুলিয়াছেন—উহারা যথাক্রমে 'ভাবকত্ব' এবং 'ভোজকত্ব'। ইহা ভিন্ন তিনি 'ভোগ' নামক অপর একটি শক্তিকেও স্বীকার করিয়াছেন।

ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদ

ইহাদের আলোচনা রসবাদী সম্প্রদায়ের আলোচনার স্থলে করা হইয়াছে।

ভট্টনায়কের মতবাদ প্রতীচ্য দার্শনিক Plotinus-এর mystic experience-এর অনুরূপ।

অভিনবগুপ্ত[২] কাশ্মীর অদ্বৈত শৈব মতবাদ অনুযায়ী রসের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে রসানুভূতি সর্বোচ্চস্তরে আনন্দের উপলব্ধি সৃষ্টি করে; কিন্তু এই আনন্দের অর্থ শুধু সত্ত্বের প্রাধান্যমাত্রই নহে, অথবা universalised object-এর সহিত universalised subject-এর সম্বন্ধ মাত্রই নহে। আনন্দ বলিতে আমরা সাধারণীভাব বুঝিলে ভুল করিব। নাটকের টেকনিকের জন্য

অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ

১ দ্রঃ সাহিত্যমীমাংসা—বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য।
২ ঐ ঐ ঐ

সাধারণীভাবের উপলব্ধি ঘটে, এবং ঐ অবস্থা Katharsis-এর স্তরে ঘটিয়া থাকে। তিনি আনন্দকে অলৌকিক, অপার্থিব বলিয়াছেন। তিনি সহৃদয়ের আনন্দাত্মাকে বলিয়াছেন রসিকত্বাদি ষড়্গুণনির্মিত। রসিকত্ব, সহৃদয়ত্ব, প্রতিভা, কাব্যানুশীলন, ভাবনা এবং তন্ময়ীভাবনযোগ্যতা—এই ছয়টি গুণ। কি করিয়া বাস্তবের ঘটনা হইতে আমরা এই অলৌকিক আনন্দকে উপলব্ধি করিয়া রসোত্তীর্ণ হই, সে সম্পর্কে অভিনব মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য ঃ—"অস্মন্মতে তু সংবেদনমেবানন্দঘন-মাস্বাদ্যতে।" "He admits that at the Kathartic level, the universalized "this" shines against the universalized "I" but asserts that the relation between them is similar to that in which they appear at the level of Is´vara, the fourth category of Kās´mīra Sa´ivism."[১]

দর্শনের দিক দিয়া নন্দনতত্ত্বের বিচার করা হইল। কাব্যের দিক্ হইতেও এই বিচার চলিয়াছে। নাট্যশাস্ত্রকারগণের মতে যদিও কাব্য নাটকের 'hand-maid' মাত্র, আলংকারিকগণের মতে কিন্তু কাব্যেরও একটি স্বাধীন সত্তা আছে। বিভিন্ন আলংকারিকসম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সমস্যা সম্পর্কে মতানৈক্য দেখা দিয়াছে—তাহা হইতেছে 'কাব্যের আত্মা কি ?'[২] কাণ্ট এবং হেগেল উভয়েই কলা সম্বন্ধে এরূপ আলোচনাই করিয়াছেন।

কাব্য ও নাটক

কাব্যের আত্মা কি ?

কাব্যশাস্ত্র বা অলংকার শাস্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে কাব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল।[৩] ইহার শেষ অবস্থায় রসকেই কাব্যের আত্মা বলিয়া স্বীকার করা হয়। কাব্যের আত্মা কি—শুধু এই বিষয়েই আলংকারিকদের নাট্যশাস্ত্রকারগণের সহিত মতের পার্থক্য ঘটে নাই, কাব্য কি প্রকার

রসই কাব্যের আত্মা

---

১ History of Philosophy : Eastern & Western, Vol. I., p. 482.

২ দ্রঃ অলংকার শাস্ত্রের ক্রমবিবর্তন ঃ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা, দ্বিতীয় ভাগ।

৩ দ্রঃ অলংকার শাস্ত্রের বিভিন্ন মতবাদ ; "প্রাচীন ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের ভূমিকা"—(বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য) পৃঃ ১৮-২১।

অনুভূতি বা উপলব্ধির সৃষ্টি করে সে বিষয়েও মতবিরোধ দেখা দিয়াছে। ভামহ 'রসাস্বাদ' শব্দের পরিবর্তে 'প্রীতি' শব্দটির প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বক্রোক্তিই কাব্যের প্রাণ। দণ্ডীর মতে মাধুর্যই শ্রেষ্ঠ গুণ, এবং ইহার মধ্যে তিনি রসকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। দণ্ডীর মতে মাধুর্যগুণযুক্ত বাক্যই কাব্য। বামন রীতিকেই কাব্যের আত্মা বলিয়াছেন। আনন্দবর্ধনের মতে ধ্বনিই কাব্যের আত্মা, কুন্তকের মতে কিন্তু বক্রোক্তিই কাব্যের প্রাণ। সংস্কৃত আলংকারিকগণের কাব্যের আত্মসম্পর্কিত বিচারকে বিশ্লেষণ করিয়া ডঃ সুশীলকুমার দে যথার্থই বলিয়াছেন[১]—"If these investigations of Sanskrit theorists are meant to explain the principle which lies at the root of poetry, they can never do so completely and successfully by merely analysing and classifying aesthetic facts and categories without taking into account the poetic imagination, which makes them what they are....Thus, Sanskrit Poetics, attempting to solve the riddle of poetry did hardly solve it, but delighted itself with the pleasure of abstract thought and formal calculation."[২]

ভামহ

দণ্ডী

বামন

আনন্দবর্ধন

কুন্তক

সুশীলকুমার দে

১ দ্রঃ New Indian Antiquary, Vol. IX, Nos. 1-3, p. 92.

২ এই সংখ্যায় ডঃ দে'র "Some Problems of Sanskrit Poetics" শীর্ষক প্রবন্ধ বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র ও বাঙালী

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেরই কিছু না কিছু অবদান আছে। আমরা এইস্থলে বাঙালীর অবদান সম্বন্ধে যথাসম্ভব আলোচনা করিব।

বৈষ্ণব পদসাহিত্যে রস

ডঃ সুশীলকুমার দে তাঁহার গ্রন্থে[১] বলিয়াছেন, 'Some Vaisnava authors like Rupagosvamin. however, attempt to bring Vaisnava ideas to bear upon the general theme of poetic or dramatic rasa' বৈষ্ণব সাহিত্যে মূল রস একটিই এবং সেটি ভক্তিরস। রূপগোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে ভক্তিরসের পঞ্চ বিভাগ বর্ণনায় প্রীতিরস দিয়া দাস্যরস এবং প্রেয়োরস দিয়া সখ্যরস বুঝাইয়াছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের দাস্যরস প্রকৃতপক্ষে ভক্তিরস; ভক্তিভাব দাস্যভাবাশ্রয়ে পুষ্ট হইয়া রসে পরিণত হইলে তাহাই হয় দাস্যরস।

শৃঙ্গাররসকে আলংকারিকগণ বলেন আদি রস। বৈষ্ণবগণ অলৌকিকত্ব স্থাপন করিয়া ইহাকে আদর করিয়া আখ্যা দিয়াছেন মধুর-রস, কান্তরস, উজ্জ্বলরস। বাৎসল্য রসের মূলে এক হিসাবে শৃঙ্গাররসই বলা যায়। রূপ-গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থকেও এক হিসাবে শৃঙ্গাররসাত্মক গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। শৃঙ্গাররস সম্পর্কে অলংকারশাস্ত্রসম্মত আলোচনাই উজ্জ্বল-নীলমণিতে পাওয়া যায়। 'অবশ্য অপ্রাকৃত ভাবপূর্ণ বৈষ্ণবদৃষ্টির বৈশিষ্ট্য, তজ্জনিত নূতনত্ব এবং রূপগোস্বামীর বৈদগ্ধ্যময় কবিত্ব উহাতে আছে, আর এইগুলিই তাঁহাকে পণ্ডিত সমাজে অমর করিয়া রাখিয়াছে।'

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে রূপ মূল বৈষ্ণব রসের নাম দিয়াছেন ভাক্তরস, আর এই ভক্তিরস দুইপ্রকার :—মুখ্য ভক্তিরস ও গৌণ ভক্তিরস। শান্ত, প্রীত, প্রেয়ঃ, বাৎসল্য, মধুর বা উজ্জ্বল ভেদে পঞ্চ প্রকার ভক্তিরস। আর হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক এবং বীভৎস—গৌণ ভক্তিরস এই প্রকারে সাত প্রকার। রূপের মতে বৈষ্ণব ভক্তিরস এইরূপে মোট বার প্রকার।

---

১ Studies in the History of Sanskrit Poetics, Vol. I, পৃঃ ২৫৫

কবি কর্ণপূর তাঁহার 'অলংকারকৌস্তুভ' গ্রন্থে আট বা নয় রস (আলংকারিকগণের স্বীকৃত) স্বীকার করিয়া অতিরিক্ত বাৎসল্য রস, প্রেমরস এবং সর্বশেষে ভক্তিরসের কথা বলিয়াছেন। ভক্তিরসের ব্যাখ্যাতা অনেকেই বাঙালী। মধুসূদন সরস্বতী অদ্বৈতবাদী আচার্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে ছিলেন ভক্তিবাদী। রূপগোস্বামী, জীবগোস্বামী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, কবিকর্ণপূর (পরমানন্দদাস সেন ইঁহার প্রকৃত নাম) এবং কবিচন্দ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ আচার্য[১] এবং ইঁহারা প্রত্যেকেই বৈষ্ণব রসতত্ত্ব সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

কর্ণপূর

রূপ, জীব, বিশ্বনাথ, কবিচন্দ্র

প্রেয়ো বা সখ্যরস রুদ্রটের সময় হইতে এবং বাৎসল্যরস অন্তত বিশ্বনাথের সময় হইতে স্বীকৃত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ অলৌকিক ভক্তিভাবের আরোপ বা তাহাদের ভক্তিমূলকতা নির্দেশ করা ব্যতীত আর কিছুই করেন নাই। কেবল প্রীতি বা দাস্যরস তাহাদের নিজস্ব সৃষ্টি। কিন্তু ভগবদ্‌ভক্তিভাব অন্তরালে না থাকিলে কেবল লৌকিক দাস্যভাব হইতে রস জন্মিতে পারে না। অতএব কাব্যগত রসতত্ত্বে বৈষ্ণবগণের মৌলিক দান কিছুই নাই। বরঞ্চ তাঁহারাই আলংকারিকগণের রসতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব ভক্তিতত্ত্বকে রসায়িত ও সঞ্জীবিত করিয়াছেন। কাব্যরসে ভক্তিভাব সঞ্চার গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ করেন নাই, করিয়াছেন দাক্ষিণাত্যবাসী বৈষ্ণবগণ।

কবি কর্ণপূর গোস্বামী[২] অলংকারকৌস্তুভ গ্রন্থে প্রসিদ্ধ ৯টি রস ও বাৎসল্য রস এবং তদতিরিক্ত ভক্তিরসের মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন, এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। তিনি যে প্রেমরসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা গণনা করা যায় না, কেননা তাহা পৃথক্ একটি রস

অলংকারকৌস্তুভ

১ জীবগোস্বামীর কাল (১৫২৩-১৬১৮ খৃঃ), রূপ গোস্বামীর কাল (খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ হইতে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রথমভাগ); বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সপ্তদশ শতকের শেষভাগ এবং অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে জীবিত ছিলেন। কর্ণপূরের কাল ১৫২৪-৮০ আর কবিচন্দ্রের সময় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ ও সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভ।

২ অলংকারকৌস্তুভ ছাড়া কর্ণপূর চৈতন্যচন্দ্রোদয় নামে নাটক লেখেন (১৫৭২ খৃঃ) এবং তাঁহার গৌরাঙ্গগণোদ্দেশদীপিকা ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে লেখা হয়।

হইলে ভক্তিরসেরই ভেদ, অন্যথায় তাহা সর্বরসের মূলীভূত রস। কর্ণপূর এখানে ভোজরাজেরই পদাংক অনুসরণ করিয়াছেন। রূপগোস্বামীর 'উজ্জ্বল-নীলমণি'তে পরকীয়া-নায়িকার ব্যাপার এবং শৃঙ্গাররসের বিবিধ ভেদ ও বিলাস-বর্ণনাও আসলে ভোজরাজের গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

রসের লক্ষণ দিতে গিয়া কবি কর্ণপূর বলিয়াছেন যে চিত্ত যখন কাব্যবর্ণিত বিভাবাদির সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে এবং বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় ও তদতিরিক্ত সমস্ত বিষয়কে নিরুদ্ধ করিয়া দেয়, তখন চিত্তে যে একটি চমৎকারজনক সুখ উদ্ভব হয় তাহাকে বলে রস।[১]

কর্ণপূরকৃত রসের লক্ষণ

কর্ণপূরের মতে ভক্তগণের চিত্তে এই রস স্বতঃসিদ্ধ। রস আনন্দ-স্বভাব বলিয়া ইহা একরূপ। নানাবিধ উপাধিভেদে তাহাকে নানারূপে দেখা যায়। সূর্যের রশ্মি যেমন এক হইয়াও নানাস্থানে প্রতিফলিত হইয়া নানা রূপ উৎপন্ন করে, তেমনই একই রস নানা উপাধিভেদে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। প্রাকৃত লোকের মধ্যে যে শৃঙ্গারাদির বর্ণনা দেখা যায় তাহার আস্বাদ প্রাকৃত রস; অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণরাধাদিনিষ্ঠ রসকে বলা যায় অপ্রাকৃত রস।

বাৎসল্যরস ও ভক্তিরসকে ধরিয়া কর্ণপূর যে মোট দশটি রস স্বীকার করিয়াছেন তাহা আগেই বলিয়াছি। ইহা ছাড়া প্রেমরস বলিয়া তিনি একটি স্বতন্ত্র রসও যে স্বীকার করিয়াছেন, তাহাও বলা হইয়াছে: এই প্রেমরস কেবল রাধাকৃষ্ণের মধ্যেই পাওয়া যায়।

কর্ণপূরের দশটি রস

শৃঙ্গাররস হইতে এই রসের পার্থক্য এই যে শৃঙ্গারে প্রেম অঙ্গ, অঙ্গী শৃঙ্গার। কিন্তু আধ্যাত্মিক প্রেম এখানে গৌণ। আর প্রেমরসে আধ্যাত্মিক প্রেমই প্রধান, অভিলাষ প্রভৃতি গৌণ।

প্রেমরস ছাড়া কর্ণপূর স্বীকৃত আরও একটি রস আছে। এই রস ভক্তিরস। বিশ্বনাথের ন্যায় রসাত্মক বাক্যকে কাব্য না বলিয়া কর্ণপূর কবিগত বিচিত্র শিল্পকে বলিয়াছেন কাব্য। এই লক্ষণের ফলে তাঁহার মতে 'অদোষৌ শব্দার্থৌ' ইত্যাদি কাব্যপ্রকাশের লক্ষণের

কর্ণপূরের ভক্তিরস

১ 'বহিরন্তঃকরণয়োর্ব্যাপারান্তররোধকম্।
সকারণাদিসংশ্লেষে চমৎকারি সুখং রসঃ॥'

কোনো প্রয়োজন থাকে না। কর্ণপূরের মতে বাক্য না হইলেও কাব্য হইতে পারে—কারণ যোগ্যতা নাই বলিয়া কোনো শ্লোকের শব্দনিচয়ের বাক্যত্ব না থাকিতে পারে, কিন্তু কাব্যত্ব থাকায় কোন হানি ঘটায় না। বামনের রীতিই কাব্যের আত্মা এই যুক্তিকে তিনি খণ্ডন করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কবির বাঙ্-নির্মিতিই কাব্য। তিনি আরও বলেন যে ধ্বনি কবিবাঙ্‌নির্মিতিরূপ কাব্যের প্রাণ আর শব্দ ও অর্থ তাহার শরীর। প্রাক্তন সংস্কারই কাব্যের বীজ। এই বীজ আপনাকে দুইভাবে প্রকাশ করে। নবনবোন্মেষশালিনী প্রজ্ঞা দ্বারা কাব্যনির্মাণশক্তিরূপে ইহা আপনাকে প্রকাশ করে, অথবা কাব্য আস্বাদনের যোগ্যতারূপে আপনাকে বিকশিত করে। কাব্যের ফল কেবলমাত্র যশ, অর্থপ্রাপ্তি প্রভৃতি নহে,[১] কিন্তু কৃষ্ণের গুণ, লাবণ্য, কেলি প্রভৃতি বর্ণনার সময় চিত্ত অভিনিবেশের দ্বারা গভীর আনন্দলাভ এবং পাঠকদের চিত্তে ঐরূপ আনন্দের আস্বাদ।

কর্ণপূর বর্ণিত স্থায়িভাব

কর্ণপূর স্থায়িভাবকে একদিকে নিত্য বলিয়া অপরদিকে স্বীকার করিয়াছেন তাহার পরিণাম। স্থায়িভাব বলিতে বুঝায় রজস্তমোরহিত শুদ্ধসত্ত্বরূপে বিদ্যমান চিত্তের একটি বিশিষ্ট ধর্ম। এই শুদ্ধসত্ত্বরূপ অবস্থা অবিদ্যারহিত চিৎ-এর রূপ এবং হ্লাদিনী শক্তির আনন্দাত্মক মূর্তিরূপ। কৃষ্ণানুগত সাধকদের এই স্থায়ী ভাবের আস্বাদ নিত্য এবং তাহা কোনও কারণের অপেক্ষা করে না।

কর্ণপূরের চমৎকার

বিশ্বনাথের ন্যায় কর্ণপূরও চমৎকারকেই বলিয়াছেন রসের সার। চমৎকারিত্বের অর্থ যে হৃদয়ের বিস্তার বা অদ্ভুততা, তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত রসের কেন্দ্র। তথাপি শৃঙ্গাররূপেতেই তাঁহার প্রধান আবির্ভাব। নায়ক-নায়িকার অবস্থাকৃত ভেদ অনুসারে কর্ণপূর[২] বহুবিধ রসাস্বাদের বর্ণনা করিয়াছেন।

১ 'যশঃ প্রভৃত্যেব ফলং নাস্ত কেবলমিত্যতে' ইত্যাদি।

২ শিবানন্দ সেনের পুত্র ছিলেন কর্ণপূর। ইঁহার কাল ষোড়শ শতাব্দী; লিখিত গ্রন্থের নাম 'অলংকার কৌস্তুভ'। ইঁহার পুত্র কবিচন্দ্র লেখেন 'কাব্যচন্দ্রিকা' নামে আর একটি অলংকারগ্রন্থ।

উজ্জ্বলনীলমণিকার রূপগোস্বামী ও তদীয় টীকাকার জীবগোস্বামী[১] বলেন যে মধুর রসেই ভক্তিরসের শ্রেষ্ঠ স্বাদ এবং অনেক ভক্ত যদিও শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যাদিকে ভক্তি বলিয়া বুঝিতে পারেন এবং তজ্জন্য উন্মুখ হন, তবুও মধুর বা উজ্জ্বলরসকে তাঁহারা কামাভিব্যক্তি মনে করিয়া তাহা হইতে বিমুখ হন। এই উজ্জ্বল রহস্যকে প্রকাশ করিবার জন্যই উজ্জ্বলনীলমণির রচনা। অপ্রাকৃত নায়ক শ্রীকৃষ্ণ ইহার অবলম্বন।

রূপ ও জীবের রস

ডঃ সুশীলকুমার দে'র গ্রন্থে অচ্যুত শর্মা বা অচ্যুতরায় মোদক নামে জনৈক আলংকারিকের বিবরণ পাওয়া যায়। সম্ভবত ইনি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন। বোধ হয় ইনি বাঙালীই, কারণ, মোদক ছিল ইঁহার উপাধি। ইনি 'সাহিত্যসার' নামে অলংকারগ্রন্থ এবং তাহার 'সরসামোদ' নামে টীকা লেখেন। ভাগীরথীচম্পূর লেখক অচ্যুত আর ইনি সম্ভবত একই ব্যক্তি। বাঙালী কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাব্যদীপিকা মম্মট এবং অন্যান্য আলংকারিকের মতগুলির প্রসিদ্ধ সার সংকলন। কান্তিচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। চিরঞ্জীব অথবা রামদেব চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য ছিলেন ঢাকার লোক। তিনি অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন। চিরঞ্জীব কাব্যবিলাস ও শৃঙ্গার-তটিনী নামে দুইটি গ্রন্থ রচনা করেন। রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ কাব্যচন্দ্রিকা নামে অলংকার গ্রন্থ এবং তাহার টীকা অলংকারমঞ্জুষা রচনা করেন। বেচারাম ন্যায়ালংকারের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'কাব্যরত্নাকর'।

অন্যান্য আলংকারিকগণ ও গ্রন্থ

উপরের গ্রন্থগুলি ভিন্ন আরও কয়েকটি বৈষ্ণবগণ-রচিত অলংকারশাস্ত্রমূলক গ্রন্থ পাওয়া যায়; যেমন (১) রূপগোস্বামীর নাটকচন্দ্রিকা (২) কবিচন্দ্রের কাব্য-চন্দ্রিকা (৩) জীবগোস্বামীর প্রীতিসন্দর্ভ (৪) এবং ভক্তিসন্দর্ভ।[২]

১ জীবগোস্বামীকৃত 'উজ্জ্বলনীলমণির' টীকার নাম 'লোচনরোচনী'। রূপগোস্বামীর অপর একটি নাট্যগ্রন্থের নাম 'নাটকচন্দ্রিকা'। রূপগোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব' ১৫৩৩ খৃঃ অব্দে ও 'উৎকলিকাবল্লরী' ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে লেখা বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'আনন্দচন্দ্রিকা' বা 'উজ্জ্বলনীলমণিকিরণ' ১৬৯৬ খৃঃ অব্দে রচিত। ইনি ভাগবতের উপর 'সারার্থদর্শিনী' নামে টীকা লেখেন। কবিচন্দ্রের 'কাব্যচন্দ্রিকা', 'সারলহরী' ও 'ধাতুচন্দ্রিকা' প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইঁহার নামে 'পদাবলী' গ্রন্থও প্রচলিত।

২ দ্রঃ Early History of Vaisnava Faith and Movement (De), p. 123. f.n.

এইসকল দেখিয়া মনে হয় যে বৈষ্ণব আলংকারিক ও বৈষ্ণব কবিগণের সংস্কৃত বা বাংলা সাহিত্যের রসতত্ত্বে মৌলিক দান প্রকৃতপক্ষে কিছু নাই। তাঁহারা প্রাচীন রসতত্ত্বকে অলৌকিক ভক্তিভাব দ্বারা নূতন ও পরিপুষ্ট করিয়া বৈষ্ণব ভক্তি এবং সাধনার পথ সরস ও সুগম করিয়া দিয়াছেন। আলংকারিক রসতত্ত্বের পক্ষে ইহা গৌরবেরই কথা। ভক্তিসাধনায় এবং ভক্তিরসের প্রকাশ ও পরিপুষ্টিতে আলংকারিক রসতত্ত্বের দান সেজন্য বিশেষরূপে স্মরণীয়।১

মন্তব্য

বৈষ্ণব পদাবলীর ন্যায় শাক্তপদাবলীরও মূল অবলম্বন ভক্তিরস। এই ভক্তিরস নানা অবস্থায় নানা ভাবের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া বাৎসল্য, বীর, অদ্ভুত, দিব্য ও শান্ত এই পঞ্চ মুখ্য রসে উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে। শাক্তগণের ভক্তিভাব হইতেছে দিব্য মাতৃভাব বা মাতৃমহাভাব; ইহাতে জগন্মাতার মাধুর্য এবং মহাশক্তির ঐশ্বর্য উভয়ই আছে। শাক্ত মাতৃভাবকে আশ্রয় করিয়া জগৎকে দেখেন দিব্য চক্ষে; জগৎ তাঁহার কাছে মিথ্যা নয়। বৈষ্ণবভক্তি ঐশ্বর্যবুদ্ধিহীন; কেবল মাধুর্যস্বরূপ হইয়া এবং নাম, রূপ ও গুণে বিভোর হইয়া দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত, কিন্তু শাক্তভক্তি ঐশ্বর্যমিশ্রিতা হইয়াও অবসানে নামরূপাতীত অদ্বৈত।

শাক্ত পদসাহিত্যে রস

বৈষ্ণব ও শাক্তপদের তুলনা

শাক্তের এই মাতৃভাবের অতিমহনীয় প্রকাশ হইয়াছে সিদ্ধকবি রামপ্রসাদের কবিতায়। শাক্তজগতে তিনি একাই ছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ, জয়দেব, এবং চণ্ডীদাস। রামপ্রসাদের ভক্তিভাব ও ভালবাসার ভাব এক হইয়া গিয়াছে। সেই ভালবাসার সমুদ্রে অবিরাম সফেন তরঙ্গভঙ্গ উঠিয়াছে, কতই বা তার বৈচিত্র্য। শাক্ত-পদাবলী যেন পঙ্ক ও সলিলের উপরে প্রস্ফুটিত পদ্মের শোভা। বৈষ্ণবের ন্যায় শাক্তের সাধনপথে কোন প্রতীক নাই; কেবল আমি আর তুমি, অর্থাৎ আমি আর মা।

শাক্তপদের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

শাক্তপদ খাঁটি গীতিকাব্য—রামপ্রসাদ বা শাক্ত কবিগণের পদে ভক্ত কবি

---

১ কাব্যালোক।

একাই নিজ চিত্তভাব নিবেদন করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু বৈষ্ণবকাব্যে রাধাকৃষ্ণ থাকায় এবং তাহাদের ভাববিনিময় ও উক্তিপ্রত্যুক্তি থাকায় বাহুলক্ষণে তাহা গীতিনাট্য। কাজেই শাক্তপদের আবেদন প্রত্যক্ষ, আর বৈষ্ণব ভাবের আবেদন পরোক্ষ। মিস্টিক উপাদান উভয়বিধ সাহিত্যেই আছে। গৌরবোক্তির স্বাভাবিক প্রাচুর্য দেখা যায় শাক্তপদে, বক্রোক্তি এবং রসোক্তি কিন্তু উভয় সাহিত্যেই প্রচুর। অবশ্য বৈষ্ণবসাহিত্যের প্রভাব শাক্তপদের উপর অনস্বীকার্য।

শাক্তপদ খাঁটি গীতিকাব্য —বৈষ্ণবপদ কিন্তু গীতিনাট্য

শাক্তপদ সাহিত্যের প্রথম রস বাৎসল্য রস। বাৎসল্য, মিলনবাৎসল্য ও বিরহবাৎসল্যভেদে উহা ত্রিবিধ। বৈষ্ণব বাৎসল্যরসের ভগবানের ঐশ্বর্যে কিছুমাত্র মিশ্রণ নাই, তাহা কেবল মাধুর্য ; শাক্তপদের বাৎসল্যভাব কেবল ভাবজগতে নয়, বাস্তবজগতেও ব্যাকুলতা, গভীরতা ও নিবিড়তায় অপূর্ব। শাক্তের ভক্তিভাব মাতৃভাবকে আশ্রয় করিয়া পরিস্ফুট হয়, ইহা একান্তই নিষ্কাম শ্রদ্ধা ভক্তি ; ধন, জন, জয় ও যশের কামনা ইহাতে কোথাও নাই। রামপ্রসাদের মধ্যে এই ভক্তিভাব দিব্যভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে। শাক্ত সাহিত্যের শেষ রস শান্ত রস। শাক্ত সাধনায় বাৎসল্যরস মুখ্যত সাধনার রস নয়। ভক্তিপূত বীররসের সাধনায় চিত্ত বীর্যশালী হইলে অদ্ভুতরসময়ী দেবীর ভাবমূর্তি উপলব্ধ হইতে থাকে, ক্রমশ জাগে দিব্যভক্তি ও দিব্যরস, তাহারই পরিণতি শান্তরসে।

শাক্তপদের রসের প্রকারভেদ

অলংকার শাস্ত্রের কয়েকটি প্রধান পারিভাষিক শব্দ

অনুভাব (Ensuant)—ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পশ্চাদ্ভাবিতা (রসগঙ্গাধর ১.৬)। লৌকিকভাব বা চিত্তবৃত্তিকে অপেক্ষা করিয়া এই অনুভব বা পশ্চাদ্ভাবিতা জন্মে। ক্রোধরূপ শারীরিক বিকারের অনন্তরভাবি অব্যভিচারিকার্য নেত্র আরক্ত হওয়া, নাসারন্ধ্রস্ফীতি, হস্তের আস্ফালনাদি। রাঘবনের মতে, রীতি ও বৃত্তি বুদ্ধিপ্রসূত অনুভাব। "ভাবং মনোগতং সাক্ষাৎস্বগতং ব্যঞ্জয়ন্তি যে. তেঽনুভাবাঃ" (ন্যায়কোশঃ)।

অনুমিতি (**Inference**)—যখন কোনো হেতুকে আশ্রয় করিয়া দুইটি বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধের জ্ঞান জন্মে তখন সেই জ্ঞানকে বলা যায় অনুমান। 'ধূম যেমন পরোক্ষ বহ্নির অনুমাপক, সেইরূপ বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারিভাবও পরোক্ষ অন্তর্গূঢ় স্থায়ী চিত্তবৃত্তির অনুমাপক।' অনুমানের অংশ তিনটি—পক্ষ, সাধ্য ও হেতু। "ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞানজন্যং জ্ঞানম্" (ন্যায়কোশঃ)।

অন্বিতাভিধানবাদ—প্রত্যেক শব্দের অর্থ অপর শব্দের অর্থের সংগে অন্বিত হইয়াই প্রতিপন্ন হয়। বাক্যস্থিত শব্দসমূহের অভিধার বলেই বাক্যের অন্বয়বোধ হয়। অন্বিত হইয়াই শব্দ অর্থবোধ জন্মায়। "শক্তিজ্ঞানাবিষয়স্য শাব্দবোধাবিষয়ত্বনিয়ম ইতি বাদঃ। ভট্টমতে চ ইতরান্বিতঘটো ঘটপদশক্য ইত্যেতাদৃশমেব শক্তিজ্ঞানং শাব্দবোধপ্রযোজকম্। এবঞ্চ শাব্দবোধে পদার্থসংসর্গস্যাপি পদশক্যত্বমঙ্গীকুর্বন্তি। এবমেতন্মতে বাক্যেঽপি শক্তিং স্বীকুর্বন্তি ইতি বিজ্ঞেয়ম্। ইদঞ্চ প্রাভাকরমতং ন তু ভট্টমতমিতি বহবো গ্রন্থকারা বদন্তি।" (ন্যায়কোশঃ)।

অভিধা (**Function of Denotation**)—যে শক্তি দ্বারা শব্দ সাক্ষাৎভাবে সংকেতিত অর্থকে বুঝাইয়া থাকে তাহাকে অভিধা বা শব্দের মুখ্য শক্তি বলা হয়। এই ব্যাপারের দ্বারা যে অর্থ প্রকাশ পায়, তাহাকে বলা হয় বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থ। "সংকেতগ্রাহ্যঃ শক্তিরূপঃ অতিরিক্তঃ পদার্থ ইতি মীমাংসকা আহুঃ।" (ন্যায়কোশঃ)।

অভিব্যক্তি—"কবিকর্মের মুখ্য উদ্দেশ্যই সহৃদয়ের আত্মচৈতন্যের আনন্দাবরক অজ্ঞানের অপসারণ। আনন্দের আবরক অজ্ঞান যখন অপগত হয়, তখন আত্মার প্রিয়রূপ আপন পরিপূর্ণ মহিমায় প্রকাশিত হয়। আনন্দ স্বরূপ আত্মার অভিব্যক্তি সাধনই সাহিত্যের চরম লক্ষ্য এবং ব্যঞ্জনাব্যাপারের দ্বারাই এই অভিব্যক্তি সম্ভব হয়।"

অভিহিতান্বয়বাদ—"ভাট্টমতানুযায়ী শব্দের অভিধাশক্তি শুধু শব্দের অর্থ বুঝাইয়াই ক্ষীণ হইয়া যায়। একাধিক শব্দের মধ্যে যে অন্বয় করা হয়, তাহা সম্ভব হয় তাৎপর্য শক্তির দ্বারা, অভিধাশক্তির দ্বারা নহে। তাৎপর্য শক্তির অস্তিত্বে যাঁহারা বিশ্বাসী তাঁহাদের মতকে বলা হয় অভিহিতান্বয়বাদ।"

'অভিহিতান্বয়বাদ মতে শব্দ ও প্রত্যয়ের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ বাক্য-তাৎপর্যবশতঃ একত্র মিলিত হয় এবং এক একটি পদার্থ অপর পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া একটি সম্মিলিত বাক্যার্থের সৃষ্টি করে।' (কাব্যবিচার)। "শাব্দবোধাবিষয়স্য শক্তিজ্ঞানাবিষয়ত্বনিয়ম ইতিবাদঃ। যথা তাৎপর্যার্থোঽপি কেষুচিৎ।" (কাব্যপ্রকাশ)।

উৎপত্তি—"ভট্টলোল্লট প্রভৃতি বলেন যে, আমাদের অন্তরের স্থায়ী ভাবের সহিত বিভাব প্রভৃতির সংযোগ হওয়াতে রস উৎপন্ন হয়। সাধারণভাবে কোনও সহৃদয়ের চিত্তেই মুখ্যভাবে রসের উৎপত্তি হয় না। ভ্রমাত্মক বোধের দ্বারা সহৃদয় দর্শকগণের চিত্তে যখন চমৎকার জন্মে, তখন তাহাতেই রসের উৎপত্তি হয়। লোল্লটের মতে, রসসূত্রের অন্তর্গত নিষ্পত্তি পদটির অর্থ উৎপত্তি বা অভূতপ্রাদুর্ভাব।"

ঔচিত্য—"সর্বপ্রকার বাক্যরচনার মধ্যে যাহা কিছু যেভাবে অনুচিত বা অননুরূপ বা অসমঞ্জস তাহাই রসভঙ্গের কারণ হয়। এইজন্য ঔচিত্যরক্ষাকেই রসাভিব্যক্তির পরম রহস্য বা পরম গুহ্যত্ব বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।" (কাব্যবিচার)। রাঘবনের মতে, ঔচিত্য "propriety, adaptation, and other points of appropriateness". ইহার বৈশিষ্ট্য proportion এবং harmony. ভোজ শৃঙ্গার-প্রকাশে বলিয়াছেন "ঔচিত্যং বচসাং প্রকৃত্যনুগতং, সর্বত্র পাত্রোচিতা পুষ্টিঃ স্বাবসরে রসস্য চ, কথামার্গেণ চাতিক্রমঃ" ইত্যাদি। "কাব্যবিচারের যাহা একমাত্র নিয়ম, আলংকারিকেরা তাহারই নাম দিয়াছেন ঔচিত্য বা অভিপ্রেত রসের উপযোগিত্ব।"

গুণ—যাহাই শব্দ এবং অর্থের শোভা উৎপাদন করে, বামনের মতে তাহাকেই গুণ বলা যায়। মম্মট কিন্তু বামনোক্ত এই লক্ষণকে অস্বীকার করিয়াছেন। ইংরাজীতে আমরা ইহাকে 'natural grace' সংজ্ঞায় অভিহিত করিতে পারি; অথবা ইহাকে বাক্যস্থ excellenceও বলিতে পারি। গুণ কাব্যের নিত্যধর্ম ও রীতির প্রধান উপাদান। "শ্লেষাদয়ো দশ মাধুর্যৌজঃপ্রসাদা ইতি ত্রয়ো বা গুণা ইত্যালংকারিকাঃ।" (ন্যায়কোশঃ)।

চমৎকার—চমৎকার শব্দের অর্থ আহ্লাদ বা আনন্দমাত্রই নহে, কিন্তু

কাব্যজনিত আহ্লাদে যে একটি সৌন্দর্যস্বরূপ বাসনার সহিত স্ফুট চিত্তের মিলনজনিত এক দুর্ব্যাখ্যেয় অনুভূতি আছে তাহাই চমৎকার। ধ্বন্যালোকেও এই শব্দটি "a general and all-comprehensive name for literary relish" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অভিনবগুপ্ত রসকে চমৎকারস্বরূপ বলিয়াছেন। জগন্নাথ ইহাকে বলিয়াছেন লোকোত্তর অনুভববেদ্য আহ্লাদ। রাঘবন ইহাকে literary delight বলিয়া সংজ্ঞিত করিয়াছেন। বিশ্বনাথ ইহাকে বলিয়াছেন 'চিত্তবিস্তাররূপো বিস্ময়াপরপর্যায়ঃ।' রসের সার চমৎকার, আর চমৎকারের সার অদ্ভুত রস।

তাৎপর্য—যে শক্তির বলে বাক্যস্থিত বিভিন্ন শব্দের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণীত করিয়া বাক্যের অন্বয় করা হয় তাহাকে তাৎপর্যশক্তি বলে। যাঁহারা শব্দের ব্যঞ্জনা স্বীকার করিতে চাহেন না, তাঁহাদের মতে শব্দের সাধারণ শক্তি জাতিতে। কিন্তু বাক্যার্থ বুঝিতে গেলে আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি, যোগ্যতা প্রভৃতির দ্বারা পদার্থগুলির পরস্পর সংসর্গ ঘটিয়া থাকে। তাহার ফলে পদার্থের অতিরিক্ত বিশেষ বাক্যার্থ সম্বন্ধে জ্ঞান হয়। এই পদার্থগুলির মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ বুঝিবার জন্য শব্দের তাৎপর্য নামক স্বতন্ত্র বৃত্তি স্বীকার করিতে হয়। এই তাৎপর্য আকাঙ্ক্ষাদিবশতঃ প্রতীত হয়। "বাক্যার্থপ্রতীতিজনকতয়াভিপ্রেতত্বং তাৎপর্যম্" (শব্দশক্তিপ্রকাশিকা)। "অত্রোক্তং ভর্তৃহরিণা সংযোগো বিপ্রযোগশ্চ সাহচর্যং বিরোধিতা। অর্থঃ প্রকরণং লিঙ্গং শব্দস্যান্যস্য সন্নিধিঃ॥ সামর্থ্যমৌচিতী দেশঃ কালো ব্যক্তি স্বরাদয়ঃ। শব্দার্থস্যানবচ্ছেদে বিশেষস্মৃতিহেতবঃ॥ ইতি। অত্রোদাহরণানি তু সশঙ্খচক্রো হরিঃ ইত্যাদীনি জ্ঞেয়ানি। (কাব্যপ্রকাশ)।"

প্রতিভা—প্রতিভা কবিভেদে অনন্তপ্রকার বলিয়া অলংকার বা কাব্যও অনন্তপ্রকারের হইতে পারে—দণ্ডী এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। কবির প্রতিভা যত প্রকারের, সৃষ্টিও ঠিক তত প্রকারেরই হইতে পারে। তাই তাহারা নব নব কবির নবীন কুশলতায় আজও সৃষ্ট হইতেছে। এই প্রতিভাশক্তি সহজাত, সেজন্য ইংরাজীতে বলা হয়, "A genins is born, not made." কবি কল্পনাবলে অন্তর হইতে 'বচন' আহরণ করিয়া অতি সাধারণকে অসাধারণ সৌন্দর্যে মণ্ডিত

করেন এবং যাহা শুধু ভাবময় ও বিদেহী ছিল, তাহাকে তিনি শরীরী করিয়া তোলেন। ইহাই প্রতিভার ফল। এই প্রতিভাকে সেজন্য 'অপূর্ববস্তু-নির্মাণক্ষমপ্রজ্ঞা' বলা যায়। আনন্দবর্ধন এবং অভিনব প্রতিভার এই মাহাত্ম্য স্বীকার করিয়াছেন। "আমাদের দেশে প্রতিভাকে বলা হইয়াছে 'নবনবোন্মেষ-শালিনী বুদ্ধিঃ' " (সাহিত্যিকা)। "প্রজ্ঞা নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা মতা।" (ন্যায়কোশঃ)।

বিভাব (excitant) :—বিভাবের অর্থ 'কারণ'। "লোকে যাহা রতি প্রভৃতি ভাবের উদ্বোধক, কাব্যে ও নাট্যে তাহাই বিভাব।" (সাহিত্য-দর্পণ, ৩য়)। এই কারণ রসানুভূতির। "লৌকিক ভীতি, লৌকিক শোক, লৌকিক হাস্য, লৌকিক প্রীতির সহিত কবিকর্মসম্ভূত ভয়ানক, করুণ, হাস্য অথবা শৃঙ্গার রসের একীকরণ কখনই সম্ভবপর নহে। কবিপ্রতিভার অলৌকিক শক্তির স্পর্শে ব্যবহারিক জগতে লৌকিক ভীতির ব্যাঘ্র প্রভৃতি যে সকল সাধারণ 'কারণ', তাহাই কাব্যজগতের বিভাবরূপে পরিণত হয়। বস্তু লৌকিক, কিন্তু বিভাব অলৌকিক। বিভাব দ্বিবিধ-আলম্বন ও উদ্দীপন। রামের শৃঙ্গার রসের আলম্বনবিভাব সীতা, উদ্দীপনবিভাব চন্দ্রোদয়াদি।"

বৃত্তি—আনন্দবর্ধনের মতে, রসের অনুকূল ঔচিত্যযুক্ত শব্দ ও অর্থের ব্যবহারের নাম বৃত্তি। কাব্য ও নাটকে রসাদি তাৎপর্যের অনুকূলভাবে শব্দার্থে ব্যবহার হইলে তাহা অত্যন্ত কমনীয় হয়। ভারতী, সাত্বতী, কৈশিকী ও আরভটী এই চারিটি প্রসিদ্ধ বৃত্তি। রাঘবন বৃত্তিকে "the nature of vastu or ideas or Itivṛtta" বলিয়াছেন। "শাব্দবোধহেতুপদার্থোপস্থিত্যনুকূলঃ পদপদার্থয়োঃ সম্বন্ধঃ।" (তত্ত্বচিন্তামণিঃ)।

ভাব—ভাবশব্দ সংস্কৃত ও বাংলায় বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়। ডঃ সুশীল-কুমার দে'র মতে ইহাকে 'emotion' বলা যায়। ইহাকে complete psychosis-ও বলা হয়। "ইহা সাধারণতঃ স্বাদনাত্মক চিত্তবৃত্তি অর্থে, কখনও সাধারণ চিত্তবৃত্তি অর্থে, এবং কখনও বা মানসিক বা দৈহিক যে কোন প্রকার অবস্থাবিশেষের অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।" অভিনয়াদির দ্বারা হৃদয়ের অন্তরস্থিত রসকে যাহা প্রকাশ করে তাহাকে ভাব বলে। ভরত বলিয়াছেন—

'বাগঙ্গসত্ত্বোপেতান্ কাব্যার্থান্ ভাবয়ন্তীতি ভাবাঃ।' "হৃদ্গতাবস্থাবেদকো মানসবিকারো ভাবঃ।" (ন্যায়কোশঃ)।

ভাবিক—ভাবিককে ভামহ 'প্রবন্ধবিষয়ক গুণ' বলিয়াছেন। ইহা কেবলমাত্র বাক্যের গুণই নহে, ভামহ ইহাকে অলংকার রূপেও দেখিয়াছেন। ইহা সেই গুণ যাহা "pertains to that part of a composition where the ideas of the past and the future presented by the poet are so vivid as to look like belonging to the present." দণ্ডীও ভাবিককে ভামহের ন্যায় প্রবন্ধগুণই বলিয়াছেন। তাঁহার মতে, ভাবিক 'কবি-অভিপ্রায়' ব্যতীত আর কিছুই নহে। (ভাবঃ কবেরভিপ্রায়ঃ)।'

ভাবাভাস—"ভাবের অনৌচিত্যবশতঃ অর্থাৎ শাস্ত্রীয় নিয়ম, স্বাভাবিক নিয়মাদি লঙ্ঘন করিয়াও যদি ভাব প্রবৃত্ত হয় বা বিদ্যমান থাকে, তখন আভাস বা দোষ হয়। কোথাও ভাবমাত্রই অযোগ্য পাত্রবৃত্তি হইলে ভাবাভাস হয়।" (সা. দর্পণ সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত)।

ভুক্তি—ভট্টনায়ক বলিয়াছেন যে, রস উৎপন্ন হয় না, অনুমিত হয় না; উহা আত্মগতও নহে, আবার পরগতও নহে। রসের ভোজকত্ব বা ভোগবৃত্তি দ্বারা সত্ত্বোদ্রেকপ্রকাশানন্দময় স্বকীয় স্বাভাবিক চিদ্‌বৃত্তিবিলক্ষণ পরব্রহ্মাস্বাদ-সহোদররূপে অলৌকিকভাবে কাব্যনাটকীয় রস আস্বাদিত হয়। রসের উপ-স্থাপন ও রসের প্রকাশের জন্য ভাবকত্ব ও ভোজকত্বরূপ দুইটি অলৌকিক স্বতন্ত্র বৃত্তি স্বীকার করা হয়। ভুক্তির অর্থ উপযোগ (ন্যায়কোশঃ)।

রস—সংক্ষেপে বলা যায়, রস একপ্রকার আনন্দময় মানসিক অবস্থামাত্র। কাব্যপাঠ, সহৃদয়লোকের মনে কাব্যের অনুরূপ ভাব সঞ্চারিত করিয়া তাঁহাকে এমন এক নৈর্ব্যক্তিক ও আদর্শ জগতে লইয়া যায় যে, তিনি তখন তদ্‌গত হইয়া পড়েন; ফলে, কাব্যের ভাবানুভূতির সহিত তাঁহার একাত্মতা সৃষ্ট হয় অথবা নাটক ইত্যাদির নায়কনায়িকার মধ্যে তাঁহার আত্মবিলোপন ঘটে। এই আত্মবিলুপ্তির মধ্য দিয়া তিনি যে নির্মল আনন্দময় মানসিক অবস্থায় উপনীত হন, সেই অবস্থাকে 'রস' বলে। শৃঙ্গার, বীর, রৌদ্র, বীভৎস, হাস্য, অদ্ভুত, করুণ, ভয়ানক ও শান্তভেদে রস নয় প্রকার। রসজাত এই আনন্দকেই বলা

হইয়াছে পরব্রহ্মাস্বাদসচিব এবং ব্রহ্মানন্দসহোদর। শ্রুতি ইহাকে ব্রহ্মের (ভগবানের) সহিত অভিন্ন করিয়া দেখিয়াছেন। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে ভক্তিরস, বাৎসল্যরস, মধুর রস ইত্যাদি কয়েকটি নূতন রসের আলোচনা আছে।

রসাভাস—রসের অনৌচিত্যতা অর্থাৎ শাস্ত্রীয় নিয়ম, স্বাভাবিক নিয়ম প্রভৃতির বিরোধবশতঃ রসের যে প্রবৃত্তি হয়, তাহাকে আভাসজনিত দোষ বলা হয়। "তথাচ ক্বচিদযোগ্যালম্বনবিষয়স্থায়িভাবকত্বং, ক্বচিদ্বা ভাবমাত্রস্যাযোগ্য-পাত্রবৃত্তিত্বং রসভাবয়োরাভাস ইত্যর্থঃ। অযোগ্যত্বঞ্চ কদাচিদ্ধর্মশাস্ত্রনিষেধাৎ কদাচিদসম্ভবাৎ কদাচিত্তত্ত্ববোধনক্ষমত্বাচ্চ বোদ্ধব্যম্" (সা. দ. হরিদাস সিদ্ধান্ত-বাগীশ সম্পাদিত)। তির্যগ্‌জাতি অর্থাৎ মনুষ্যেতর প্রাণিগত বিষয়ে যে সম্ভোগ-শৃঙ্গারের উদ্রেক, তাহা রসাভাসের একটি প্রকারের উদাহরণ, যেমন—কুমার-সম্ভবে "মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে" ইত্যাদি। "...the breach of Aucitya resulted in 'Ābhasata'....If there is Aucitya we have Rasa and sentiment: if there is Anaucitya due to absence of Prakṛtyaucitya etc, we have Rasābhāsa and sentimentality.... রাবণস্য সীতায়ামিব রতেঃ"—(Raghavan); অভিনবগুপ্ত অনৌচিত্যকে রসাভাস এবং হাস্যরস বলিয়াছেন।

লক্ষণা—শব্দের বাচ্যার্থ বাধিত হইলে পর যে ব্যাপারের দ্বারা ঐ বাচ্যার্থের সহিত সাদৃশ্য, সামীপ্যাদি সম্বন্ধ বিশিষ্ট প্রকৃত অর্থের বোধ জন্মে, তাহার নাম লক্ষণা। লক্ষণার দ্বারা লব্ধ বা বোধিত অর্থকে বলা যায় লক্ষ্যার্থ বা secondary sense। রূঢ়ি এবং প্রয়োজন ভেদে লক্ষণা আবার দুই প্রকার। লাক্ষণিক অর্থ গৌণ বা ভাক্ত অর্থ নামেও পরিচিত। "আলংকারিকাস্তু শক্যসম্বন্ধজ্ঞানং লক্ষণা"......(ন্যায়কোশঃ)।

ব্যঞ্জনা—অভিধা ও লক্ষণাশক্তি নিজ নিজ অর্থ বুঝাইয়া বিরত হইলে যে শক্তিবলে শব্দের ঐ বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থকে অবলম্বন ও অতিক্রম করিয়া অপর একটি নূতন অর্থের স্ফুরণ হয়, তাহাকে বলে ব্যঞ্জনা। এক কথায় ব্যঞ্জনাকে বলা যায়, ব্যঙ্গ্যার্থ-প্রতীতির উপযোগী শব্দ ও অর্থের ব্যাপারবিশেষ। ইংরাজীতে ইহাকে বলা হয় suggestiveness; ইহা আবার দুইভাগে বিভক্ত:—শাব্দী

ও আর্থী। "শব্দস্য বৃত্তিবিশেষো ব্যঞ্জনা। তদুক্তম্, বিরতাস্বভিধাদ্যাসু যয়ার্থো বোধ্যতেঽপরঃ। সা বৃত্তির্ব্যঞ্জনা নাম শব্দস্যার্থাদিকস্য চ॥ (সা, দ)" [ন্যায়কোশঃ]

ব্যভিচারি-ভাব (সঞ্চারিভাব)—রসসমূহের আভিমুখ্যে বিবিধভাবে চলে বলিয়া ভরত এই ভাবকে ব্যভিচারী বলিয়াছেন। রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব স্থিররূপে বর্তমান থাকে, কিন্তু নির্বেদ প্রভৃতি ভাব একবার প্রাদুর্ভূত, আবার তিরোভূত হইয়া তাহাদের আভিমুখ্যে চলে বলিয়া ইহাদিগকে ব্যভিচারী বলে। ইংরাজীতে ইহাকে 'more transient emotion' বলা যায়; কল্লোলসমূহ যে প্রকার সমুদ্রে একবার উত্থিত হয়, আবার বিলীন হয়, এবং এইরূপে তাহারা উৎকর্ষ বিস্তার করিয়া তাহার সারূপ্যপ্রাপ্ত হয়, সঞ্চারিভাবগুলিও সেইপ্রকার স্থায়িভাবে উন্মগ্ন নিমগ্ন হইয়া নিজ নিজ স্থায়িভাবকে পোষণ করিয়া রসস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। "স্থিরতয়া বর্তমানে হি রত্যাদৌ নির্বেদাদয়ঃ প্রাদুর্ভাবতিরোভাবাভ্যামাভিমুখ্যেন চরণাদ্ব্যভিচারিণঃ কথ্যন্তে" (ন্যায়কোশঃ)।

সহৃদয়—হৃদয় আছে যাঁহার, অর্থাৎ সৌকুমার্য ও সুরুচি এবং তাহা হইতে উদ্ভূত কাব্যের সুনিপুণ বাসনা আছে যাঁহার তিনিই সহৃদয়। "কাব্যানুশীলনের অভ্যাসবশে মনোরূপ নির্মল দর্পণে যাঁহারা কাব্যের বর্ণনীয় বস্তুর সহিত তন্ময়তা পাইতে পারেন, তাঁহাদেরই হৃদয় সংবাদশালী, তাঁহারাই সহৃদয়" (ধ্বন্যালোক, ১।১ টীকা)। "আলংকারিকাস্তু কাব্যার্থভাবনাধীনপরিপক্কবুদ্ধিঃ। যথাকাব্যং যথাযোগং কবেঃ সহৃদয়স্য চ যশ আনন্দাদি করোতি। (কাব্যপ্রকাশ ১।২)"

সংকেত—সংকেতের অর্থ ইচ্ছাবিশেষ। "ইদং পদমিমমর্থং বোধয়ত্বিতি অস্মাচ্ছব্দাদয়মর্থো বোদ্ধব্য ইতি বেচ্ছাসংকেতরূপা বৃত্তিঃ" ইতি শক্তিবাদে গদাধরভট্টাচার্যাঃ। সংকেতগ্রহস্তু ব্যাকরণবৃদ্ধব্যবহারাদিতো ভবতি।"

সাধারণীকরণ—সাধারণীকরণের সাক্ষাৎফল চিদ্গত আবরণভেদ। আমাদের অসাধারণত্বময় ব্যক্তিত্বের বিসর্জনপূর্বক নাট্য বা কাব্যচিত্রিত চরিত্র ও ভাবের সহিত একটি সাধারণ সম্বন্ধ স্থাপনের নাম সাধারণীকরণ। এই অবস্থায় দর্শক বা শ্রোতা স্বকীয় দেশ, কাল ও অবস্থাবিশেষের সম্বন্ধ এবং ব্যক্তিবিশেষের বৈশিষ্ট্য বিস্মৃত হন। ইহাকে সকলসহৃদয়সংবাদশালিতা বলা যায়। ইহার ফলে 'পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ' ইত্যাদি প্রকার বোধ জন্মে।

সামাজিক—সমাজচিত্তের সহিত যাঁহার সুনিবিড় যোগ আছে তিনিই সামাজিক। হৃদয়বত্তা লইয়া তিনি যদি সমাজের সুস্থরুচি নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করিয়া সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় হন, তবে তাঁহাকে সহৃদয় সামাজিক বলে। সামাজিকের লক্ষণ বর্ণনা করিতে যাইয়া অ্যারিস্টট্‌ল্ বলিয়াছেন, "One man pre-eminent in virtue and education"; ইঁহাকে ideal spectator or listener-ও বলা যায়। "সাহিত্যিকরা কেবল সাহিত্যিক নন, তাঁরাও সামাজিক মানুষ। সমাজের সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা উপকরণরূপে তাঁদের সাহিত্যিক মনকে কেবল উদ্বুদ্ধ করে না, তাঁদের সামাজিক মনকেও নাড়া দেয়……(অতুল গুপ্ত)।"

স্থায়িভাব (**Primary emotion**)—বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব স্থায়িভাবসমূহকে আশ্রয় করিয়া থাকে। বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব দ্বারা পরিবৃত হইয়া স্থায়িভাব 'রস'নাম লাভ করে। বিশ্বনাথের মতে, "অবিরুদ্ধ বা বিরুদ্ধ ভাবসমূহ যাহাকে তিরোহিত করিতে পারে না, যাহা আস্বাদরূপ অঙ্কুরের মূলস্বরূপ তাহাই স্থায়িভাব (৩।২০৪)।"

স্ফোট—'স্ফুটত্যভিব্যক্তীভবত্যস্মাদিতি স্ফোটঃ'। যাহার সাহায্যে বর্ণ, পদ বা বাক্যের অর্থ প্রকাশিত হয়, তাহাই স্ফোট। যাহা বর্ণের অর্থবোধ জন্মায় তাহা বর্ণস্ফোট, যাহা পদার্থবোধের উপযোগী তাহা পদস্ফোট এবং যাহা বাক্যের অর্থ বোধিত করে তাহা বাক্যস্ফোট। বর্ণসমষ্টি পদ, পদসমষ্টি বাক্য কিন্তু বর্ণপদ প্রভৃতি ক্ষণিক ও আশুবিনাশী। সুতরাং, একাধিক বর্ণ ও পদের একত্র সমাবেশ সম্ভবপর নহে। অথচ, এইরূপ সমাবেশ ভিন্ন পদ ও বাক্যের গঠন হয় না এবং পদার্থ ও বাক্যার্থের জ্ঞানও জন্মে না। এই অবস্থায় অর্থের অনুকূল একটি ব্যাপার স্বীকার করিতে হয়, এই ব্যাপারের নামই স্ফোট। বাচকত্ব বা মুখ্যার্থ প্রকাশ করাই স্ফোটের একমাত্র ধর্ম। 'গৌঃ' পদটি গ্+ঔ +স্—এই তিনটি বর্ণের সমাবেশে গঠিত হইয়াছে। প্রতিটি বর্ণের উচ্চারণমাত্রেই উহা ধ্বংস হইয়া যায়। সুতরাং, স্ফোট স্বীকার না করিলে 'গৌঃ' এই অখণ্ডপদের অর্থপ্রতীতি হইতে পারে না। স্ফোট সম্বন্ধে Monier Williams

বলিয়াছেন—"The eternal and imperceptible element of sound or words and the real vehicle of idea which bursts or flashes on the mind when a sound is uttered."

অলংকারশাস্ত্রের গ্রন্থপঞ্জী

ইংরাজী ঃ—

1) De, Sushil Kumar—Sanskrit Poetics, Vols. I-II.
2) Kane, P. V.—History of Sanskrit Poetics. (History of Alaṃkāra Literature).
3) De, S. K. and Dasgupta, S. N.—History of Sanskrit Literature, Vol. I (Classical Period)—C. U.
4) V. Raghavan—Some Concepts of the Alaṃkāra S'āstra.
5) Lahiri, Prakash Chandra—Concepts of Riti and Guna in Sanskrit Literature—Dacca University.
6) New Indian Antiquary, Vol. IX, Nos. 1-3.
7) A. L. Basham—The Wonder that was India, pp. 416-417.
8) K. C. Pandey—Indian Aesthetics (Chowkhamba Sanskrit Series, Vol. 2)
9) Siddhabharati, Vol. I
10) De, S. K.—History of Vaisnava Faith and Movement in Bengal.

বাংলা ঃ—

১) প্রাচীনভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের ভূমিকা—বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
২) সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস—জাহ্নবীচরণ ভৌমিক
৩) সংস্কৃত সাহিত্যের কথা—নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
৪) সাহিত্যমীমাংসা—বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
৫) কাব্যবিচার—সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত
৬) কাব্যালোক—সুধীরকুমার দাশগুপ্ত

৭) সাহিত্যিকা—নলিনীকান্ত গুপ্ত

৮) গৌড়ীয় বৈষ্ণবরসের অলৌকিকত্ব—উমা রায়

সংস্কৃত :—

১) নাট্যসূত্র (শাস্ত্র)—ভরত

২) অগ্নিপুরাণ

৩) কাব্যাদর্শ—দণ্ডী

৪) কাব্যালংকার—ভামহ

৫) কাব্যমীমাংসা—রাজশেখর

৬) কাব্যালংকারসূত্র—বামন

৭) ধ্বন্যালোক—আনন্দবর্ধন

৮) অভিনবভারতী— অভিনবগুপ্ত

৯) ব্যক্তিবিবেক—মহিমভট্ট

১০) বক্রোক্তিজীবিত—কুন্তক

১১) রসগঙ্গাধর—জগন্নাথ

১২) সাহিত্যদর্পণ—বিশ্বনাথ

১৩) কাব্যপ্রকাশ—মম্মট

১৪) উজ্জ্বলনীলমণি—রূপগোস্বামী

১৫) অলংকারকৌস্তভ—কর্ণপূর

১৬) শৃঙ্গারপ্রকাশ—ভোজ

ছন্দ

ছন্দ কাহাকে বলে? ঃ—ছন্দশাস্ত্রের আলোচনার পূর্বে ছন্দ কি বস্তু সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। ইংরাজীতে যাহাকে metre বলে, বাংলা বা সংস্কৃতে তাহাকেই বলা হয় 'ছন্দ'। ইংরাজীতে 'metre' কি বুঝাইতে হইলে বলিতে হয় "Poetic rhythm determined by the number and character of the 'feet' which it contains."[১] 'নিরুক্তকার ছন্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, 'ছন্দাংসি ছাদনাৎ' অর্থাৎ চুবাদিগণীয় চদ্ বা ছদি ধাতু হইতে ইহার ব্যুৎপত্তি। দেবতাগণকে মৃত্যুভয় হইতে রক্ষা করার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছিল ছন্দ। বৈদিকমন্ত্র ছিল ছন্দোবদ্ধ এবং সেই ছন্দ বেদে সাধারণত সাতপ্রকারই ছিল। পিঙ্গল 'ছন্দঃসূত্রে' ছন্দ অর্থে বুঝিয়াছেন—অক্ষরসংখ্যা বা অক্ষরসমষ্টি। সংক্ষেপে বলা যায়:—'যে পদকদম্ব কতিপয় পরিমিত অক্ষরে সম্বদ্ধ ও যাহা শ্রবণমাত্র শ্রবণের ও মনের প্রীতি বা আনন্দ জন্মাইয়া দেয়, তাহাকে ছন্দঃ (verse) বা পদ্য বলে।'[২]

Metre ও ছন্দ

'নিরুক্তে' ছন্দের অর্থ

'ছন্দঃসূত্রে' ছন্দের অর্থ

ছন্দই পদ্য

ছন্দ কাব্যের অঙ্গস্বরূপ। ইহারই পারিপাট্যের জন্য পদ্যময় কাব্যের অঙ্গসৌষ্ঠব ঘটে। ছন্দদোষে কাব্যের অঙ্গবৈকল্য ঘটে এবং লোকের আনন্দাস্বাদের হানি ঘটে।

ছন্দ কাব্যের অঙ্গীভূত

ছন্দশাস্ত্রের স্বরূপ ও আলোচ্য বিষয় ঃ—'ছন্দশাস্ত্র' বলিতে ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য ও ভাষা-বৈশিষ্ট্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সৌন্দর্যতত্ত্বকে বুঝায়। ছন্দ সাহিত্যের অন্তর্গত, সাহিত্য ভাষার অন্তর্গত, ভাষা ধ্বনির অন্তর্গত। কাজেই ছন্দ সৌন্দর্যশাস্ত্রের

ছন্দশাস্ত্র বলিতে কি বুঝায়?

---

১ 'Good English : How to speak and write it' (published by the Statesman & the Times), p. 584.

২ 'কাব্যনির্ণয়'—লালমোহন বিদ্যানিধি, পৃঃ ৭৭।

অন্তর্গত হইলেও ভাষাতত্ত্বনিরপেক্ষ বা ধ্বনিতত্ত্বনিরপেক্ষ নহে। ছন্দভেদের একটি প্রধান কারণ ভাষাভেদ। সংস্কৃত ছন্দ ও ইংরেজী ছন্দ একপ্রকার নহে, তাহার কারণ ইহাদের ভাষা-বৈশিষ্ট্য পৃথক্।

ভাষা ভেদের জন্যই ছন্দভেদ হয়

কাব্যভাষার অন্তর্গত ধ্বনিগত ও অর্থগত সৌন্দর্যকে বলা হয় 'অলংকার', এবং কাব্যভাষার অঙ্গগত বিচিত্রভঙ্গীর প্রবহমান ধ্বনি-সৌন্দর্যকে বলা হয় 'ছন্দ'। বস্তুনিহিত যে বৈশিষ্ট্যের সংস্পর্শে মানবমনের স্বাধীন কর্মশক্তির উদ্বোধন ঘটে ও তাহার দ্বারা মানুষ মনের আনন্দ পায়, তাহারই নাম সৌন্দয। শৃঙ্খলাই হইতেছে সকল সৌন্দর্যের মূল। যে নিয়ম বা ধর্ম সম, অর্ধসম, বিষম সকল প্রকার অঙ্গকে বা বস্তুকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখী করিয়া ও ঐক্যবদ্ধ করিয়া গ্রথিত করে তাহার নাম শৃঙ্খলা।

অলংকার ও ছন্দ

সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলা

মানবদেহ স্নায়বিক সমতামূলক অনুভূতিতে অভ্যস্ত। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে, রক্ত-সঞ্চালনে, ধমনীস্পন্দনে, চলিবার পদক্ষেপে নির্দিষ্ট ভঙ্গীর পৌনঃপুনিকতায় মানবদেহ অভ্যস্ত এবং অভ্যস্ত পথে যাত্রাই দেহের পক্ষে সহজ, স্বাভাবিক ও আরামদায়ক। দেহযন্ত্রের আবর্তন ক্রিয়ার সহিত পুনরাবৃত্তির ঐক্য ঘটে বলিয়া দেহ স্বাচ্ছন্দ্য-সুখ অনুভব করে ও সেইজন্য সৌন্দর্য-বোধ জন্মায়।

সৌন্দর্যবোধ কি করিয়া জন্মে ?

সৌন্দর্যবিশ্লেষণে ছন্দ বা প্রবহমান ধ্বনি-সৌন্দর্যের অর্থ দাঁড়ায়—একটি পূর্ণ ধ্বনি-প্রবাহের সুসমঞ্জস ও তরঙ্গায়িত ভঙ্গী।

ছন্দের অর্থ

বৈদিক ও প্রাচীন সংস্কৃতে দেখিতে পাই যে, অক্ষরের হ্রস্বদীর্ঘতাই ছন্দের ভিত্তি স্থানীয় এবং একটা বিশেষ আদর্শ অনুসারে হ্রস্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের সমাবেশ অবলম্বন করিয়াই ছন্দ রচিত হয়। ইংরাজীতে অক্ষরের স্বাভাবিক accentই ছন্দের ভিত্তিস্থানীয়; প্রতি চরণে কয়টি accent, এবং চরণের মধ্যে accented ও unaccented অক্ষরের কি পারম্পর্য, ইহার উপরই ছন্দের ভিত্তি। অর্বাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃতের অনেক ছন্দে এবং বাংলা ছন্দে দেখিতে পাওয়া যায় যে জিহ্বার সাময়িক বিরতি বা যতিই ছন্দের ভিত্তিস্থানীয়। ঠিক

প্রাচীন সংস্কৃত, ইংরেজী ও বাংলা ছন্দের বৈশিষ্ট্য

কতক্ষণ পরে যতির আবির্ভাব হইবে, তাহাই এখানে মুখ্য তথ্য। দুই যতির মধ্যে কালপরিমাণই বাংলা ছন্দের প্রধান বিচার্য বিষয়।"[১]

পর্ব, পাদ, foot বা measure একই বস্তু

কিন্তু আমাদের জানা উচিত যে বৈদিক ভাষা, সংস্কৃত ভাষা ও ইংরেজী ভাষার ছন্দেও আছে 'পর্ব'। বৈদিক ছন্দের ও সংস্কৃতে অধিকাংশ বৃত্তছন্দেরই যাহাকে 'পাদ' বলা হয়, আসলে তাহাই হইতেছে পর্ব। ইংরেজী ভাষার ছন্দে যাহাকে 'foot' বা measure বলা হয়, তাহারই নাম পর্ব। সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মাত্রা-ছন্দের 'পাদ' পর্ববহুল।'[২]

পর্ব-বিন্যাসের দিক্ দিয়া ধ্বনিপ্রবাহ রচনা দ্বিবিধ—সম্মিতিহীন ও সম্মিতি-যুক্ত। সম্মিতিহীন রচনার নাম 'গদ্য' ও সম্মিতিযুক্ত রচনার নাম পদ্য বা বৃত্ত। সম্মিতিহীন রচনায় সাধারণতঃ বক্তব্য অর্থেরই প্রাধান্য থাকে, ধ্বনিপ্রাধান্য থাকে না; সেই জন্যই ইহাকে বলে গদ্য; সম্মিতিযুক্ত রচনায় নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের পদের বা পর্বের প্রাধান্য থাকে বলিয়া তাহাকে বলা হয় পদ্য। পদ্যে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের বারবার আবর্তন ঘটে বলিয়া ইহার অপর নাম—'বৃত্ত' অর্থাৎ আবর্তিত অক্ষর সংখ্যাদ্বারা নির্ধারিত পদ্যের নাম 'বৃত্ত'। Wordsworth এই বৃত্তকেই বলিয়াছেন Metrical Composition,

সম্মিতিহীন রচনাই গদ্য এবং সম্মিতিযুক্ত রচনাই পদ্য বা বৃত্ত

Metrical Compositionই বৃত্ত

গদ্যে কিন্তু ছন্দ থাকিতেও পারে আবার না থাকিতেও পারে। অথচ পদ্যে ছন্দ থাকিবেই, এসম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। পদ্য তাহাই যাহা সম্মিত, সম্মিতি সঙ্গতিরই অন্তর্ভুক্ত, কাজেই প্রকৃত পদ্যমাত্রেরই ছন্দ থাকে। এই জন্যই, ছন্দ বলিতে সাধারণ লোক 'পদ্যের ছন্দ'ই বুঝিয়া থাকে।

পদ্যে ছন্দ অপরিহার্য

সুসঙ্গত গদ্যের বৈশিষ্ট্য পর্বের দৈর্ঘ্য সংগতি। ভাবজাত পর্বদৈর্ঘ্য অর্থের

১ 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র', পৃঃ ২২ (৩য় সং)।

২ দ্রঃ 'ছন্দোমীমাংসা'—তারাপদ ভট্টাচার্য।

অনুরোধে কতকটা সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হয়। পদ্যের বৈশিষ্ট্য কিন্তু পর্বগত দৈর্ঘ্যসম্মিতি বা নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের পুনরাবৃত্তি। পদ্যে ভাব-পর্বের দৈর্ঘ্য অপরিবর্তনীয়—অর্থের খাতিরে সামান্য মাত্রও সংকোচন-প্রসারণ চলে না।১

গদ্য ও পদ্যের বৈশিষ্ট্য

পদ্যছন্দের সম্মিতির গুণে সম্মিতিযুক্ত পর্বদৈর্ঘ্যও ক্রমে ক্রমে আমাদের অভ্যাসগত হইয়া অবচেতন মনে স্থানলাভ করে। পরিচিত দৈর্ঘ্যের পর্বযুক্ত পদ্যছন্দের সংস্পর্শে আসিলেই আমাদের অবচেতন মন যথাস্থানে সম্মিতি বজায় রাখিতে প্রস্তুত হয়। "আমরা যতি লক্ষ্য করিয়া না পড়িলেও অভ্যাসবশে ঠিক যথা-স্থানেই যতি দিয়া পড়িয়া যাই, অথচ আমাদের চেতন মনে এই বিরতি মোটেই অনুভূত হয় না, চেতন মন কবিতার অর্থ-নির্ণয়েই ব্যাপৃত থাকে।"২

পদ্যের সম্মিতিগুণ আমাদের অবচেতন মনে স্থানলাভ করে

ছন্দশাস্ত্রে ধ্বনির বৈশিষ্ট্য চারিটি :—মাত্রা, শক্তি, সুর ও জাতি। মাত্রার অর্থ উচ্চারিত ধ্বনিতে অনুভূত কালদৈর্ঘ্য। শক্তির অর্থ উচ্চারণগত দৈহিক শক্তি বা কণ্ঠশক্তি; সুরের অর্থ কণ্ঠতন্ত্রীর কম্পনের অল্পতা বা আধিক্য-সঞ্জাত ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য এবং জাতির অর্থ উচ্চারিত ধ্বনির মৌলিকত্ব। সংস্কৃতে মাত্রাসংখ্যা দ্বারা নিরূপিত পদ্যকে বলা হয় জাতি।

মাত্রা, শক্তি, সুর ও জাতি

"উচ্চারণসাধ্য হ্রস্বতম ধ্বনিই হইতেছে অক্ষর।" অক্ষরের উচ্চারণে অনুভূত কালদৈর্ঘ্যই মাত্রা, পূর্বেই বলা হইয়াছে। ধ্বনিপ্রবাহে যতগুলি অক্ষর থাকে, প্রবাহের দৈর্ঘ্য তত মাত্রা—ইহাই হিসাব। মাত্রা ব্যক্তিগত কালমাত্র, ব্যক্তিনিরপেক্ষ কাল নহে। স্বর-ধ্বনিরই মাত্রা আছে, ব্যঞ্জনধ্বনির মাত্রা নাই। ছন্দশাস্ত্রে একমাত্রার ধ্বনি-

অক্ষর

১ 'মাসমেকং, মসং কুর্যাৎ ছন্দোভঙ্গং ন কারয়েৎ।'

২ 'ছন্দোবিজ্ঞান'—ভট্টাচার্য পৃঃ ৪৮।

দৈর্ঘ্যকে বলে হ্রস্ব ও দুইমাত্রার ধ্বনিদৈর্ঘ্যকে বলে দীর্ঘ।[১] দীর্ঘ অক্ষরের অর্থ দ্বিমাত্রিক অক্ষর। হ্রস্ব অক্ষরের অর্থ একমাত্রিক অক্ষর। অক্ষর সকল অবস্থাতেই সমমাত্রিক বা স্থিরমাত্রিক, ইহার মাত্রার তারতম্য হয় না—ছন্দশাস্ত্রে একমাত্র অক্ষরই হইতেছে ধ্বনিপ্রবাহ মাপিবার মানদণ্ড এবং মাত্রা-সংখ্যাই হইতেছে প্রবাহ-দৈর্ঘ্যের হিসাব।

ব্যঞ্জনধ্বনির মাত্রা নাই
হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বর

মাত্রাসংখ্যাই প্রবাহ-দৈর্ঘ্যের হিসাব

অক্ষরের উচ্চারণে প্রযুক্ত দৈহিক বলই শক্তি। স্বরযন্ত্রের উচ্চারণের ক্ষমতাই দৈহিক বল। উচ্চারণের সবলতা-দুর্বলতা ব্যক্তি-বিশেষ-নিরপেক্ষ সার্বজনীন ব্যাপার। অপেক্ষাকৃত অল্পশক্তিতে উচ্চারিত অক্ষরের নাম 'লঘু' এবং অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তিতে উচ্চারিত অক্ষরের নাম 'গুরু অক্ষর। স্বর ধ্বনিই লঘু বা গুরু হইতে পারে। ব্যঞ্জনধ্বনি পূর্ণ অক্ষরই নহে বলিয়া উহা লঘু বা গুরু হয় না।

লঘু ও গুরু অক্ষর

ব্যঞ্জনধ্বনি লঘু বা গুরু হয় না

ছন্দের প্রয়োজনীয়তা ঃ—এবারক্রম্বি বলিয়াছেন—

'The systematic study of verse or metrical rhythm is called prosody, and now we have the general principle which must govern it : metre is the modulated repetition of a rhythmical pattern. The rules given in prosody are valid only so far as they show how, in this metre or that, variations of speech-rhythm may conform with the ideally constant pattern, and what variations are capable of so conforming.' (The Theory of Poetry).

কাব্যতত্ত্বের দিক্ হইতে শব্দের ধ্বনিরূপের বিচারে প্রথম ও প্রধান আলোচ্য হইতেছে ছন্দ। ছন্দ প্রাচীনকাল হইতেই পৃথক্ মতে পৃথক্ শাস্ত্র হিসাবে আলোচিত হইবার গৌরব লাভ করিয়াছে। বেদে ছন্দ যে ছন্ন

১ 'ঊকালোঽজ্ঝ্রস্বদীর্ঘপ্লুতঃ'—পাণিনি। "একমাত্রো ভবেদ্ধ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে। ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ঃ"—শ্রুতবোধ।

বেদাঙ্গের একটি অঙ্গ তাহা এই গ্রন্থের প্রথম ভাগেই আলোচিত হইয়াছে। সংস্কৃতেও ছন্দশাস্ত্র অলংকারশাস্ত্রের বাহিরে এক পৃথক্ বিদ্যা।

বেদ অপৌরুষেয়—ন্যায়, স্মৃতি, সাংখ্য, বেদান্ত, মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্র সকলে একবাক্যে এই কথারই ঘোষণা করিয়াছে। ছন্দজ্ঞান ভিন্ন আবার এই বেদার্থজ্ঞান সম্ভবপর নয়। কারণ বেদগুলি নানাছন্দে ও পদ্যের বিবিধভঙ্গীতে সজ্জিত শব্দরাশির সমষ্টি। ছন্দশাস্ত্রজ্ঞানবিহীন পাঠকের পক্ষে বেদাধ্যয়নে দোষ ঘটিতে পারে। ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে বলা হইয়াছে যে, ছন্দ, দেবতা ও বিনিয়োগ না জানিয়া যিনি বেদ অধ্যয়ন করেন বা অধ্যাপনা করেন তিনি পাপী বলিয়া পরিচিত। 'পাণিনীয় শিক্ষা'য়ও দেখা যায়—'আর্ষং ছন্দশ্চ দৈবত্যং বিনিয়োগঃ পুনঃ পুনঃ। বেদিতব্যং প্রযত্নেন ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ॥' পাতঞ্জল মহাভাষ্যে দেখি—মন্ত্র যদি স্বর বা বর্ণপাঠে দোষযুক্ত হয় ত সেই মন্ত্ররূপ বাগ্‌বজ্র যজমানকে হত্যা করে। চতুর্দশ বিদ্যার মধ্যে ছন্দশাস্ত্র একটি বিশিষ্ট বিদ্যা। অতএব সাহিত্যরসিক মাত্রেরই ছন্দজ্ঞান বিশেষ প্রয়োজনীয়।

ছন্দের প্রয়োজনীয়তা বুঝা গেল। এই ছন্দের উৎপত্তি আমাদের দেশে কিভাবে হইয়াছিল তাহাই এখন আলোচ্য।

ছন্দের উৎপত্তি ঃ—শ্রুতি ছন্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দেখাইয়া উহার উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোকপাত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। 'ঐতরেয় আরণ্যক'[১] বলিয়াছে যে, লোককে পাপসম্বন্ধ হইতে নিবারণ বা আচ্ছাদন করার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছিল ছন্দ। 'তৈত্তিরীয় সংহিতা'র[২] মতে, অগ্নিচয়নের সময় যজমানকে চীয়মান অগ্নির উত্তাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই ছন্দের উপযোগিতা। অর্থাৎ ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছিল অগ্ন্যুত্তাপ হইতে যজমানকে রক্ষা করিবার জন্য। 'ছান্দোগ্য উপনিষদ্'[৩] বলিয়াছে যে, দেবতাদিগকে অপমৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিল ছন্দ। যাস্কের মতে—'ছন্দাংসি ছাদনাৎ'। ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছিল আহ্লাদ দিবার জন্য। পাণিনির সূত্রে আছে 'চন্দেরাদেশ্চ ছ'।

১ ঐ. আরণ্যক, ২।১।৬।

২ তৈত্তি. সংহিতা, ৫।৬।৬।১।

৩ ছা. উপনিষদ, ১।৪।২।

ছন্দ বলিতে বুঝায় 'গতি-সৌন্দর্য'। গতিশীল বস্তুমাত্রেই হয় ছন্দযুক্ত, নয় ছন্দহীন, সাহিত্যিক ও ব্যবহারিক অর্থে ছন্দ হইতেছে—'ভাষার অন্তর্গত প্রবহমান ধ্বনি-সৌন্দর্য'। বহুল ব্যবহারের দিক্ দিয়া ছন্দ বলিতে 'সাহিত্যের ছন্দই বুঝায়। সংকীর্ণ অর্থে ছন্দকে কেবল ভাষাগত ধ্বনি-সৌন্দর্য বলিলেই হয়...' (ছন্দোবিজ্ঞান—ভট্টাচার্য পৃঃ ১)।

ছন্দের উৎপত্তির এক বিচিত্র কাহিনী পাই রামায়ণকার বাল্মীকির জীবনী হইতে। প্রসিদ্ধি আছে যে আদি কবি বাল্মীকির ক্রৌঞ্চমিথুনজনিত শোকই শ্লোকরূপে উৎসারিত হইয়াছিল। সহচরী-বিয়োগকাতর ক্রৌঞ্চের বেদনায় কবির চিত্তে বেদনার সঞ্চার হয়। এই বেদনা হইতেই সহসা জন্মলাভ করিয়াছিল 'পরিপূর্ণ বাণীর সঙ্গীত।'[১]

অযত্নবিন্যস্ত শব্দে কবিতা হয় না ; "কবিতার জন্য প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী বাণীবিন্যাস।" এইখানেই কবিতায় ছন্দের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছিল। ছন্দের উৎপত্তিও হইয়াছিল সম্ভবতঃ এইজন্য। "অপরিহার্য শব্দ যথা-বিন্যস্ত হইলে তাহাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় চিত্রগুণ ও স্রোতস্বিতার এবং শব্দ-সমূহ তখন বাক্যে সমর্পিত হইয়া অবশ্যম্ভাবী ছন্দময় রূপ লাভ করে। সুতরাং মানব মনের ভাবনা কল্পনা যখন অনুভূতিরঞ্জিত যথাবিহিত শব্দ সম্ভারে বাস্তব সুষমামণ্ডিত চিত্রাত্মক ও ছন্দময় রূপ লাভ করে, তখনই হয় কবিতা।"

সম্ভবতঃ, ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছিল প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী হইতে। প্রকৃতি ছন্দে বাঁধা। পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণ যাহাকে বলিয়াছেন—rhythmic dance in Nature, প্রকৃতির মধ্যে সেই তত্ত্বের সন্ধান লাভ করিয়া মানুষ তাহার emotionকে বাঁধিয়াছিল গানে, সুরে, ছন্দে। আমাদের শরীরের মধ্যে যে শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ত বহিতেছে তাহার মধ্যেও ছন্দ আছে। আমাদের চলায়, আমাদের বলায় আছে ছন্দ। ইহা ছাড়া সেই সুপ্রাচীন যুগে ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছিল in the feeling of magic, awe and wonder. মানুষ প্রথমে কথা কহিয়াছিল ছন্দে, গান গাহিয়াছিল কবিতায়।

১ ভাষা ও ছন্দ—রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথও প্রকৃতির মধ্যেই দেখিয়াছেন ছন্দ—প্রকৃতিই ছন্দের উৎপত্তি-স্থল। 'ভাষা ও ছন্দে' তিনি বলিয়াছেন :—

'অরণ্য উঠায়ে লক্ষ শাখা
মর্মরিছে মহামন্ত্র ; ঝটিকা উড়ায়ে
লক্ষ পাখা গাহিছে গর্জন গান ;
নক্ষত্রের অক্ষৌহিণী হতে অরণ্যের পতঙ্গ
অবধি মিলাইছে এক স্রোতে সঙ্গীতের
শান্তি সিন্ধু-পারে, ভাষার অতীত তীরে।'

ছন্দ যেদিন জন্মলাভ করিল সেদিন তাহার নিজেকে প্রকাশ করিবার জন্য কী আকুলতা, কী বেদনা। 'তরুণ গরুড়সম কী মহৎ ক্ষুধার আবেশ পীড়ন করিছে তারে? কী তাহার দুরন্ত প্রার্থনা, অমর বিহঙ্গশিশু কোন্ বিশ্বে করিবে রচনা আপন বিরাট নীড়?'

ছন্দের উৎপত্তি

সেইজন্যই ত 'অলৌকিক আনন্দের ভার বিধাতা যাহারে দেয়, তার বক্ষে বেদনা অপার, তার নিত্য জাগরণ।'

ভাষাতত্ত্বের দিক্ হইতে বলা যায় ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছিল Bow-Wow, Sing-Song theoryর মাধ্যমে। অনুকারাত্মক ধ্বন্যাত্মক শব্দই ছন্দের জনক।

ছন্দশাস্ত্রের সূচনা ও ক্রমবিকাশ :—ছন্দশাস্ত্র যে কোন্ সুদূর অতীতের তমসাচ্ছন্ন নিভৃত কন্দরে ছিল গুহাহিত, আজ তাহা বলা সুকঠিন। কীথ্ বলিয়াছেন[১] যে ব্রাহ্মণসাহিত্যে ছন্দপ্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায় এবং শাংখ্যায়ন শ্রৌতসূত্র, নিদানসূত্র, ঋক্ প্রাতিশাখ্য এবং কাত্যায়নের অনুক্রমণীগুলি ছন্দ লইয়া আলোচনা করিয়াছে। নিদানসূত্র সামবেদের অন্তর্গত আর শাংখ্যায়ন শ্রৌতসূত্রে (৭।২) ছন্দ লইয়া আলোচনা আছে; ঋক্সংহিতার পরবর্তী সূক্তগুলির মধ্যে কতকগুলি ছন্দেরই নাম আছে।[২]

বৈদিক ছন্দ যে কত প্রাচীন তাহা বলা কঠিন। আরনল্ডের (Arnold)

---

১ A History of Sanskrit Literature, p. 415.

২ Indische Studien, VIII—Weber.

মতে ইন্দো-আর্য জাতির পারসিকগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রাক্কালে বা সমকালে ইহাদের সূচনা হইয়াছিল।[১]

ছন্দশাস্ত্রের আলোচনা 'নিরুক্তে'র মধ্যেও কিছু কিছু পাওয়া যায়। ছন্দশাস্ত্র যে একটি বিশিষ্ট বেদাঙ্গ ছিল তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

উপনিষদের যুগে আমরা দেখি বৈদিক ছন্দগুলির মধ্যে অনুষ্টুভ্‌ ধীরে ধীরে এপিক শ্লোকের আকার ধারণ করিতেছে। ঋগ্বেদেও অনুষ্টুভের শ্লোক-ধর্মিতা দেখা যায়। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব।

লৌকিক অথবা ক্লাসিক্যাল ছন্দের রচয়িতার মধ্যে ছন্দঃসূত্রে পিঙ্গল যাঁহাদের নাম করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ক্রৌষ্টুকি, ট‌ণ্ডিন, যাস্ক, কাশ্যপ, শৈতব, রাত এবং মাণ্ডব্য প্রসিদ্ধ। অভিনবগুপ্ত কাত্যায়ন, ভট্টশঙ্কর এবং জয়দেব হইতে ছন্দ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ছন্দবিজ্ঞান পিঙ্গলের সময়েই জন্মলাভ করিয়াছিল বলিয়া আমাদের ধারণা এবং তাঁহার 'ছন্দঃসূত্র' অন্যতম বেদাঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়।[২] সম্ভবতঃ পিঙ্গলই এই বিজ্ঞানের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। তিনি একটি metrical line-কে 'ত্রিক' অর্থাৎ তিন অক্ষর-বিশিষ্ট আটটি ভাগে ভাগ করার প্রথা প্রচলিত করেন। অতি প্রাচীনকাল হইতেই বৈদিক ছন্দ নির্ধারিত হইত শ্লোকপাদে অক্ষর সংখ্যা দ্বারা। প্রাতিশাখ্যগুলির যুগে ছন্দের ২৬ প্রকারের ভেদ দেখা যায়; কিন্তু যতই এই বিজ্ঞানের প্রসার ঘটিতে থাকে এবং ছন্দের মধ্যে যতই গীতিধর্মিতা প্রকাশ পাইতে থাকে, ততই এই ২৬ প্রকারের ছন্দ হইতেই নূতন নূতন ছন্দের সৃষ্টি হইতে থাকে, কারণ চরণগুলিতে হ্রস্ব-দীর্ঘ অক্ষরের বিন্যাস ভিন্ন ভিন্নরূপের হইতে থাকে। ইহাই নবসৃষ্ট বর্ণসংগীত—এই সংগীত বৈদিক যুগের স্বরসংগীত এবং অপভ্রংশ যুগের তালসংগীত হইতে পৃথক্ বস্তু। এই বর্ণসংগীতের ভিত্তি ছিল sound variation; কিন্তু স্বরসংগীতের ভিত্তি ছিল 'pure modulation of the voice unconnected with the variation of short and long sounds.'[৩]

---

১ Vedic Metre (Cambridge), 19.

২ Vedic Age, p. 478; ছন্দঃসূত্রকার পিঙ্গল ও প্রাকৃত পিঙ্গল এক ব্যক্তি নহেন।

৩ Poona Orientalist, VIII, p. 202.

পিঙ্গলের 'ছন্দঃসূত্রে' বৈদিক অপেক্ষা ক্লাসিক্যাল যুগের ছন্দই বেশী আলোচিত হইয়াছে। পিঙ্গল ছন্দের আলোচনায় বীজগাণিতিক symbol-প্রক্রিয়ার ব্যবহার করিয়াছেন। 'ল' বলিতে পিঙ্গল লঘু বুঝিয়াছেন, 'গ' বলিতে গুরু এবং 'ম' বলিতে molossus বুঝিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইবে।

পিঙ্গল ছয়টি প্রত্যয়ের মধ্যে মাত্র চারিটির উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি 'অধ্বনে'র আলোচনা করেন নাই এবং হ্রস্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের অঙ্কন পদ্ধতির কোন উল্লেখ একেবারেই করেন নাই। এই জন্যই মনে হয় যে তাঁহার সময়ে লিখিয়া ছন্দবিচার করার পদ্ধতি বিশেষ প্রচলিত ছিল না। পিঙ্গলের কাল নিশ্চিতভাবে আজও স্থিরীকৃত হয় নাই। কিন্তু তিনি যে এপিক অনুষ্টুভ্ বা উপজাতিছন্দের পূর্ণ বিকাশের পরবর্তী যুগের লেখক, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। তথাপি তিনি একজন প্রাচীন ছন্দশাস্ত্রকার। মীমাংসাসূত্রের ভাষ্যকার শবরস্বামী তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন[১]। কীথের মতেও পিঙ্গল নিশ্চয়ই ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে'র অংশবিশেষের রচনাকালের পূর্ববর্তী।[২] পিঙ্গলকে খৃষ্টপূর্ব প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক বলিয়া মনে হয়। রাত, মাণ্ডব্য, কাশ্যপ প্রভৃতি পূর্বোক্ত প্রাচীন ছন্দশাস্ত্রকারগণের উল্লেখ হইতে মনে হয় ক্লাসিক্যাল ছন্দশাস্ত্রের উৎপত্তি পিঙ্গলের বহু পূর্ব হইতেই হইয়াছিল। ক্লাসিক্যাল যুগের কবিগণ যে পিঙ্গলকেই তাঁহাদের ছন্দ রচনায় অনুসরণ করিয়াছিলেন[৩] একথা বলা কঠিন, তবে ইহা অবধারিত সত্য যে পিঙ্গলের অপেক্ষা প্রাচীনতর অন্য কোন ছন্দশাস্ত্রকারের লিখিত গ্রন্থ আজ পর্যন্তও পাওয়া যায় নাই। পিঙ্গলছন্দঃসূত্রের উপর নিম্নলিখিত টীকাকারগণের টীকাগুলি পাওয়া যায়:—হলায়ুধ, শ্রীহর্ষশর্মন্, বাণীনাথ, লক্ষ্মীনাথ, যাদবপ্রকাশ এবং দামোদর। নারায়ণের 'বৃত্তোক্তিরত্ন'

১ The Age cf Imperial Unity, p. 272.

২ A History of Sanskrit Literature.

৩ 'Pingala invented a code of mnemonics which has become so popular that the systems of Bharata or of the later Janaśraya have not been adopted by writers on prosody.'—Krishnamachariar, p. 903.

এবং চন্দ্রশেখরের 'বৃত্তমৌক্তিক' পিঙ্গলছন্দেরই paraphrase মাত্র। 'বৃত্তমৌক্তিক' গ্রন্থটিকে পিঙ্গল ছন্দঃসূত্রের বার্তিক বলা হইয়াছে।

ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে' (১৬শ ও ৩২শ অধ্যায়ে) ছন্দ সম্পর্কিত আলোচনা দেখা যায়। ষোড়শাধ্যায়ে ছন্দগুলির নামকে পরিচিত করান হইয়াছে মুদ্রাদ্বারা। আর দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে উদাহরণগুলি প্রায়ই প্রাকৃতে লিখিত এবং ভরত ঐগুলি নিজেই লিখিয়াছিলেন বলিয়া প্রচলিত। পঞ্চদশ অধ্যায়ের ৩৩-১১৯ শ্লোকে 'বাচিকাভিনয়' ছন্দ বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে। ষোড়শ এবং দ্বাত্রিংশ অধ্যায়স্থ ছন্দ বর্ণনায় পার্থক্য দেখাইতে গিয়া ভরত বলিয়াছেন যে সাধারণ কাব্যে এবং নাট্যে এই ছন্দ বা বৃত্তগুলির ব্যবহার হইবে[১] (ষোড়শ অধ্যায়স্থ ছন্দ সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য)। কিন্তু দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের ছন্দগুলি গানের ক্ষেত্রে, বিশেষত ধ্রুবতালবিধির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ভরতের মতে বৃত্ত পাঠ্য হইবে, কিন্তু গীত বলিতে গেয়কেই বুঝায় ।

ভরত ও পিঙ্গলের তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যায় যে Bharata's notable deviation from Pingala is that, whereas the latter uses merely a Sūtra for the definition, he defines the metres in a full stanza, composed in the same metre which is being defined. When this was done, there really was no need for an additional illustration ; but Bharata invariably quotes a stanza in illustration after defining a metre. Pingala gives no illustration at all.[২]

অপর একজন প্রসিদ্ধ ছন্দশাস্ত্রকার ছিলেন জয়দেব। তাঁহার গ্রন্থের নাম 'জয়দেবচ্ছন্দস্'। মুকুলের পুত্র হর্ষট এই গ্রন্থের উপর টীকা লিখিয়াছিলেন। 'জয়দেবছন্দঃ' হর্ষটের টীকা সমেত কিছুদিন হইল প্রকাশিত হইয়াছে।[৩] জয়দেব পিঙ্গলের প্রণালীই অনুসরণ করিয়াছেন। প্রথম তিন অধ্যায়ে বৈদিক ছন্দ, তারপর মাত্রাবৃত্তগুলি, পরে বিষম এবং অর্ধসমবর্ণবৃত্ত, তৎপরে সমবর্ণবৃত্ত

১ নাট্যশাস্ত্র, ১৬।১৪৮।

২ The Age of Imperial Unity, p. 273.

৩ Jayadāman, p. 1-40, ed. by H. D. Velankar, Bombay, 1949.

এবং সর্বশেষে ছয়টি প্রত্যয়ের লক্ষণ ও বিচার করিয়াছেন। এসম্বন্ধে যথাস্থানে আলোচনা করা হইবে। পিঙ্গল হইতে জয়দেবের পার্থক্য এই যে, জয়দেব পিঙ্গলের অনুল্লিখিত 'প্রত্যয়' অধ্বন্‌এর নাম করিয়াছেন এবং ছয়টি প্রত্যয়ের কথা বলিয়াছেন। অধ্বনের উল্লেখে বুঝা যায় যে জয়দেবের সময় লেখার প্রচলন হইয়াছিল যদিও তখন লিপির প্রথম অবস্থা, কারণ তখন, বৃহৎ কাষ্ঠ, প্রস্তর অথবা ধাতব খণ্ডে লিপি অভ্যাস করা হইত। আর একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য এই যে জয়দেব 'employs in his metrical definition single lines of the very metre which is being defined, whereas Pingala used only the' 'Sūtras'. ভরত[১] ও জয়দেবের পার্থক্য এই যে 'Jayadeva has introduced economy by making the definition itself serve the purpose of illustration.'

জয়দেব সম্ভবত বরাহমিহিরের পরিচিত ছিলেন। স্বয়ম্ভূ ও অভিনবগুপ্ত[২] তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। স্বয়ম্ভূর উল্লেখ করিয়াছেন আবার হেমচন্দ্র। ভরতের অব্যবহিত পরেই জয়দেবের কাল নিঃসংশয়ে বলা চলে; সেজন্য তিনি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতকে বর্তমান ছিলেন বলিয়া মনে হয়।

জনাশ্রয়ের 'ছন্দোবিচিতি' সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ৫৮০-৬.৫র মধ্যে রচিত। বিষ্ণুকুণ্ডিন্ বংশের রাজা দ্বিতীয় মাধববর্মা আর জনাশ্রয় সম্ভবত একই ব্যক্তি, কেননা মাধববর্মার উপাধিই ছিল 'জনাশ্রয়'। জনাশ্রয় বহু প্রাচীন ছন্দশাস্ত্রকারগণের গ্রন্থ হইতে প্রচুর উদ্ধৃতি তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের পূর্বে যেসকল ছন্দশাস্ত্র প্রণেতার নাম ছিল প্রসিদ্ধ, জনাশ্রয় প্রায় তাহাদের সকলেরই উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রুতবোধকে[৩] বলা হয় কালিদাসের রচনা। কিন্তু ইহা সত্যই কালিদাসের

---

১ The Age of Imperial Unity, p. 273.

২ 'সর্বেষাং বৃত্তানামিত্যাদৌ অর্থসমাসেন জয়দেবোঽভ্যধাৎ'—অভিনবভারতী। নমিসাধু, নারায়ণভট্ট এবং রামচন্দ্র বুধেন্দ্র জয়দেবের উল্লেখ করিয়াছেন—Vide History of Classical Sanskrit Literature—M. Krishnamachariar, pp. 902-903 fn.

৩ ডঃ দে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে কালিদাসের নামে প্রচলিত প্রায় ২০টি রচনার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সেগুলির নামকরণ করা হয় নাই। বসুমতী সিরিজে রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ [কালিদাস গ্রন্থাবলীর ৩য় খণ্ডে] ইহাকে কালিদাসকৃত বলিয়া ধরিয়াছেন।

রচনা কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ইহার প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে—"কোন্ শ্লোক কোন্ ছন্দে নিবদ্ধ, তাহার লক্ষণ শ্রবণমাত্রে যাহার সাহায্যে বুঝা যায়, সেই 'শ্রুতবোধ' নামক সংক্ষিপ্ত ছন্দোগ্রন্থ এইবার বলিব।" কেহ কেহ শ্রুতবোধকে বররুচির প্রণীতও বলিয়া থাকেন। এই শ্রুতবোধ কোন্ সময়ের লেখা বলা কঠিন। তবে গুপ্তযুগের শেষভাগেই ইহা রচিত হইয়াছিল, ছন্দের ভঙ্গিমা দেখিয়া একথা মোটামুটি বলা যাইতে পারে। ইহার অনেকগুলি টীকা আছে—হর্ষকীর্তি উপাধ্যায়, মনোহর শর্মা, তারাচন্দ্র, হংসরাজ, মাধব, লক্ষ্মীনারায়ণ, শুকদেব, চতুর্ভুজ এবং নাগাজী ইহার প্রসিদ্ধ টীকাকার।

বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় (১০৪ অধ্যায়) গ্রহগণের গমনাগমনের সহিত ছন্দগুলি বর্ণিত হইয়াছে। 'বৃহৎসংহিতা'র টীকাকার ভট্টোৎপল একজন ছন্দশাস্ত্র প্রণেতা আচার্যের উল্লেখ করিয়াছেন। জয়মঙ্গলাচার্য ১০৯৪-১১৪৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে 'কবিশিক্ষা' নামে এক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

দণ্ডী যে 'ছন্দোবিচিতি' নামে এক ছন্দগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন বলিয়া মত প্রচলিত আছে, কীথ্ তাহা বিশ্বাস করেন না এবং ভামহ হয়ত এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার ধারণা। কাহারও কাহারও মতে[১] 'ছন্দোবিচিতি' কোন গ্রন্থবিশেষের নাম নহে; ইহা ছন্দশাস্ত্রকেই বুঝাইয়া থাকে। নাট্যশাস্ত্রে দেখি 'ইতি ভারতীয়ে নাট্যশাস্ত্রে ছন্দোবিচিতির্নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।'

ছন্দবিষয়ে ক্ষেমেন্দ্রের একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আছে, নাম 'সুবৃত্ততিলক'। ইহাতে বলা আছে যে প্রসিদ্ধ লেখকগণ প্রত্যেকেই এক একটি বিশিষ্ট ছন্দের ভক্ত, যেমন পাণিনির[২] প্রিয় ছন্দ ছিল উপজাতি, কালিদাসের ছিল মন্দাক্রান্তা, ভারবির বংশস্থবিল এবং ভবভূতির শিখরিণী প্রভৃতি।

হেমচন্দ্র 'ছন্দোঽনুশাসন' নামে এক ছন্দগ্রন্থ সংকলিত করেন। কেদারভট্টের 'বৃত্তরত্নাকর' খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের পূর্বে রচিত। ইহাতে ১৩৬টি ছন্দের আলোচনা আছে এবং সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এটি একটি প্রসিদ্ধ রচনা।

১ Indian Historical Quarterly, 1955-56 number.

২ এই নামে একজন কবি ছিলেন; তিনি ও বৈয়াকরণ পাণিনি অভিন্ন কিনা তাহা নিরূপিত হয় নাই।

'বৃত্তরত্নাকর' ৬টি অধ্যায়ে সমাপ্ত এবং মল্লিনাথ, শিবরাম প্রভৃতি টীকাকারগণ ইহার বহুল ব্যবহার করিয়াছেন।

বৃত্তরত্নাকরের অনেকগুলি টীকা আছে। তন্মধ্যে পণ্ডিতচিন্তামণি, শুল্হণ, কৃষ্ণবর্মা, গোবিন্দভট্ট, কৃষ্ণসার, তারানাথ ও ভাস্কব রায়েব টীকা উল্লেখযোগ্য। ভাস্কর 'অভিনববৃত্তরত্নাকর' নামে এক ছন্দগ্রন্থ রচনা করেন।

গঙ্গাদাস ছিলেন বাঙালী গোপালদাস বৈদ্যের পুত্র। ছন্দোমঞ্জরীর ছয়টি অধ্যায়ে তিনি বিভিন্ন ছন্দের লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন এবং সেগুলির উদাহরণচ্ছলে শ্লোকে কৃষ্ণের প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার ছন্দোমঞ্জরী অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে। গঙ্গাদাস খৃষ্টীয় পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতকে বর্তমান ছিলেন। 'ছন্দোমঞ্জরীর' টীকার মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ জগন্নাথ সেন, চন্দ্রশেখর ও গোবর্ধনকৃত টীকা।

গোবিন্দের পুত্র চিন্তামণি জ্যোতির্বিদ্ ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে 'প্রস্তারচিন্তামণি' নামে তিন অধ্যায়ের এক প্রসিদ্ধ ছন্দগ্রন্থ রচনা করেন। প্রস্তারের প্রয়োজন সম্বন্ধে বলা হয়, 'Prastaras are valuable in the elucidation of rhythms in Indian music.'[১]

ছন্দশাস্ত্রের কয়েকটি অপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

গ্রন্থ	লেখক
বৃত্তদর্পণ	সীতারাম
জগন্মোহনবৃত্তশতক	বাসুদেব ব্রহ্মপণ্ডিত
বৃত্তরত্নার্ণব	নৃসিংহ ভাগবত
বৃত্তকল্পদ্রুম	জয়গোবিন্দ
বৃত্তকৌমুদী	জগদ্গুরু
বৃত্ততরঙ্গিণী	কৃষ্ণ

এইরূপ অন্যূন পঞ্চাশটি ছন্দগ্রন্থের নাম পাওয়া যায়।[২]

বৈদিক ও লৌকিক ছন্দঃ—যাস্ক ও সায়ণের মতে ছন্দের ব্যুৎপত্তি-

১ History of Classical Sanskrit Literature, p. 910.
২ Do p. 911.

গত অর্থ কি তাহা পূর্বেই বলিয়াছি ; এখানে আলোচ্য বৈদিক ছন্দ, লৌকিক ছন্দ এবং তাহাদের তুলনামূলক আলোচনা।

বেদে সাতপ্রকার ছন্দই প্রধান, পূর্বে বলিয়াছি।[১] গায়ত্রী প্রভৃতিই সেই সাতটি প্রসিদ্ধ ছন্দ। ঋক্‌প্রাতিশাখ্যে বলা আছে :—"গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুপ্ চ বৃহতী চ প্রজাপতেঃ। পংক্তিস্ত্রিষ্টুব্‌জগতী চ সপ্তচ্ছন্দাংসি তানি হ। অষ্টাক্ষর প্রভৃতীনি চতুর্ভূর্য়ঃ পরং পরম্॥"[২] অর্থাৎ গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুভ্, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুভ্ এবং জগতী—এই সাতটি প্রজাপতির ছন্দ। গায়ত্রীর আট অক্ষর, অন্য সকল গুলির ক্ষেত্রে পরপর চারিটি অক্ষর করিয়া যথাক্রমে বাড়াইয়া যাইতে হইবে। দেবতা এবং অসুরগণেরও ছন্দ ছিল সাতটিই। এই ছন্দগুলি ছাড়া আর্ষছন্দ নামে আর এক প্রকার ছন্দই বিশেষ প্রসিদ্ধ, যে ছন্দে আমাদের ঋগাদি সংহিতা রচিত।

গায়ত্রী শব্দের অর্থ, গান বা স্তুতিতে যাহা প্রযুক্ত হয় (নিরুক্ত ৭)। অথবা ইহার তিনটি পাদ থাকায় ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে—এমনও বলা যায়। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে 'শতপথ ব্রাহ্মণ' বলিয়াছে যে, গান করিতে করিতে ব্রহ্মার মুখ অর্থাৎ তিন বেদ হইতে আবির্ভূত হইয়াছিল এই গায়ত্রী (শ. ব্রা ৬।১।১।১৫)। যাহা উৎস্নাতা তাহাই উষ্ণিক্। 'উৎস্নাতা' শব্দের অর্থ গায়ত্রীর অপেক্ষা চারিটি বেশী অক্ষরে যাহার রচনা সম্পন্ন হয়। অথবা দেবতাদের এই ছন্দ বেশী প্রিয় ; আবার গায়ত্রী অপেক্ষা চারিটি বেশী অক্ষর ইহাতে থাকায় ইহা উষ্ণীষ্‌যুক্তাও বলা চলে। 'বেশী অক্ষর থাকায় অর্থাৎ অনুষ্টোভনের জন্য ছন্দের নাম অনুষ্টুভ্।'[৩] গায়ত্রীর থাকে তিন পাদ ;

---

১ "The main principle governing Vedic metre is measurement by number of syllables. The metrical unit here is not the foot in the sense of Greek prosody, but the foot (pāda) or quarter in the sense of the verse or line which is a constituent of the stanza. Such verses consist of eight, eleven, twelve, or (much less commonly) five syllables"......A Vedic Grammar for Students (Macdonell), p. 436.

২ ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্য, ১৬।১,২।

৩ "The most typical forms of the stanza, are :—the Anustubh which consists of four dimeter verses." etc. Vedic Metre—Arnold.

কিন্তু অনুষ্টুভের একটি পাদ বেশী থাকে। অনুষ্টুভের অপেক্ষা চারি অক্ষর বেশী থাকায় পরিবহণের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে বৃহতী ছন্দ, পাঁচটি পাদযুক্ত ছন্দ পংক্তি। 'কাশিকা' বলিয়াছে যে, পংক্তি ছন্দের নাম ঐরূপ হইয়াছে, কারণ উহাতে আছে পাঁচটি পাদ। গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দ অপেক্ষা দেবতাগণ এই ছন্দেই সর্বাধিক স্তুত হইয়াছেন বলিয়া ছন্দের নাম হইয়াছে ত্রিষ্টুপ্।[১] অথবা ঋষি তিনবার এই ছন্দে স্তব করিয়াছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি এই ছন্দের নাম দিয়াছেন ত্রিষ্টুপ্। বিস্তৃততম বা গততম ছন্দের নাম জগতী। অথবা প্রজাপতি বিষণ্ণ অবস্থায় এই ছন্দকে দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম হইয়াছিল জগতী।

আর্য ছন্দের উদাহরণ দিতে যাইয়া 'ঋক্প্রাতিশাখ্য' বলিয়াছে যে গায়ত্রী ২৪টি অক্ষরসমন্বিতা এবং ত্রিপাদবিশিষ্টা অষ্টাক্ষরা, অথবা ষড়ক্ষরা এবং চারিপাদবিশিষ্টা। ত্রিপাদবিশিষ্টা গায়ত্রীর উদাহরণ :— অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্॥ আর চারিপাদবিশিষ্টার উদাহরণ :—ইন্দ্রঃ শচীপতির্ বলেন বীড়িতঃ। দুশ্চ্যবনো বৃষা সমৎসু সাসহিঃ॥[২]

উষ্ণিহ্ ২৮ অক্ষরযুতা এবং ত্রিপদা। প্রথম দুইটি পাদে থাকে ৮টি করিয়া অক্ষর, শেষটিতে থাকে ১২টি অক্ষর। অগ্নে রাজস্য গোমতঃ (ঋ, স, ১।৭৯।৪) ইত্যাদি এই ছন্দের উদাহরণ।[৩] ৩২টি অক্ষরযুতা ও চতুষ্পদবিশিষ্টা অনুষ্টুভ্। ইহার উদাহরণ—গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণঃ (ঋ, স, ১।১০।১) প্রভৃতি। বৃহতীর প্রায়ই থাকে চারিটি পাদ এবং উহার অক্ষর থাকে ৩৬টি। প্রথম তিন পাদের প্রত্যেকটির থাকে ৮টি করিয়া অক্ষর, শেষ পাদে থাকে ১২টি অক্ষর। উদাহরণ—মা চিদন্যদ্বি শংসত (ঋ. ৮।১।১) ইত্যাদি। পংক্তি ছন্দের পাঁচটি পাদ এবং প্রত্যেক পাদের থাকে ৮টি অক্ষর। উদাহরণ—ইন্দ্রো মদায় বাবৃধে (ঋ ১।৮১।১) ইত্যাদি। ত্রিষ্টুভের থাকে ৪৪টি অক্ষর,—ইহার চারিটি পাদ থাকে এবং প্রত্যেক পাদ ১১ অক্ষরযুক্ত হয়। উদাহরণ—পিবা সোমমভি যমুগ্র

১ 'The Tristubh, which consists of four trimeter verses, each of eleven syllables.' Four trimeter verses, each of twelve syllables, form a Jagati stanza.'—Vedic Metre.

২ গায়ত্রীর বিভিন্ন প্রকার ভেদের জন্য দ্রঃ ঋক্প্রাতিশাখ্য, ১৬।১৮-২৮।

৩ এই ছন্দের প্রকার ভেদের জন্য দ্রঃ 'প্রাতিশাখ্য' ১৬।৩১-৩৬।

তর্দঃ (ঋ. ৬।১৭।১) ইত্যাদি। জগতী ছন্দের থাকে চারিটি পাদ, প্রত্যেক পাদে থাকে ১২টি অক্ষর, অর্থাৎ জগতী ছন্দের মোট অক্ষর সংখ্যা ৪৮। ইহাই ইহার স্বাভাবিক প্রকৃতি। উদাহরণ—প্রদেবমচ্ছা মধুমন্ত ইন্দবঃ (ঋ. ১।৬৮।১) ইত্যাদি।১

প্রত্যেক ছন্দশাস্ত্র প্রণেতাই সংকেত দ্বারা ছন্দের লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকেন। পিঙ্গল 'ছন্দঃসূত্রে'ও সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ইহাতে ম, য, র, স, ত, জ, ভ, ন, গ, এবং ল এই দশটি অক্ষর দ্বারা সমাপ্ত ছন্দ বিষয়ক সংকেত প্রকাশিত হইয়াছে। এই দশটি অক্ষরই যাবতীয় ছন্দ শিক্ষার মূল। তিন তিনটি অক্ষর একত্র ধরিয়াই ছন্দ স্থির করিতে হয়। তিন অক্ষরের সমষ্টিকে গণ বলে। ছন্দশাস্ত্রে ম হইতে ন পর্যন্ত মোট গণ ৮টি। গ ও ল যথাক্রমে গুরু ও লঘু অক্ষরকে বুঝায়, তিন অক্ষরের সমষ্টিকে নহে।

সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ববর্ণ, অনুস্বার ও বিসর্গ যুক্ত বর্ণ, জিহ্বামূলীয় ও উপধ্মানীয় বর্ণের পূর্ব স্থিত লঘু বর্ণের গুরু সংজ্ঞা হয়। দ্বিমাত্র দীর্ঘবর্ণকেও গুরু বলে। এই দ্বিমাত্র গুরুবর্ণকে মনে করিতে হইবে দুইটি লঘুবর্ণ রূপে।

পিঙ্গলছন্দঃসূত্রে 'বসু' শব্দে গুরু লঘু আটটি বর্ণকে বুঝিতে হইবে বলা আছে। একাক্ষর ছন্দকে এই শাস্ত্রে 'দৈবী গায়ত্রী' বলে। গায়ত্রী, উষ্ণিক্ প্রভৃতি সাত প্রকার ছন্দের প্রত্যেকটিই আর্ষী, দৈবী, আসুরী, প্রাজাপত্যা, যাজুষী, সাম্নী, আর্চী ও ব্রাহ্মী ভেদে আট প্রকার। পঞ্চদশাক্ষর ছন্দের নাম আসুরী গায়ত্রী। আট অক্ষর ছন্দকে বলে প্রাজাপত্যা গায়ত্রী। ষড়ক্ষর ছন্দ যাজুষী গায়ত্রী। দ্বাদশাক্ষর ছন্দের নাম সাম্নী গায়ত্রী। অষ্টাদশাক্ষর ছন্দেই আর্চী গায়ত্রী। গায়ত্রী ছন্দের পর হইবে উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ ও জগতী ছন্দ। উহাদের প্রত্যেকেরই যথাক্রমে গায়ত্রীর ন্যায় প্রকারভেদ বুঝিতে হইবে।

---

১ 'ঋক্‌প্রাতিশাখ্য'স্থ ছন্দজ্ঞানলাভের জন্য দ্রঃ The Rgveda Pratiśakhya by M.D. Sastri, volume III (English Translation), pp. 113-137 and 320-321; এই প্রসংগে বৈদেশিক ছন্দের বিশেষ প্রয়োজনীয় তথ্য Arnoldএর 'Vedic Metre' হইতে জানিবার জন্য দ্রঃ 'History of Classical Sanskrit Literature'—Krishnamachariar, pp. 898 900.

গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দের পাদে যে স্থলে অক্ষর সংখ্যা কম হইবে, সেই স্থলে ইয্, উব্ প্রভৃতি দ্বারা পূরণ করিতে হইবে। যেমন—

'তৎসবিতুর্বরেণ্যম্' এই গায়ত্রীপাদে আট অক্ষর স্থলে সাত অক্ষর হওয়ায় 'তৎসবিতুর্বরেণিয়ম্' এইরূপ পূরণ করিতে হইয়াছে। এইজন্য সূত্র 'ইযাদিপূরণঃ' (পিঙ্গল ৩।২)। গায়ত্রীর পাদে আট অক্ষর, জগতীর পাদে দ্বাদশ অক্ষর সকল সময়েই স্বীকার করিতে হইবে। ত্রিষ্টুভের পাদে একাদশ অক্ষর থাকিবেই। গায়ত্রী ছন্দ ত্রিপাদ ভিন্ন হইবে না, কারণ অষ্টাক্ষর চারি পাদে হয় অনুষ্টুপ্ ছন্দ। এ বিষয়ে পূর্বেই বলিয়াছি। এই গায়ত্রী আবার পাদনিচৃৎ, অতিপাদ-নিচৃৎ, নাগী, বারাহী, বর্ধমানা, প্রতিষ্ঠা, দ্বিপাদ এবং ত্রিপাদ ভেদে আট প্রকার। উষ্ণিকের লক্ষণ প্রাতিশাখ্যকৃত লক্ষণেরই অনুরূপ। ইহা ককুভ্, পুর উষ্ণিক্, পরোষ্ণিক্‌ভেদে তিন প্রকার। অনুষ্টুভের বিশেষ কোনো ভেদ নাই। পথ্যা, ন্যঙ্কুসারিণী (বা স্কন্ধোগ্রীবী বা উরোবৃহতী) উপরিষ্টাৎ, পুরস্তাৎ, মহা এবং সত(ঃ) ভেদে বৃহতী ছয় প্রকার বলা হইয়াছে। সত(ঃ), আস্তার, প্রস্তার, বিস্তার, সংস্তার, অক্ষর, পদ, পথ্যা, জগতী ভেদে পঙক্তি ছন্দ নয় প্রকার। জ্যোতিষ্মতী, পুরস্তাজ্জ্যোতি, মধ্যেজ্যোতি, উপরিষ্টাজ্জ্যোতি ভেদে ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী প্রত্যেকে চারি প্রকার।

ইহা ছাড়া, শংকুমতী ককুম্মতী, পিপীলিকামধ্যা, যবমধ্যা, ভুরিক্, নিচৃৎ, বিরাট্, স্বরাট্ প্রভৃতি ছন্দের আলোচনা ঋক্ প্রাতিশাখ্য ও পিঙ্গল ছন্দঃসূত্রে পাওয়া যায়। দেবতাদি দ্বারাও সন্দিগ্ধ স্থলের অনেক সময় ছন্দ নির্ণয় করা যায়। আদি শব্দের দ্বারা ('দেবতাদিতশ্চ' সূত্রে ৩।৬২) স্বর প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। দেবতা দ্বারা ছন্দ নির্ণয় করিতে হইলে কোন্ ছন্দের কোন্ দেবতা জানা আবশ্যক; সুতরাং দেবতা নির্ণয়ের জন্যই ঐ সূত্র করা হইয়াছে। গায়ত্রী হইতে জগতী পর্যন্ত পূর্বোক্ত সাত প্রকার ছন্দের ক্রমান্বয়ে অগ্নি, সবিতা, সোম, বৃহস্পতি, মিত্রাবরুণ, ইন্দ্র এবং বিশ্বদেব দেবতা (সূত্র ৩।৬৩)। গায়ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া জগতী পর্যন্ত সাত প্রকার ছন্দের স্বরও যথাক্রমে ষড্‌জ, ঋষভ, গন্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ ভেদে সাত প্রকার (সূত্র ৩।৬৪)। গায়ত্রী প্রভৃতি সাতটি ছন্দের বর্ণও যথাক্রমে নির্দিষ্ট হইয়াছে যেমন, সিত,

সারঙ্গ, পিশঙ্গ, কৃষ্ণ, নীল, লোহিত, গৌর। গায়ত্রী প্রভৃতি সপ্তবিধ ছন্দের গোত্র যথাক্রমে অগ্নিবেশ্য, কাশ্যপ, গৌতম, অঙ্গিরস, ভার্গব, কৌশিক ও বাশিষ্ঠ ভেদে সাত প্রকার।

একশত চারি অক্ষরে হয় 'উৎকৃতি' নামক ছন্দ। ১০০ অক্ষরযুক্ত ছন্দের নাম অভিকৃতি। উৎকৃতির উদাহরণ যজুর্বেদ হইতে—'হোতা যক্ষদশ্বিনী চ্ছাগস্য' (প্রথম পাদ) ইত্যাদি। অভিকৃতির উদাহরণ যজুর্বেদে—'দেবো অগ্নিঃ স্বিষ্টকৃৎ' ইত্যাদি। ৯৬ অক্ষর ছন্দের নাম সংস্কৃতি, ৯২ অক্ষর ছন্দের নাম বিকৃতি, ৮৮ অক্ষর ছন্দের নাম আকৃতি ও ৮৪ অক্ষর ছন্দের নাম প্রকৃতি, ৮০ অক্ষর ছন্দের নাম কৃতি, ৭৬ অক্ষর ছন্দের নাম অতিধৃতি, ৭২ অক্ষর ছন্দের নাম ধৃতি, ৬৮ অক্ষর ছন্দের নাম অত্যষ্টি, ৬৪ অক্ষর ছন্দের নাম অষ্টি, ৬০ অক্ষর ছন্দের নাম অতিশক্করী, ৫৬ অক্ষর ছন্দের নাম শক্করী, ৫২ অক্ষর ছন্দের নাম অতিজগতী।[১]

গায়ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিষ্টুপ পর্যন্ত ছন্দকে বলা হয় আর্যা ছন্দ এবং বেদের ন্যায় লৌকিক ছন্দেও ইহাদের ব্যবহার হইয়া থাকে। প্রত্যেক ছন্দেরই চারি ভাগের এক ভাগকে বলে পাদ। ন্যূনাধিক যত অক্ষর পাদ দ্বারা যে ছন্দের সমাপ্তি হয়, তত অক্ষরে সেই ছন্দের পাদ ধরিতে হইবে।

আর্যাছন্দের প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম গণ মধ্যগুরু হইবে না, ইহার ষষ্ঠ গণ হইবে মধ্যগুরু। কোনো কোনো স্থলে আর্যা ছন্দের ষষ্ঠগণ সর্বলঘুও হইবে। পথ্যা, বিপুলা, চপলা, মুখচপলা, জঘনচপলা, গীতি, উপগীতি, উদ্গীতি, আর্যা ভেদে আর্যা ৯ প্রকার। উপচ্ছন্দসক, আপাতালিকা, প্রাচ্যবৃত্তি, উদীচ্যবৃত্তি ও প্রবৃত্তক ভেদে বৈতালীয় ছন্দ ৫ প্রকার।

আর্যা প্রভৃতি ছন্দের মধ্যে যাহাতে নির্দিষ্ট মাত্রার সংখ্যা হইতে অক্ষরসংখ্যা কম হইবে, তাহাকে গুরু সংখ্যা ও তদ্ভিন্ন অন্যকে লঘু সংখ্যা জানিতে হইবে। একটি গুরুবর্ণের দ্বিমাত্রার জন্য গুরুবর্ণের সমাবেশ থাকিলে মাত্রার সংখ্যা হইতে

---

১ এই সকল ছন্দের উদাহরণের জন্য দ্রঃ পিঙ্গলছন্দঃসূত্রম্—সামাধ্যায়ি সম্পাদিত (১৯৩৫ সংস্করণ), পৃঃ ৪৪—৪৯।

অক্ষর সংখ্যা কম হয়। সেজন্য, কেবল লঘুবর্ণের সমাবেশ থাকিলেই লঘু সংখ্যা হইবে।

এখন বৃত্ত ছন্দের আলোচনা করা হইতেছে। 'জাতি' ও 'বৃত্ত' ভেদে ছন্দ দুই প্রকার। পূর্বোক্ত লৌকিক সকল ছন্দই কিন্তু জাতি। বৃত্তছন্দ তিন প্রকার—সম, অর্ধসম ও বিষম। যাহার প্রত্যেক পাদ সমান অর্থাৎ একই লক্ষণে লক্ষিত তাহাকে সম; যাহার অর্ধভাগ সমান ও এক লক্ষণে লক্ষিত তাহাকে অর্ধসম এবং যাহার সকল পাদই ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত তাহাকে বিষম বলে। সমবৃত্ত সংখ্যা দ্বারা সমবৃত্ত সংখ্যাকে গুণ করিলে যে সংখ্যা গুণফল হয়, তাহা দ্বারা বুঝিতে হইবে অর্ধসমবৃত্ত সংখ্যা। অর্ধসমবৃত্ত সংখ্যাকে অর্ধসমবৃত্ত সংখ্যা দ্বারা গুণ করিলে যে সংখ্যা গুণফল হয় তাহা দ্বারা বিষমবৃত্ত সংখ্যা নির্ধারিত হয়।[১]

বৈদিক ছন্দের আলোচনা শেষ করিবার পূর্বে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। উপনিষদের যুগে যে অনুষ্টুভ্ ছন্দ একটি বিশিষ্ট আকার লাভ করিয়া প্রায় এপিক ছন্দ শ্লোকের অনুরূপ হইয়া আসিতেছিল, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। ঋগ্বেদেও ঐ ধরণের ছন্দই পাই:—'বায়ুরস্ম উপমন্থাৎ পিনষ্টি স্ম কুনন্নম। কেশী বিষস্য পাত্রেণ যদ্রুদ্রেণ পিবৎসহ॥'

ছন্দ সম্বন্ধে মহাভষ্যিকার পতঞ্জলি যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। 'ছন্দোগ্রন্থোঽপ্যুপযুজ্যতে ছন্দোবিশেষাণাং তত্র তত্র বিহিতত্বাৎ। তস্মাৎ সপ্তচতুরাণি ছন্দাংসি প্রাতরনুবাকেঽনূচ্যন্তইতি হ্যাম্নাতম্। গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্ বৃহতীপংক্তিত্রিষ্টুব্ জগতীত্যেতানিসপ্ত ছন্দাংসি। চতুর্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী। ততোঽপি চতুর্ভিরক্ষরৈরধিকাষ্টাবিংশত্যক্ষ-রোষ্ণিক্। তথান্যত্রাপিশ্রূয়তে। গায়ত্রীভির্ব্রাহ্মণস্যাদধ্যাৎ ত্রিষ্টুব্ভীরাজন্যস্য জগতীভির্বৈশ্যস্যেতি। তত্রমগণ-যগণাদিসাধ্যো গায়ত্র্যাদিবিবেকং ন ছন্দোগ্রন্থমন্তরেণ সুবিজ্ঞেয়ঃ।...তস্মাদেতানি মন্ত্রেমন্ত্রে বিদ্যাদিতি শ্রূয়তে। তস্মাত্তদ্বেদনায় ছন্দোগ্রন্থ উপযুজ্যতে।'

---

১ অর্ধসমবৃত্ত ও বিষম বৃত্তের সংখ্যা নির্ধারণের জন্য দ্রঃ পিঙ্গলছন্দঃসূত্রম্ (সামাধ্যায়ি সম্পাদিত) পৃঃ ৯০-৯২)। ললিত, দ্রুতমধ্যা, ভদ্রবিরাট, কেতুমতী, আখ্যানিকী, হরিণপ্লুতা, অপরবক্ত্র, শিখা, পুষ্পিতাগ্রা, যবমতী প্রভৃতি ছন্দ ও তাহার উদাহরণ 'ছন্দঃসূত্রে' পাওয়া যায়।

ক্রৌঞ্চবিয়োগজনিত বাল্মীকির বেদনাবিধুর চিত্তের স্বতঃস্ফূর্ত যে ছন্দোবদ্ধ আবেগ বাণীমূর্তি লাভ করিয়াছিল, তাহাই যে শ্লোকরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া জগতে অমর কাব্যের সৃষ্টি করিল তাহা পূর্বেই বলিয়াছি।[১] ইহারই মধ্যে বোধ হয় বাল্মীকির আদি কবি নামের সার্থকতা নিহিত আছে। বাল্মীকিই ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত কাব্যের প্রথম রচয়িতা, এই ধারণা প্রচলিত আছে।

এপিক যুগের ছন্দোলক্ষণ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। এই যুগের কাব্যছন্দ তিন প্রকারের। এ সম্বন্ধে হপ্‌কিন্‌সের বিশ্লেষণ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। "The first is measured by syllables, the second by morae, the third by groups of morae. These rhythms ran the one into the other...Part of this development was reached before the epic began, but there were other parts, as will appear, still in process of completion. Neither of the chief metres in the early epic was quite reduced to the later stereotyped form. The stanza-form, too, of certain metres was still inchoate."[২]

রামায়ণ রচনার পর হইতেই ছন্দ-বিজ্ঞান বিশেষ প্রসার লাভ করে এবং ছন্দের মধ্যে এতই বৈচিত্র্য দেখা যাইতে থাকে যে ভরতকে নাট্যশাস্ত্রে ১৪ এবং ১৫ অধ্যায়ে ছন্দোবিচিতি আখ্যায় ইহাদের পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করিতে হইয়াছিল, সে কথাও পূর্বেই বলা হইয়াছে। Regnaud বলিয়াছেন : 'Bharata defines the tunes of a metre in quantities laghu or guru for fixed places. Kohala has a section on prosody. According to Bharta and Kohala, whose main sphere was histrionics, the rhythm of the metre must appear to be a spontaneous effusion of the thoughts and sentiments of the actor on the scene.'[৩]

---

১ নিষাদবিদ্ধাণ্ডজদর্শনোত্থঃ
শ্লোকত্বমাপদ্যত যস্য শোকঃ।
রঘুবংশ—১৪ সর্গ।

২ Great Epic, Chapter IV.

৩ La metrique de Bharata, A. M. G , 2, Paris.

পিঙ্গলকৃত 'ছন্দঃসূত্রে'র কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে বলা দরকার। 'He started the practice of measuring a metrical line with the help of the Trikas or the eight groups of three letters each.'[১] বৈদিক যুগের স্বরসঙ্গীত ও অপভ্রংশযুগের তালসঙ্গীত হইতে ক্লাসিক্যাল যুগের বর্ণসঙ্গীতের পার্থক্য পূর্বেই দেখাইয়াছি। অনুষ্টুভ্ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল ক্লাসিক্যাল ছন্দই বর্ণসঙ্গীতের ভিত্তিতে রচিত। পিঙ্গলের ছন্দঃসূত্রে প্রাতিশাখ্য যুগের ২৬টি প্রধান ছন্দশ্রেণীর কিছু কিছু sub-variety-র সংজ্ঞা দেওয়ার সর্বপ্রথম সার্থক চেষ্টা দেখা যায় এবং খুব সম্ভবত সেজন্যই পিঙ্গলকে সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রের জনক বলা হয়। বর্ণসঙ্গীতের উপর ভিত্তি করিয়া বর্ণবৃত্তের বর্ণনা ছাড়া ছন্দঃসূত্রে আরও তিন প্রকার প্রধান ছন্দ-বৈচিত্র্যের আলোচনা করা হইয়াছে যেগুলি "are based upon a negative form of the saṅgīta." এগুলির নাম আর্যা, বৈতালীয় এবং মাত্রাসমক। পরবর্তী ছন্দগ্রন্থগুলিতে এগুলির সকলকেই মাত্রাবৃত্ত বলা হইলেও পিঙ্গল ইহাদের ঐ নামে কোথাও অভিহিত করেন নাই। "Even the enumeration of the five mātrā gaṇa of four mātrās each, which are necessary for these metres, is peculiar in the case of Piṅgala. He describes them as though they were only another group of the Akshara Gaṇas, where the usual ta, na, ma and ya are dropped and a group of two long letters and another of four short letters are added."[২] বর্ণবৃত্তের মধ্যে যেগুলির lineগুলি ছয় অক্ষর অপেক্ষা কম সংখ্যাবিশিষ্ট পিঙ্গল সে সকল ছন্দের লক্ষণ করেন নাই। জয়দেব এবং ভরতও কিন্তু সংস্কৃতের ছন্দের বেলায় এই পথ অনুসরণ করিলেও প্রাকৃত পদ্যের বেলায় অপেক্ষাকৃত ছোট ছন্দের উদাহরণও দিয়াছেন। এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

পিঙ্গল ছয়টি প্রত্যয়ের মধ্যে মাত্র চারিটি প্রত্যয়ের উল্লেখ করিয়াছেন

১ The Age of Imperial Unity, p. 271.
২ ঐ p. 272.

বলিয়াছি। তিনি অধ্বন্‌কে একেবারে বাদ দিয়াছেন এবং পরবর্তী যুগের ছন্দগ্রন্থলেখকগণের প্রদত্ত হ্রস্ব দীর্ঘ অক্ষরের graphical representation কিন্তু তাঁহার গ্রন্থে মেলে না। এইজন্যই মনে হয় যে পিঙ্গল যখন তাঁহার সূত্রগুলি রচনা করেন, তখন ছন্দ লিখিয়া তাহার বিশ্লেষণ করার প্রথা বোধ হয় বিশেষ প্রচলিত ছিল না।

ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে' ছন্দের নাম মুদ্রাসহযোগে বলা হইয়াছে ১৬শ অধ্যায়ে। ৩২শ অধ্যায়ে প্রাকৃতকাব্যের ছন্দ লক্ষণ করিতে যাইয়া যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাও ভরতের নিজস্ব সৃষ্টি। কেননা প্রচলিত কোন প্রাকৃত কাব্য রচনা হইতে যে ঐগুলি ধার করা হইয়াছিল বলিয়া ত জানা যায় না। বৃত্তকে ভরত বলিয়াছেন পাঠ্য (to be recited), আর গীতকে বলিয়াছেন গেয় (to be sung)। প্রায়ই যে ছন্দের লক্ষণ দেখা যাইবে সেই ছন্দের stanza-তেই ছন্দের লক্ষণ বা সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। তবে কখন কখনও আবার এমন কি অনুষ্টুভ্‌ ছন্দেও তাহাদের লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। ভরতের সহিত পিঙ্গলের পার্থক্য কোথায়, সে সম্বন্ধে পূর্বেই জানাইয়াছি।

জয়দেব যে পিঙ্গলকে অনুসরণ করিয়াই তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, একথাও বলা হইয়াছে। প্রথমে তিনি বৈদিক ছন্দের লক্ষণ ও উদাহরণ দিয়া পরে মাত্রাবৃত্ত, বিষম এবং অর্ধসম বর্ণবৃত্ত, সমবর্ণবৃত্ত এবং পরিশেষে ৬টি প্রত্যয়ের কথা বলিয়াছেন। পিঙ্গলে পাই ৪টি প্রত্যয়, জয়দেবে কিন্তু ৬টি। পিঙ্গল 'অধ্বন্‌' প্রত্যয়ের নামও করেন নাই, কিন্তু জয়দেবের বৈশিষ্ট্যই এই 'অধ্বন্‌'।[১] ইহাতেই মনে হয় জয়দেবের সময় লেখা প্রচলিত ছিল, এবং বড় বড় কাঠের টুকরা, পাথর অথবা ধাতব board জাতীয় ফলকে অক্ষরগুলি লেখা হইত, এবং অক্ষরগুলির আকারও ছিল বেশ বড় বড়। জয়দেব 'employs in his metrical definitions single lines of the very metre which is being defined', কিন্তু পিঙ্গল সেক্ষত্রে কেবলমাত্র সূত্র

১ " Adhvan' is the space occupied by a given metrical line when written down, the rule being that each letter whether short or long, shall occupy the space of an Angula and that so much space shall also be left between any two letters."—The Age of Imperial Unity, p. 273.

প্রয়োগ করিয়াছেন। জয়দেব ছন্দের সংজ্ঞার মধ্যেই ছন্দের উদাহরণ দিয়াছেন, কিন্তু ভরত একবার সংজ্ঞা দেখাইয়া পরে পৃথক্ শ্লোকে তাহার উদাহরণ দিয়াছেন।

জনাশ্রয়ের 'ছন্দোবিচিতি'র উল্লেখ পূর্বেই করিয়াছি। ছয়টি অধ্যায়ে গ্রন্থটি সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বিষম, সম এবং অর্ধসম, বৃত্ত, জাতি, বৈতালীয় আর্যা এবং প্রস্তারের বিশদ আলোচনা আছে। পিঙ্গল যে যতির (Pause বা Caesura) প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন নাই, সেজন্য জনাশ্রয় পিঙ্গলের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। 'Janāsrayākāra uses Ganas or quantities of 2, 3, 4, and 5 letters (a letter is counted by the presence of a single vowel irrespective of the number of consonantal sounds in conjunction with it)"[১] এই গ্রন্থ এবং ইহার পদ্ধতি সাধারণ পাঠকের সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং নূতন বলিয়া উহাদের গণগুলি একটি তালিকার আকারে নিম্নে দেখান হইল :—

জনাশ্রয়ের সূত্র	প্রতীক প্রয়োজনীয় ব্যঞ্জন বর্ণ	প্রতীক স্বর	ছন্দের সাংকেতিক চিহ্ন বা symbol	পিঙ্গলের সূত্র ঐ পরিমাণ অক্ষরের জন্য	উদাহরণ	মন্তব্য
গঙ্গাস্	স্	নাই	⌣ ⌣	গ গ	বাণী	
নদীজ্	জ্	×	। ⌣	ল গ	পরা	
চন্দ্রপ্	প্	×	⌣ ।	গ ল	অস্তু	
নম্বর্	র্	×	। ।	ল ল	মম	
নূনংসাগ্	গ্	উ	⌣ ⌣ ⌣	ম গ ণ	বামাক্ষী	
কৃশাঙ্গীঙ্	ঙ্	ঋ	। ⌣ ⌣	য „	লতাঙ্গী	ঋ

১ History of Classical Sanskrit Literature, p. 905.

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধীবরাশ্	শ্	ঈ	⌣ । ⌣	র গ ণ	শ্রীকরা	
কুরুতেল্	ল্	উ	। । ⌣	স „	যুবতিঃ	
তেশ্রীকব্	ব্	এ	⌣ ⌣ ।	ত „	চোলেষু	
বিভাতিক্	ক্	ই	। ⌣ ।	জ „	বিভাতি	
সাতবৎ	ৎ	আ	⌣ । ।	ভ „	কাচন	আ [আৎ]
তরতিম্	ম্	অ	। । ।	ন „	সরসি	অ [অম্]
নচরতিদ্	দ্	নাই	। । । ।	ন ল „	বিহরতি	
কমলিনীয্	য্	নাই	। । । ⌣	ন গ „	কমলিনী·	
লোলমালায	ষ্	ও	⌣ । ⌣ ⌣	র গ	হারযষ্টিঃ	ও
ধৈর্যমস্তেট্	ট্	ঐ	⌣ । ⌣ । ⌣	র ল গ	কুঞ্চিতালকা	
রৌতিময়ুরোঞ্	ঞ্	ঔ	⌣ । । ⌣ ⌣	ম গ গ	শুদ্ধগুণাঢ্যা	
জয়নববরণ্ (?)	ণ্	নাই	। । । । । ।	ন ন	জয়তুজয়তু	

জনাশ্রয়ের ছন্দ ১৮টি সাংকেতিক সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই সূত্রগুলির প্রতীক তাহাদের শেষ অক্ষরগুলি। ইহাদের মধ্যে ১১টি সূত্র, শব্দের আদিতে যে স্বর আছে, তাহার দ্বারাই বিজ্ঞাপ্য।[১]

গঙ্গাদাসের[২] ছন্দোমঞ্জরীতেও প্রায় উপরের অনুরূপ আলোচনাই পাওয়া যায়। সেখানে বলা আছে—'পদ্যংচতুষ্পদী তচ্চ বৃত্তং জাতিরিতি দ্বিধা। বৃত্তমক্ষরসংখ্যাতং জাতির্মাত্রাকৃতা ভবেৎ॥ সমমর্ধসমং বৃত্তং বিষমঞ্চেতি তৎ ত্রিধা। সমং সমচতুষ্পাদং ভবত্যর্ধসমং পুনঃ॥' ইত্যাদি। 'গণ'গুলির লক্ষণ সম্বন্ধে একটি স্মারকশ্লোক দেওয়া হইয়াছে।

১ জনাশ্রয়ের 'ছন্দোবিচিতি'র বিশদ বিবরণের জন্য Krishnamachariar-এর History of Classical Sanskrit Literature এর পৃঃ ৯০৭-৮ দ্রষ্টব্য।

২ গঙ্গাদাসের বাসস্থান কোথায় ছিল জানিবার উপায় নাই। তবে তাঁহার উপাধি 'দাস' দেখিয়া তাঁহাকে কেহ কেহ বঙ্গদেশবাসী বলিয়া মনে করিয়াছেন।

'মস্ত্রিগুরুস্ত্রিলঘুশ্চ নকারো
ভাদিগুরুঃ পুনরাদিলঘুর্যঃ।
জো গুরুমধ্যগতো রলমধ্যঃ
সোঽন্তগুরুঃ কথিতোঽন্তলঘুস্তঃ ॥
গুরুরেকো গকারস্তু লকারো লঘুরেককঃ'।

লঘুগুরু বর্ণের সম্বন্ধে গঙ্গাদাস বলেন যে অনুস্বারযুক্ত দীর্ঘ, বিসর্গসংযুক্ত বর্ণ এবং সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্ণ হয় গুরু। পাদের অন্তস্থিত লঘুবর্ণ বিকল্পে গুরু এবং গুরুবর্ণ বিকল্পে লঘু হইয়া থাকে। পাদের অন্তস্থিত বর্ণের লঘু গুরু ব্যবস্থা হয় প্রয়োজনানুসারে।

যে যে স্থলে জিহ্বা স্বেচ্ছাপূর্বক বিশ্রামলাভ করে তাহাকে বলে 'যতি' উহা উচ্চারণ-সৌকর্যের জন্যই হইয়া থাকে। যতি ছন্দের সর্বত্র থাকে না পদান্তে থাকিলে তবেই চমৎকারের আতিশয্য ঘটে। পদমধ্যে থাকিলে উহা শোভা নষ্ট করে।

কালিদাসের নামে প্রচলিত[১] 'শ্রুতবোধ' সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্রের এক অভিনব সৃষ্টি। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে 'গণ' হিসাবে ছন্দের লক্ষণ নির্দেশ করা হয় নাই। শ্লোকে 'লঘু (হ্রস্ব), 'গুরু' (দীর্ঘ) অক্ষরের নির্দেশ দ্বারা ছন্দের প্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে এবং ছন্দের সংজ্ঞানির্দেশক শ্লোক (verse) ঐ ছন্দেই রচিত হইয়াছে। ইহাতে বৈদিক ছন্দ আলোচিত হয় নাই। ছন্দোমঞ্জরীতেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে।

এই গ্রন্থ হইতে জিজ্ঞাসু পাঠকদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য দু'একটি অংশ উদ্ধৃত করা হইল :—

'যস্যাস্ত্রিষট্সপ্তমমক্ষরং স্যাদ্ হ্রস্বং সুজঙ্ঘে নবমঞ্চ তদ্বৎ।
গত্যা বিলজ্জীকৃতহংসকান্তে! তামিন্দ্রবজ্রাং ব্রুবতে কবীন্দ্রাঃ ॥' ২০

অর্থাৎ 'জঙ্ঘাসুবৃত্তশালিনি মরালগমনে প্রিয়ে! প্রতি পাদক্ষেপে তুমি হংসকান্তি মলিন করিয়াছ, তোমাকে ইন্দ্রবজ্রাবৃত্তের পরিচয় দিতেছি।

---

১ দ্রঃ History of Sans. Lit—DasGupta & De, p. 740 fn. 5. (Vol. I).

হংসগতির মত যাহার তৃতীয়, ষষ্ঠ, সপ্তম ও নবমবর্ণ লঘু উচ্চারিত হয়, তাহাই মহাকবিগণের প্রিয় ইন্দ্রবজ্রাবৃত্ত।[১] যে কোন একটি চরণ Scan করিলেই দেখা যাইবে যে ইন্দ্রবজ্রার পাদের তৃতীয়, ষষ্ঠ, সপ্তম ও নবম বর্ণ ই কেবল লঘু হইবে। বাকী সকলেই গুরু :—যেমন,

'তা মি ন্দ্র ব জ্রাং ক্র ব তে ক বী ন্দ্রাঃ (শেষ চরণ)
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১

এখন — — ⌣ | — — ⌣ | ⌣ — ⌣ | — — ॥ বা 'ততজ গগ' অর্থাৎ 'স্যাদিন্দ্রবজ্রা যদি তৌ জগৌ গঃ' 'ছন্দোমঞ্জরীকৃত এই লক্ষণই আসিয়া পড়িল।

তোটকের লক্ষণে 'শ্রুতবোধ' বলিতেছে :—

স তৃতীয়কষষ্ঠমনঙ্গরতে! নবমং বিরতিপ্রভবং গুরুচেৎ। ঘনপীনপয়োধরভারনতে! ননু তোটকবৃত্তমিদং কথিতম্ ॥ অর্থাৎ ১২ অক্ষরের একটি পাদে যদি তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম এবং অন্ত্যবর্ণ গুরু হয়তো তাহাকে তোটকচ্ছন্দ বলা হইবে। অর্থাৎ তোটককে Scan করিলে এইরূপ দাঁড়াইবে :—

১ ২ ৩	৪ ৫ ৬	৭ ৮ ৯	১০ ১১ ১২
⌣ ⌣ —	⌣ ⌣ —	⌣ ⌣ —	⌣ ⌣ —
স	স	স	স

পিঙ্গলকৃত তোটকেরও এই চারিটি 'সগণ'ই থাকিবে।

উপরে উদ্ধৃত 'শ্রুতবোধে'র উদাহরণদ্বয় হইতেই বুঝা যাইবে যে এই গ্রন্থের রচয়িতা শুধু যে ছন্দের লক্ষণই দেখাইয়াছেন, তাহাই নহে, উদাহরণগুলির মাধ্যমে যে যে ছন্দের লক্ষণ দেখাইয়াছেন, সেই উদাহরণগুলিতে শৃঙ্গাররস চরম স্ফূর্তি লাভ করিয়াছে এবং ছন্দবর্ণনা করিতে যাইয়া অপূর্ব কাব্য জন্মলাভ করিয়াছে। অনেকগুলি ছন্দের নামকরণ কেন ঐরূপ হইল, কবির দৃষ্টিতে তাহারও অপরূপ সার্থকতা উদাহরণে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'শ্রুতবোধ'কার কালিদাসই হউন বা অন্য যিনিই হউন না কেন, গ্রন্থটি যথার্থ অন্বর্থনামা; ছন্দের লক্ষণ শ্রুত-মাত্রেই তৎসম্বন্ধে বোধ হয় বটে।

১ বসুমতী সিরিজ, তৃতীয় ভাগের ৫০২ পৃষ্ঠায় রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ কর্তৃক অনুদিত।

সংস্কৃত ছন্দ—বৈদিক ও লৌকিকের আলোচনা শেষ হইল। ছন্দগুলির কি মধুর নাম! প্রাকৃতিক বস্তুনিচয়ের সৌন্দর্য আকণ্ঠ ভরিয়া পান করিয়া এই ছন্দগুলিতে তাহারই ঝংকার তুলিয়াছেন কবিগণ। পর্বত, নদী, বন, জীবজগৎ, প্রসিদ্ধ পাত্রপাত্রী ও ঈশ্বরের নামানুকরণে ছন্দের নামকরণ হইয়াছিল—সংস্কৃত সাহিত্যের ইহা এক অভিনব বৈশিষ্ট্য ও অপূর্ব সৃষ্টি। ইংরেজী ছন্দের নামে এত বৈচিত্র্যও নাই, ছন্দের নামগুলির মধ্যেও নাই কোন সুর, ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা। মালিনী, হরিণী, প্রহর্ষিণী, অনঙ্গশেখর, বরযুবতী, হারিণী, মত্তা, প্রমদা, মন্দাক্রান্তা, প্রভাবতী—কি চমৎকার এই নামগুলি!

বৈদিক ছন্দের বৈশিষ্ট্য[১] দেখাইতে যাইয়া অধ্যাপক ম্যাকডোনেল বলিয়াছেন "Nearly all metres have a general iambic rhythm inasmuch as they show a preference for the even syllables (second, fourth, and so on) in a verse being long rather than short. In every metre the rhythm of the latter part of the verse (the last four or five syllables) called the cadence is more rigidly regulated than that of the earlier part. Verses of eleven and twelve syllables are characterised not only by their cadence, but by a caesura after the fourth or the fifth syllable, while verses of five and eight syllables have no such metrical pause. Verses combine to form a stanza or ṛc, the unit of the hymn........"

ছন্দ :—সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরাজী

সংস্কৃত ছন্দের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

প্রতীচ্য মনীষী Basham বলেন, "Metrically Sanskrit poetry was quantitative, and rigidly regulated. The normal stanza was one of four quarters, each of length varying from eight to twenty-one syllables, generally equal and unrhymed....these metres allowed little

১ এই প্রসংগে দ্রষ্টব্য: Vedic Metre—Arnold এবং 'Vedic Age'; A Vedic Grammar for Students, pp. 437-447.

or no scope for variation and their syllables were arranged in complicated patterns, usually of great beauty."[১]

ক্লাসিক্যাল ইউরোপের ছন্দগুলির ন্যায় ভারতীয় কাব্যের ছন্দও ছিল হ্রস্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের পরিমাণের বা সংখ্যার উপর নির্ভরশীল। ইংরাজী ছন্দে Stress বা শ্বাসাঘাতের উপরই প্রাধান্য, ভারতীয় ছন্দে কিন্তু তাহা নহে। ক্লাসিক্যাল ইউরোপের ভাষাগুলিতে অক্ষরকে দীর্ঘ বলা হইত তখনই যখন তাহাতে দীর্ঘ স্বর (long vowel) থাকিত। অথবা হ্রস্বস্বরের পর যদি দুইটি ব্যঞ্জনবর্ণ (Consonants) থাকিত, তাহা হইলেও অক্ষরকে বলা হইত দীর্ঘ। প্রথমটির উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় :—ā, ī, ū, ṝ, e, o, ai, or au অর্থাৎ আ, ঈ, ঊ, ৠ, এ, ও, ঐ এবং ঔ। "The favourite stanza form at all times was of four lines or 'quarter's (pāda), usually equal, and varying in length from eight to over twenty syilables each, with a full caesura between the second and third quarters. Most of the metres of classical poetry were set in rigid patterns and not divided into feet, but broken only by one or two caesura in each quarter."[২] কিন্তু বৈদিক ছন্দ[৩] এবং মহাকাব্যের শ্লোকচ্ছন্দে দেখা যায় যথেষ্ট বৈচিত্র্য।

ইউরোপের ছন্দ ও ভারতীয় ছন্দ

বৈদিক ছন্দের[৪] মধ্যে সর্বাধিক ব্যবহার দেখা যায় ত্রিষ্টুভের। ঋগ্বেদের পরবর্তীকালের সূক্তগুলির মধ্যে দেখা যায় অনুষ্টুভের প্রাধান্য। ইহা যে গায়ত্রীর ন্যায় অথচ গায়ত্রীর অপেক্ষা ইহাতে একটি পাদ বেশী থাকে তাহা পূর্বেই দেখাইয়াছি। বৈদিক যুগের

সংস্কৃত ছন্দের বিবর্তন

১ The Wonder that was India, p, 418; সংস্কৃত ছন্দের সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও বৈশিষ্ট্যের জন্য দ্রঃ Bharavi's Kiratarjuniyam, Canto XIII, by A. Sastri & M. Das, pp. 192-194 (Revised Second edition).

২ The Wonder that was India, p. 508.

৩ দ্রঃ ঐ p. 509.

৪ Arnoldর "Vedic Metre" হইতে প্রয়োজনীয় অংশের জন্য দ্রঃ Histoty of Classical Sanskrit Literature—Krishnamachariar, pp 808-809.

এই অনুষ্টুভ্ ছন্দ হইতেই এপিক যুগের সর্বপ্রিয় ছন্দ শ্লোকের[১] আবির্ভাব হইয়াছিল। উপদেশমূলক এবং বর্ণনাত্মক কবিতার জন্য বিশেষ করিয়া এই ছন্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

পরবর্তী যুগে প্রায় শতাধিক ছন্দের ব্যবহার হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে অনেকের নামই কাল্পনিক ছিল, অথচ তাহাদের মধ্যে ছিল সত্যই এক অপরূপ মাধুর্য। ছন্দোমঞ্জরীতে ছন্দের লক্ষণ দিতে যাইয়া যে সকল সংজ্ঞা করা হইয়াছে তাহাদের ছন্দ নির্ণয় করিলেই সেই সেই ছন্দের উদাহরণ মিলিবে।[২]

সংস্কৃতের আর্যাছন্দ ছিল মাত্রার সংখ্যার উপর নির্ভরশীল। কেবল 'গীতগোবিন্দে' জয়দেব যে সকল ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা এক

গীতগোবিন্দের ছন্দ

হিসাবে ব্যতিক্রম কারণ ছন্দগ্রন্থগুলিতে ঐ জাতীয় সকল ছন্দের লক্ষণ পাওয়া যায় না। খুব সম্ভব ঐ সকল ছন্দ প্রচলিত জনপ্রিয় সংগীত হইতে গৃহীত হইয়াছিল। Bashamএর মতে "The Stanzas of the lyric (গীতগোবিন্দ), excluding the refrain, consist of four quarters of nine, eight, nine and ten syllables respectively, all of which are short except the last rhyming syllable in the first and third quarters and the penultimate in the second and fourth".[৩]

ইংরাজী ছন্দশাস্ত্রের সম্বন্ধে বলা হয় যে ছন্দ নির্ভর করে দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের উপর :—(ক) The accentuation of syllables এবং (খ) The

ইংরাজী ছন্দের বৈশিষ্ট্য

number of accented syllables to a line ; এই accented বা উদাত্ত এবং unaccented বা অনুদাত্ত অক্ষর সমষ্টির নির্ধারিতভাবে বা বিশিষ্টভাবে মিলনের নামই পাদ (foot)। একটি পাদে অক্ষর সংখ্যা দুই বা তিন হইতে পারে কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই

১ "Sloka is free syllabic, a stanza of four padas in two verses (himistichs) of 16 Syllables restricted to guru and laghu syllables in some fixed places... Gana Chhandas has morae in groups etc."—Krishnamachariar. p 901-902.

২ সুপ্রসিদ্ধ ক্লাসিক্যাল ছন্দের উদাহরণের জন্য দ্রঃ The Wonder that was India. pp. 509-511.

৩ The Wonder that was India, পৃঃ ৫১২।

দুইএর কম এবং তিনের বেশী হইবে না—Iambus, Trochee, Anapaest ও Dactyl চারি প্রকার বিভিন্ন পাদযুক্ত ছন্দের উদাহরণ। Iambus-এ থাকে প্রথমে শ্বাসাঘাতহীন (unaccented) পরে শ্বাসাঘাতাত্মক (accented)। Trochee প্রথমে accented, পরে unaccented। Anapaest-এ প্রথমে দুইটি unaccented পরে accented; আর Dactylএ প্রথমে accented পরে দুইটি unaccented।[১]

ইংরাজী ছন্দে কোন একটি চরণের ছন্দ বিশ্লেষণ করিতে হইলে, সেটিকে প্রথমে বিভিন্ন পাদে বিভক্ত করা চাই এবং তাবপর বলিতে হইবে ঐ পাদ (foot) কি প্রকার বা কোন লক্ষণযুক্ত এবং ঐ lineএ কতগুলি ঐপ্রকার পাদ আছে। "In scanning a line two short syllables coming together are often pronounced as if they were one for the sake of the metre."

বাংলাভাষায় একটি কবিতায় যে কয়েকটি পাদ (চরণ) থাকে তাহা লইয়াই ছন্দ গণনা করা হয়। এই পদ একাক্ষরেও হইতে পারে, কিন্তু কেবল ব্যঞ্জনবর্ণে হয় না। স্বরযুক্ত ব্যঞ্জন অথবা কেবল স্বর দ্বারাই পদ সমাধা হইতে পারে, যেমন সে, দে, নে, অ, আ, ই ইত্যাদি। একাক্ষরা বৃত্তি লঘু ও গুরু ভেদে দুই প্রকার, যেমন, নি, ধ, প, ম, গ, রি, সা।

বাংলা ছন্দের বৈশিষ্ট্য

কন্যা (দ্ব্যক্ষরাবৃত্তি), কুমারী (ত্র্যক্ষরা), সতী (চতুরক্ষরা), পঙ্‌ক্তি (পঞ্চাক্ষরা) রসবতী (ষডক্ষরা), মধুমতী (সপ্তাক্ষরা), ভৃঙ্গাবলী (অষ্টাক্ষরা), দিগক্ষরা (দশাক্ষরা), মল্লিকামালা বা একাবলী (একাদশাক্ষরা)—এগুলি বাংলা ছন্দের প্রসিদ্ধ বৃত্তি।

এক একটি কবিতায় যতগুলি পদ থাকে, তাহা লইয়াই যে বাংলাভাষায় ছন্দ গণনা করা হয়, একথা বলিয়াছি। যেমন ত্রিপদী, চৌপদী, বিষমপদী ইত্যাদি। পয়ার ছন্দ এই নিয়মানুযায়ী দ্বিপদী। চারি চরণের কমে একটি শ্লোক হয় না। এই চরণ ও পদ এক নহে।

১ English Grammar Series, Book IV, J. C. Nesfield, p. 406.

চারি চরণের কোন চরণের শেষের শব্দের মিল থাকিলে উহাকে মিল বা মিত্রাক্ষর ছন্দ (Rhyme) বলা যায়। এই মিত্রাক্ষর ছন্দ আবার প্রথমসম অর্ধসম, পর্যায়সম ইত্যাদি ভেদে নানাপ্রকার। যে কবিতায় কোন পদের সহিত কোন পদের শেষ শব্দের সমতা দেখা যায় না, তাহাকে অমিল বা অমিত্রাক্ষর ছন্দ (Blank verse) বলে। সনেট ও অমিত্রাক্ষর বাংলা ছন্দের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

সনেট ও অমিত্রাক্ষর বাংলা ছন্দের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য

মিত্রাক্ষর ছন্দের প্রধান শাখা পয়ার (Couplet বা Distich)। এই ছন্দে সর্বসমেত ২৮টি অক্ষর থাকে, পূর্বার্ধে থাকে ১৪ ও পরার্ধে থাকে ১৪টি অক্ষর। পূর্বার্ধের ও পরার্ধের প্রথম চরণ প্রায়ই আট আট অক্ষরযুক্ত, শেষ চরণ ছয় ছয় অক্ষরযুক্ত হয়। প্রাচীন বাংলার সকল ছন্দের মূলেই আছে এই পয়ার।

বাংলায় সংস্কৃতানুযায়ী ছন্দের[১] প্রচুর ব্যবহার হইয়াছে। এই প্রকার মাত্রাবৃত্তি ছন্দ পজ্ঝটিকা, বিধুমালা, মধুমতী, ভাবিনী, আর্যা প্রভৃতি। বর্ণবৃত্তি ছন্দ যেমন গজগতি, দ্রুতগতি, তোটক, ভুজঙ্গপ্রয়াত, অনুষ্টুপ্, রুচিরা, ক্রৌঞ্চপদ, শশিবদনা, সমানিকা, নবমল্লিকা, পিকাবলী, চামর ইত্যাদি।

বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ

বাংলা ছন্দের বিবর্তন দেখাইতে যাইয়া মোহিতলাল বলেন :—"বাঙালীর ছন্দোবোধ জন্মিয়াছে রবীন্দ্রযুগে ; তাহার কারণ, তিনিই সর্বপ্রথম বাংলাভাষার সর্ববিধ ধ্বনিকে অফুরন্ত ছন্দলীলায় লীলায়িত করিয়া বাঙালীর কাণে ছন্দরস ও মনে ছন্দপিপাসার উদ্রেক করিয়াছেন বাংলা কাব্যের প্রথম শিল্পী কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র কিন্তু তাঁহার অব্যবহিত পরবর্তী যুগে তাহার সেই শিল্পাদর্শ, খাঁটি বাংলা-কবিতার হট্টগোলে বাঙালীর কান দুরস্ত করিবার অবসর পায় নাই। তারপর, বাংলা ছন্দ-সঙ্গীতের আকস্মিক ও অপূর্ব বিকাশ হইয়াছিল মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর

বাংলা ছন্দের বিবর্তন

১ উদাহরণস্বরূপ :—

পিঙ্গল্ বিহ্বল্ ব্যথিত নভতল্ কই গো কই মেঘ উদয় হও
সন্ধ্যার্ তন্দ্রার্ মূরতি ধরি মেঘ মন্দ্রমন্থর্ বচন্ লও। (মন্দাক্রান্তা)

ছন্দে।...... সর্বশেষে গিরিশ ঘোষের নাটকে সে ছন্দ মোক্ষলাভ করিয়া বাঙালীর কানকেও মুক্তি দিল।"[১]

বাংলা ছন্দ-রচয়িতৃগণের দিক্‌পালস্বরূপ মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল, সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুকান্ত ভট্টাচার্য। ছন্দশাস্ত্র বিষয়ক একটি রচনা রবীন্দ্রনাথের আছে, নাম 'ছন্দ'। দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন দিলীপকুমার রায় তাঁহার 'ছান্দসিকী' গ্রন্থে।

বাংলায় ছন্দকার

সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দের উপর একটি প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার নাম 'ছন্দসরস্বতী'। ছন্দ যে সত্যই 'পরিপূর্ণ' বাণীর সঙ্গীত সত্যেন্দ্রনাথ অপেক্ষা ইহা আর কে বেশী উপলব্ধি করিয়াছে? তাইত তিনি ছিলেন আমাদের ছন্দযাদুকর। ছড়ার ছন্দে সত্যেন্দ্রনাথ হসন্তের কৌশলে যে মাত্রাবৃত্তের উদ্ভাবনা করিয়াছিলেন, তাহা সত্যই অভিনব। সত্যেন্দ্রনাথ হসন্তযুক্ত অক্ষরকেই গুরু এবং সকল স্বরান্ত বর্ণকে লঘু ধরিয়া বাংলা কবিতায় সংস্কৃতের অনুকরণে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন। উহা ঠিক ছড়ার ছন্দ নয় বটে, তবুও কথ্য বাংলাভাষার উচ্চারণ বজায় রাখিয়াই, আমাদের কণ্ঠের হসন্তপ্রবণতাকেই কাজে লাগাইয়া তিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন এক নূতন ছন্দধ্বনি। কিন্তু এ ছন্দ একহিসাবে কৃত্রিম, কারণ বাংলা বাক্যের উচ্চারণে আদ্য ঝোঁককে কোন ক্রমেই আর কোথাও সরাইয়া লওয়া যায় না। এজন্য সত্যেন্দ্রনির্দিষ্ট ছন্দে ছন্দের কারুকলা বা কৃত্রিম ধ্বনিচাতুর্যই প্রধান হইয়া ওঠে, ফলে কাব্যপ্রেরণার আন্তরিকতা ক্ষুণ্ণ হয়। তবুও সত্যেন্দ্রনাথ[২] বাঙালী কবির একটা বহুকালের আকাঙ্ক্ষা কতকটা সহজ উপায়ে মিটাইতে চাহিয়াছিলেন।[৩]

সত্যেন্দ্রনাথের বাংলা ছন্দশাস্ত্রে অবদান

১ 'বাংলা কবিতার ছন্দ' পৃ: ৬; বাংলা ছন্দের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের জন্য দ্র: 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' পৃঃ ২১৮-২২৩।

২ সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দের নিপুণ বিশ্লেষণের জন্য দ্র: 'ছন্দোবিজ্ঞান' পৃঃ, ২২৩-২৩০।

৩ সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দবৈশিষ্ট্য বুঝিবার জন্য দ্রঃ 'বাংলা কবিতার ছন্দ', পৃ: ৫৪-৫৭, ৫৮-৬২ মধুসূদনের ছন্দ, ঐ পৃ; ৬৯, বাংলা ছন্দে মিল, ঐ পৃঃ ১৭০-১৭৩।

ছন্দশাস্ত্রের কয়েকটি প্রধান পারিভাষিক শব্দ

অর্ধসম—তাহাকেই অর্ধসম বৃত্ত বলা হইয়া থাকে যাহাতে তৃতীয় পাদ প্রথমপাদের ন্যায় এবং চতুর্থ পাদে দ্বিতীয় পাদের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। "ভবত্যর্ধসমং পুনরাদিস্তৃতীয়বৎ যস্য পাদস্তুর্যো দ্বিতীয়বৎ" (ছন্দোমঞ্জরী)। ইহার কয়েকটি উদাহরণ যথা—অপর বক্ত্র, পুষ্পিতাগ্রা, বিয়োগিনী ইত্যাদি।

গণ—ছন্দবিশ্লেষণের জন্য ছন্দশাস্ত্রকারগণ আটটি গণের উদ্ভাবন করিয়াছেন। গণ বলিতে অক্ষরসংখ্যাত পাদ বুঝায়, এবং প্রত্যেকটি গণে তিনটি করিয়া অক্ষর থাকে। ম, ন, ভ, য, জ, র, ত, স—এই আটটি গণ। বৃত্ত ছন্দের গণ দুই প্রকারঃ-এক অক্ষরের এবং তিন অক্ষরের।

গুরু—কোন অক্ষর দীর্ঘস্বর যুক্ত হইলে তাহাকে গুরু বলা হয়। আ, ঈ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও এবং ঔ দীর্ঘ বলিয়া গুরু; কিন্তু হ্রস্বস্বরও যদি অনুস্বার অথবা বিসর্গযুক্ত অথবা সংযুক্ত বর্ণসমন্বিত হয় তো তাহাকেও গুরু বলা হইয়া থাকে। পাদের অন্তস্থিত অক্ষর ছন্দের প্রয়োজনে হ্রস্ব বা দীর্ঘ হইতে পারে, অর্থাৎ লঘু বা গুরু বলিয়া তাকে প্রয়োজন অনুযায়ী গণনা করিতে হয়।

চরণ—"কবিতার পংক্তিকে আমরা চরণ বলিয়া থাকি কিন্তু পংক্তি মানেই চরণ নয়। ছন্দের পূরা মাপ যতখানি পাওয়া যায় ততখানিই 'চরণ'—চরণকে ভাগ করিয়া পংক্তির আকারে সাজানো যাইতে পারে।" (বাংলা কবিতার ছন্দ—মোহিতলাল মজুমদার, পৃঃ ৭)।

ছন্দ—"ছন্দস্" শব্দের মূল অর্থ আনন্দ দান করা। বাক্যের বা পংক্তির বিভিন্ন অংশের যে বিশেষ পারিপাট্য বা সামঞ্জস্য ভাষায় এক অনির্বচনীয় দোলা উৎপন্ন করিয়া ভাষাকে শক্তিশালী ও মনোজ্ঞ করে তাহাকে ছন্দ বা ছন্দস্পন্দ (rhythm) বলে। নিরুক্তকার যাস্ক বলিয়াছেন—'ছন্দাংসি ছাদনাৎ।' দুর্গাচার্য ইহার টীকা করিয়াছেন, "যদেভিরাত্মানমাচ্ছাদয়ন্ দেবাঃ মৃত্যোর্বিভ্যত-স্তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বম্"। কিন্তু 'ছদি' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ছন্দ শব্দের অর্থ 'আহ্লাদন'। সমস্ত অভিধানেই 'ছন্দ' শব্দের এই অর্থকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। পরে অর্থসংকোচন হইয়া প্রথমে শব্দটির অর্থ হয় 'আনন্দদায়ক

রচনা' এবং তাহার পর পদ্যের এক একটি প্যাটার্ণ বুঝাইতে শব্দটি ব্যবহৃত হইতে থাকে। (বাংলা ছন্দ : সুধীভূষণ ভট্টাচার্য পৃঃ ১-২)

জাতি—"বৃত্ত ছন্দের ন্যায় জাতি ছন্দও চতুষ্পদী। কিন্তু বৃত্ত ছন্দের সহিত ইহার প্রধান পার্থক্য হইল, অক্ষরসংখ্যার পরিবর্তে অক্ষরের মাত্রা সংখ্যা গণনা করিয়া এই ছন্দের গঠন নির্ণয় করিতে হয়। সেজন্য এই ছন্দের অন্য নাম মাত্রা ছন্দ। জাতি ছন্দ প্রধানত অসমপদী।" (বাংলা ছন্দ—সুধীভূষণ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৯)।

পদ্য—সুনির্দিষ্ট যতি পতনের ফলে পংক্তিতে স্পষ্ট ছন্দস্পন্দ উৎপন্ন হইলে তাহাকে পদ্য বলে। 'ছন্দোমঞ্জরী'তে পদ্যকে চতুষ্পদী বলা হইয়াছে। বৃত্ত এবং জাতিভেদে এই পদ্য দুই প্রকার।

পাদ—ইহাকে Macdonell বলিয়াছেন—"The metrical unit is the foot or quarter in the sense of the verse or line which is a constituent of the stanza." (A Vedic Grammar for Students).

বিষমবৃত্ত—'যে বৃত্তের চারিটি পাদের প্রত্যেকটি পরস্পর ভিন্ন তাহাকে বিষমবৃত্ত বলা হয়।' (ছন্দোমঞ্জরী)।

বৃত্ত—"এক শ্রেণীর সংস্কৃত ছন্দে পংক্তির কোন্ অক্ষর লঘু হইবে ও কোন্‌টি গুরু হইবে, তাহা সম্পূর্ণভাবে নির্দিষ্ট হইয়া পড়ে। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে ইহার নাম বৃত্ত-ছন্দ বা অক্ষর ছন্দ। বৃত্ত ছন্দ বদ্ধাক্ষর চতুষ্পদী ও প্রধানতঃ সমপদী। ('বাংলা ছন্দ' : সুধীভূষণ ভট্টাচায, পৃঃ ৭)। "বৃত্তমক্ষরসংখ্যাতম্" —'ছন্দোমঞ্জরী'। বৃত্ত শব্দে আবর্তন অর্থাৎ সামঞ্জস্যপূর্ণ পর্ব দৈর্ঘের বার বার আবর্তনের আভাস পাওয়া যায়।

মাত্রা—ন্যূনতম ধ্বনির পরিমাণকে মোহিতলাল মাত্রা বলিয়াছেন। 'Mātrā is a syllabic instant. There is a class of metres in Sanskrit regulated by the number of syllabic instants, one instant or Mātrā being allotted to a short vowel, and two to a long one."

লঘু—অক্ষরের স্বর হ্রস্ব হইলে লঘু বলা হয়। অ, ই, উ, ঋ এবং ৯ লঘু। পাদের অন্তেস্থিত অক্ষর প্রয়োজনানুযায়ী হ্রস্ব বা দীর্ঘ হইয়া থাকে।

সমবৃত্ত—যে বৃত্তের চারিটি পাদ সকলেই সমান তাহাকে সমবৃত্ত বলে।

গ্রন্থপঞ্জী

ইংরাজী ঃ

1. E. Arnold—Vedic Metre
2. A. B. Keith—A History of Sanskrit Literature
3. M. Winterniz—History of Indian Literature Vol 1.
4. M. D. Sastri—Ṛgveda Prātiśākhya Vol. III (Trans).
5. J. C. Nesfield—English Grammar Series BK. IV.
6. A. L. Basham—The Wonder that was India, pp. 501-512
7. Bose and Sterling—Rhetoric and Prosody
8. H. D. Velankar (ed)—Jayadāman
9. M. Krishnamachariar—History of Classical Sanskrit Literature
10. Bharatiya Vidya Bhavan Series :—
    a) The Vedic Age
    b) Age of Imperial Unity
    c) The Classical Age
11. Hopkins—Great Epics
12. Bhide—A Concise Sanskrit English Dictionary, pp. 1222-1228 (1st edn)
13. D. Kanjilal—Chandomanjari (Modern Book Agency)
14. Etymology of Yaska—S. Verma
15. Nirukta—(Eng. Trans.)—L. Sarup.

বাংলা ঃ

১) বাংলা কবিতার ছন্দ—মোহিতলাল মজুমদার
২) ছন্দোবিজ্ঞান—তারাপদ ভট্টাচার্য
৩) বাংলা ছন্দ—সুধীভূষণ ভট্টাচার্য
৪) বাংলা ছন্দের মূলসূত্র—অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়
৫) প্রবোধচন্দ্র সেন—ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ
৬) ছান্দসিকী—দিলীপকুমার রায়

৭) ছন্দ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮) কাব্য নির্ণয়—লালমোহন বিদ্যানিধি

৮) অগ্নিপুরাণ

৯) ছন্দোমীমাংসা—তারাপদ ভট্টাচার্য

১০) নিরুক্ত—অমরেশ্বর ঠাকুর (আশুতোষ গ্রন্থমালা), ১ম-২য় খণ্ড

১১) ছন্দসূত্রম্ (পিঙ্গলকৃত)—সামাধ্যায়ি সম্পাদিত

১২) ছন্দোমঞ্জরী—বিদ্যানিধি সম্পাদিত

১৩) শ্রুতবোধ—কালিদাস গ্রন্থাবলী ৩য় খণ্ড (বসুমতী সিরিজ)

১৪) ছন্দসরস্বতী—(কবি) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সংস্কৃত:

১) নিরুক্ত—যাস্কাচার্য

২) ঋক্ প্রাতিশাখ্য—শৌনক

৩) ছন্দঃসূত্র—পিঙ্গলাচার্য

৪) প্রাকৃত পিঙ্গল

৫) শ্রুতবোধ—কালিদাসের নামে প্রচলিত

৬) নাট্যসূত্র (শাস্ত্র)—ভরত

৭) ছন্দোমঞ্জরী—গঙ্গাদাস

নামনির্দেশিকা

নামনির্দেশিকা

[শুধু প্রধান প্রধান সংস্কৃত গ্রন্থ ও উহাদের রচয়িতৃগণের নাম এখানে লিখিত হইল। পার্শ্ব-লিখিত সংখ্যাগুলি পৃষ্ঠার নির্দেশক। তারকাচিহ্ন পাদটীকার নির্দেশক।]

গ্রন্থ

গ্রন্থকার